# ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ**

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

জাহানারা দেওয়ান

এম.ফিল

রেজি. নং: ২২০, শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ডিসেম্বর ২০১৯

*Dhaka University Institutional Repository*

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রতয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষক জাহানারা দেওয়ান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য পেশকৃত "ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। আমার জানামতে এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। যা তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক। এই অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে অন্যত্র ডিগ্রিলাভ অথবা প্রকাশনার লক্ষে ব্যবহৃত হয়নি।

গবেষণাকর্মটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করেছেন।

গবেষণাকর্মটি এম.ফিল ডিগ্রির জন্য সন্তোষজনক। ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০১৯

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে উক্ত শিরোনামে আর কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং আমার এ গবেষণাকর্মটি অন্য কোথাও ডিগ্রি লাভ কিংবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(জাহানারা দেওয়ান)
এম.ফিল
রেজি. নং: ২২০,
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

# কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের যিনি জগৎ সমূহের মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যার অপার মেহেরবানীতে "ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি যথাসময়ে উপস্থাপন সম্ভব হয়েছে। অজস্র দরূপ ও সালাম পেশ করছি তাঁর প্রিয় হাবীব রসূলে মকবুল হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসারী তাঁদের প্রতি।

বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদের প্রতি। যিনি আমার কর্মস্পৃহা দেখে বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র দৃষ্টিহীন নারী গবেষক হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর অধীনে গবেষণার সুযোগ প্রদান করেছেন। যার অকৃত্রিম উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ অভিসন্দর্ভটির গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায়, উপাধ্যায় ,বিন্যাস এবং এর ভাবলালিত্য পরিপূর্ণতা পেয়েছে তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায়। এম.ফিলের মত একটি জটিল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও তা সম্পাদনে যেখানে স্বাভাবিক ব্যক্তিবর্গ বহুলাংশেই অসমর্থ সেখানে সকল নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে থেকে একজন দৃষ্টিহীনকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্তিকরণ, সে তো এক বিরাট মহানুভবতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। তাই তো পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী ও আমার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরে আমি আমার তত্ত্বাবধায়কের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

এখানে আমি অধ্যাপক ড. আব্দুল মালেক, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাকী, অধ্যাপক ড. আব্দুল লফিত, ড. জহিরুল ইসলাম এবং জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান এম ডি রফিকুল ইসলামসহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি সর্বান্তকরণে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা আফিল উদ্দীন দেওয়ান ও মাতা অবলা বেগমকে যাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ ও দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। আমি আমার পিতার জান্নাতুল ফিরদাউস এবং মাতার নেক হায়াত ও সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করছি।

বিশেষত আমার শৈশবে ব্যাপটিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়ে (মিরপুর) ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষার্পণ থেকে শুরু করে মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট, বদরুন্নেসা কলেজ ছাত্রীনিবাস ও রোকেয়া হলের সকল

রুমমেটসহ যাদের সাহচর্য ও কর্মপ্রেরণা জীবনের এ কণ্টকাকীর্ণ পথে আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে আজ তাদের আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি।

এখানে উল্লেখ্য, রোকেয়া হলের যেসব শিক্ষার্থী কখনো শ্রুতি লিখন, কখনো ভয়েস রেকর্ড, কখনো দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে পড়ে শোনানো, আবার কখনো তথ্য সংগ্রহের স্বার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শতকষ্ট ও পরম সহিষ্ণুতার সাথে দিনের পর দিন আমার সাথে থেকে এ দূরূহ কাজটিকে আলোর মুখ দেখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তাদের নিকট আমি চিরঋণী।

আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে যে সকল লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। গবেষণাকর্মটির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতায়

জাহানারা দেওয়ান

## শব্দ সংকেতমালা

| | |
|---|---|
| অনু. | : অনুবাদ |
| অনু: | : অনুচ্ছেদ |
| অনূ. | : অনূদিত |
| (আ.) | : আলাইহিস সালাম |
| আল-কুরআন, ১:২ | : প্রথম সংখ্যা সূরা, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত |
| ই. ফা. বা. | : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ |
| ইমাম বুখারী | : আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা’ঈল আল-বুখারী |
| ইমাম মুসলিম | : আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন নিশাপুরী |
| ইমাম তিরমিযী | : আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী |
| আবূ দাউদ সুলায়মান | : আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস সিজিস্তানী |
| ইমাম নাসাঈ | : আহমদ ইব্ন শু‘আইব আন নাসাঈ |
| ইমাম মাজাহ্ | : আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী |
| খ. | : খণ্ড |
| খ্রি. | : খ্রিস্টাব্দ |
| জ. | : জন্ম |
| ড. | : ডক্টর |
| ডা. | : ডাক্তার |
| দ্র. | : দ্রষ্টব্য |
| পৃ. | : পৃষ্ঠা |
| পরি: | : পরিচ্ছেদ |
| প্রা. | : প্রাগুক্ত |
| মৃ. | : মৃত্যু |
| রহ./র. | : রহমতুল্লাহ আলাইহি |
| রা. | : রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু |
| (সা.) | : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম |
| Ed. | : Edition |
| P. | : Page |
| PP. | : Pages |
| Vol. | : Volume |

# সূচিপত্র


ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা................ ১

প্রত্যয়ন পত্র ........................................................................ ২

ঘোষণা পত্র........................................................................ ৩

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন.................................................................... ৪

শব্দ সংকেতমালা ................................................................ ৬

ভূমিকা ........................................................................ ১৬

প্রথম অধ্যায় ........................................................................ ২২

নৈতিকতা ও নান্দনিকতার ধারণা........................................................................ ২২

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নৈতিকতা ........................................................................ ২৩

(ক) পরিণতিমূলক মতবাদঃ ........................................................................ ২৪

(খ) পরিণতিমুক্ত মতবাদঃ ........................................................................ ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ধর্ম ও নৈতিকতা ........................................................................ ২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নৈতিকতা ........................................................................ ২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ নান্দনিকতা........................................................................ ২৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নান্দনিকতা ........................................................................ ৩১

বিশ্বপ্রকৃতির নান্দনিক আচরণ ........................................................................ ৩৩

গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন ........................................................................ ৩৪

দিবারাত্রির সংঘটন........................................................................ ৩৪

জোয়ার-ভাটা ........................................................................ ৩৫

ঋতু পরিবর্তন ........................................................................ ৩৫

বায়ু প্রবাহ........................................................................ ৩৫

আগুন-পানি........................................................................ ৩৬

জীবদেহের নান্দনিক শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য........................................................................ ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়........................................................................ ৩৮

মুসলিম স্থাপত্য ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী ........................................................................ ৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ: মহানবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগের স্থাপত্য........................................................................ ৩৯

কুবার মাসজিদ ........................................................................ ৩৯

মাদীনার মাসজিদ ........................................................................ ৪০
বসরার জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪১
কুফার জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪১
ফুসতাতের জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪২
**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উমাইয়া যুগের স্থাপত্য ........................................................................ ৪২**
কুব্বাতুস সাখরা ........................................................................ ৪৩
আল-আকসা মাসজিদ ........................................................................ ৪৩
দামেস্কের জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪৪
কর্ডোভার জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪৪
মিনইয়া প্রাসাদ ........................................................................ ৪৪
মাশাত্তা প্রাসাদ ........................................................................ ৪৫
**তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আব্বাসীয় যুগের স্থাপত্য ........................................................................ ৪৫**
সামাররার জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪৫
বাগদাদের জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪৬
ইবনে তুলুনের মাসজিদ ........................................................................ ৪৬
আবু দুলাফের জামে মাসজিদ ........................................................................ ৪৬
উখাইদির প্রাসাদ ........................................................................ ৪৬
বালকুয়ারা প্রাসাদ ........................................................................ ৪৭
কাসর আল আশিক ........................................................................ ৪৭
**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: উসমানীয় যুগের স্থাপত্য ........................................................................ ৪৭**
সুলতান আহমেদ মাসজিদ ........................................................................ ৪৮
সুলায়মানি মাসজিদ ........................................................................ ৪৮
কুব্বাত আন নবী ........................................................................ ৪৮
তোপকাপি প্রাসাদ ........................................................................ ৪৯
**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের স্থাপত্য ........................................................................ ৪৯**
মাদীনাতি আয যাহরা ........................................................................ ৪৯
আল ক্যাফেরিয়া প্রাসাদ ........................................................................ ৪৯
স্বর্ণ বুরুজ ........................................................................ ৫০
গ্রানাডা শহর ........................................................................ ৫০
আল হামরা প্রাসাদ ........................................................................ ৫০
**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সুলতানি ও মুঘল আমল ........................................................................ ৫১**
কুওয়াতুল ইসলাম মাসজিদ ........................................................................ ৫১
কুতুব মিনার ........................................................................ ৫১
দিল্লীর জামে মাসজিদ ........................................................................ ৫২

আগ্রার তাজমহল.....৫২

শালিমার উদ্যান.....৫৩

লাহোর দূর্গ.....৫৩

লাল কেল্লা.....৫৪

আগ্রা দুর্গ.....৫৪

**সপ্তম পরিচ্ছেদঃ সমকালীন মুসলিম স্থাপত্যঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ.....৫৫**

ষাট গম্বুজ মাসজিদ.....৫৫

বায়তুল মোকাররম মাসজিদ.....৫৬

কুসুম্বা মাসজিদ.....৫৬

ছোট সোনা মাসজিদ.....৫৭

আতিয়া মাসজিদ.....৫৭

গুঠিয়া মাসজিদ.....৫৮

লালবাগ কেল্লা.....৫৮

আহসান মঞ্জিল.....৫৯

বাঘা মাসজিদ.....৫৯

২০১ গম্বুজ মাসজিদ.....৬০

**অষ্টম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী.....৬০**

**ক্যালিগ্রাফির বৈচিত্র্যময়তা.....৬১**

কুফী লিপি.....৬১

নাস্‌খী লিপি.....৬২

সুল্‌স লিপি.....৬২

মুহাক্কাক লিপি.....৬৩

রায়হানী.....৬৩

তালিক.....৬৩

নাসতালিক.....৬৩

জুলফ-ই-আরুশ.....৬৩

শিকাস্‌তা.....৬৪

খত আল মানসুর ও খত্‌-আল-হুর.....৬৪

বিহারী.....৬৪

ঘুবার.....৬৪

দিওয়ানী.....৬৫

ইযাযা.....৬৫

তাজ.....৬৫

তুঘরা.....৬৫

সাক্বি......................................................................................................................৬৫

মূসান্না বা আয়নালী...........................................................................................................৬৫

খত আস সম্বুল.................................................................................................................৬৫

## তৃতীয় অধ্যায় ........................................................................................... ৬৭

**ইসলামী সাহিত্য ও সঙ্গীতের নন্দন-দর্শন ........................................................................ ৬৭**

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ কাব্য সাহিত্যে ইসলাম ............................................................................৬৮**

কাব্য সাধনায় পবিত্র কুর'আনুল কারীমের কতিপয় আয়াত ও হাদীসের ভাষ্যঃ.................................৭২

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মহানবী (সা.) ও তৎপরবর্তী সাহিত্য......................................................৭৫**

উমাইয়া সাহিত্য.............................................................................................................. ৭৮

আব্বাসীয় সাহিত্য ............................................................................................................ ৭৮

পারস্য সাহিত্য ................................................................................................................৭৯

শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদী.................................................................................................... ৮০

মহাকবি মুহাম্মাদ আবুল কাশেম ফেরদৌসী ........................................................................... ৮৩

মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী................................................................................................ ৮৪

আবুল ফাতহ উমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম ....................................................................... ৮৫

শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ (হাফিজ)............................................................................................... ৮৫

আল্লামা স্যার মুহাম্মাদ ইকবাল...............................................................................................৮৬

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্য .................................................................. ৮৭**

কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)................................................................................................ ৮৭

গোলাম মোস্তফা (১৮৫৭-১৯৬৪) ...........................................................................................৯০

কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮১৯-১৯৭৬)..............................................................................৯২

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) .............................................................................................৯৬

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সংগীত ও ইসলাম......................................................................................৯৯**

## চতুর্থ অধ্যায় ........................................................................................ ১০২

**ইসলামে শিক্ষার নৈতিক-নান্দনিক ধারাপাত .......................................................................... ১০৩**

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ শিক্ষার স্বরূপ ...........................................................................................১০৪**

আভিধানিকঃ....................................................................................................................১০৪

পারিভাষিকঃ ....................................................................................................................১০৬

শিক্ষার উদ্দেশ্য................................................................................................................১০৭

শিক্ষার লক্ষ....................................................................................................................১০৯

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞানান্বেষণ ....................................................১১০**

সকল জ্ঞানের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাঃ .............................................................................. ১১১

জ্ঞান অনুসন্ধানে মহান আল্লাহর তাগিদঃ ................................................................................ ১১১

জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদাঃ ........ ১১২

আল্লাহই সকল জ্ঞানের দিশারীঃ ........ ১১২

নবী রসূলগণের আগমন হয়েছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ........ ১১৩

শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ........ ১১৩

শিক্ষাদান পদ্ধতি ........ ১১৪

হাদীসের আলোকে জ্ঞান আহরণ ........ ১১৫

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ জ্ঞানার্জনের সিঁড়ি ........ ১১৭**

১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ........ ১১৭

২. অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ........ ১২১

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ আরবে ইসলামী শিক্ষার পটভূমি ........ ১২৭**

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ও মক্কার শিক্ষাকেন্দ্র সমূহঃ ........ ১২৮

২. হিজরতের পরবর্তী মাদীনার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ........ ১৩৪

৩. ইসলামে শিক্ষার শৈশবঃ ........ ১৩৫

**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ উপমহাদেশের তৎকালীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ........ ১৩৫**

সুলতানি আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ........ ১৩৬

মোঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ........ ১৩৭

ইংরেজ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ........ ১৩৭

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণ পদ্ধতি ........ ১৩৮**

উপযুক্ত পরিবেশ ........ ১৩৯

থেমে থেমে পাঠদান ........ ১৩৯

রেখাচিত্রের দ্বারা স্পষ্টকরণ ........ ১৪০

ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয় ........ ১৪০

গল্প বলার মিষ্টিভঙ্গি ........ ১৪০

উপমা দিয়ে বোঝানো ........ ১৪০

শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণ ........ ১৪১

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ........ ১৪১

আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন ........ ১৪১

গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি ........ ১৪২

বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ ........ ১৪২

প্রায়োগিক পদ্ধতিতে শিক্ষা ........ ১৪২

ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ........ ১৪২

শাস্তিদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান ........ ১৪২

## পঞ্চম অধ্যায় ........ ১৪৪

**ইসলামে চিকিৎসাস শৈলীর নান্দনিক সত্ত্বা ........ ১৪৪**

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে আরোগ্য লাভ...১৪৭**

জ্বর ...১৪৭

হৃদ রোগ ও বুক ব্যথা...১৪৮

রক্তক্ষরণ, প্রদাহ ও জখম নিরাময়ে খেজুর পাতার ছাই ...১৪৯

চক্ষু রোগের চিকিৎসায় কুম্বী...১৪৯

পোকা মাকড় ও বিচ্ছুর দংশন...১৫০

নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের প্রদাহ ...১৫০

পেটের পীড়া, ডায়রিয়া ও আমাশয়...১৫১

নিতম্বের ব্যথা ...১৫১

স্মরণশক্তি লোপ...১৫২

লোবান পরিচিতি...১৫২

শিঙ্গা বা হিজামা...১৫২

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বৃক্ষ-লতা ও ফলমূলের কার্যকারিতা...১৫৪**

খেজুর (Date palm) ...১৫৫

কালিজিরা (Black cumin)...১৫৬

ঘৃতকুমারী (Aloe vera)...১৫৬

হালিম (Cress)...১৫৭

ডুমুর (Fig)...১৫৭

লাউ (Groud)...১৫৮

মেথি (Fenugreek) ...১৫৮

সোনামুখী (Senna)...১৫৯

বিহিদানা (Quince)...১৬০

মেহেদীঃ (Henna)...১৬০

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানি, মধু ও দুধ ...১৬১**

রোগ নিরাময়ে পানি ...১৬১

মহা ঔষধরূপী যমযমের পানি...১৬১

রোগ নিরাময়ে মধু...১৬৩

রোগ মুক্তিতে দুধ ...১৬৪

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রোগ শোক আল্লাহর রহমতের নিদর্শন ...১৬৬**

**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ চিকিৎসা সেবায় ডাক্তারের ভূমিকা...১৬৮**

চিকিৎসা ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতাঃ...১৭০

**ষষ্ঠ অধ্যায়... ১৭২**

**ইসলামে জীবিকা নির্বাহে নৈতিক রূপরেখাঃ ... ১৭২**

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ শ্রেষ্ঠতম মানবদিগের জীবন-নির্বাহ**............১৭৪
খোলাফায়ে রাশেদীন ও অপরাপর সাহাবাদের জীবন নির্বাহ:............১৭৭
**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব**............১৭৮
হারাম উপার্জনসমূহ............১৮০
চুরির দ্বারা রুযি............১৮০
জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার............১৮১
ডাকাতি করে আয়............১৮১
মুক্তিপণ আদায়............১৮২
সুদী কারবারি বা বানিজ্য............১৮২
ব্যবসায় নেশাজাত দ্রব্য হারাম............১৮৩
জুয়া বা লটারি দ্বারা আয়............১৮৩
ঘুষের দ্বারা কামাই............১৮৩
ভাগ্য গণনা নিষিদ্ধ............১৮৪
পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন............১৮৫
আমানতের খিয়ানাত............১৮৫
মূর্তি বা ছবির ব্যবসা হারাম............১৮৬
গান ও বাদ্যযন্ত্র অবৈধ............১৮৭
হারাম ও মৃত প্রাণী বিক্রয় দ্বারা উপার্জন............১৮৮
জাদু দ্বারা আয় রোজগার............১৮৮
ওকালতি ও বিচারকার্যে অনৈসলামিক পথে আয় উন্নতি............১৮৯
তাবিজ ব্যবসায়ের বিধান............১৮৯
ভিক্ষাবৃত্তির হুকুম............১৯০
**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ হালাল উপার্জনের মাহাত্ম্য**............১৯০
হালাল উপার্জন ও তার ক্ষেত্রসমূহ:............১৯২
**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামে ব্যবসা**............১৯৬
ব্যবসায়িক নীতিমালা............১৯৮
সততা ও সত্যবাদিতা............১৯৮
হীন স্বার্থে ওজনে কম-বেশি দেয়া............২০১
আমানত রক্ষা............২০৩
আমানত রক্ষায় ইসলামী বিধান............২০৩
ধোঁকা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ............২০৫
মিথ্যা শপথ পরিহার............২০৬
ইসলামে ভেজাল মিশ্রণ বর্জনীয়............২০৮
**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ চাকরি**............২১২

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইসলামে কৃষি কাজ** ........ **২১৮**

**সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে শিল্পকর্ম** ........ **২২৪**

## সপ্তম অধ্যায় ........ ২৩০

**মুসলিম ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবন শৈলীতে ইসলামী নান্দনিকতা** ........ **২৩০**

**প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামে গৃহসজ্জা** ........ **২৩৫**

রুচিশীল পরিপাটি বাসগৃহ ........ ২৩৫

ইসলামে সুসজ্জিত আবাসস্থল ........ ২৩৬

ইসলামে ব্যবহার্য আসবাবপত্র ........ ২৩৯

স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ........ ২৩৯

একান্ততা ........ ২৪০

ধাতব বস্তু ও দামী পাথরসমূহ ........ ২৪০

খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র ........ ২৪০

ইসলামে শিশু খেলনা ........ ২৪১

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পানাহার** ........ **২৪২**

খাবার গ্রহণ ও শেষে পালনীয়: ........ ২৪৩

সহভোজী, সহপাঠী এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃবর্গের সাথে একত্রে আহারের নিয়ম ও ফযীলত ........ ২৪৫

বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালীন খাবারের নিয়ম ........ ২৪৭

আমন্ত্রিত অতিথিকে খাবার প্রদানের মাহাত্ম্য ........ ২৪৮

দাওয়াত প্রদান ও দাওয়াত কবুল ........ ২৪৯

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ঘুম** ........ **২৫১**

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পবিত্রতা অর্জন** ........ **২৬০**

পানির প্রকারভেদ ও তার হুকুম: ........ ২৬২

বিভিন্ন ধরণের পানির বিধান: ........ ২৬৩

শৌচালয়ের আদবঃ ........ ২৬৪

ইস্তিঞ্জার নিয়মাবলি: ........ ২৬৫

গোসলের ফরয: ........ ২৬৯

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইসলামে পোশাক ও সাজসজ্জা** ........ **২৭১**

পোশাক নির্বাচন: ........ ২৭১

নারীর মর্যাদাই পোশাক: ........ ২৭৪

সাজসজ্জা ও প্রসাধনী ব্যবহারে ইসলামের দিক নির্দেশনা: ........ ২৭৬

পরচুলা লাগানো: ........ ২৭৬

আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ........ ২৭৬

মাথায় চিরুনি করা: ........ ২৭৭

খোপা বাঁধা: ........ ২৭৭

নাক-কান ফোঁড়ানো: ........ ২৭৭

নারী ও পুরুষের সোনার আংটি ব্যবহার: ........ ২৭৮

রূপার আংটি ব্যবহার: ........ ২৭৮

পুরুষের খুশবু লাগানো: ........ ২৭৮

চোখে সুরমা: ........ ২৭৮

নূপুর পরা : ........ ২৭৯

মেহেদি লাগানো: ........ ২৭৯

স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা: ........ ২৭৯

স্ত্রীর মন খুশি করার জন্য স্বামীর সাজসজ্জা: ........ ২৭৯

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ঈমান ........ ২৮০**

ঈমানের রুকনসমূহ: ........ ২৮১

**সপ্তম পরিচ্ছেদ : তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ........ ২৯২**

তাকওয়া পরিচিতি ........ ২৯৩

পবিত্র কুরআনে তাকওয়া: ........ ২৯৫

**অষ্টম পরিচ্ছেদ : নিয়তের বিশুদ্ধতা ........ ৩০১**

বিশুদ্ধ নিয়তের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য: ........ ৩০৪

**নবম পরিচ্ছেদ : সবর ........ ৩০৭**

**দশম পরিচ্ছেদ : দোয়া বা যিকর ........ ৩১৩**

**একাদশ পরিচ্ছেদ : শোকর ........ ৩২১**

ক) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মারফত শোকরের পরিচয় ........ ৩২২

খ) মৌখিক শোকরের পরিচয়: ........ ৩২২

গ) আত্মিক শোকর: ........ ৩২২

**দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : তাওবা ও ইস্তিগফার ........ ৩২৫**

তাওবার গুরুত্ব: ........ ৩২৬

**নৈতিকতা ........ ৩৩৩**

**উপসংহার ........ ৩৩৪**

# ভূমিকা

মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে অতি নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। যে দিকেই তাকাই তাঁর সৃষ্টিলোকের অপার সৌন্দর্য আমাদের অন্তরাত্মাকে আন্দোলিত ও বিমোহিত করে। মানব হিতৈষী সমুদয় এ সৌন্দর্যের বিশালতার মাঝে অবগাহন করলে অন্তর্দৃষ্টি যেন বিস্ময়াভূত ও বিনয়াবনত হয়ে পড়ে।

পরম দয়াময় আল্লাহর সৃজনকর্ম যে কতটা সুনিপুণ, জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞানসম্মত তারই এক অনুপম (নান্দনিক) দৃষ্টান্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছে পবিত্র কুরআনুল কারীমের অত্যন্ত তাৎপর্যবহ নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে-
"তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কী? অতঃপর তুমি দৃষ্টি ফিরাও একের পর এক, সেই দৃষ্টি অবনমিত ও ক্লান্ত হয়ে তোমারই দিকে ফিরে আসবে।"[১]
আয়াতের অন্তর্নিহিত গুঢ়তত্ত্ব বা নান্দনিকতা অনেকটা এমন যে, কোন স্তম্ভ ব্যতীত সাত সাতটি আসমানকে সেই রাজাধিরাজ কি চমৎকারভাবেই না স্থাপন করেছেন, একে অপরের উপর খসে পড়ার ন্যায় বিশৃঙ্খলার লেশমাত্র যেখানে নেই। কারো পক্ষে সমগ্র নিখিল বিশ্বের কোথাও কোন অসঙ্গতি বা অবিন্যস্ততা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মহান রবের অন্তহীন রহস্যে ঘেরা সৃষ্টি সৌন্দর্যের নির্ভুলতাকে অবলোকন করতে গিয়ে মানব মস্তিস্ক যেন বারংবারই ক্লান্ত ও নিশ্চল হয়ে পড়ে।
কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশ্ব প্রতিপালকের সৃষ্টির নান্দনিকতা স্পষ্টত প্রতিভাত হয়েছে এভাবে- "যিনি তার প্রতিটি সৃষ্টিকে নির্মাণ করেছেন সুন্দরতম অবয়বে।"[২]
বিশ্বজাহানের প্রতিটি সৃষ্টিই মহান রবের পক্ষ হতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার সৃজনকর্ম এতোটাই নান্দনিক যে, সৃষ্টির প্রয়োজনানুসারে প্রতিটি বস্তু তিনি তৈরি করেছেন সবচেয়ে উপযোগী, গঠনশৈলী ও সর্বাধিক কার্যকর গুণাবলী সম্পন্ন করে। এসব নান্দনিকতা হৃদয়াঙ্গম করতে কুরআনুল কারীমের শক্তিশালী অপর আয়াতটিও অর্থবহ এবং যথার্থ গুরুত্বের দাবিদার- "তিনিই আল্লাহ তা'য়ালা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৩]

[১] আল-কুরআন ৬৭: ৩-৪
[২] আল-কুরআন ৩২: ৭
[৩] আল-কুরআন ৫৯: ২৪

নৈতিকতা ও নান্দনিকতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যা কিছু সত্য-সুন্দর ও শুভ তাই নান্দনিকতার নির্দেশক এবং তা সবার নিকট গ্রহণীয়ও বটে। মানুষের বিবেকবোধ ও নীতি-নৈতিকতার মাঝে নির্মল পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিপূর্ণ নন্দনবোধ বিকশিত হয়।

নান্দনিকতা মানবমনের এমন এক বিমূর্ত অনুভূতিসঞ্জাত বোধ যা দৃশ্যমান বস্তুজগতের বহির্কাঠামো ভেদ করে এর অন্তর্নিহিত রূপ ও প্রকৃতির সন্ধান দেয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও নন্দনবোধের মাঝে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিরাজমান; বস্তুর বাহ্যিক রূপ প্রত্যক্ষণ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী হলেও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অনুধাবন এক ইন্দ্রিয়াতীত বোধ। পক্ষান্তরে, নৈতিকতা হচ্ছে কোন কার্যের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের চেতনা যা মূল্যবোধের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যের চেতনা না থাকলে কোন কিছুর উপরই নৈতিক বিচার প্রয়োগ সম্ভব নয়। নৈতিক চেতনাই মানুষকে সৎকার্য সম্পাদন ও অসৎ কার্য পরিহারের প্রেরণা যোগায়। যিনি সকল নীতি-নৈতিকতার আঁধার সেই মহান রবের সৃষ্ট মানবকূলের প্রত্যেক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড যেন তাঁরই শেখানো নীতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই নীতিসিদ্ধ চিন্তা-চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে রসূল (সা:) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনে। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নৈতিক ও নান্দনিক বিচারে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং তাঁরই রঙে রঙিন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বান্দাহদের তাঁরই রঙে রঙিন হওয়ার আদেশ দিয়েছেন এভাবে-

"তোমরা বলো, আমরা গ্রহণ করেছি আল্লাহর রং। আল্লাহর রঙের চেয়ে কার রং অধিক উত্তম? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।"[৪]

আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়া মানে তাঁরই নির্দেশিত নৈতিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। এই আয়াতে রং এর বিশেষ তাৎপর্য হল- রং যেমন দেখলেই শনাক্ত করা সম্ভব, ঠিক একইভাবে যারা নৈতিক তাদের কথা, কাজ, আচরণই তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড। একজন প্রকৃত নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখলেই বুঝা যায় সে, আল্লাহর রঙে রঙিন। মানুষ এমন সব নৈতিক নান্দনিক গুণের কল্যাণেই সৃষ্টির সেরা, যা কিনা আর সব প্রাণিকূলের মাঝে অনুপস্থিত। মানুষ পরিচালিত হয় যুক্তি-বুদ্ধি ও নীতিবোধ দ্বারা। এ যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার ফলেই সে অসুন্দরকে ভুলে ন্যায়ানুগ ও সুন্দরকে গ্রহণ করে।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে নান্দনিক জীবনধারায় নৈতিকতার উপস্থিতি অনস্বীকার্য। আর এতেই মু'মিন ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবনশৈলীর প্রকৃত নৈতিকতা ও নান্দনিকতার বীজ নিহিত।

যেহেতু নান্দনিকতার উন্মেষের জন্য ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য, তাই নৈতিকতার বিবেচনা নন্দনসংক্রান্ত যেকোন দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচ্য হওয়া আবশ্যক। মানবসৃজিত কলাকৈবল্যবাদী নন্দনদর্শনের সাথে ইসলামী দর্শনের মৌলিক পার্থক্য নন্দনচেতনার সাথে নৈতিকতার অভেদ সম্পর্কের ধারণা। ইসলামী নন্দনবোধ কেবল বিচ্ছিন্ন

---

[৪] আল-কুরআন ২: ১৩৮

সৌন্দর্যবৃত্তির বীক্ষা নয়; ইসলামের নন্দনচেতনায় মানবাত্মার অপরাপর বৃত্তিসমূহ যেমন সত্য, প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণ এর ধারণাও নিগূঢ়ভাবে সংযুক্ত ও সমন্বিত। ইসলামের নন্দনব্যাখ্যার পরিধির কেন্দ্রে সৌন্দর্যান্বেষার সাথে নৈতিকতার অভিন্ন অবস্থান লক্ষণীয়।

নৈতিকবোধ সকল নান্দনিকতার আধার। যা কিছু নৈতিক তার সবটা নান্দনিক হলেও মানব মস্তিষ্ক প্রসূত যে নান্দনিকতা ইসলামে তার পুরোটা নান্দনিক নাও হতে পারে। ইসলামে নৈতিকতা ও নান্দনিকতা নির্মল স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় জীবনবোধের অন্তর্নিহিত রসাস্বাদনেরই প্রতিফলন। মু'মিন মুসলমানের জীবনশৈলীর পরতে পরতে প্রবহমান নৈতিকতা ও নান্দনিকতা সমন্বিত জীবনবোধের এক অমেয় স্রোতধারা।

নৈতিকতা ইসলামের আলোক স্তম্ভ, ইসলামী নন্দনতত্ত্ব তার বিচ্ছুরিত আলো। আবার ইসলামী জীবনধারায় নৈতিকতা যেন হৃৎপিণ্ড আর ইসলামী নন্দনবোধ এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনীতন্ত্র। এই ধমনীর তপ্ত শোনিত ধারা এর অঙ্গ-প্রতঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হৃৎপিণ্ড ব্যাধিগ্রস্থ হলে যেমন শরীর অচল হয়ে পড়ে,ধমনী সঠিক কার্যসম্পাদনে অক্ষম হয়ে যায় তেমনি নৈতিকতা ত্রুটিযুক্ত হলে মানুষের আদর্শিক মূল্যবোধ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, আর নান্দনিকতাও তার আসল রূপ হারায়। শরীরকে ভালো রাখতে যেমন হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর সার্বিক পরিচর্যা দরকার তেমনি নির্মল নির্ভেজাল এবং সুশৃঙখল বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলামী নন্দনবোধ সম্বলিত নৈতিকতার অধ্যয়ন তার সফল বাস্তবায়ন আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

এ নৈতিকতা ও নান্দনিকতার বহুমাত্রিক শাখা-প্রশাখার প্রভাব আমাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে। তন্মাধ্যে অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ কতিপয় শাখা-প্রশাখার উপর আলোচ্য গবেষণাকর্মে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

ইসলামে নন্দনবোধ ও নৈতিকতা বিষয় দুটি সমন্বিত সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম স্থাপত্য ও ক্যালিগ্রাফিতে এক নির্মল পবিত্রতার আবহ তৈরি করেছে। প্রতিটি জিনিসের সর্বোত্তম রূপদাতা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। তাই মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণে হুবহু চিত্রায়ণের পরিবর্তে ইসলামসিদ্ধ প্রতীকধর্মী চিত্রকর্ম ও ক্যালিগ্রাফির সংশ্লেষণ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের অন্তরে এক পরম সুখানুভূতির জন্ম দেয়। অনুভূতির এই গভীরতাকে সার্থক করে তুলতে ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইসলামী সাহিত্য ও সঙ্গীত যেন এক বৈতরণী সদৃশ। আর এ সাহিত্য ও সঙ্গীত নৈতিক নান্দনিক জীবনধারার প্রচ্ছদপটে আধ্যাত্মিকতার পবিত্র ছোঁয়া বান্দাহর হৃদয় মনকে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্যের মাহাত্ম অনুসন্ধানের পথে ধাবিত করে। ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সঞ্জীবনী শক্তি শিক্ষা যার পরিব্যাপ্তি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, সৃষ্টিলোকের অপার সৌন্দর্যানুসন্ধান করতঃ এটি বান্দাহর ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। শিক্ষার মতই ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে চিকিৎসা নামক আরেক চিরায়ত রোগনিরাময় প্রক্রিয়া। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসকের সেবা প্রদানের মাঝে মূলত নৈতিক নান্দনিক সম্পর্ক স্থাপনসহ আরোগ্য লাভে আল্লাহর স্মরণে বান্দাহ যতখানি নিমগ্ন হয়ে পড়ে নৈতিক নান্দনিক চেতনায় সিক্ত অন্তর ততখানি পূণ্যের পথে ধাবিত হয়। ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সাথে জীবননির্বাহ বিষয়টি পরিপক্ক ফল ও তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ঐ ফলের মিষ্টতা সদৃশ। ইসলাম জীবিকা নির্বাহের

ক্ষেত্রে মিষ্টতা রুপ নৈতিকতার সর্বোচ্চ স্ফুরণ ঘটানোর বিষয়ে জোর তাগিদ দিয়েছে। কেননা জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাঝেই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ তথা সমগ্র জাতির সফলতার বীজ নিহিত। মুসলিম ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবনশৈলীতে ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার রূপরেখা যেন এক ফুটন্ত ফুল ও তার মন মাতানো সুরভি বিশেষ। এখানে আল্লাহর ইবাদাতকে ফোটা ফুল এবং তার সুরভিকে পার্থিব-অপার্থিব কল্যাণ দেখানো হয়েছে। ফুলের সঠিক পরিচর্যার ফলেই সে যেরূপ অনাবিল সৌরভ ছড়ায়, তেমনি ইসলামী হুকুম আহকাম অনুসারে অত্যন্ত জীবন ঘনিষ্ট (গৃহসজ্জা, পানাহার, ঘুম, পবিত্রতা, পোশাক ও সাজসজ্জা, ঈমান, তাকওয়া, নিয়তের বিশুদ্ধতা, সবর, যিকর, তাওবা ও ইস্তিগফার) এ সমুদয় ইবাদাত যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই দোজাহানের প্রকৃত কল্যাণ লাভ সম্ভব।

ইসলামী চেতনাবোধের মমার্থে আল্লাহর অতি পছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে মানবজীবনে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার আবেদন দেহের শিরা-উপশিরার ন্যায় বেষ্ঠিত। তারই তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক সমগ্র সৃষ্টি ইসলামী নৈতিকতা ও নান্দনিকতার নির্যাস হৃদয়ে ধারণ করে পরিপূর্ণ জীবনদর্শনের সকল ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করবে এটাই ইসলামের মৌলিক দাবি।

গবেষণাকর্মটির অবয়ব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে এর বিষয়বস্তু চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ৭ টি অধ্যায়ে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে।

সারল্যের জ্ঞানবিচারে ইসলামে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার রূপরেখা বহুলাংশে এমন যে সুপেয় পানির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা যতটা প্রত্যাশিত ইসলামী জীবনাচরণে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার উপস্থিতি ততটাই কাঙ্ক্ষিত। অনুরূপ চন্দ্র, সূর্যের সৌন্দর্য তাদের বিকিরিত আলো আর ইসলামের সৌন্দর্য মানবজীবনে নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়ন। 'নৈতিকতা ও নান্দনিকতার ধারণা' শিরোনামে গবেষণা কর্মের প্রথম অধ্যায়ে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার একটি সাধারণ বিবৃতির রূপায়ন, ধর্ম ও নৈতিকতার নিবিড় সম্পর্ক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার স্বরূপ চিত্রায়িত হয়েছে। আবার গবেষণাকর্মটিতে অবতারণা হয়েছে মহাজাগতিক ও প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের মাঝে নিয়মতান্ত্রিকতার এমন সব অত্যাশ্চর্য বিষয়,যা থেকে নৈতিক ও নান্দনিক জীবনধারায় সূচিত হতে পারে এক স্বতন্ত্র ও নবতর অধ্যায়।

নন্দনশৈলীর দিক বিচারে মুসলিম স্থাপত্যকলা ও ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি সৌন্দর্যতত্ত্বের এক বৈচিত্র্যময় ধারা। স্থাপত্য একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনবোধের সাক্ষ্য বহন করে। মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপত্য মাসজিদ নির্মাণ শৈলী থেকে মুসলিম স্থাপত্য ও অলংকরণ শিল্পের অভ্যুদয় এবং কুরআন সংরক্ষণ প্রয়াস থেকেই ক্যালিগ্রাফি ও বাঁধাই শিল্পের সূত্রপাত। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও মুসলিম স্থাপত্য সমধারায় প্রবহমান এক অতি নান্দনিক শিল্পকর্ম। 'মুসলিম স্থাপত্য ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম শাসনামলে নির্মিত ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপনা ও ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। অত্র পর্যালোচনায় শিল্পদ্বয়ের নান্দনিক স্রোতধারা মনের মুকুরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলিম স্থাপত্যে বিজিত অঞ্চলের প্রভাব, নির্মাণ উদ্দেশ্য ও কৌশল, দুর্লভ মূল্যবান উপকরণ ও বিচিত্র মনোহারি অলংকরণ শৈলীর বর্ণনা মাধুর্য উক্ত অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। মুসলিম স্থাপত্য কীর্তির কর্মনৈপুণ্য এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যেমনি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ফুটে উঠেছে ক্যালিগ্রাফির নিখুঁত শৈল্পিক দৃশ্য ব্যঞ্জনা।

ইসলামের মর্মবাণী হৃদয়ে ধারণ পূর্বক নৈতিক নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন প্রকৃত মুমিন যে সাহিত্য ও সংগীত সাধনার ব্রত নেন তাই ইসলামী সাহিত্য ও সংগীত। গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে । 'ইসলামী সাহিত্য ও সংগীতের নন্দনদর্শন' শিরোনামে সাহিত্য ও সংগীতে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, তার স্বরূপ ও বিষয়বস্তু, কুরআনিক সাহিত্যমূল্য নিরূপণ এবং বিশিষ্ট সাহাবী কবিদের সাহিত্য কর্ম বিধৃত হয়েছে। মহানবী ও তৎপরবর্তী উমাইয়া, আব্বাসী ও পারস্য সাহিত্য জগতের স্বনামধন্য সুসাহিত্যিকগণের জীবনদর্শন ও সাহিত্য কর্মের সারসংক্ষেপ এখানে বর্ণিত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম সাহিত্য ও সঙ্গীতের ধারাকে যে সকল ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন নিবন্ধটিতে তাঁদের নান্দনিক জীবন-কর্মের সংযোজন ঘটেছে; সেই সাথে সংগীত সাধনায় ইসলাম কী নীতিমালা আরোপ করে তার তাত্ত্বিক দিক উপস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ও নান্দনিক গুণাবলীর বিকাশের অন্যতম প্রেষণার আধার। 'ইসলামে শিক্ষার নৈতিক নান্দনিক ধারাপাত' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার স্বরুপ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামের আলোকে জ্ঞান আহরণের তাৎপর্য ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া জ্ঞান চর্চার মাধ্যম ও ইসলামী শিক্ষার পটভূমিসহ তৎপরবর্তী ইতিহাস পর্যায়ক্রমিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সুন্দর ও নান্দনিক ভঙ্গিমায় শিক্ষার্পন ও উক্ত অধ্যায়টির প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে বান্দাহর সুস্থতালাভে পরম আশীর্বাদস্বরুপ, যা রোগকে সহনীয় ও তা থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে। 'ইসলামে চিকিৎসা শৈলীর নান্দনিক সত্তা' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে আরোগ্য লাভের উপায়-উপকরণ বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে অন্তর্ভুক্ত আছে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও রোগ-শোকে বৃক্ষরাজি-ফলমূলের ভূমিকা, মহৌষধরুপী পানি, মধু ও দুধের উপকারিতা এবং অসুখ-বিসুখের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। পাশাপাশি চিকিৎসককে তার মহত্তর (নান্দনিক) এ কর্মপন্থাটির প্রতি নিষ্ঠাবান হতে বিনম্র তাগিদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ আনুসারে পরিচালিত প্রতিটি কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য। বিশ্বজাহানে জীবনধারণের মতো ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর এ বিষয়টিতেও ইসলাম পরিষ্কার নীতিমালা দেখিয়ে দিয়েছে; যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবনব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। অভিসন্দর্ভটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে আল্লাহর প্রিয়তম ব্যক্তিবর্গের জীবনাদর্শ এবং আত্মনির্ভরশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত বিধৃত হয়েছে। 'ইসলামে জীবিকা নির্বাহে নৈতিক রুপরেখা' শিরোনামে এ অধ্যায়টিতে আরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে হারাম ও হালালের তাৎপর্যবহ পর্যালোচনা। ব্যবসা, চাকরী, কৃষি, শিল্পনির্ভর রুজি-রোজগারের বিষয়টি কতটা নীতি নৈতিকতার দাবিদার তাই অধ্যায়টির পরিশেষে স্থান পেয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে একমাত্র মানুষই নৈতিক ও নান্দনিক বিবেকবোধ সম্পন্ন; তাই এই বোধশক্তিকে (নি'য়ামতকে) জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো বান্দাহর অবশ্য করণীয়। 'মুসলিম ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনশৈলীতে ইসলামী নান্দনিকতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের জীবনধারার নান্দনিকতার মাহাত্ম আলোচিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর কলেবরকে দুইটি মৌলিক (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ) অংশে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাহ্যিক জীবনাচরণের মধ্যে গৃহসজ্জা, পানাহার, ঘুম, পবিত্রতা, পোশাক ও সাজসজ্জা অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে ঈমান, তাকওয়া, নিয়ত, সবর, দোয়া, শুকর, তাওবা ও ইস্তিগফার অভ্যন্তরীণ জীবনবোধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইসলামের নন্দনভাষ্যের সাথে অপরাপর নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদের বৈপরীত্যের দরুণ মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন সৃষ্টির প্রকৃত নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটির মূল লক্ষ্য ইসলামের

নৈতিকতা ও নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের আলোকে নন্দনবোধের প্রকৃত রূপ অনুধাবন ও ব্যাখ্যায়ন। ইসলামী নৈতিকতার আলোকে নন্দনচর্চায় ইসলামের দিকনির্দেশনানুসারে কোন গবেষণা কর্মসম্পাদিত হলে স্থাপত্য-ক্যালিগ্রাফি, সাহিত্য-সঙ্গীত, শিক্ষা-চিকিৎসা, জীবিকা-প্রাত্যহিক জীবন শৈলীতে নৈতিক নান্দনিক নন্দনমূল্য বিচারের পাশাপাশি ইসলামের নন্দনব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নিরসনের দ্বার উন্মোচিত হবে। ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতা বিষয়টি মানব জীবনের সাথে এতটাই প্রগাঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ যে তা ব্যাপক পরিসরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবিদার। তাই এর বিষয়বস্তুর পরিধির বিশালতা সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করে তৃষিত হৃদয়কে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করা নিতান্তই কঠিনসাধ্য, তা সত্ত্বেও আমার সীমিত জ্ঞান দ্বারা অনুসন্ধিৎসু বিদ্যানুরাগী পাঠকের জিজ্ঞাসু হৃদয়ের খোরাক জোগাতে অভিসন্দর্ভটিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের জানামতে, ইতোপূর্বে ইসলামী কৃষ্টি সভ্যতার নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য বিচারে নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের প্রেরণা সংবলিত অনুসন্ধানমূলক কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। অতএব এ বিষয়ে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হলে জ্ঞানের দুয়ারে এক নতুন সংযোজন হবে যা থেকে পাঠক, গবেষক, বিদ্যানুরাগীসহ সকল শ্রেণির মানুষ উপকৃত হবেন বলে আমি দারুণভাবে আশাবাদী।

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট রয়েছে পরিপূর্ণ জ্ঞান। হে পরওয়ারদিগারঃ আপনি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। আর আপনার প্রিয় হাবিব রসূলে মাক্বূল (সা.) এর প্রতি অজস্র দরুদ ও সালাম পৌঁছে দিন। (সুম্মা-আমীন)

## প্রথম অধ্যায়

## নৈতিকতা ও নান্দনিকতার ধারণা

নৈতিকতা শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো أخلاقية। শব্দটি একবচন, خلق থেকে আগত। যা خ ل ق বর্ণমূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র। আর নান্দনিকতার আরবী প্রতিশব্দ جمالي এটি جمال এর বিশেষণ। جمال অর্থ রূপ, শোভা, সৌন্দর্য, সুন্দর ইত্যাদি। আর جمالي অর্থ নান্দনিক, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সত্ত্বাগতভাবে সৌন্দর্যের আধার; মানবমনের নান্দনিকতার ধারণার স্রষ্টাও আল্লাহ তা'আলা। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেন: إن الله جميل يحب الجمال" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।"[৫] কিন্তু মানবাত্মার নন্দনচেতনা সত্ত্বেও আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপ অনুধাবন সাধারণ মানব মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতার অতীত। মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিচার বিবেচনা ও তাঁর মনোনীত জীবনব্যবস্থার নির্দেশানুসারে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং মানবনির্মিত শিল্পশৈলীর নান্দনিকতা অনুধাবন করতে পারে। ইসলাম একটি শাশ্বত জীবন বিধান মর্মে, নিখিল জাহানে সামগ্রিক জীবনাচরণে যে সর্বোত্তম দর্শন লক্ষণীয় তাই ইসলামী নৈতিকতা ও নান্দনিকতার বাস্তব প্রতিফলন।

সমাজ কাঠামোসৃষ্ট প্রচলিত প্রত্যয়ানুসারে, ইসলাম কেবল একটি ধর্ম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যেখানে মূর্ত-বিমূর্ত, আত্মিক-বাহ্যিক, ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত ও সমন্বিত। নৈতিকতা বিহীন নন্দনচর্চা ইসলাম অনুমোদন করে না; কারণ এরূপ নান্দনিকতা নানাবিধ বিকৃত মানসিকতার উন্মেষ ঘটায়। এমনকি অনেকসময় সামাজিক ব্যাধিরূপে বিস্তার লাভ করে। মূলত ইসলামী জীবনদর্শনে নৈতিকতা ও নান্দনিকতা একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানবজীবনের কোন ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নরূপে ব্যাখ্যার অবকাশ নেই তাই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত জীবনের প্রতিটি বিষয়েই নান্দনিকতা ও নৈতিকতার ধারণা বিরাজমান। ইসলামসিদ্ধ নান্দনিক অভিজ্ঞতা সামগ্রিক নন্দনতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা নৈতিকতার মোড়কে উন্মোচিত হবে।

[৫] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন নিশাপুরী (র.), *মুসলিম শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০০২, খন্ড: ১ম, অধ্যায়: কিতাবুল ইমান, পরিচ্ছেদ: অহংকারের বিবরণ ও তা হারাম হওয়া, পৃ. ১৫২ হাদীস নং-১৬৭

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ নৈতিকতা**

নৈতিকতা নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আর নীতিশাস্ত্র হলো আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। নৈতিকতা মানব প্রকৃতির এমন এক রক্ষাকবচ যা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং উচিত ও অনুচিতের পার্থক্য নিরূপণ করত এবং ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে বর্জনে মানবহৃদয়কে প্রভাবান্বিত করে। এটা মানবচরিত্রের সুকুমার বৃত্তিগুলোর পরিস্ফুটন ঘটিয়ে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করে দেয়। পরকল্যাণের আদর্শে মানুষের আচরণের ভালো বা মন্দ, ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ। মানুষের আচরণের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা এই বিজ্ঞানের কাজ নয়, বরং নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে আচরণের যথাযথ বিবেচনা করাই এর লক্ষ। নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণের মূল্য অবধারণ করে এবং পরমকল্যাণের স্বরূপ নির্ধারণ করে সেই আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের ঐচ্ছিক ও অভ্যাসজাত ক্রিয়ার যথার্থ নৈতিক মূল্য নিরূপণ করে। ব্যবহারিক অর্থে নৈতিকতা হচ্ছে এমন একটি গুণ যা ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের ভিত্তিতে বিবেকবান মানুষের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকা গ্রন্থে নৈতিকতার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "নৈতিকতা হলো দর্শনের এমন একটি শাখা যার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট নৈতিক আচরণ ও কার্যক্রমের সূত্র সম্পর্কে মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়।"[৬] এই মর্মে উইলিয়াম সিলি বলেন, "মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও কাজের ভালো, উচিত, ঠিক পরিভাষা গুলো নীতিশাস্ত্রের নৈতিকতার মানদণ্ডের দ্বারা নিরুপিত হয়।"[৭] আচরণের ভালো বা ঔচিত্যের আলোচনাই নীতিশাস্ত্র। এই শাস্ত্র আচরণের সাধারণ নিয়ম এবং ঔচিত্য বা অনৌচিত্য, ভাল বা মন্দ প্রবণতার প্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলির বিচার করে। একই আঙ্গিকে জি.ই. ম্যুর বলেছেন, "আমাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তাই হল আমাদের নীতিবোধ এবং শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হল আমাদের নৈতিকতা।"[৮]

অপরদিকে আবেগবাদী এ.জে. এয়ারের মতে, "আসলে নৈতিক ধারণা কোন ধারণাই নয়, এগুলো ছদ্ম ধারণা মাত্র। এ মতবাদে কোন কাজ ভাল বা মন্দ যেমন "সত্য বলা ভাল কাজ", আর মিথ্যা বলা মন্দ কাজ"- এ জাতীয় নৈতিক অবধারণ সত্য বা মিথ্যা বলা সম্পর্কে বক্তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ।"[৯] আবেগবাদীদের মতে, নৈতিকতার মূল্য নিরূপণে ব্যবহার্য নৈতিক শব্দ বা প্রতীকের কোন সত্তাগত মূল্য নেই। এসব সূচকের মাধ্যমে বক্তার আবেগ প্রকাশিত হয় বা এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রোতার মনে বিশেষ আবেগ বা মনোভাবের উদ্রেগ হয়। সেকারণে দার্শনিক পিটার সিঙ্গার বলেন, "নৈতিকতা থেকে অনৈতিকতাকে পৃথক করা একটি ভ্রমাত্মক প্রয়াস, কারণ যারা অপ্রচলিত নৈতিক বিশ্বাস মেনে চলেন, তারাও তাদের নিজস্ব নৈতিক আদর্শ অনুসরণে জীবনযাপন করতে

---

৬ মোঃ আলমগীর হোসেন, *নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন*, গুগল প্লাস পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০১৪. পৃ. ২৭

৭ মোঃ আলমগীর হোসেন, প্রাগুক্ত

৮ G. E. Moore, *Principle Ethica*, Cambridge:1968, Page: 6

৯ মোঃ আলমগীর হোসেন, প্রাগুক্ত, ২৭

পারেন।"[১০] অধ্যাপক নিউয়ার ও কিলিং বলেন, "নৈতিকতা হলো বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐ সকল কাজ যা মানুষের নৈতিক আচরণ, কর্তব্য এবং বিচার বিবেচনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে।"[১১] বিভিন্ন দার্শনিকের নৈতিকতা সংক্রান্ত মতবাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও এতে এই মূল বীক্ষা লক্ষণীয়, নীতির আলোকে পরিচালিত বিষয় ও কার্যাবলী সম্পৃক্ত জ্ঞানই নৈতিকতা এবং এ নৈতিকতা বিবেকবান মানুষের চরিত্রের উত্তম বিষয় যা প্রকৃত বিচারে কল্যাণমুখী। কোনো কার্যের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ফলে অন্তরে যে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর ভাবের সঞ্চার হয় তাকেই বলা হয় নৈতিক ভাবাবেগ। বস্তুত নিয়মের ভেতরে যা কিছু আমাদের মেনে চলা উচিত তাই নীতি আর সেই নীতির অধীনে থেকে আমরা যা কিছু করতে সক্ষম হই তাই নৈতিকতা।

নীতিশাস্ত্রে নৈতিকতা ও নৈতিক মূল্য নির্ণয় সংক্রান্ত মতবাদ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) পরিণতিমূলক মতবাদ

(খ) পরিণতিমুক্ত মতবাদ।

**(ক) পরিণতিমূলক মতবাদঃ**

এ মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কাজের "যথৌচিত্য" ও "অনৌচিত্য" নির্ণয়ের প্রকৃত মাপকাঠি, একটি কাজ মন্দের তুলনায় কতটুকু শুভ, উৎপাদনে সক্ষম, তার বিচার। অতএব, একটি কাজ নৈতিকভাবে উচিত হবে কেবল তখন যখন তা মন্দের তুলনায় অধিকতর শুভ ফল বয়ে আনবে; যদি কাজটি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে তা 'অনুচিত' হিসেবে পরিগণিত হবে। মুহাম্মাদ আবদুল হাই ঢালী এর আলোচনানুসারে-

পরিণতি মূলক মতবাদ "যথোচিত, "বাধ্যতাবোধ" ও নৈতিকভাবে ভালকে (morally good) অনৈতিকভাবে 'ভাল' (non-morally good) এর উপর নির্ভরশীল করে তোলে। একইভাবে ইহা নৈতিক মূল্য মতবাদকে (theory of moral values) অনৈতিক মূল্য মতবাদের (theory of non-moral values) উপর নির্ভরশীল বলে মনে করে। নৈতিকভাবে "যথোচিত" বা নৈতিক "ভাল" বলতে কি বুঝায়, তা জানতে হলে, আমাদের প্রথমে জানা উচিত অনৈতিক অর্থে "ভাল" কি। পরিণতিবাদীরা অনৈতিক অর্থে "ভাল" বলতে কি বুঝায়, তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকেন। তারা অনেক সময় সুখবাদীদের (hedonists) মত ভাল কে "আনন্দ" (pleasure) এবং মন্দকে "বেদনার" (pain) সাথে একার্থবোধক মনে করেন। আবার অনেক সময় তারা অসুখবাদীদের মত "ভাল" কে জ্ঞান, (knowldege) "পূর্ণতা" (perfection) ইত্যাদির সাথে একার্থবোধক বলে গণনা করেন।

তবে ভাল উৎপাদনে ব্যক্তির নিজের নাকি সমষ্টির জন্য ভাল বিবেচ্য- এ নিয়ে পরিণতিবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আত্মস্বার্থবাদীদের, প্রধানত ইপিকিউরাস, হবস এবং নীটশের মতে ব্যক্তির নিজের জন্য যা অধিকতর ভাল,

---

[১০] প্রাগুক্ত, ২৭

[১১] মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ঢালী, *নীতিবিদ্যা: আদর্শনিষ্ঠ ও পরা-নীতিবিদ্যা*, ক্ষণিকা, বৈশাখ ২৬, ১৩৮৮, পৃ.: ১৪

তাই তার করা উচিত। অর্থাৎ কোন কাজ যথোচিত হবে যখন এটি মন্দের তুলনায় অধিকতর ভাল ফল দেবে এবং অনুচিত হবে যখন এর বিপরীতটি ঘটবে। উপযোগবাদী বেন্থাম এবং মিলের মতে, কাজের মাধ্যমে বেদনার তুলনায় অধিকতর আনন্দ লাভ করা-ই প্রকৃত শুভ।

**(খ) পরিণতিমুক্ত মতবাদঃ**

এ মতবাদ অনুযায়ী কোন কাজের 'মান' বা 'ফল' ব্যতিরেকেও এর ভাল মন্দ বিচার করা যেতে পারে। পরিণতিমুক্ত মতবাদীরা মনে করেন যে, একটি কাজের ভাল বা মন্দ ফলাফল ছাড়াও কাজটির নিজস্ব পদ্ধতির বা উদ্দেশ্যের বিচারে তার 'যথোচিত' বা অনুচিত বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিণতিমুক্ত মতবাদকে সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: যথা:

i) কার্য পরিণতিমুক্ত মতবাদ

ii) নিয়ম পরিণতিমুক্ত মতবাদ

কার্য পরিণতিমুক্ত মতবাদ অনুযায়ী কার্যনির্ধারণ একটি বাধ্যতামূলক বিষয় যেমন, "এই পরিস্থিতিতে আমার এগুলো করা উচিত। কঠোর কার্য পরিণতিমুক্তবাদী যেমন ই.এফ.ক্যেরিট ও এইচ.এ. প্রিচার্ডের মতানুসারে, "আমরা প্রত্যেকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে অবশ্যই দেখব বা পৃথকভাবে ঠিক করবো-কি করা আমাদের যথোচিত বা বাধ্যতামূলক; এখানে আমরা কোন নিয়মের প্রতি তাকাব না বা বিবেচনা করবো না কাজটির দ্বারা মন্দের তুলনায় নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য কতটুকু শুভ ফল লাভ হল।"[১২]

অর্থাৎ, তারা স্বতন্ত্র ও বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে কার্যের আবশ্যকতা নির্ধারণ করেন। পক্ষান্তরে উদারপন্থী কার্য পরিণতিমুক্ত মতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিয়ম গঠন করা সম্ভব। ফলে একই পরিস্থিতিতে পরবর্তী সময়ে কি করা উচিত তা নির্ধারণ করা, অর্থাৎ একটি সার্বিকীকৃত নিয়ম প্রণয়ন করা সম্ভব হতে পারে যদিও তারা বিশ্বাস করেন যে, সার্বিক নিয়মে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা উচিত নয়।

অপরপক্ষে নিয়ম-পরিণতি-মুক্ত মতবাদীরা মনে করেন যে, 'যথোচিত' 'অনুচিতের' মাপকাঠি একটি স্থূল নিয়ম (যেমন আমাদের সর্বদাই সত্য কথা বলা উচিত) অথবা একটি সূক্ষ্ম নিয়ম দ্বারা গঠিত হতে পারে। অবশ্য পরিণতিবাদীদের বিরুদ্ধে এরা বলেন যে, এই সমস্ত নিয়ম-কানুনের যথার্থতা "ভাল" বা "শুভ" উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয়। ক্লার্ক, প্রাইস, রস ও কান্টের মতানুসারে, এ নিয়মগুলি মৌলিক এবং ক্ষেত্রবিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়।

---

[১২] মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ঢালী, প্রাগুক্ত

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ধর্ম ও নৈতিকতা

মানব আচরণের অন্যতম প্রধান নির্ধারক মানুষের স্বজ্ঞাজাত ও ক্ষেত্রবিশেষে স্বীকৃত প্রথালব্ধ নৈতিক বোধ অনাদিকাল হতে অনুসরণীয় নৈতিক আর্দশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। সভ্যতার উষালগ্ন হতে নৈতিকতার সর্বজনগ্রাহ্য ও প্রথাবদ্ধ রূপ প্রদানের অন্যতম কাঠামো ছিল ধর্ম। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি নৈতিক বোধ ও মূল্যের প্রকাশ। নীতিদর্শনেও ধর্ম ও নৈতিকতার সাযুজ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি বিশেষ আলোকপাত লক্ষণীয়। বুদ্ধিবাদী রেনে দেকার্তের মতে, "ধর্ম হতেই নীতি ও নৈতিক আদর্শের উৎসারণ।"[১৩] "অভিজ্ঞতাবাদী জন লকের দর্শনেও ধর্ম ও নৈতিকতার সমধর্মী সম্পর্ক লক্ষণীয়। তবে কান্টীয় দর্শনে ধর্ম ও নীতির সম্পর্কের ক্রম ও কারণ লকীয় দর্শন হতে ভিন্ন। কান্টের মতে, ধর্ম হতে নীতি নয়, বরং নীতি হতেই ধর্মের উদ্ভব।"[১৪]

নীতি ও ধর্মের সম্পর্ক ও ক্রম বিষয়ক মতবাদকে তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:[১৫]

(১) প্রথম মতবাদ অনুসারে ধর্ম থেকে নীতির উদ্ভব ঘটেছে। এ মতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা নিজের ইচ্ছায় নীতি সৃষ্টি করেন ও মানুষের চিন্তার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। মানবজীবনে নীতির উপযোগিতা ব্যাখ্যায় এ মতবাদ নৈতিক আচরণের ফলস্বরূপ পুরস্কার ও অনৈতিক আচরণজনিত শাস্তির ধারণার অবতারণা করে। অর্থাৎ মানুষ যদি সৃষ্টিকর্তার বিধি-নিষেধ মেনে চলে তবে সে কৃপা লাভ করতে পারে, আর না মানলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। সেজন্য এ মতবাদ অনুযায়ী, সৃষ্টিকর্তার আদেশ ও নিষেধ-ই ন্যায়নির্ধারক; কাজেই ধর্ম থেকে নীতির জন্ম।

(২) দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে নীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়। কান্ট, মার্টিন প্রমুখ নীতিবিদ এই মতবাদের প্রবক্তা। আমাদের প্রথাগত বিশ্বাস এই যে, মানুষ সৎ আচরণ করলে সুখ পায়, আর অসৎ আচরণ করলে শাস্তি পায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক সময় সৎ ব্যক্তি সুখী এবং অসৎ ব্যক্তি অসুখী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। এজন্য কান্ট বলেন যে, সাধুতার সাথে সুখের বিশ্লেষক সম্পর্ক নয়- বরং সংশ্লেষক সম্পর্ক। কান্ট মনে করেন যে, সদাচরণে যদি সুখ না আনে এবং অসদাচরণ যদি দুঃখ না আনে, তবে নৈতিকতার কোন মূল্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় ।তাই তিনি মনে করেন যে, বিশ্বের অন্তরালে এমন নৈতিক সত্তা আছেন যিনি সৎকাজের সাথে সুখ এবং অসৎ কাজের সাথে দুঃখের সংযোগ সাধন করেন। এই জগতে সৎ কাজের সাথে সুখ এবং অসৎ কাজের সাথে দুঃখের সংযোগ না ঘটলে তিনি পরবর্তী জীবনে সৎ ব্যক্তিকে সুখী এবং অসৎ ব্যক্তিকে অসুখী করবেন। এই নৈতিক শক্তির উৎস সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই নৈতিক বাধ্যতাবোধের উৎস। কাজেই নীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি এবং নৈতিকতার ধারণার পূর্ণতার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন।

---

[১৩] ড. রশীদুল আলম, *নীতিবিদ্যা পরিচয়*, মেরিট কেয়ার প্রকাশন, ৪র্থ মূদ্রণ, জানুয়ারী ১৭, পৃ.: ১৯

[১৪] প্রাগুক্ত পৃ. ৪০

[১৫] প্রগুক্ত পৃ. ৪০-৪১

(৩) তৃতীয় মতানুসারে ধর্ম ও নীতি পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রত্যয়। কোনো পরমসত্তার নির্ভরতা থেকে ধর্মের উৎপত্তি। প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায় মানুষ তার নিজের মধ্যে পরমশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। পরমসত্তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাকুলতা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু নীতিশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের বিবেক থেকে। মানুষের বিবেক তার সামনে একটি নৈতিক আদর্শ তুলে ধরে এবং সেই সাথে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সে এই আদর্শ অনুসরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মানুষের বিচারবুদ্ধি তার নৈতিক জীবনকে মহৎ ও উন্নত করার লক্ষ্যে তাকে অনুপ্রাণিত করে। নীতি ও ধর্মের উৎস স্বতন্ত্র হলেও উভয়ে পরস্পরের ওপর ক্রিয়া করে ও প্রভাব বিস্তার করে। উভয়ের মধ্যে কিছু বিষয়ের পার্থক্য থাকলেও নীতি ও ধর্ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নৈতিকতা**

ইসলামের মৌলিক দর্শন ও দীক্ষার সাথে নৈতিকতা সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য: ইসলাম মানব আচরণের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যার মৌলিক কাঠামো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিশাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত। অনুরূপভাবে নীতিশাস্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে মানব আচরণের নৈতিক বিধান। "নীতিশাস্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আর ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। কুরআনভিত্তিক নীতিশাস্ত্রই হচ্ছে মূলত ইসলামী জীবনবিধান।[১৬]

ইসলামের নৈতিকদর্শনের কেন্দ্রে শুভ ও সত্যের প্রতি মানুষের প্রকৃতিগত আকাঙ্ক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ দৃশ্যমান। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে 'ফিতরাত' মানবসত্তায় গ্রোথিত অর্থাৎ মানুষ স্বভাবতই নীতিপূর্ণআচরণগামী। অতএব, যেসব আচরণ সত্তাগত শুভবোধের পরিচায়ক (যেমন সত্যকথন, নিষ্ঠাচার) ব্যক্তিক ও সামষ্টিক কল্যাণের নিয়ামক, সেসবই কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে নৈতিক আচরণ হিসেবে অনুমোদিত।
আজকের বিশ্বের বিজ্ঞানী বা নীতিদার্শনিকগণ বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজিত ও সদাকার্যরত নিয়মের অধ্যয়ন ও গবেষণায় যতটা ব্যতিব্যস্ত, মানবকল্যাণে বিশ্বস্রষ্টার নাযিলকৃত আইন বিধান অধ্যয়ণ ও অনুধাবনে ততটা সাগ্রহী নন। অথচ তারা যদি প্রতিটি জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের তত্ত্ব উদঘাটন ও অনুধাবনে অন্ধভাবে তীর নিক্ষেপ না করে সকল উদ্ভাবকের উদ্ভাবক মহান স্রষ্টার দেখানো নীতি দর্শন অধ্যয়নে ব্রতী হতো তাহলে জীবন কাঠামো নৈতিকতার আলোয় পুনরুজ্জীবিত হতো। এ দুনিয়া বস্তুগত দিক দিয়ে যতই উন্নতি লাভ করছে, নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ততই বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাবিদ, দার্শনিক সর্বোপরি নৈতিক দর্শনের ধারক ও বাহকগণ

---

[১৬] খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্রকথা*, প্রকাশক: শামসুজ্জামান খান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ডিসে. ১৯৮৭, পৃ.০৪

সর্বাত্মক নৈতিক বিপর্যয় লক্ষ করে ত্রাসিত চিত্তে বিশ্ববিবেকের কাছে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। নৈতিক ব্যাধি ও বিপর্যয়ের প্রকৃত প্রতিষেধক এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জটিলতার প্রতিবিধান কেবল পেশ করেই তারা ক্ষান্ত। তাই নৈতিক পুনর্জাগরণে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান (দ্বীন ইসলাম) অনুসরণ আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বহু মনীষী, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক কুরআনের বহু সূক্ষ্ম নৈতিক নান্দনিক তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে অকৃত্রিম বিশ্বাসে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করছেন। আজ এ কথা ধ্রুব সত্য যে, বিশ্বমানবতার উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ একমাত্র ইসলামের নীতিদর্শনের ভিত্তিতেই অর্জন সম্ভব। নীতিবিদ্যায় দেকার্তীয় ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রধান বিরোধক্ষেত্র এই যে, ধর্ম নৈতিকতার উৎস হিসেবে গ্রহণীয় নয় কারণ ধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই অনুসারীদের উপর বিভিন্ন আরোপিত নীতিমালা অবলম্বনের বিধান জারি করে এবং সে আরোপিত নীতির ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারন করে। এক্ষেত্রে ইসলামী নীতিদর্শন অপরাপর দর্শন হতে অধিকতর ভিন্ন ও যুক্তিনির্ভর; যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে 'আখলাক' ও 'ফিতরাত' এর মাঝে অভেদ বিবেচনা করা হয়, সে বিবেচনায় নৈতিক বোধ বাহ্যিকভাবে আরোপিত কোনো বিধান নয়, বরং মানুষের অর্ন্তগত চরিত্রের অনুগমন। এ কারণে ইসলাম অনুমোদিত আচরণবিধি ও নৈতিক বোধের মাঝে অভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান।

অতএব ইসলাম আমলের ভিত্তিতে ব্যক্তি সম্পর্কে নৈতিক বিচার পেশ করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় চিন্তা, বাক্য ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি বিধানই নৈতিক জীবনের লক্ষ। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য ইসলাম জীবন পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। মানুষের স্বভাবের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই ইসলামের লক্ষ। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে যে কাজ এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে সেই কাজ নীতিসম্মত বা নৈতিক, আর যে কাজ এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে না, বরং মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই কাজ অন্যায় বা অনৈতিক।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রত্যেক জাতির নিকটই তাদের মহাপুরুষদের জীবনেতিহাসের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, মিতাচার ও অমিতাচার, সৎকর্ম ও অপকর্ম এবং ঈমান ও কুফরের সংঘাত-সংঘর্ষের শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ মজুদ রয়েছে, যাতে প্রত্যেক জাতি অমিতাচার, অপকর্ম ও কুফরের ভয়াবহ পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করতঃ তারা মিতাচার, সৎকর্ম ও ঈমানের সুফল থেকে উপকৃত হতে সদাজাগরুক।

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ নান্দনিকতা**

নন্দনতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ aesthetics যা গ্রীক শব্দ aesthetikos বা aistheta থেকে উদ্ভুত। Aistheta শব্দের অর্থ perceptible things অর্থাৎ প্রত্যক্ষণযোগ্য বিষয়। কাজেই aesthetics মানে প্রত্যক্ষণ শাস্ত্র, প্রাচীন

সংস্কৃতিতে যাকে বলা হয় বীক্ষাশাস্ত্র। বীক্ষণ অর্থ বিশেষভাবে দেখা অর্থাৎ গ্রীক প্রত্যক্ষণ আর সংস্কৃত বীক্ষণ একই কর্মকাণ্ডের পরিচায়ক।[১৭] Aesthetics কে সৌন্দর্য বিজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে যা সৌন্দর্যের আদর্শে কোন বস্তু সুন্দর, কোন বস্তু অসুন্দর তা নিরূপণ করে।[১৮]

নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র: এর উৎপত্তি শিল্প সৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক। শিল্প মানবমনের সৌন্দর্যচেতনার বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের নানান দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে, তার নাম নন্দনতত্ত্ব। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে পলফোর্ড বলেন, Aesthetics is the philosophical branch of inquiry concerned with beauty, art and perception.
তাঁর মতে নন্দনতত্ত্ব বা aesthetics এর দর্শনগত উৎপত্তি হল প্রাচীন গ্রীস যেখানে সক্রেটিস, প্লেটোরমতে দার্শনিকগণ সৌন্দর্যের ও সৌন্দর্যবোধের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। পলফোর্ড আরো বলেন, Aesthetics is also used to refer to the critique of art and design. তাঁর মতে, 'নন্দনতত্ত্ব' মূলত sensory perception এর উপর নির্ভরশীল, যার সংজ্ঞা পরিবর্তনশীল, সময়ের সাথে ভিন্নতা পায়; এটি বিষয়ভিত্তিক যা মানুষ ও সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন রকমের। সাধারণ ধারণায় বলা যায়- Aesthetics as philosophy refers to the study of sensory values. This means judgment or evaluation by the senses.[১৯]

ব্যক্তির সৌন্দর্যভাবনাকে জ্ঞান ও দর্শনের অনুসন্ধানের বিষয়ে রূপান্তরে প্রাচীন দার্শনিকবৃন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষত সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল ও লনজাইনাসের আলোচনাসমূহে সৌন্দর্যের দার্শনিক ভাষ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন নন্দনদর্শনে সৌন্দর্য, সত্য ও শুভের মাঝে অভিন্ন সুর আবিষ্কৃত হয়েছে: সক্রেটিস ও প্লেটো উভয়ই সৌন্দর্যের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন। একইসাথে গ্রীকদর্শনে সৌন্দর্যগুণে উত্তরণের নিয়ামকরূপে "order"(সুসামঞ্জস্য) "smmetry"(অঙ্গ সৌষ্ঠব) এবং "definiteness"(নির্দিষ্টতা) এর সমন্বয় উল্লিখিত হয়েছে। এরিস্টটল Poetics গ্রন্থে আলোকপাত করেছেনঃ "to be beautiful, a living creature, and every whole is made up of parts, [and] must --- present a certain order in its arrangements of parts"[20] পরবর্তীতে টমাস এ্যাকুইনাস-ও এরিস্টটলীয় ধারা অনুসরণপূর্বক Summa Theologica গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ There are three requirements for beauty. Firstly, integrity or perfection – if something is impaired, it is ugly. Then there is due

---

[১৭] সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*, সন্দেশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ৮
[১৮] প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫
[১৯] http://paulford.com/a/what-is-asthetics/
[২০] Aristotle, *Poetics*, Volume-2, P. 1705

proportion or consonance. And also clarity: whence things that are brightly coloured are called beautiful.”[21]

আধুনিক সৌন্দর্যদর্শনের অন্যতম প্রভাববিস্তারকারী তাত্ত্বিক ভাষ্যের উৎস ইমান্যুয়েল কান্টের Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime, Critique of Pure Reason ও Critique of Judgement গ্রন্থসমূহে ইমান্যুয়েল কান্ট প্রত্যেক ব্যক্তির নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সার সংক্ষেপে বলেন, একজন ব্যক্তি কখনই দ্বিমত পোষণ করবে না যখন অন্যকোন ব্যক্তি তাকে বলবে কোন জিনিস তার নিকট আনন্দদায়ক যদি জিনিসটি নিজেই একটি আনন্দদায়ক বস্তু হয়। কান্টের নিকট নান্দনিক মূল্য অন্য সকল জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি বিষয়টির উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বা সত্য হয়। কতিপয় দার্শনিক কোন বস্তু বা বিষয় সুন্দর হওয়ার জন্য যে ছয়টি মৌলিক নীতিকে নির্ধারণ করেছেন, তা হল-

১. Design (নকশা)

২. Variety (বৈচিত্র)

৩. Uniformity (একরূপতা)

৪. Simplicity (সরলতা)

৫. Intricacy (নিগূঢ়তা) এবং

৬. Magnitude (বিশালতা)

অতএব, নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসের দিক লক্ষ করলে দেখা যায়, নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস বহু পুরনো এবং বিকাশের ধারায় কেবল নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, এর অঙ্গাঙ্গী জিজ্ঞাস্য, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রিসের প্রকৃতিবাদী দার্শনিকবৃন্দ ও পিথাগোরাসের অনুসারীরা একে দেখতেন দর্শনের অংশ বলে, যা বিশ্বের হুবহু চিত্র তুলে ধরার কাজ করে। পরে তাঁরা কাব্যতত্ত্বকে এবং সুন্দরের ও শিল্পের প্রকৃতিকে অনুসন্ধেয় হিসেবে নির্ধারণ করেন। তবে প্লেটো এর সাথে শিল্পের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের শর্ত এবং মানুষের শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। এক সময় নন্দনতত্ত্ব ছিল নীতিশাস্ত্রের সীমানার মধ্যে (সক্রেটিস), যা ছিল থিওলজির সন্ধানে করা বিভাজন, যাতে শিল্পের সহায়তায়, মানুষকে ঈশ্বরের সেবায় সম্মত করা চলে (তার্তুলিয়ান, টমাস অ্যাকুইনাস)। এতে প্রকৃতি ও শিল্পের সমৃদ্ধ বিষয়ে (লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি) অনুসন্ধান চলল, আরো উদ্যোগ নেয়া হলো শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির করতে (বোয়াল্যু)। পরে শিল্পের মাধ্যমে বিশ্বের ইন্দ্রিয়জ অনুধ্যান বিশ্লেষণ করল (বমগার্টেন); তবে এর বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকল নিছক সুন্দরের জগতে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে শিল্পে, এবং কেবল শিল্পে নয় বরং শিল্পের মধ্যকার সুন্দরের মধ্যে বিশ্বের আত্মার সার্বিক সংশ্রয়ে শিল্পের স্থান নির্ণয় করা (হেগেল)

---

২১ Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, P. 39

এর লক্ষ হয়ে থাকল। ক্রমে তা মানুষ ও অস্তিত্বের মধ্যেকার নান্দনিক সম্পর্কের গোটা পরিধিকে আমলে আনতে (চেরনিশেভস্কি); অভিলাষী হলো; এর সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব চাইল ব্যক্তিগত শৈল্পিক প্রবণতাকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে, যেমন, রোমান্টিকতাবাদ (নোভালিস) এবং বাস্তবতাবাদ (দোরোলিউবোভ, চেরনিশেভসিঙ্ক); এবং কেউ কেউ শিল্পের চর্চাকে তাত্ত্বিক ভাবে বাস্তাবায়ন করতে প্রয়াস পেল (নব্য পজিটিভিস্টরা)। আর শিল্প সহ, মানব কর্মতৎপরতার সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের অনুধ্যানের নান্দনিক দিককে তাত্ত্বিক অর্থে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব; যেখানে তারা শিল্পের সামাজিক গুরুত্বকে বাড়াতে চায়, যার জন্য এর প্রকৃতি অধিকতর উপলব্ধি করা আবশ্যক।

সর্বোপরি, নন্দনতত্ত্ব বিষয় হিসেবে এভাবে মানবমূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে বিবেচনায় আনে। ইউরি রোরেভ বলেন. “নন্দন তত্ত্ব হলো জ্ঞানের ঐ শাখা যা ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত যত মানবিক মূল্যবোধ, তার সারমর্ম বিবেচনা করে; তাদের সৃজন উপলব্ধি উপভোগ ও আত্মীকরণকে পর্যালোচনা করে।’ এ হলো দার্শনিক বিজ্ঞান, যা বিশেষ নান্দনিক চিন্তনের সাধারণ নিয়মাবলি  সম্পর্কিত, যা অর্জিত হয়ে যে কোনো মানবিক কর্মসূত্রে সুন্দরের নিয়মানুসারে এ সমস্ত চিন্তনের ফসলকে সূত্রবদ্ধ করে, নিশ্চিত ও নিখুঁত করে তোলে।[২২]

**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নান্দনিকতা**

ইসলামী দর্শনানুসারে, সকল সৌন্দর্যভাবনা আল্লাহ তা‘আলার একত্ব ও সত্তাগত সৌন্দর্য হতে উৎসারিত। তাওহীদ শৈল্পিক সৃজনশীলতা বিরোধী নয়, সৌন্দর্য উপভোগেরও বিরোধী নয়। বরং তাওহীদ সৌন্দর্যকে পবিত্র মনে করে, এর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎকর্ষ সাধন করে। তাওহীদ শুধু আল্লাহতে, তাঁর ওহীতে বা ওহীর শব্দে পরমসৌন্দর্য দেখতে পায়। একজন মু’মিন তার চারপাশের অস্তিত্বশীল সবকিছুর মধ্যকার নান্দনিকতাকে এ মর্মে উপলব্ধি করে যে তা মহান আল্লাহর সৌন্দর্যেরই নিদর্শন।

The Islamic paradigm (দৃষ্টান্ত)... is based upon towhid (the absolute unity of God), a unifying (ঐক্য) thread that pervades all natural and social sciences. Art does not stand apart from science, as in the western notion of autonomous art. Islamic theory does

---

[২২] ইউরি বোরেভ, *নন্দনতত্ব*, একটি পাঠ্যগ্রন্থ অনু: শামসুদ্দিন চৌধুরী, বর্ণায়ন প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ২৩

not have to contend with the autonomy of art because of its homogeneous foundations.[23]

ইসলামী তত্ত্বানুযায়ী শিল্প কোন স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন মাধ্যম নয়: ইসলামের নন্দনদর্শন অন্যান্য জীবনসংশ্লিষ্ট কাঠামোর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী শিল্পদর্শনের অন্যান্য জ্ঞানপ্রত্যয় এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানের সাথে সমমুখী সম্পর্ক প্লেটোনিক দর্শনেও লক্ষণীয়। ইসলামের নন্দনভাবনামতে বিচ্ছিন্ন কাঠামোগত উপাদানের সাথে সমন্বয় সাধিত হয় "তাওহীদ" এর ধারণানুযায়ী। আল্লাহ তা আলার সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বব্যাপিতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় কান্টের "a priori" ধারণাকে সমন্বিত করা যায়। মাসুদুল আলম চৌধুরী "A critical Examination of the Concept of Islamization of knowledge in Contemporary Times" প্রবন্ধে এ "a priori" সত্ত্বা হতে সকল বাস্তব ও অধিবাস্তব বিষয়কাঠামোর উৎসরণকে চিহ্নিত করেছেন "epistemological-ontological simultaneity." রূপে। অতএব, ইসলামী নন্দনতত্ত্বানুসারে নন্দন কোন একক প্রত্যয় নয় বরং ইসলামের তাওহীদভিত্তিক মূলনীতি যা ইসলাম সম্মত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আচরণবিধানের ভিত্তি, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামী দর্শনে নান্দনিকতা বহুল আলোচিত এবং কিয়দাংশে দ্বান্দ্বিক এক প্রত্যয়। এর অন্যতম মূল কারণ কলাকৈবল্যবাদী নন্দনদর্শনের "art for art's sake" সূত্রের সাথে ইসলামী নন্দনচেতনার মূলনীতির আদর্শিক বিরোধ। [ইসলামী নন্দনতত্ত্বের মৌলিক প্রেরণা কেবল শিল্পে রসাস্বাদনের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি অর্জন নয়, মানবহিতৈষী নন্দনচর্চার বোধ জাগ্রত করাই ইসলামের নন্দনব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য।] ইসলামী নন্দনতত্ত্ব জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করে। নান্দনিক চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ, নান্দনিকতার অভিজ্ঞতা সমূহ আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। যদিও সৌন্দর্যের ধারণা নন্দনতত্ত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় তারপরও এই ধারণা দিয়ে নন্দনতত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। বিশেষত ইসলামে নন্দনতত্ত্বের দুইটি দিক রয়েছে, একটা ধারণাগত অর্থাৎ থিয়োরিটিকাল, আর অন্যটি বস্তুগত অর্থাৎ প্রাকটিক্যাল। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিল্প এবং নন্দনতত্ত্ব বলতে বুঝায় যে কোনো বিষয়ের মেটাফিজিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল সারবস্তু।

প্রাচীন গ্রীকদর্শনে শিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ পরম সত্যের রূপ উপস্থাপন, যা প্লেটোনিক বচনে "Idea" বা "Form" সূচকে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের জ্ঞানতত্ত্বানুসারে যেহেতু আল্লাহ তা'আলাকে পরম সত্য ও সৌন্দর্যের কেন্দ্ররূপে বিবেচনা করা হয়, তাই ইসলাম সমর্থিত নন্দনতত্ত্বমতে শিল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহর সত্ত্বা হতে উৎসারিত সৌন্দর্যানুসন্ধান ও এর উপস্থাপন। লনজাইনাস, বার্ক ও কান্টের দর্শনে শিল্পসৃষ্টির যে "Sublime"

---

২৩ Omar W. Nasim, "*Toward an Aesthetic Theory*", The American Journal of Islamic Sciences 15:1

(সর্বোচ্চ) পর্যায়ের এবং তার উপজাত "ecstasy" (পরমানন্দ) এর উল্লেখ আছে, তার সাথে দূরবর্তী অর্থে পরম সত্তার রুপ অনুধাবনের প্রয়াসের সাদৃশ্য অনুভূত হয়। তবে বার্কের এবং অনুরূপ নিওক্লাসিকাল দর্শনে মানুষের বৌদ্ধিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতার মাঝে সাময়িক ও মহাকালিক জ্ঞানের সকল প্রত্যয় অনুধাবন ও বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা কল্পনা করা হয়েছে; তার অন্তর্নিহিত অনুপপত্তি ইসলামী নন্দনদর্শনের সাথে পাশ্চাত্য দর্শনের অংশবিশেষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অন্যতম কারণ। মাসুদুল আলম চৌধুরীর পর্যালোচনায়:-

"The neo-classical worldview is also non-discursive, non-process and non-dialectic in essence. In it, knowledge is incapable of being formed, for it already exists in its optimal state. Hence, the universe around complying to neo-classical world-view must necessarily behave optimally, without chances of conflict and shortfalls remaining."[২৮]

কান্ট Critique of Judgment গ্রন্থে নন্দনবোধ এর ব্যক্তিক অনুভূতিকে সার্বজনীনরূপে উপস্থাপন করেছেন। কান্টের মতে, কোন সার্বিক পরিকাঠামো নয়, বরং ব্যক্তির মৃন্ময় সৌন্দর্যভাবনা শিল্পরূপ বিচারের পরিমাপক। ইসলামী দর্শনে শিল্পরূপ বিচার সংক্রান্ত নীতি কান্টীয় "disinterested" ও "subjective" মানদণ্ড হতে ভিন্ন; ইসলামী ভাবানুসারে শিল্পমূল্য নির্ধারিত হয় শিল্পকর্মে পরমসত্ত্বা ও নৈতিকবোধের প্রতিফলনের মাত্রানুসারে। যে পরমসত্ত্বা ও নৈতিক বোধের প্রতিফলনের মাত্রানুসারে। যে শিল্পরূপে পরম ইচ্ছা, সত্তার পরম বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি নৈতিক বোধের প্রতিফলন বিকীর্ণ হয়, তা ইসলামী দর্শনমতে শিল্পচেতনা ও শক্তিতে সার্বজনীন বিচারে উৎকর্ষ সমৃদ্ধ। ইসলাম সর্বদা স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর সেগুলোর সৌন্দর্যানুসন্ধান করত: তা উপভোগ ও ভালোবাসার কথা বলে। কাজেই একমাত্র আল্লাহর সন্তোষকল্পে সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ নান্দনিক জীবনবোধের এক অমূল্য দর্শন।

**বিশ্বপ্রকৃতির নান্দনিক আচরণ**

বান্দাহকে নৈতিক-নান্দনিক জীবনধারায় অটল রাখতে নিম্নোক্ত আয়াতটি অনুসরণীয়- "হে নবী, বলুন, প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তোমার রব তা জানেন।"

আয়াতের সারকথা মাফিক প্রত্যেক বান্দাহর নৈতিক পথ ও মতে অধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত কাম্য।

[২৮] Masudul Alam Chowdhury, "*A critical Examination of the concept of Islamization of knowledge in contemporary Times*", Muslim Education Quarterly 10, no. 4 (summer 1993): 10

নৈতিকতা বা নান্দনিকতার এ তত্ত্বকথা বিশ্ব পরিমণ্ডলের বহিকাঠামো ভেদ করে মহাবিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত যার প্রতিটি স্তরে অনুসন্ধান করলেই আমরা এমন এমন সব নিদর্শন দেখতে পাই, সেখানে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান নৈতিকতা ও নান্দনিকতার এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। এখানে তার স্বরূপ চিত্রায়িত হলো:

**গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন**

গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের মাঝে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সময়ানুবর্তিতার (নান্দনিকতা ও নৈতিকতা) চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রতিনিয়ত নক্ষত্রগুলো নির্দিষ্ট গতিধারায়, দিকে, স্থানে ও সময়ে আবর্তিত হচ্ছে। ফলে এদের একে অপরের মাঝে কোনরূপ সংঘর্ষ বাঁধে না। বস্তুত এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেন নৈতিকতা ও নান্দনিকতার এক অনুপম সাক্ষ্য বহন করে।

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সবাই আপন-আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।"[২৫]

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেন নি।" নিশ্চয়ই রাত-দিনের আবর্তনে, আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মাঝে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[২৬]

"তোমরা কি লক্ষ কর না যে, যা কিছু আসমানসমূহে আর যমীনে আছে, আল্লাহ সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'য়ামাতসমূহ পরিপূর্ণ করেছেন।'[২৭]

"তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।"[২৮]

**দিবারাত্রির সংঘটন**

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই পৃথিবীতে আহ্নিক গতির ফলে কি চমকপ্রদ ও স্বত:স্ফূর্তভাবেই না দিবারাত্রি সংঘটিত হয়ে চলেছে। ক্রমাগত দিনরাত্রি সংঘটনের ফলে জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন থাকছে।

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেক-সম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন"[২৯]

"তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে ঢেকে যায়"[৩০]

---

[২৫] আল-কুরআন ২১: ৩৩
[২৬] আল-কুরআন ১০: ৫-৬
[২৭] আল-কুরআন ৩১: ২০
[২৮] আল-কুরআন ৩৯: ৫
[২৯] আল-কুরআন ৩: ১৯০
[৩০] আল-কুরআন ৩৬: ৩৭

"(আল্লাহ) রাত্রির দ্বারা দিনকে আবৃত করেন, উহা তাকে দ্রুত অনুসরণ করে।"[৩১]

**জোয়ার-ভাটা**

চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের পানি ফুলে ফেঁপে উঠা এবং মোহনীয় ভঙ্গিমায় তীরে আছড়ে পড়ার দৃশ্যব্যঞ্জনা, মহাবিশ্বের অত্যাশ্চর্য নান্দনিক নিদর্শন সমূহের একটি। জোয়ার-ভাটার নিজস্ব ছন্দ ও গতি যেমন উপভোগ্য তেমনি অকস্মাৎ ধাবিত না হয়ে সংকেতমাফিক সে তার অস্তিত্ব জানান দেয়।

"তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের অধীন।"[৩২]

**ঋতু পরিবর্তন**

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্য বিধানকল্পে অঞ্চলভেদে প্রতিটি ঋতুই-বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এর স্বতন্ত্র নান্দনিকতা প্রকৃতির বুকে ধরা দেয় এভাবে; গ্রীষ্মের ভিন্ন স্বাদের ফলমূলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি, বর্ষার মেঘের ঘনঘটা আর বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ পরিবেশ, শরতের ঝকঝকে রৌদ্রজ্জ্বল নীলাভ স্বচ্ছ আকাশ এবং কাশবনের শুভ্রতা; হেমন্তের বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে ফসলি জমির সুখবারতা, শীতের শিশিরস্নাত ভোর, খেজুর রসের মিষ্টি আমেজ এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ টাটকা রঙ্গিন শাকসবজির পসরা, বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু যেন নবজাগরণেরই বার্তা বাহক। এসবই যথানিয়মে কার্য সাধনের এক অনন্য নান্দনিক প্রক্রিয়ার অধীন।

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকা-সমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালা যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমীনের মাঝে বিচরণ করে।"[৩৩]

**বায়ু প্রবাহ**

সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক এই বায়ু প্রবাহ অবিরাম নিয়মতান্ত্রিক (নান্দনিক) প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য বিধান করত: প্রকৃতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলে।

"আমি বায়ুসমূহ পাঠিয়ে থাকি যা উর্বরা, আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি, আমি তোমাদের জন্য পানির যোগান দেই- বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই।"[৩৪]

---

[৩১] আল-কুরআন ৭: ৫৪
[৩২] আল-কুরআন ১৬: ১২
[৩৩] আল-কুরআন ২: ১৬৪
[৩৪] আল-কুরআন ১৫: ২২

**আগুন-পানি**

আগুন ও পানি নাম দুটো শুনলেই আপাতদৃষ্টে মনে হয় এদের একটি পুড়িয়ে ফেলে, অপরটি ডুবিয়ে দেয় অথচ এর গূঢ়তত্ত্ব অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় যে, কার্য-সম্পাদনে তারা উভয়েই যথেষ্ট নৈতিকতা ও নান্দনিকতার পরিচয় বহন করে অর্থাৎ সর্বদা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তারা অনড়-অবিচল।

"তোমরা যে আগুন জ্বালাও তা লক্ষ করেছ কি? তোমরাই কি অগ্নি উৎপাদক বৃক্ষ সৃষ্টি কর? নাকি আমি? "[৩৫]

"আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি বরকতময় পানি এবং তদ্দ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরোন করা হয়।"[৩৬]

"তিনিই সে সত্ত্বা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চড়াও। [৩৭]"

"তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আনো, নাকি আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি; তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও না?"[৩৮]

**জীবদেহের নান্দনিক শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য**

নান্দনিক উপযোগিতার বিচারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দেহকাঠামোয় সর্বোত্তম রূপে সুবিন্যস্ত ও সংস্থাপিত এবং দেহের বিকাশকল্পে তা সদা কার্যকর। এই বিশ্বপরিমণ্ডলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া সুশৃঙ্খল জীবন প্রবাহের ধারাকে রক্ষা করে চলেছে।

"যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন।"[৩৯]

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নানান স্তর অতিক্রম করে।"[৪০]

"এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে দাঁড় করেছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।"[৪১]

"তারা কী লক্ষ করেনি তাদের উপরস্থ পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময়ই এদের স্থির রাখেন।"[৪২]

---

[৩৫] আল-কুরআন ৫৬: ৭১-৭২
[৩৬] আল-কুরআন ৫০:৯
[৩৭] আল-কুরআন ১৬: ১০
[৩৮] আল-কুরআন ৫৬: ৬৮-৭০
[৩৯] আল-কুরআন ৮২: ৭-৮
[৪০] আল-কুরআন ৭১: ১৪
[৪১] আল-কুরআন ২৩: ১৪
[৪২] আল-কুরআন ৬৭: ১৯

“আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরণের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। তারপর তা থেকে ঘন নিবিড় শস্যদানা উৎপাদন করেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেক পৃথক বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী।”[৪৩]

মহাবিশ্বে চলমান সমুদয় এ ঘটনা প্রবাহ থেকে আমরা নৈতিক ও নান্দনিক জীবনবোধের এক অনিন্দ্য সুন্দর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই।

বিবেকবোধ ও মস্তিষ্কহীন হওয়া সত্ত্বেও সময়ানুবর্তিতা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলাবিধানে সময়ের শুরু থেকে কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়ে মালিকের হুকুমে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে এরা সদা জাগরুক। তাহলে আমরা একটিবারও ভেবে দেখেছি কি সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এই নৈতিকতা ও নান্দনিকতার আদর্শ আমাদের বাস্তবজীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়ে থাকে?

[৪৩] আল-কুরআন ৬: ৯৫

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# মুসলিম স্থাপত্য ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী

ইসলামী শিল্পের আবহ বিনির্মাণে ঐশী নির্দেশনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা শিল্পীয় মানসপটে কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত গুণাবলীর ছাঁচ নির্মাণ করে। ইসলামী শিল্প হল শ্বাশত জীবনবিধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সভ্যতার শিল্প। মুসলিম স্থাপত্য মূলত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমান ও অমুসলমান দক্ষ স্থপতি, চিত্রকর, লিপিকর ও কারুশিল্পীদের সৃষ্ট সৃজনশীল নান্দনিক শিল্পকর্ম। মুসলিম স্থাপত্যকলা স্বতন্ত্র সভ্যতা ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত যা ইসলামিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিত্রিত। আরবরা গণিত ও জ্যামিতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং মুসলিম স্থাপত্যের সূত্র তৈরীতে তাদের জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন। আরবরা সামগ্রিকভাবে শিল্পে ততটা সমৃদ্ধ ছিল না তবে তাদের নান্দনিক সংবেদনশীলতা পারস্য, সিরিয়া, মিশর, মেসোপটেমিয়া ও বাইজান্টাইন এর উন্নত শিল্পের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুসলিম স্থাপত্যের ভীত রচনা করে। তুর্কি সুলতানগণ দশম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি মুসলিম স্থাপত্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পারস্যের শিল্প ও সাহিত্য, পেইন্টিং, ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য ও ইসলামী আলংকরিক শিল্পের বিভিন্ন ধারা মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। উপমহাদেশে মুঘল শাসকগণ স্থাপত্য শিল্প, বয়নশিল্প, আলংকারিক শিল্প প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ সকল ক্ষেত্রেই মুসলিম বিশ্বের সমস্ত শৈল্পিক চিন্তাধারার উপর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ বিদ্যমান। কেননা, ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ ধর্ম অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ইসলামী শিল্পের সত্যিকার আধ্যাত্মিক বার্তা উপলব্ধি করতে হলে এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্যালিগ্রাফি, চিত্রকর্ম, সঙ্গীত এবং আলংকারিক শিল্পসমূহকে অনুধাবন করতে হবে।

যেসব শিল্পমাধ্যম ও শিল্পকর্ম মনন নির্ভর, বীক্ষণাকাঙ্ক্ষা ও আত্মিক প্রশান্তি জাগ্রত না করে ইন্দ্রিয় বাসনার উদ্রেক করে, সে সব শিল্পরূপে শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন বিঘ্নিত হয়। ইসলাম বিস্তারের কালিক পরিক্রমায় মুসলিম স্থাপত্যের বিভিন্ন নিদর্শনের মাঝে ইসলামী শিল্পকর্মের অনিন্দ্য নন্দনতাত্ত্বিক ও শৈল্পিক মূল্য প্রতিভাত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীন ও তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকগণের পৃষ্টপোষকতায় মুসলিম স্থাপত্য, ক্যালিগ্রাফি, সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চায় অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। নির্মাণ কৌশল, উদ্দেশ্য ও অলংকরণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুসলিম স্থাপত্য দুইভাগে বিভক্ত।

১. ধর্মীয় স্থাপত্য

২. লৌকিক স্থাপত্য

ধর্মীয় স্থাপনার মধ্যে মাসজিদ অন্যতম আর প্রাসাদ, সরাইখানা, হাম্মামখানা, দূর্গ ইত্যাদি লৌকিক স্থাপত্যের নিদর্শন। ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই আধ্যাত্মবাদ তথা নৈতিক নান্দনিক

মূল্যবোধের আলোকে ধর্মীয় স্থাপনায় মুসলমানগণ ন্যাচারালিজমের পরিবির্তে স্টাইলাইজেশনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফুল লতাপাতার অ্যারাবেস্ক নকশা, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, মোজাইক, টাইলস, কাঠের খোদাইকৃত নকশা, মূল্যবান পাথর ও রঙের সংমিশ্রণে স্থাপনাকে স্বতন্ত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক স্থাপনায় ফ্রেস্কো ও টেমপ্যাবায় প্রাণী ও মানুষের প্রতিকৃতি অকপটে চিত্রিত হয়ে থাকে। ইসলামী দিকনির্দেশনানুসারে সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতাবোধ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে নৈতিকতানির্ভর মানবকল্যাণমুখী স্থাপত্য নির্মাণ ও নন্দনচর্চা আবশ্যক।

## প্রথম পরিচ্ছেদঃ মহানবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগের স্থাপত্য

মহানবী (সা.) ও তাঁর পরবর্তী চার খলিফার সময়কালকে উমাইয়া পূর্ব বা খোলাফায়ে রাশেদুনের  যুগ বলে। স্থাপত্য শিল্পে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। এসময় মুসলমানগণ সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর, বাইজানটাইন এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যকে পরাভূত করে। স্থাপত্য রীতিতে এ সকল সাম্রাজ্যের বহু কৌশল এবং প্রযুক্তি গৃহীত হয়েছিল। সে সময়ে মুসলমান শাসকগণ প্রাসাদের চেয়ে মাসজিদ নির্মাণে অধিক মনোযোগী হন। এ যুগের নির্মাণ শৈলীতে কাঁচা ইট, খেজুর পাতা, তাল পাতা, খেজুর গাছের কাণ্ড, কাঠ, বেত, নলখাগড়া এবং পাথর ব্যবহৃত হয়। সে সময়ে বিজ্ঞানের বিকাশ না ঘটায় মুসলমানগণ ইমারত নির্মাণে প্রযুক্তি ও অলংকরণ প্রক্রিয়াসমূহ প্রয়োগ করতে পারেননি। এ সময়ে মাসজিদ সংলগ্ন স্থানে শাসন কর্তাদের জন্য দার আল ইমারাহ নির্মিত হওয়ায় নামাজ ও শাসনকার্য পরিচালনা করা সহজ ছিল।

নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সময়ের স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে মাসজিদ নির্মাণ অন্যতম। কালিক পরিক্রমায় নির্মিত বিভিন্ন মাসজিদের নন্দনশৈলীর বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

### কুবার মাসজিদ

হিজরতের পর মাদীনার প্রায় ৩.২৫ মাইল দক্ষিণে কুবা নামক স্থানে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) মুসলমানদের প্রথম মাসজিদ নির্মাণ করেন যা ঐতিহাসিক কুবা মাসজিদ নামে খ্যাত। মর্যাদা ও নান্দনিকতার বিচারে মসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী ও মাসজিদে আল আকসার পরেই মাসজিদে কুবার স্থান: হজ্ব ও উমরার দর্শনার্থীদের জন্য এ মাসজিদটি সওয়াব ও আধ্যাত্মিকতার নির্দশন। হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইব আল আনসারী (রা:) বর্ণনা করেন; রসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন- "মাসজিদে কুবায় এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, সওয়াবের দিক থেকে একটি উমরা আদায়ের সমতুল্য।"[৪৪]

মহানবী ও তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর, হযরত ওমরসহ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম (রা:) এ মসজিদে সালাত আদায় করতেন।

[৪৪] ইমাম আবু  ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র), *আল জামে আত-তিরমিযী*- অনু: মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৭, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২১৭, খ. ২য় অধ্যায় : সালাত (নামায), অনুচ্ছেদ : কুবার মসজিদে নামায আদায়ের ফযীলত, পৃ.৪৯, হাদীস নং- ৩২৪

হযরত উসমান (রা:) কুবা মাসজিদের প্রথম সংস্কারক, পরবর্তীতে আরো সাতবার এর সংস্কার সম্পন্ন হয় এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে মাসজিদটি পুনর্নির্মিত হয়। উন্নত সাদা পাথরে বেষ্টিত, দ্বিতল বিশিষ্ট মাসজিদটির ছাদে একটি বড় গম্বুজসহ অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাঁচটি গম্বুজ ও চার কোণে চারটি সুদৃশ্য মিনার দৃশ্যমান। নিবিড় খেজুর বাগানের ভাঁজে ভাঁজে পড়ন্ত বিকেলের অস্তগামী সূর্যের লালিমা মুসলমানদের অন্তরে যেন আধ্যাত্মিকতার পরম সুখ বইয়ে দেয়।

**মাদীনার মাসজিদ**

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদীনার ২ এতিম কিশোর সাহল এবং সুহায়েল এর নিকট হতে ১০ দিনার মূল্যে একটি মসজিদের জায়গা ক্রয় করেন। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে তাল পাতা, পাথর, খেজুর পাতা, কাণ্ড, কাঁদা মাটি ও লাবীন (কাঁচা ইট) ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ছিল ১০০ বর্গ কিউবিট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং উচ্চতা ৪ $\frac{১}{২}$ ফুট। মাসজিদটির ৩টি প্রবেশদ্বার পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ বাব-আল-নবী যা কেবল মহানবী (সা.) ব্যবহার করতেন, উত্তর দিকের প্রবেশ পথ বাব আল জিব্রাঈল ও পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথ বাব আল রহমত। এ মসজিদে মিনার না থাকায় মহানবী (সা.) হযরত বিল্লাল (রা.) কে মাসজিদ সংলগ্ন উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে আযানের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে মিহরাব নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদের দক্ষিণ অংশ জুল্লাহ বা ছাদ বিশিষ্ট নামাজ কক্ষ এবং উত্তর অংশ সাহন বা চত্বর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হযরত উমার (রা.) এর সম্প্রসারণ করেন এবং হযরত উসমান (রা.) খেজুর পাতা ও কাণ্ডের বদলে প্রাচীরের গাঁথুনী পাথর দ্বারা আর ছাদ কাঠ দ্বারা নির্মাণ করেন। 'আকীক' পাহাড় থেকে নুড়ি পাথর এনে মেঝেতে বিছিয়ে এর সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। লতা, গুল্ম এবং সুনিপুণ হস্তাক্ষরের সমন্বয়ে কুরআন মাজিদের আয়াত সমূহের নকশা দিয়ে মসজিদের গাত্রসমূহ আরো নান্দনিক করা হয়। উমর বিন আব্দুল আজিজের নির্দেশে মাসজিদকে মর্মর পাথরের প্যানেল জাতীয় নকশা এবং বিভিন্ন রঙয়ের মোজাইক দ্বারা শোভিত করা হয়। বর্তমানে মাসজিদটির আয়তন ২০০ বর্গকিউবিট।

মদীনা মাসজিদের নির্মাণশৈলী সম্পর্কে Encyclopedia of Islam এ বলা হয়- "The mosque of Madina was developed the general type of the Muslim Mosque."[৮৫]

মদীনা মসজিদের স্থাপত্যিক উৎস সম্পর্কে Chamber's Encyclopedia তে বলা হয়- "The Arabs were for the most part nomads of the desert men whose time was divided between battle and prayer, with no artistic taste or technical knowledge of craftsmanship."[৮৬]

---

[৮৫] Volume: 5

[৮৬] Volume: ii, Page-775

**বসরার জামে মাসজিদ**

হযরত উমর (রহ.) ১৪ হিজরীতে (৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে) 'উতবা বিন গাযওয়ান বসরার জামে মাসজিদ' সাদা-মাটা ভাবে নির্মাণ করেন। এটি সরু বাঁশ, বেত ও নলখাগড়া দিয়ে নির্মিত হয়। এটি ১০০ কিউবিট, একটি বর্গাকৃতির মাসজিদ। বসরার শাসনকর্তা যিয়াদ ৬৬৫ সালে মসজিদের পুন:নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। এতে পোড়া ইট, জিপসাম মর্টার এবং সেগুন কাঠ ব্যবহৃত হয়। ফলে আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যায়। মুসল্লিদের কপালে যাতে ধুলোবালি না লাগে তাই যিয়াদ ইব্‌নে আবীহ্ এর আদেশে মাসজিদ অভ্যন্তরে মাকসুরা বেষ্টিত নির্দিষ্ট স্থান নির্মিত হয়। এ মর্মে ক্রেসওয়েল বলেন, Ziad who was well acquainted with the turbulent spirit of the cities of Iraq thoroughly realized political importance of the mosque, the dominating position in which was concentrated at the same time the political and social life of the Arab empire.[৪৭]

**কুফার জামে মাসজিদ**

সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস ৬৩৮ সালে কুফা নগরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি সেখানে মাসজিদ এবং দার আল ইমারাহ নির্মাণ করেন যা শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে বিস্তৃত হয়। এর আয়তন ২০০ বর্গকিউবিট। নান্দনিকতা বর্ধনে সামরিক অনুকরণে চারদিকে পরিখা খনন করা হয়। সাদা পাথরের তৈরী এ মাসজিদের জুল্লা ৫টি সারিতে বিভক্ত, যা দেখতে অতি নান্দনিক। জুল্লা চারিদিকে উন্মুক্ত ছিল এবং নামাজ গাহ থেকে অদূরে বারজিয়াস নামক শহরের ফটক দেখা যেত। আধুনিক স্থাপত্য ঐতিহাসিকগণ এই ছাদকে গ্যাবল (Gable) বা চালা ছাদ বলে। ল্যামো বলেন, "কুফার প্রাথমিক মাসজিদটিতে বিশেষ করে ছাদে মোজাইক এবং দেয়াল চিত্র (Fresco) ছিল।[৪৮] সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক নির্মিত অতি সাধারণ ও অনাড়ম্বর কুফার মাসজিদটি উমাইয়া যুগে একটি অনিন্দ সুন্দর ইমারাতে পরিণত হয়। ৬৭০ সালে শাসনকর্তা যিয়াদ ইবন আবী কুফা মাসজিদের নান্দনিকতা বর্ধন ও সম্প্রসারণের সূচনা করেন। আহওয়াজ পাহাড় থেকে আনিত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত জুল্লা পুন:নির্মিত হলে উচ্চতা হয় ৩০ ফুট। মুকাদ্দাসীর মতে, "এতো দীর্ঘ অথচ সুউচ্চ ছাদ বিশিষ্ট মাসজিদ আমি ইতঃপূর্বে কোথাও দেখিনি।"[৪৯] বসরা এবং কুফার মাসজিদের মধ্য দিয়েই মূলত মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সূত্রপাত এবং নন্দনশৈলী নব যুগে উন্নীত হয়।

---

[৪৭] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম শিল্পকলা ও স্থাপত্য*, নভেল পাবলিশিং হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, মে-২০০৫, পৃ. ৪১

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

**ফুসতাতের জামে মাসজিদ**

ফুসতাতের জামে মাসজিদ প্রাথমিক স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। হযরত উমার (রা.) এর খিলাফত আমলে ১৯ হিজরীতে (৬৪০ খ্রিস্টাব্দ) মিশর বিজয় সমাপ্ত হয়। ফুসতাত শহর কায়রো নগরীর দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত। মিশর বিজয়ী সেনাপতি আমর ইবন আল আস ৬৪১ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ফুসতাত মাসজিদ নির্মাণ করেন। স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে এটি পূর্ববর্তী মাসজিদ সমূহের থেকে ভিন্নতর। কারণ মহানবী (সা.) এর মাসজিদ থেকে শুরু করে কুফা মাসজিদ পর্যন্ত সব মাসজিদ ছিল বর্গাকৃতির। কিন্তু এই মাসজিদটি আয়তাকার এবং তার কোনো চত্বর বা সাহন ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে ফুসতাতের জামে মাসজিদের নির্মাণ উপকরণ ছিল কাঁচা ইট, খেজুর পাতা ও তার কাণ্ড, নলখাগড়া। এ মাসজিদের দৈর্ঘ্য ৫০ কিউবিট এবং প্রস্থ ৩০ কিউবিট। কিবলার দিক ছাড়া এর অপর তিনদিকে ২টি করে ৬টি প্রবেশ পথ ছিল। এ মাসজিদের ছাদ খুব নিচু ছিল। মসজিদের মেঝেতে কুচি পাথর বিছিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। মাসজিদে কোন মিহরাব ছিল না। এটির সংলগ্ন স্থানে দারুল ইমারা নির্মিত হয়েছিল। উমাইয়া খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার সময়ে মিশরের নবম শাসনকর্তা মাসলামা বিন মুখাল্লাদ কর্তৃক ফুসতাতের জামে মাসজিদ পুনর্নির্মিত হয়। মাসলামা মসজিদের দেয়াল পলেস্তারা ও নূরী বিছানো মাদুর দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেন। মুয়াবিয়ার নির্দেশে আযান দেয়ার জন্য মাসজিদের চার- চার কোণে চারটি সাওয়ামি বা চৌকোণাকৃতির মিনার নির্মিত হয়েছিল। ৭১০-৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাসজিদটির পুন:নির্মাণকালে কুলঙ্গি আকৃতির একটি মিহরাব কিবলা নির্দেশিকা হিসাবে নির্মিত হয়। খলিফা আল মামুনের শাসনকালে মিশরের আবদ আলমাস ইবন তাহির ৮২৭ সালে মাসজিদটির পুন:নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। এ আকর্ষণীয় ও বিশালাকৃতির মাসজিদটি ইসলামী স্থাপত্যকলায় এক অনবদ্য নান্দনিক সৃজনকর্ম।

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: উমাইয়া যুগের স্থাপত্য**

খোলাফায়ে রাশিদুনের পর ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান উমাইয়া সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। ৯০ বছর পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য টিকে থাকে। উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসন এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনের ফলে মহানবী (সা.) ও তাঁর পরবর্তী খলিফাদের সহজ সরল জীবনধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সময়ের মুসলমানগণ বিজিত রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করলে জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। স্থাপত্য শিল্পে তারা মিশরিও, বাইজানটাইন ও সাসানীয় নীতি অনুসরণ করে। সিরিয়ার গির্জাসমূহের চাকচিক্যময়তা আরবের মুসলমানদের যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে তাই মুসলিম শাসকবৃন্দ নান্দনিক স্থাপত্যকর্মে ব্রতী হন।

**কুব্বাতুস সাখরা**

রিচমন্ডের অভিমতে “The dome of the rock is the earliest existing monument of Muslim architecture”[50] কুব্বাতুস সাখরা রসূল (সা.) এর মিরাজের পবিত্র ধর্মীয় স্মৃতি বহন করে চলেছে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আব্দুল আল মালিক নির্মিত কুব্বাতুস সাখরা রসূল (সা.) এর মিরাজের একটি ধর্মীয় নিদর্শন। ১০ ফুট উচ্চতা ও পাঁচ খিলান বিশিষ্ট এই মাসজিদটি প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যের সাক্ষী হয়ে আছে। নবী কারীম (সা.) উর্ধ্বগমনের সময় যে পাথরে পদচিহ্ন রেখে যান তা অতি পবিত্র এবং মসজিদের সকল কারুকার্য পাথরটিকে ঘিরে সংঘটিত। মসজিদের খিলানগুলো সাদা ও কালো মার্বেল দিয়ে বৃত্তাকার স্তম্ভাকারে সাজানো। যা কাঠের ছোট বন্ধনিতে সংযুক্ত। এর মূল আকর্ষণ ৬৮ ফুট উঁচু স্বর্ণমণ্ডিত দ্বিগম্বুজ যার ব্রোঞ্জের চূড়ায় Crescent দৃশ্যমান। মসজিদের কাঠের দরজায় তামা বা ব্রোঞ্জের খোদাইকৃত সূক্ষ্ম নকশায় আঙুরের থোকা, দ্রাক্ষালতা ও অ্যাকান্থাস অন্যতম। নানাবিধ অলংকরণ রীতি- অ্যারাবেস বা জ্যামিতিক নকশা, শিলালিপি যেমন কুফী বা নাসখী অথবা রঙিন টালির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ডানা নকশা, অর্ধচন্দ্র ও তারকার চিত্র সাসানীয় ও বাইজানটাইন চিত্রকলার কথা মনে করিয়ে দেয়। ইসলামের সর্ব প্রথম ও অনন্য এ স্মৃতিস্তম্ভ শুধু ধর্মীয় ইমারতই নয়, স্থাপত্য শিল্পে এক অনবদ্য নান্দনিক প্রতীকও বটে। পি. কে হিট্টির দৃষ্টিতে- “To the Moslems the dome of the Rock is more than a place of archaeological interest and artistic value. It is a living symbol of their faith.”[51] কুব্বাতুস সাখরার দৃশ্যপট অবলোকন করলেই মুগ্ধ হতে হয়। প্রাথমিক মুসলিম স্থাপত্য হিসেবে কুব্বাতুস সাখরার গুরুত্ব বর্ণনা করে K. A. C. Creswell বলেন- “The Dome of the Rock being the earliest existing monument of muslim architecture, on accurate knowledge of its original appearance is therefore of the greatest importance.”[৫২]

কুব্বাতুস সাখরার খ্রিস্টান নির্মাণশৈলী বর্ণনা করে Ettinghausen, R. O. Grabar and M. Jenkins-Madina বলেন- “In its major characteristics the Dome of the Rock follows the architectural practices of the Christian Empire.”[৫৩]

**আল-আকসা মাসজিদ**

হযরত সুলাইমান (আ:) কর্তৃক জেরুজালেমে নির্মিত আল-আকসা মাসজিদটি ৭০৫ খ্রি: উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক সম্প্রসারণ ও সংস্কার করেন।

৭৪৬ খ্রি:, ১০৩৩ খ্রি: ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসূর, ফাতেমীয় খলিফা আল জাহির পুনরায় মাসজিদটি নির্মাণ করেন। বর্তমানে মাসজিদটি ফিলিস্তিনি নেতৃত্বাধীন ইসলামি ওয়াকফের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আল-আকসা মসজিদের গম্বুজ সীসার এনামেল ওয়ার্ক আচ্ছাদিত, কাঠের তৈরি উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
[৫২] K.A.C. Cresswell; *A Short Account of Early Muslim Architecture*, Revised Edition, Cario: The American University Press, 1989, P.18
[৫৩] *Islamic Art and Architecture*. 650-1250, New Haven and London: Pelican Publishers, 2001, P. 32

পাশে পাথর নির্মিত চারটি সুউচ্চ মিনার দণ্ডায়মান। এ মসজিদের ১৫টি প্রবেশপথ, ৩টা বারান্দা এবং সীসার পাতের সংযুক্তি একে আরো নান্দনিক করে তুলেছে।

**দামেস্কের জামে মাসজিদ**

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রারম্ভে যে দুটি স্থাপত্য গুরুত্বপূর্ণ তার একটি কুব্বাতুস সাখরা এবং অপরটি দামেস্কের জামে মাসজিদ। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের খলিফা আল-ওয়ালিদ নির্মিত জামে মাসজিদটি স্থাপত্য ও নান্দনিকতার দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাসজিদের প্রতিচ্ছবি। প্রফেসর পি. কে. হিট্টির অভিমত, "This umayyad mosque is still considered the fourth holiest sanctuary in Islam, after the three Harams of Makkah, Al-Madinah and Jerusalem."[54]

দামেস্কের জামে মাসজিদের অলঙ্করণ নয়নাভিরাম, অভিজাত ও নান্দনিকতাপূর্ণ। এর মোজাইককৃত নানা অংশে তরুরাজি, নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মাসজিদের নামাজঘরের পরিমিতি পূর্ব-পশ্চিমে ৪৪৬ ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে মাত্র ১২১ ফুট। মাসজিদটি ঝাড়বাতি ও ঝুলন্ত বাতি দ্বারা আলোকসজ্জিত করা হত। ওযুর পানি সংরক্ষণে সাহনের পশ্চিম কোণে একটি গম্বুজ কোঠা স্থাপিত হয়। মাসজিদটিতে ৬টি অতিসুন্দর মর্মর পাথরের ঝাঝড়িওয়ালা বাতায়ন পথ দেখা যায়।

**কর্ডোভার জামে মাসজিদ**

৭৮৫-৭৮৬ সালে স্পেনে নির্মিত কর্ডোভার জামে মাসজিদ আব্দুর রহমানের এক অনবদ্য নান্দনিক সৃজনকর্ম। ২৬,৫০০ বর্গগজের আয়তাকার মাসজিদটি সে সময়ের তৃতীয় বৃহত্তম মাসজিদ, যা পূর্ব ও পশ্চিমে ৫৮৫ ফুট এবং উত্তর- দক্ষিণে ৪১০ ফুট; এর দক্ষিণে জুল্লাহ ও উত্তরে ৬ দরজাবিশিষ্ট সাহন অবস্থিত। সুনিপুণ মোজাইক শিল্প এবং নির্মল মনোরম পরিবেশ বিশাল এ মাসজিদটিকে অধিক দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে।

"The great Mosque of Cordova forms a vast rectangle, free on all sides and measuring about 178m.(410ft) from east to west excluding the buttresser."[55]

**মিনইয়া প্রাসাদ**

খলিফা আল ওয়ালিদ নির্মিত এ মিনইয়া প্রাসাদটি ই.এ মাজার ১৯৩২ সালে উদঘাটনের লক্ষ্যে খনন কাজ শুরু করেন। প্রাসাদটির নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে হল কক্ষটির মেঝে এবং দেয়ালের নিম্নাংশে মর্মর পাথরের আবরণ এবং এর উপর রঙিন, সাদা কাঁচের সোনালী পাতার নকশা ছিল। ৩টি কক্ষের মোজাইকে কালো, সাদা, লাল, স্বর্ণপিঙ্গল বর্ণ

---

[৫৪] ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, নভেল পাবলিশিং হাউস, বাংলা বাজার ঢাকা, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৮৫

[55] K.A.C. Cresswell, *A Short Account of Early Muslim Architecture*, Revised Edition, Cairo:The American University press, 1989

পরিদৃষ্ট হয়। রোমান ক্যাস্ট্রাকারে নির্মিত এই প্রাসাদটিকে নান্দনিকতার বিচারে উমাইয়া প্রাসাদের আদর্শরূপে পরিগণিত হয়।

**মাশাত্তা প্রাসাদ**

মাশাত্তা প্রাসাদ মুসলিম স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। মনে করা হয়, খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদ ৭৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ৪৭৩ বর্গফুটের বৃহত্তর পরিসরের প্রাচীন পাথর দ্বারা নির্মিত এ প্রাসাদটির ল্যায়ার্ড ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। প্রাসাদ অভ্যন্তরে ৫৭ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি হল ঘর এবং ৮৯ × ৭৫ ফুট গভীর একটি দরবার কক্ষ ছিল। প্রাসাদ তোরণের পূর্ব ও পশ্চিম পাশের দেয়াল ও বুরুজের অলঙ্করণ অতি মনোরম। প্রাচীরের নিম্নাংশে দ্রাক্ষালতা ও এ্যাকান্থাসগুল্মের উপস্থিতি এর নান্দনিকতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, যার গুল্ম হতে আঙ্গুর ঝুলে পড়ছে এবং এতে পাখি বসে ঠোকর দিচ্ছে।

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আব্বাসীয় যুগের স্থাপত্য**

উমাইয়া শাসনের পতন এবং আব্বাসীয় খেলাফতের গোড়া- পত্তনের ফলে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ধারায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। পারস্য সংস্কৃতি ক্রমশ বিকাশ লাভ করে। তারা রাজধানী দামেস্ক থেকে পারস্যের প্রাচীন শহর বাগদাদে স্থানান্তর করে। আব্বাসীয় খিলাফতে পাঁচশতের অধিক কাল টিকে ছিল যা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মূলত কাঁচামাটি দ্বারা আব্বাসীয় স্থাপত্য গড়ে উঠে কারণ মেসোপটেমিয়ায় প্রচুর পরিমাণে মাটি উৎপন্ন হত, পাথর ততটা সহজলভ্য ছিল না। কাঁদাকে পুড়িয়ে ইট তৈরী হত। মাসজিদ এবং ইমারতের ছাদে কাঠ ব্যবহৃত হত। স্টাকু অলঙ্করণ ও মোজাইক ডেকোরশনের মাসজিদের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়।

**সামাররার জামে মাসজিদ**

৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল মুত্তাসিন সামাররার জামে মাসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করে ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করেন। ২৬০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮০ মিটার প্রস্থের এ মাসজিদটিতে ১ লক্ষ মুসল্লী একত্রে সালাত আদায় করতে পারতেন। পোড়া ইটের প্রাচীর মাসজিদটিকে ঘিরে রেখেছে। মাসজিদ প্রাচীর ৮ $\frac{৩}{৪}$ ফুট, চওড়া এবং লাল ইটের তৈরী। মাসজিদটি ছিল ১৬ দরজা বিশিষ্ট। মূল মসজিদের বাইরে উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রাচীর বেষ্টিত যিয়াদা মাসজিদটিকে নান্দনিক করে তুলেছে। মাসজিদের সাথে মালবীয় (পেঁচানো) মিনারের সংযোগ স্থাপন করেছে একটি সেতু। আল মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক খোদাইকৃত সামাররার জামে মাসজিদের কারুকার্য এবং অলঙ্করণ এর নান্দনিকতাকে বৃদ্ধি করেছে।

**বাগদাদের জামে মাসজিদ**

আব্বাসীয় খিলাফাতের দ্বিতীয় শাসক আবু জাফর আল মনসুর মাসজিদটি ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ শুরু করে ৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তা শেষ করেন। এর প্রাচীর কাঁদা ও শুকনো ইটের তৈরী যাতে ১৭টি খিলান পথ ও ৫০টি অর্ধগোলাকৃতির বুরুজ ছিল, পুন:নির্মাণের পর মাসজিদটিতে ২টি সাহন ও ২টি জুল্লাহ সংযুক্ত হয়। এ মাসজিদের কিবলা প্রাচীরের প্রবেশপথ দিয়ে খলিফা মাকসূরায় প্রবেশ করতে পারতেন।

**ইবনে তুলুনের মাসজিদ**

আহমেদ বিন তুলুন ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে একটি জামে মাসজিদ নির্মাণ করেন। এই মাসজিদে জুল্লাহ, সাহন, সাহনের তিন দিকে রিওয়াক এবং এদের বহি:প্রাচীরকে পরিবেষ্টন করে তিনদিক যিয়াদাহ পরিদৃষ্ট হয়। মনোরম লাল ইটের এ মসজিদের জুল্লাহ ৫টি খিলান পথে বিভক্ত। মাসজিদের প্রবেশ পথ ছিল ২৩টি। উন্মুক্ত চত্বরে ওযুর জন্য পানির ফোয়ারা ছিল। ১০টি মার্বেল খচিত পাথরের স্তম্ভের একটি সোনালী রঙের গম্বুজ কে পরিবেষ্টন করে আছে ১৬টি মর্মর পাথরের স্তম্ভ যা মাসজিদটিকে নান্দনিক করে তুলেছে। যিয়াদার সীমানায় চুনাপাথরের ৪ তলায় বিভক্ত একটি মিনার নির্মিত হয়েছিল। দুই খিলানের সংযোগস্থলে পুষ্পলতা এবং দ্রাক্ষালতার নকশা এর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ইবনে তুলুনের এ মাসজিদে মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় উভয় স্থাপত্য কৌশলের এক নান্দনিক ছোঁয়া পাওয়া যায়।

**আবু দুলাফের জামে মাসজিদ**

জাফর আল মুতাওয়াক্কিল আল মাড়ুয়া নামক স্থানে ৮৬০ খ্রি. আবু দুলাফের জামে মাসজিদটি নির্মাণ করেন। একটি যিয়াদা এই মাসজিদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ মাসজিদটির পূর্ব- পশ্চিমে ৬৯৯ ফুট, উত্তর- দক্ষিণে ৪৪৬ ফুট এবং এর প্রবেশপথ ১৫টি। স্টাকু ডেকোরেশন ইট নির্মিত এ মাসজিদটিকে দিয়েছে এক নান্দনিক বৈশিষ্ট্য।

**উখাইদির প্রাসাদ**

ধারণা করা হয়, ঈসা বিন মূসা ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে উখাইদির প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদটি একটি সুরক্ষিত দূর্গের অবকাঠামোর নির্মিত যা চুনাপাথর ও জিপসামের তৈরী। বেষ্টনী ও প্রাচীরে ৪৪টি বুরুজ পরিলক্ষিত হয়। যার পরিমিত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ৩৭০ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিম ২৭০ ফুট। এগুলোর পশ্চিম প্রান্তে আয়তাকার কুলঙ্গি মিহরাব বিশিষ্ট একটি মাসজিদ ছিল। ৪টি বাইত পদ্ধতিতে কক্ষ সমূহ সুবিন্যস্ত পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন এবং ঘোরানো করিডর হতে প্রত্যেকটিতে যাওয়া যায়। উখাইদির প্রাসাদ সিরিয় এবং পারসীয় স্থাপত্যের নান্দনিক সংমিশ্রণ দেখা যায়। কৌণিক খিলানের ব্যবহার, মাসজিদের আয়তাকার মিহরাব সংযোজন, গ্রোয়েন ভল্ট ও জ্যামিতিক নকশা দূর্গের নান্দনিকতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

**জউসাক আল-খাকানী**

টাইগ্রিস নদীর তীরে ৪৩২ একর ভূমির উপর বর্গাকৃতির জউসাক আল-খাকানী মাসজিদটি (৮৩৬-৮৪২) খ্রি. নির্মিত হয়েছিল। মাসজিদ অঙ্গনের প্রত্যেক দিকে ৩টি কক্ষ এবং ১টি ফোয়ারা, কেন্দ্রীয় অঙ্গনের চতুর্দিকের দেয়াল কাঙ্গুরায় সুশোভিত ছিল। এখানে ৩ সহস্র সেনা সংকুলান হয় এরূপ ১টি সেনানিবাস ছিল। সেনানিবাসের অঙ্গনে ৩টি মাসজিদ ছিল, জউসাক আল-খাকানীর কক্ষগুলোর অলংকরণ পলেস্তারা, ফ্রেসকো, মর্মর খোদাই ইত্যাদি কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। প্রাসাদটির গঠন, অলংকরণ শৈলী পরবর্তীতে বাগদাদ এবং কায়রোতে অনুসৃত হয়েছিল।

**বালকুয়ারা প্রাসাদ**

টাইগ্রিস নদীর দক্ষিণ পশ্চিম তীরে সামাররার নদীর দক্ষিণ প্রান্তে ৮৪৯-৮৫৯ খ্রি. বালুকুয়ারা প্রাসাদটি নির্মিত হয়। এর অলংকরণ মূলত ৩ ধরণের পলেস্তারা কার্য, রঙ রেখা এবং মোজাইক চিত্র। প্রাসাদের হল কক্ষ ত্রিখিলান বিশিষ্ট গেটের নকশায় ফল পুষ্পে সুশোভিত প্রাচীর দ্বারা আলাদা আলাদা ভাবে বেষ্টিত এবং এর পিছনে সংযোজন কেন্দ্রে ছত্রী বিশিষ্ট জলাধার, উদ্যানের ডানে তিন আইল বিশিষ্ট মাসজিদ এবং বামে একটি ক্ষুদ্র মাসজিদ ছিল। প্রাসাদটি অপেক্ষাকৃত অসমতল এবং উঁচু ভূমিতে হওয়ায় তা নগরের বাহ্‌বা কুড়িয়েছিল।

**কাসর আল আশিক**

পরিখা দ্বারা বেষ্টিত জিপসাম এবং কাদামাটি মিশ্রিত কৃত্রিম পাথরে তৈরি এ প্রাসাদটি কুব্বাত আস সুলাইবিয়া প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদটির বুরুজের মধ্যবর্তী দেয়ালের উর্ধ্বাংশে ৩টি বদ্ধ খিলান নকশায় অলঙ্কৃত। খিলানসমূহের অন্তর্ভাগ একটি খাড়া ত্রিখাঁজ খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি নকশায় সুশোভিত। প্রাসাদের সব নকশাই নান্দনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অতি আকর্ষণীয়।

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ উসমানীয় যুগের স্থাপত্য**

উসমানীয় সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য বা অটোমান সাম্রাজ্য বলে পরিচিত একটি ইসলামি সাম্রাজ্য যা ছয়শত বছর ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে প্রথম সুলাইমানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেশাস, উত্তর আফ্রিকা এবং হর্ণ অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল।

উসমানীয় স্থাপত্য পারস্য বাইজেন্টাইন ও ইসলামি স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবিত, টিউলিপ যুগে পশ্চিম ইউরোপের অলংকরণপূর্ণ শৈলীর প্রভাব সাম্রাজ্যের উপর পড়ে। উসমানীয় স্থাপত্যের ধারণা ছিল মূলত মাসজিদ কেন্দ্রিক। মাসজিদ ছিলো সমাজ নগর পরিকল্পনা ও সম্প্রদায়ের জীবনের সাথে একীভূত। এ স্থাপত্যের নিদর্শনে মাসজিদ

ছাড়াও মাদরাসা, হাসপাতাল, হাম্মাম ও মাজার ছিল। ইস্তাম্বুল ছাড়াও মিশর, তিউনিশিয়া, ইরিত্রিয়া, আলজিয়াস, বলকান, রোমানিয়ায়ও মাসজিদ, সেতু, ফোয়ারা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যে বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানের ফলে অলংকরণেও এর প্রভাব পড়ে। দরবারের শিল্পীরা বাইজানটাইন শিল্পের সাথে চীনা শিল্পের সংমিশ্রণে শিল্পকে নান্দনিক করে তুলেছেন।

**সুলতান আহমেদ মাসজিদ**

ইস্তাম্বুলের বসফরাস প্রণালীর তীরে মুসলিম ঐতিহ্যের নিদর্শন কোলে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুলতান আহমেদ মাসজিদ। এটি হাজিয়া সোফিয়া (বেহেশতী প্রজ্ঞা) নামেও পরিচিত। তুরস্কের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন স্থান এ মাসজিদটি। বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩৭ সালে হাজিয়া সোফিয়া নির্মাণ করেন। ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ সালের মধ্যে উসমানীয় সুলতান আহমেদ বখতি এই মাসজিদ নির্মাণ করেন।

৭২ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ৬৪ মিটার প্রস্থের এ মাসজিদটি উসমানীয়দের ইস্তাম্বুল জয়ের প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন ৫০টি চিত্রের সমন্বয়ে কারুকার্য খচিত টাইলস একে অতি নান্দনিক করে তুলেছে। ভেতরটা সম্পূর্ণ হাতে কারুকার্য খচিত দুর্লভ টাইলসে আবৃত। কারুকার্য গুলো ফুল ও লতাপাতা বিশিষ্ট। এর মূল নান্দনিক আকর্ষণ মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত নিখুঁত কারুকার্য খচিত মিহরাব।

১৯৩৪ সালে কামাল আতাতুর্ক একে জাদুঘরে পরিণত করেন। মাসজিদটির সুউচ্চ গম্বুজ ও নয়নাভিরাম মোজাইক পর্যটকের হৃদয় কেড়ে নেয়।

**সুলায়মানি মাসজিদ**

১৫৫০-১৫৫৭ সালে সম্রাট সুলায়মানের আদেশে ইস্তাম্বুলে এ মাসজিদ নির্মিত হয়। উসমানীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থপতি সিনান মাসজিদটির নকশা করেন। একটি নান্দনিক প্রবেশদ্বার মুসল্লিসহ দর্শনার্থীদের ভেতরে প্রবেশের অভ্যর্থনা জানায়। বিশাল দ্বারটির নকশা মাসজিদের অভ্যন্তরের মিহরাবের আদলে তৈরী এবং এটি মক্কার দিক নির্দেশ করছে। মাসজিদটির উচ্চতা ৫৩ মিটার, গম্বুজের ভেতরের ব্যাস ২৬ মিটার এবং ৪টি মিনার লক্ষণীয়। শ্বেত মর্মর পাথরে নির্মিত উঠান ও এর কেন্দ্রস্থলে ঝর্ণার অবস্থিতি একে অনন্যতা দিয়েছে। সুলায়মানি মাসজিদের মেঝে মিশরের কায়রো এবং তুরস্কের উসাক শহর থেকে আনা নান্দনিক কার্পেটে আবৃত। এ মাসজিদটি উসমানীয় সাম্রাজ্যের শৌর্য বীর্যের এক নান্দনিক প্রতীক।

**কুব্বাত আন নবী**

১৫৩৮ সালে জেরুজালেমের উসমানীয় গভর্নর মুহাম্মাদ বে এই গম্বুজ নির্মাণ করেন। এ স্থাপনাটি অষ্টভুজাকৃতি। আটটি স্তম্ভ ধূসর মার্বেলের তৈরী এবং এর অলংকরণে লাল, কালো ও সাদা পাথর ব্যবহৃত হয়েছে।

**তোপকাপি প্রাসাদ**

সুলতান ২য় মুহাম্মদের নির্দেশে ১৪৫৯ সালে ইস্তাম্বুল শহরে তোপকাপি প্রাসাদটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। রাজকীয় গেটের ডানে ছিল হাম্মাম বা ফোয়ারা যাতে ওযু ও গোসলের ব্যবস্থা রয়েছে এবং দক্ষিণে রাজকীয় রন্ধনশালা। ১ম চত্বর থেকে ২য় চত্বরে ঢুকতে গেট অফ স্যালুটেশন দিয়ে ঢুকতে হয়। ৪র্থ চত্বর থেকে বামে বসফরাস প্রণালী, ডানে মর্মর সাগর এবং আধুনিক ইস্তাম্বুল দেখা যায়। চারটি বিশাল হলঘরে রয়েছে অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে মুসলমানদের জন্য পবিত্র সমরচিহ্ন হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আলখাল্লা এবং তরবারি, উসমানীয় স্থাপত্যকলার বহু নিদর্শন, চীনামাটির বাসন, পোশাক, অস্ত্র, ঢাল, বর্ম আবরণ উসমানীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র নকল ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি হস্তলিপি। উসমানীয় যুগের অন্যতম নান্দনিক স্থাপত্য তোপকাপি প্রাসাদ ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ভূষিত হয়।

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের স্থাপত্য**

৭৫৫ সালে ১ম আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই স্পেনীয় মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়। পিতৃপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই ভেবেই সূদুর স্পেনে আব্দুর রহমান স্বেচ্ছায় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম আব্দুর রহমানের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ইমারত কর্ডোভার জামে মাসজিদ। স্পেনীয় মুসলিম স্থাপত্য ইতিহাসে এটাই প্রথম নিদর্শন।

**মাদীনাতি আয যাহরা**

সিয়েরা মেরিনার নিম্নঢালে অবস্থিত ৯৪১ সালে নির্মিত মাদীনাতি আয যাহরাকে আরবী ঐতিহাসিকগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ শহরটি ৩টি ধাপে বিভক্ত- ১ম ধাপে খলিফার প্রাসাদ, ২য় ধাপে উদ্যান এবং ৩য় ধাপে মাসজিদ। স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত বিভিন্ন ভাস্কর্যে প্রাণীর মুখ হতে ফোয়ারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হত। গৃহের ৫টি আইলের মধ্যে মধ্যবর্তী আইলের শেষে সুদৃশ্য মিম্বার ছিল। স্থাপনাটি গাঢ় পাটল বর্ণের সমর প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং এর মধ্যস্থলে ফোয়ারা বিশিষ্ট একটি জলাধার ছিল।

**আল ক্যাফেরিয়া প্রাসাদ**

পণ্ডিতগণ আল ক্যাফেরিয়া প্রাসাদকে তাইফা নৃপতি আল মুক্তারি বিন হুদের কীর্তি বলে মনে করেন। প্রাসাদের বর্ধিত অংশের মধ্যে ৭৫ ফুট বলাকৃতির একটি ক্ষুদ্র মাসজিদ রয়েছে। সমর স্তম্ভের উপর নির্মিত ৪৫ ফুট উঁচু গম্বুজ একে বিশেষত্ব দিয়েছে। মাসজিদের মিহরাবটি পলেস্তারা অলংকরণে সমৃদ্ধ। নীল পশ্চাৎ ভূমির উপরে এই পলেস্তারা অলংকরণ অতি নান্দনিক। জিরালডিও স্পেনের বিখ্যাত ইমারতসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং সেভিলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্যের একটি। জিরালডিও মূলত সেভিল জামে মাসজিদের মিনার।

**স্বর্ণ বুরুজ**

আল মুত্তাসিম শাসনকর্তা ২য় ইউসুফের শাসনকালে স্বর্ণ বুরুজ নির্মিত হয়। বুরুজটি দ্বাদশ ভুজ বিশিষ্ট একটি তিন তলা ইমারাত যার জানালা শরছিদ্র বিশিষ্ট। নিচের ২টি তলের শিরোভাগ কাঙ্গুরায় সুশোভিত। ১ম তলের কাঙ্গুরার নিচে সমান্তরালভাবে কুলঙ্গি স্থাপন করে নকশা অঙ্কিত। স্বর্ণবুরুজের অদূরে নদীর তীরে আরেকটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে একে নদীর অপর তীর থেকে মনোরম দেখায়।

**গ্রানাডা শহর**

আরব বিজয়ের মধ্য দিয়ে গ্রানাডা শহরের উদ্ভব। গ্রানাডার প্রাচীন নাম ইলিবেরিস। যার অর্থ 'নতুন শহর' গ্রানাডা স্থাপত্যের প্রকৃত গৌরবান্বিত ইতিহাস শুরু হয় নাসিরীয় সুলতানদের আমলে। এই নাসিরীয় সুলতানরা সাবিকা পাহাড়ের উপর বিখ্যাত আল হামরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আল হামরা এতই নান্দনিক যে গ্রানাডা বলতে অনেকে এই প্রাসাদকেই ইঙ্গিত করেন।

এই প্রাসাদ ছাড়াও বর্তমানে গ্রানাডায় আরো যে সব ইমারতের চিহ্ন রয়েছে সে সবের মধ্যে আলবাইসিন অঞ্চলে অবস্থিত "দার আল হুরা" বা রানীর প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য।

সাবিকা পাহাড়ের নিম্নে বর্তমানে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য লক্ষ করা যায় যার মধ্যে সুলতান প্রথম ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত একটি মাদরাসা এবং শয্যাগার (Carleon) উল্লেখযোগ্য। মাদরাসাটি মর্মর প্রস্তরে উৎকীর্ণ এবং লতাগুল্ম অলংকরণে সজ্জিত।

**আল হামরা প্রাসাদ**

১২৪৮ সালে নাসিরীয় বংশের প্রথম সুলতান মুহাম্মাদ বানু আল আহমরাই এ প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তী সুলতানদের অধীনে এই নির্মাণ কাজ প্রায় ২ শতাব্দী ধরে চলে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ইউসুফ এবং পঞ্চম মুহাম্মাদই এটি নির্মাণে অবদান রাখেন। ১৮৭০ সালে আল-হামরা প্রাসাদ স্পেনীয় জাতীয় ইমারত হিসাবে ঘোষিত হয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে পর থেকে এটা স্পেনীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে রক্ষিত আছে।

প্রাসাদের উত্তর এবং পশ্চিমে দারো নদীর উপত্যকা, দক্ষিণে সাবিকা পাহাড়ের বিস্তৃতি এবং পূর্বে রেইচিকো পাহাড়ের ঢাল। প্রবেশ পথের তিনটি তোরণের মধ্যে প্রথমটি শান্তি ও প্রাচুর্যের এবং দ্বিতীয়টির ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক। আল হামরা প্রাসাদে ৩টি বিখ্যাত বরুজ রয়েছে- পর্যবেক্ষণ বুরুজ, ভক্তি বুরুজ এবং গিরিপথ বুরুজ। বহি:দিকে এটা অতি সাদা-সিধা, যত অলঙ্করণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সামগ্রিক নকশা অনুসারে প্রাসাদটি তিনটি অঙ্গনে বিভক্ত- প্রশাসনিক অঙ্গন, সরকারি বাসস্থান অঙ্গন এবং হারিম বা সিংহ অঙ্গন। প্রশাসনিক অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা এবং মূল কক্ষের অভ্যন্তরে ৪টি স্তম্ভের উপরে চন্দ্রাকৃতি কাঠের ছাদ। প্রশাসনিক ভবন থেকে সরকারি

বাসস্থানে প্রবেশের অঙ্গনটি আল হামরার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ অঙ্গন, সিংহ অঙ্গনের বিশেষত্ব এটি নুড়ি পাথরে সজ্জিত। এর চারপাশেই খিলান বিশিষ্ট উন্মুক্ত বারান্দা আছে যার মেঝে সমূহ মর্মর প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নিন্দা রাজার উদ্যান নামে পেছনে একটি উদ্যান অঙ্গন রয়েছে।

সিংহ অঙ্গন এবং সরকারি বাসভবনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চার কক্ষবিশিষ্ট স্নানাগার অবস্থিত। এদের একটি বিশ্রাম কক্ষ এবং অন্য তিনটি কক্ষ রোমান স্নানাগারের ন্যায় শীতল স্নান, উষ্ণ স্নান এবং বাস্পীয় স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আল হামরা প্রাসাদের অলংকরণ মূলত টালি মোজাইককৃত এবং রঙিন পলেস্তারা ছাঁচে কারুকার্যকৃত যার স্থানে স্থানে মর্মর মোজাইক, খোদাই, রঙচিত্র এবং কাচের কাজও দেখা যায়। একই নকশাকে পুন: পুন: স্থাপন করে প্রাসাদে যে অলংকরণের ছন্দ তৈরি হয়েছে তা বিরল। স্থাপত্য ও পারিপার্শ্বিকতার এই সংমিশ্রণ আল হামরা মাসজিদকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সুলতানি ও মুঘল আমল**

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন সামের (মুহাম্মাদ ঘুরী নামে পরিচিত) হাত ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত যা প্রায় দীর্ঘ ৩০০ বছর স্থায়ী হয়। এ সময়ের ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপনায় ইন্দো-মুসলিম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। ইমারাহ নির্মাণ শৈলীতে খিলান, গম্বুজ, খিলানওয়ালা ছাদ, লতাগুল্মের নকশা, সুন্দর হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ আরবী লিপি, জ্যামিতিক রেখাচিত্র ও মোজাইক নকশা স্থান পায়।

সুলতানী আমলের অবসানের পর মুঘল শাসনের অবতারণা হলে শিল্পসংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পানুরাগী মুঘল সম্রাটগণের স্থাপত্যে পারসিক, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান। আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী সম্রাটগণ তাদের স্থাপত্যে প্রথমে লাল বেলে পাথর ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে শ্বেত মর্মর পাথরের সংযোজন স্থাপত্যশৈলীর নান্দনিকতায় নবমাত্রা যোগ করে।

**কুওয়াতুল ইসলাম মাসজিদ**

১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আইবেক রাজধানী দিল্লিতে মাসজিদটি নির্মাণ করেন যার অর্থ ইসলামের শক্তি। আয়তাকার এ মাসজিদটির দৈর্ঘ্য ২১২ ফুট এবং প্রস্থ ১৫০ ফুট যার পরিসর চারদিকে পাথরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, পশ্চিম দিকে এর জুল্লাহ অবস্থিত এবং জুল্লাহর অগ্রভাগের খিলান পথটি রক্তিম বেলে পাথর, কুরআনের আয়াত ও লতাগুল্মের নকশায় আচ্ছাদিত।

**কুতুব মিনার**

ভারত বিজয়স্মৃতি ও মুসলিম আধিপত্যের প্রতীক স্বরূপ কুওয়াতুল ইসলাম মাসজিদ প্রাঙ্গনে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ কুতুবউদ্দীন আইবেক একটি সুউচ্চ ও অলংকৃত মিনার নির্মাণ করেন, জগৎখ্যাত এ স্থাপনাটি কুতুব মিনার নামে

পরিচিত। কুতুবউদ্দীন আইবেক এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনসহ প্রথমস্তর নির্মাণ করেন। এ স্তরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মুহাম্মাদ বিন সামের নাম উল্লেখ আছে। ইলতুতমিশ এর সম্প্রসারণ করে ২য় ও ৩য় তলা এবং পরবর্তীকালে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক গম্বুজ বিশিষ্ট চতুর্থ ও পঞ্চম তলা সম্পন্ন করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে বজ্রপাতে গম্বুজটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে সিকান্দার লোদী এটি সংস্কার করেন যা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত টিকে ছিল। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্রিটিশ সরকার ১৮২৮ সালে সংস্কার করেন।

ইসলামী স্থাপত্য কলার পরিচায়ক ২৩৮ ফুট উঁচুঁ এ মিনারটি পাঁচটি স্তরে সজ্জিত। ব্যালকনি দ্বারা বিভক্ত এ সুউচ্চ মিনারটির ভিত্তিভূমি ৪৬ ফুট ব্যাসার্ধ এবং ক্রমশ সরু হয়ে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ১০ ফুট ব্যাসার্ধে পৌঁছেছে। বর্তমানে গম্বুজের পরিবর্তে রেলিং ব্যবহৃত হয়েছে। মিনার অভ্যন্তরে ৩৭৯টি সিঁড়ি প্যাঁচানো অবস্থায় এক স্তর থেকে অন্যস্তরের উপরে উঠে গেছে। মিনারটির অলংকরণে কুরআনের আয়াত, লতাগুল্ম ও জ্যামিতিক রেখার ব্যবহার এর নন্দনশৈলীকে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতা।

**দিল্লীর জামে মাসজিদ**

মুঘল স্থাপত্য কলার অনুপম নিদর্শন, বাদশাহ শাহজাহান ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির ভোজ পাহাড়ে ইতিহাসখ্যাত এ স্থাপত্যকলা নির্মাণ করেন। মাসজিদের প্রবেশ চত্বরটি সাদা ও কালো মর্মর পাথরের রেখা, চিহ্ন, রক্তিম বেলে পাথরের মধ্যে সুনিপণভাবে সংস্থাপিত। জুল্লায় প্রবেশের জন্য মধ্যস্থলে একটি সুউচ্চ খিলানওয়ালা ফটকের সাথে চার স্তর বিশিষ্ট সুউচ্চ মিনার আছে। গ্লোভার বলেন, “It is undoubtedly the typical Shahjahani trait in complete lucidity and coherence in its external architectural effect.”[56]

**আগ্রার তাজমহল**

বিশ্ব সপ্তাশ্চর্যের অবিস্মরণীয় প্রতীক আগ্রার তাজমহল সম্রাট শাহজাহানের কালজয়ী স্থাপনা। তাজমহলের প্রধান নকশাবিদ ভারতীয় মুঘল স্থপতি ওস্তাদ ঈসা। তাজমহলের নান্দনিকতা সৃষ্টিতে ওস্তাদ ঈসা ও মোহাম্মদ শরীফ (নকশাবিদ), আমানত খান, আব্দুল গফুর, রওশন খান, জুলফিকার, চিরঞ্জীব লাল ( মোজাইক শিল্পী), ইসমাইল আফাদী (গম্বুজ তৈরীকারক) আবু মোহাম্মদ (মার্বেল খোদাই শিল্পী) এ সকল ব্যক্তিবর্গের অবদান রয়েছে। তাজমহলের বৃহৎ পরিসরটি আয়তাকার যা উত্তর- দক্ষিণে ১৯০০ ফুট এবং পূর্ব- পশ্চিমে ১০০০ ফুট পরিমিতির উদ্যান দ্বারা পরিশোভিত। উদ্যানসহ সুউচ্চ তাজমহল পরিসরটি একটি উঁচু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

উত্তরদিকে, পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি লাল পাথর ও সাদা মার্বেলের মিশ্রণে দুইটি ইমারত নির্মিত যা পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত। জল ও স্থল উভয় পথে এ সমাধিস্থলে গমন সম্ভব। সম্রাট শাহজাহানের মরদেহ তাজমহলের অভ্যন্তরে হল কক্ষের পার্শ্ববর্তী অংশে সমাহিত আছে। তাজমহলের চত্বরের চারকোণায় চারটি ঢালু মিনার নির্মিত হয়েছে।

---

[৫৬] সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

তাজমহলের প্রবেশ পথ পার হলে ১০০০ বর্গফুটের একটি চমৎকার উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থলে একটি ফোয়ারা এবং তার দুই পাশে মার্বেল আচ্ছাদিত পথ মূল ভবনের দিকে গেছে। উদ্যানটির মাঝে একটি মার্বেল নির্মিত চৌবাচ্চা যাতে তাজমহল প্রতিবিম্বিত হয়। আরবী কালিগ্রাফি মুসলমানদের পবিত্র ও সুকুমার শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। ক্যাপ্টেন মান্ডি বলেন, "এই ইমারাতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ণনাতীত। মার্বেলে সেই দক্ষতা ও নৈপুন্যের সাথে লতাপাতা ও ফুলের নকশা কেটে মণিমুক্তা বসিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে তা অনতিক্রান্ত। কর্ণেলিয়া, জেসপার, লাপিজ, লাজুলিসহ মহামূল্যবান মণিমুক্তা ও দুষ্প্রাপ্য পাথরের বর্ণাঢ্য ছটায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে গাঢ় লাল রঙের পাথর সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"[৫৭]

স্যামুয়েল স্মিথ এর মতে- "তাজমহলের খোদাই করা নকশাগুলি দেখে মনে হবে যে এগুলো পাথরের কাঁটা নয় বরং কাপড়ে বোনা নকশা।"[৫৮]

"The entire complex was proportionally designed accordding to a series of geometrically related grids, hence explaining not only the tomb's perfect balance but also that of entire complex."[৫৯]

"All the designes of this unique tomb wew highly edecated not only in Mathmatics, engineering, and astronogy, but also in literature and of course technology. There were thus well prepared to formulate the tomb's symbolic programm as the ultimate vision of paradise on earth."[60]

**শালিমার উদ্যান**

পাকিস্তানের লাহোরে ১৬৪১ সালে উদ্ভাবিত মুঘল আমলের এ স্থাপনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক। সম্রাট শাহজাহানের অধীনে খলিলুল্লাহ খান উদ্যান তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মধ্য এশিয়া, কাশ্মির, পাঞ্জাব, পারস্য ও দিল্লি সালতানাতের চিত্র শৈলী এতে প্রাধান্য পেয়েছে। উদ্যানটিতে ৪১০ টি ঝর্ণাধারা ছিল বিধায় এলাকাটিতে শীতলতা অনুভূত হয়। শালিমার উদ্যান ইউনেস্কো কর্তৃক ১৯৮১ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

**লাহোর দূর্গ**

২০ হেক্টর এলাকা সম্বলিত লাহোর দূর্গ পাকিস্তানের ইকবাল পার্কের দেয়াল ঘেরা শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এর দুটি ফটক-আলমগিরি ফটক, মাসজিদি ফটক। দূর্গের উল্লেখযোগ্য স্থান হল- শিশ মহল, আলমগিরি ফটক,

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
[৫৮] প্রাগুক্ত
[59] W.E Begaly and ZA Desai, *Taj Mahal,The Illuminated Tomb* (cambridge and seatlle,1989)
[60] Catherine B.Asher, *Architecture of Mughol India*, Cambridge University Press,1992

নওলাখা প্যাভেলিয়ন ও মোতি মাসজিদ। এর আধুনিক স্থাপনা মুঘল আমলের। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর দূর্গটি দখল করে ইট ও চুনাপাথর দিয়ে তা পুন:নির্মাণ করেন। শাহজাহান শাহ বুরুজ, শিশ মহল ও নওলাখা প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করেছেন। তিনি ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান-ই আম নির্মাণ করেন। যেখানে সাধারণ লোক বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। লাহোর দূর্গ ১৯৮১ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানে ভূষিত হয়।

**লাল কেল্লা**

বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের শক্তিশালী প্রতীক। প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লার লাহোরি গেট সংলগ্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৮ সালে যমুনা তীরে অবস্থিত এ দূর্গের কাজ শুরু করে ১৮৪৮ সালে শেষ করেন। লাল কেল্লার অলংকরণ ও শিল্পকর্ম অতি নান্দনিক পারসিক, ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই অভিনব শিল্পকলা ব্যঞ্জনাময়, বর্ণনাময় এবং স্বতন্ত্রতার দাবীদার। দুর্গের দুটি দরজা- দিল্লি গেট ও লাহোর গেট। দিল্লি গেটের বাইরে একটি বড়ো মুক্তাঙ্গন রয়েছে যা দিওয়ান-ই-আম এর অঙ্গন রূপে ব্যবহৃত হত। স্বর্ণ চিত্রিত দূর্গের রেলিং দিয়ে সাধারণকে সিংহাসন থেকে পৃথক করে রাখা হত। দিওয়ান-ই- আম ছিল পুরোপুরি শ্বেতপাথরে মোড়া কক্ষ এবং পুষ্পাচিত্রে সজ্জিত। কক্ষগুলি নহর-ই-বেহিস্ত (স্বর্গোদ্যানের জলধারা) নামে একটি নিরবিচ্ছিন্ন জলধারা দ্বারা সংযুক্ত। দূর্গটি নির্মিত হয়েছিল কুরআনে বর্ণিত স্বর্গোদ্যানের অনুকরণে প্রাসাদের ভিতরের গাত্রে "যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে তবে তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই" কথাটি উপর্যপরি দেওয়ালে খোদিত ছিল। কেল্লার উত্তরে আছে জীবন প্রদায়ী নামে একটি আনুষ্ঠানিক উদ্যান। লাল কেল্লার অলংকরণ নান্দনিকতার দাবিদার। ২০০৭ সালে লাল কেল্লা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

**আগ্রা দুর্গ**

তাজমহল থেকে ২ কি. মি. দূরে ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর কর্তৃক নির্মিত এ দুর্গটি যমুনার তীরে অবস্থিত। সম্রাট আকবরের নির্দেশে ৪ হাজার নির্মাণ শ্রমিক ১৫৫৬ থেকে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে লাল বেলে পাথর দ্বারা দুর্গটি পুন:নির্মাণ করেন। শত্রুসেনা যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে তাই চতুর্দিকের পরিখায় কুমির এবং বাগানে থাকতো শ্বাপদ হিংস্র জন্তু। এই দুর্গে দ্রষ্টব্য হল যোধাবাঈয়ের মহল, শাহজাহানের খাস মহল, অঙ্গরী বাগ, মিনা মাসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শিশ মহল, নাগিনা মাসজিদ, মাছি ভবন, মিনা বাজার প্রভৃতি। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, শাহ জাহান ও আওরঙ্গজেবের মতো মহামতি মোঘল সম্রাটগণ এখানে অবস্থান করেছেন। সাদা মার্বেলে তৈরি সম্রাটের নিজস্ব মহল দেওয়ান-ই-খাস দারুণ কারুকার্যময় এক স্থাপত্য। এখানেই ছিল বহুল আলোচিত তখত-ই-তাউস অর্থাৎ 'ময়ুর সিংহাসন' সুসজ্জিত অলঙ্কৃত এ প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো কাটান সম্রাট শাহজাহান।

**সপ্তম পরিচ্ছেদঃ সমকালীন মুসলিম স্থাপত্যঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ**

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থাপত্যের উপকরণ, শিল্পকলা এবং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এর নন্দনশৈলীকে দিয়েছে অনন্য বৈচিত্রময়তা। নগরায়ন এবং আধুনিকায়নের সাথে তাল মিলিয়ে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে স্থাপত্যরীতি আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে।

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি সময়কাল বাংলা স্থাপত্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় স্থাপত্য শিল্প তার স্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করে যা বাংলারীতি নামে আখ্যায়িত। এই নতুন রীতিতে ইলিয়াসশাহী ও হোসেনশাহী সুলতানগণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। স্থাপত্যকীর্তির নন্দনশৈলীতে ছিল অলংকৃত বন্ধনী, স্থানীয় পোড়ামাটির ফলকের নকশা যা স্পষ্টতই জন্ম দিয়েছে স্বতন্ত্র বাঙালী রীতির।

দিল্লি অধিকারের কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানদের বাংলায় আগমন ঘটে। ১২০৪-১২০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকেই সূচনা হয় বাংলায় মুসলিম শাসনের। মুসলমানগণ নিয়ে এসেছিলেন তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাতে যোগান দিয়েছে নির্মাণ কৌশল। এগুলি হচ্ছে কোন ইমারাতের সদরের বহি:কাঠামো নির্মাণে খিলান ও স্তম্ভ এবং গম্বুজ তুলে ধরার জন্য পেন্ডেটিভ ও স্কুইঞ্চের ব্যবহার।

**ষাট গম্বুজ মাসজিদ**

বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমের জেলা বাগেরহাট শহর থেকে ৭ কি. মি. দূরে খুলনা- বাগেরহাট মহাসড়কের উত্তর পাশে লাগোয়া সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত এ মাসজিদটি প্রাচীন আমলের সর্ববৃহৎ নান্দনিক নিদর্শন। এটি পঞ্চদশ শতকে খান-ই জাহানের নির্মিত; যা বর্তমানে ২০ টাকার নোটে মুদ্রিত। মাসজিদটি উত্তর- দক্ষিণে ১৬০, ভিতরের দিকে ১৪৩, পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮, ভিতরের দিকে ৯০ ফুট। মাসজিদটি ষাট গম্বুজ নামে অবহিত হলেও এতে মোট গম্বুজ সংখ্যা মূলত ৮১টি। মাসজিদের চার কোণের মিনার উপরের ৪টি গম্বুজ বাদ দিলে গম্বুজ সংখ্যা ৭৭টি। আর ৭৭টি গম্বুজের মধ্যে ৭০টির উপরিভাগ গোলাকার এবং মধ্যের একটি সারিতে ৭টি গম্বুজ চার কোণ বিশিষ্ট। ষাট গম্বুজ মসজিদের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি ভাগে ৭টি সারিতে বিভক্ত (৭×১১) মোট ৭৭টি গম্বুজ আছে। গম্বুজ গুলোর ছাদ পরিকল্পনার এই ভার বহনের জন্য নিচের অংশে সারিবদ্ধভাবে (৬×১০) ৬০টি পাথরের খাম বা পিলার বসানো। মাসজিদের ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ১০ টি মিহরাবের মধ্যে মাঝের মিহরাবটি আকারে বড় এবং তুলনামূলক অধিক কারুকার্য খচিত। মাসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট আকারের খিলানযুক্ত দরজা এবং ৪ কোণে ৪টি মিনার আছে। সামনের দুটি মিনারে প্যাঁচানো সিঁড়ি ছিলো এবং এখান থেকে আযানের ব্যবস্থা ছিল। এদের নাম ‘রওশনকোটা’ ও ‘আন্ধারকোটা’। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন এ মাসজিদটিকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়।

**বায়তুল মোকাররম মাসজিদ**

বায়তুল মোকাররম ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের জাতীয় মাসজিদ যেটি বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কাবার সদৃশ। পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফ বাওয়ানি ও তার ভাতিজা ইয়াহিয়া বাওয়ানির উদ্যোগে এই মাসজিদ নির্মাণের পদক্ষেপ গৃহীত হয় ফলশ্রুতিতে ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৬৩ সালে ১ম পর্বের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররাম মাসজিদ সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। পুরান ঢাকা ও নতুন ঢাকার সংযোগস্থলে মাসজিদটির জন্য জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। বিশিষ্ট স্থপতি টি. আব্দুল হুসেন খারিয়ানিকে মাসজিদ কমপ্লেক্সটির নকশার জন্য নিযুক্ত করা হয়। আয়তাকার মিহরাব বিশিষ্ট এ মাসজিদের প্রধান কক্ষটি তিন দিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা, যাতে ৪০ হাজার মুসল্লি একত্রে সালাত আদায় করতে পারেন। ১৯৬৩ সালের ২৫ জানুয়ারি শুক্রবার এ মাসজিদে প্রথম জুমআর সালাত অনুষ্ঠিত হয়। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মাসজিদটি বর্তমানে ১০ টাকার নোটে মুদ্রিত।

**কুসুম্বা মাসজিদ**

বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পরীতির প্রথম যুগ পর্বের (১২০২-১৫৭৫ খি.) কুসুম্বা মাসজিদ নওগাঁ জেলার ইতিহাস ও বাংলায় সুলতানি আমলের এক অনন্য নিদর্শন। প্রায় সাড়ে চারশত বছরের ঐতিহ্যবাহী এই কুসুম্বা মাসজিদ বর্তমানে পাঁচ টাকার নোটে মুদ্রিত। বরেন্দ্র জনপদের আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলাধীন ৮নং কুসুম্বা ইউনিয়নের কুসুম্বা নামীয় গ্রামে এর অবস্থান। মাসজিদের প্রবেশদ্বারে বসানো ফলকে এর নির্মাণকাল লেখা আছে হিজরি ৯৬৬ সালে (১৫৫৪-১৫৬০ খ্রি.)। আফগানী শাসনামলের শাসক গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে সুলায়মান নামে এক ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেন। মাসজিদ অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম কোণে স্তম্ভের উপর একটি উঁচু আসন রয়েছে সেখানে কাজী বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।

মাসজিদটির দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট, প্রস্থে ৪২ ফুট। জ্যামিতিক নকশার আদলে  পোড়ামাটির সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত এই মাসজিদের দেয়ালগুলো বাইরে ও ভিতরে পাথর দ্বারা আবৃত। মাসজিদটি বাংলা চালাঘরের মতো উত্তর- দক্ষিণে ঈষৎ বক্র। চারদিকের দেয়াল ৬ ফুট পুরু। মাসজিদের চার কোণে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অষ্টভুজাকৃতির চারটি মিনার বা টারেট এবং এর উত্তর দিকের মেহরাবের সামনে পাথরের স্তম্ভের উপর তৈরী করা হয়েছিল একটি দোতলা ঘর যেটিকে বলা হত 'জেনান গ্যালারি' (মহিলাদের নামাজঘর)। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত পাথরের তৈরী স্তম্ভের উপর স্থাপিত খিলানগুলির শীর্ষে রয়েছে কলস মোটিফের অলঙ্করণ। মিহরাবের ফ্রেমে, প্লাটফর্মের প্রান্ত ও মাসজিদের কিবলা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে আঙ্গুর গুচ্ছ, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা। বাইরের দেয়ালের দৃষ্টিনন্দন অলংকরণগুলি ছাঁচে ঢালা ও গভীরভাবে খোদাইকৃত।

মোটকথা, জ্যামিতিক নকশার আদলে পোড়া মাটির সুদৃশ্য কারুকাজ, মিহরাবে বিভিন্ন ফুল, লতাপাতা, ঝুলন্ত শিকল ও মনোরম কারুকার্য খচিত কুসুম্বা শাহী মাসজিদ মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন। মাসজিদ সংলগ্ন উত্তর- দক্ষিণে রয়েছে ৭৭ বিঘা বিশিষ্ট একটি বিশাল দিঘি যা লম্বায় ১২০০ ফুট ও চওড়ায় ৯০০ ফুট। মাসজিদের সামনের দিকের খোলা প্রাঙ্গন ও পাথর বসানো সিঁড়ি দিঘিতে গিয়ে নেমেছে।

মাসজিদটির শুর আমলের হলেও এটি বাংলা স্থাপত্য রীতিতেই নির্মিত। মাসজিদটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

**ছোট সোনা মাসজিদ**

ছোট সোনা মাসজিদ বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত একটি নান্দনিক স্থাপত্য কীর্তি। হোসেন শাহ স্থাপত্য রীতিতে তৈরী "গৌড়ের রত্ন" নামে খ্যাত এই মাসজিদটি সুলতান আলাউদ্দীন শাহ এর শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৯ খ্রি.) ওয়ালি মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত। মাসজিদের বাইরের দিকে সোনালী রং এর আস্তরণ থাকায় সূর্যের আলো তা সোনার মতো ঝলমল করত বিধায় গ্রামবাসী একে ছোট সোনা মাসজিদ নামে অভিহিত করে। মাসজিদের চারকোণে চারটি বুরুজ, যাতে ধাপে ধাপে বলয়ের কাজ আছে। পূর্ব দেয়ালের পাঁচটি দরজা বরাবর মাসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। এদের মধ্যে মাঝেরটি আকারে বড়। প্রতিটি নকশাই অর্ধ-বৃত্তাকার। মিহরাবগুলোতে পাথরের উপর অলঙ্করণ রয়েছে। ১৫টি গম্বুজ বিশিষ্ট এ মাসজিদের বিশেষত্ব এই যে, বাইরের যে কোন পাশ থেকে তাকালে কেবল পাঁচটি গম্বুজ দেখা যায়। পেছনের গম্বুজগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরো মাসজিদের অলংকরণে মূলত পাথর, ইট, টেরাকোটা ও টাইলস ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মাসজিদের সম্মুখ ভাগ, বুরুজসমূহ, দরজার অংশে পাথরের উপর মিহি কাজ রয়েছে, যেখানে লতা পাতা, গোলাপ ফুল, ঝুলন্ত শিকল, ঘন্টা ইত্যাদি খোদাই করা আছে।

বর্তমানে স্থাপনাটির দক্ষিণ- পূর্ব প্রান্তে পাঁচিল ঘেরা দুটো কবর, যার একটি বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও অপরটি মেজর নাজমুল হক টুলুর।

**আতিয়া মাসজিদ**

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে সাঈদ খান পল্লী শাহ বাবা কাশ্মীরির সম্মানার্থে মাসজিদটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত শিলালিপির তথ্যমাফিক আতিয়া মাসজিদের নির্মাণকাল ১০১৯ হিজরি। টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে দেলদু'য়ার অন্তর্গত আতিয়া গ্রামে লৌহজং নদীর পূর্ব পাড়ে এটি অবস্থিত। আতিয়া মাসজিদের খিলানগুলি চতুর্কেন্দ্রিক রীতির। কিবলা দেয়ালে তিনটি অলঙ্কৃত মিহরাব এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবের পেছনে বাইরের দেয়াল কিছুটা প্রক্ষেপিত। মাসজিদের চার কোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির পার্শ্ব বুরুজ সমদূরত্বে ছাঁচ কাটা নকশায় বিভক্ত। বুরুজগুলি পলকাটা ছোট গম্বুজযুক্ত এবং কলস ফিনিয়ালে অলঙ্কৃত।

আতিয়া মাসজিদের একটি নান্দনিক বৈশিষ্ট্য এর কার্নিশ ধনুক বক্রাকৃতির। এ মাসজিদের পশ্চিম দেয়ালের শীর্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংবলিত প্রহরা দেয়াল লক্ষণীয়। আতিয়া মাসজিদের পূর্ব ও উত্তর দেয়াল টেরাকোটা, ইট খোদাই নকশাসহ চমৎকার আঞ্চলিক মোটিফ দ্বারা অলঙ্কৃত। সম্পূর্ণ ফাসাদ সূক্ষ্ম, বিস্তৃত একই রকম প্যানেল নকশায় আচ্ছাদিত। এতে রয়েছে অসংখ্য ফুলের অলঙ্করণ, চক্রাকার রোজেট ও জ্যামিতিক নকশা। এ জাতীয় অলঙ্করণ ষোলো শতকের প্রথম ভাগের গৌড়ের মাসজিদ সদৃশ। বর্তমানে আদি শিলালিপির অনুরূপে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের শীর্ষে প্রোথিত একটি লিপি থেকে জানা যায়, ১০১৮ হিজরিতে মাসজিদটি স্থাপিত।

**গুঠিয়া মাসজিদ**

গুঠিয়া মাসজিদ নামে খ্যাত অতি নান্দনিক শৈল্পিক ছোঁয়ায় স্থাপিত এই বায়তুল আমান জামে মাসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্স। বরিশাল মহানগরী থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বানারীপাড়া সড়ক সংলগ্ন উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া নামক গ্রামে অবস্থিত এ মাসজিদটি মধ্যপ্রাচ্যের মাসজিদগুলোর আদলে নির্মিত। এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টুর পুরোপুরি নিজস্ব কর্ম প্রচেষ্টায় আনুমানিক ২০০২ সালে দেশের অন্যতম সেরা স্থাপত্যশৈলীর নয়নাভিরাম এ স্থাপত্যটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২০০৬ সালের ২০ অক্টোবরে জুমার সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। দৃষ্টিনন্দন এ মাসজিদটি দক্ষিণাঞ্চলে তো বটেই, সমগ্র বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এখন পরিগণিত। ১৪ একর ভূমির উপর নির্মিত মাসজিদ কমপ্লেক্সের মূল গেটে ঢুকতেই হাতের ডানে চোখে পড়বে নানান রঙের ফুল ও গাছ দিয়ে সাজানো চমৎকার একটি পুকুর, যাতে প্রতিবিম্বিত হয় মসজিদের পুরো অবয়ব। শান বাঁধানো মোজাইককৃত পুকুর ঘাটের উল্টোদিকে মাসজিদ প্রবেশ পথের দুটি ফোয়ারা রাতে আলোর ঝলকানিতে আরো দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যবর্ধনে মাসজিদটির তিন পাশে খনন করা হয়েছে কৃত্রিম খাল এবং মনোরম লেক। প্রবেশ তোরণের সামনে, কেন্দ্রীয় গম্বুজে বৃত্তাকারে এবং ভেতরের বিভিন্ন স্থানে শোভা পাচ্ছে সুরা আর রহমান, পবিত্র আয়াতুল কুরসি সহ আল কুরআনের নানা ক্যালিগ্রাফি। এসব সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি এবং আল্পনা করা হয়েছে বর্ণিল কাঁচ, মূল্যবান মার্বেল পাথর, গ্রানাইট ও সিরামিক দিয়ে। নিচে সাদা মার্বেল পাথরের টাইলস এবং ওপরে অত্যাধুনিক ঝাড়বাতির ব্যবহার মাসজিদ অভ্যন্তরকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। ১৮৩ ফুট উঁচু মিনার এবং ২০টি গম্বুজ বিশিষ্ট এ মাসজিদটির ভেতরে ও বাইরে প্রায় ৭০০০ মুসল্লি একত্রে সালাত আদায় করতে পারেন।

**লালবাগ কেল্লা**

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুঘল সুবাদার মুহম্মদ আজম শাহ ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ সালে একটি মুঘল দূর্গ নির্মাণ শুরু করেন যা লালবাগ কেল্লা নামে খ্যাত। কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ১৬৮০ সালে নতুন সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁ দুর্গের নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। ১৬৮৪ সালে এখানে শায়েস্তা খাঁর কন্যা ও সুবাদার মুহম্মদ আজম শাহর স্ত্রী ইরান দুখত রাহমাতে বানুর (পরী বিবি) অকাল মৃত্যু ঘটে। কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ এ দুর্গটি অশুভ মনে করেন এবং ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে অসমাপ্ত অবস্থার সকল নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। লালবাগ

কেল্লার মূল আকর্ষণ তিনটি ভবন- পরী বিবির সমাধি, দেওয়ান-ই-আম মাসজিদ, সাথে দুটি বিশাল তোরণ ও আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত মজবুত দুর্গ প্রাচীর। নির্দিষ্ট ব্যবধানে কয়েকটি ফোয়ারাসহ একটি পানির নালা তিনটি ভবনকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে সংযুক্ত করেছে। কেল্লার পশ্চিম অংশে জলাধার ও ফোয়ারাসহ একটি নান্দনিক ছাদ- বাগান দৃশ্যমান। দক্ষিণের দুর্গ প্রাচীরে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ৫টি বুরুজ ও পশ্চিমের দুর্গ প্রাচীরে ২টি বুরুজ যার প্রতিটির সাথে মাটির নিচে অবস্থিত সুড়ঙ্গ পথটি ব্রিটিশ আমল থেকেই সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত দরজা দিয়ে কেল্লায় ঢুকতেই বরাবর চোখে পড়বে পরী বিবির সমাধি। মার্বেল কাষ্ঠ পাথর ও নানা রং এর ফুল পাতা সুশোভিত চাকচিক্যময় টালির সাহায্যে অভ্যন্তরীণ নয়টি কক্ষ অলঙ্কৃত হয়েছে। স্থাপনাটির ছাদ করবেল পদ্ধতিতে কাষ্ঠ পাথরে তৈরি এবং চারকোণে চারটি অষ্টকোণ মিনার ও মাঝে একটি অষ্টকোণ গম্বুজ আছে। মূল সমাধি সৌধের কেন্দ্রীয় কক্ষের উপরের এই গম্বুজটি এক সময়ে স্বর্ণখচিত ছিল, পরবর্তীতে পিতলের/ তামার পাত দিয়ে পুরো গম্বুজটিকে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থাপনাটির অভ্যন্তর ভাগ সাদা মার্বেল পাথরে আচ্ছাদিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট লালবাগ কেল্লার মাসজিদটি এদেশের মুঘল মাসজিদের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যা বর্তমানেও মুসল্লিদের সালাতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

**আহসান মঞ্জিল**

নওয়াব আবুদল গণি কর্তৃক ১৮৫৯ সালে ঢাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ১৮৭২ সালে সমাপ্ত হয়। যেটি ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারীর সদর কাচারি। আহসান মঞ্জিলের ছাদের উপর নান্দনিক একটি গম্বুজ আছে, যা একসময় ছিল ঢাকা শহরের সর্বোচ্চ গম্বুজ। ছাদের ওপর একটি অষ্টভুজাকৃতির কক্ষের কোণের সূচাগ্র মাথাগুলোকে কেন্দ্রের দিকে ক্রমে হেলিয়ে চূড়াতে নিয়ে কুমদ্রকলির আকারের গম্বুজটি তৈরি করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকের গাড়ি বারান্দার ওপর দিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে একটি সুবৃহৎ খোলা সিঁড়ি সম্মুখের বাগান দিয়ে নদী তীরে নেমেছে। প্রাসাদের উভয় তলার উত্তর-দক্ষিণে আছে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে প্রশস্ত বারান্দা। দৃষ্টিনন্দন এ স্থাপনাটির মেঝে মার্বেল পাথরে পরিশোভিত। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে দেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

**বাঘা মাসজিদ**

তৎকালীন একটি শিলালিপির বর্ণনামাফিক সুলতান নুসরত শাহ ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে এ স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। রাজশাহী শহর থেকে ৪০ কি:মি: দক্ষিণপূর্বে বাঘা উপজেলায় একটি বড় পুকুরের পশ্চিমাপাড়ে নান্দনিক এ মাসজিদটির অবস্থান। এর প্রবেশপথে মাসজিদের চতুর্দিকে পাথরখণ্ডাবলী এমনভাবে স্থাপিত যে বাইরে থেকে মাসজিদটিকে দ্বিতল বলে মনে হয়। পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ মাসজিদটির খিলানগুলো চমৎকার খাঁজ বিশিষ্ট এবং ফুলের আর খোপ নকশায় সজ্জিত। মিহরাব খিলানের স্প্যানড্রিলগুলো ফুলদানী নকশাঙ্কিত এবং সুদৃশ্য প্যাঁচানো আঙ্গুর লতার ন্যায় পত্ররাজি ও গোলাপ নকশা বিদ্যমান।

## ২০১ গম্বুজ মাসজিদ

মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মগদা শিমলা ইউনিয়নের দক্ষিণ পাথালিয়া গ্রামে বিখ্যাত এ স্থাপনাটির অবস্থান। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে এই মাসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২০১৭ সালের সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা নির্মার্ণাধীন। বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাধিক গম্বুজ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মিনার বিশিষ্ট এই মাসজিদের নির্মাণ ব্যয় আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা। নয়নাভিরাম এ মাসজিদের ছাদে ৮১ ফুট উচ্চতার একটি বড় গম্বুজের চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট ১৭ ফুট উঁচু আরও ২০০টি গম্বুজ বিদ্যমান। মূল মাসজিদের চার কোণে ১০১ ফুট উচ্চতার চারটি মিনার দৃশ্যমান। ৪৫১ ফুট বা ৫৬ তলা উচ্চতার মিনারটি মাসজিদের সন্নিকটে, যেটি মাসজিদটিকে ইতিহাসখ্যাত করে তোলার পেছনে মূল ভূমিকা রাখবে। বর্গাকার (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৪৪ ফুট) দ্বিতল এই মাসজিদটিতে একসঙ্গে প্রায় ১৫ হাজার মুসল্লি নামায আদায় করতে পারবেন। মাসজিদের টাইলসে এক অভিনব পদ্ধতিতে অঙ্কিত হয়েছে সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন শরীফ। দেয়ালে চিত্রিত এ ঐশী বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে তা হৃদয়ে ধারণ করে মুসল্লিরা আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হতে পারবেন। মাসজিদের ফটক তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে ৫০ মণ পিতল। ২০১ গম্বুজ মাসজিদ নামবিশিষ্ট বিশাল এ কমপ্লেক্সটি ১৫ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অতিনান্দনিকতাপূর্ণ এ মাসজিদটি খুব শীঘ্রই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দনশৈলী

ক্যালিগ্রাফি এমন এক নান্দনিক সৃজনকর্ম যা ঐশ্বরিক শিল্পকলার প্রতীক। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, "উত্তম হাতের লেখা সত্যের উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে দেয়।"[৬১] ইসলামী ক্যালিগ্রাফি মূলত আরবী বর্ণমালা কেন্দ্রিক বিশ্বনন্দিত একটি বিশুদ্ধ শিল্পকলা। গবেষকগণ একে ডেকোরেটিভ আর্ট বা অলঙ্করণ শিল্পকলা হিসেবে অভিহিত করেন। ইসলামী ক্যালিগ্রাফিকে পাশ্চত্যের পণ্ডিতগণ ধর্মীয় লোক সমাজে গণ্ডিবদ্ধ ও একপেশে হিসেবে তুলে ধরলেও অনেকের মতে তা প্রাগ্রসর বিশুদ্ধ শিল্পকলা হিসেবে পরিগণিত। গবেষকগণের মতে, ধর্মীয়ভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টান বৌদ্ধ এমনকি হিন্দু ধর্মের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট শিল্পকলা চর্চাকে নিজ নিজ উপাসনার অংশ ধরা হয়। কিন্তু ইসলাম ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে ইবাদতের অংশ হিসেবে না ধরে শুধু নন্দনশৈলীর অংশ মনে করে। হৃদয় গহীনে সৌন্দর্যবোধের প্রতি যে পিপাসা তা মেটায় শিল্পকলা। একইসাথে জৈবিক ও মানবিক শিল্প পিপাসা পরস্পর এগিয়ে চলে প্রতিযোগিতার ছলে। আর এ শিল্পকলা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে যে সৌন্দর্য হৃদয়ের মণিকোঠায় পৌঁছে দেয় তা জৈবিক বা নৈতিক হতে পারে। ধর্মই এখানে সৌন্দর্যের প্রতিরূপ বিবেচনা করে এর কতটা গ্রহণীয়-বর্জনীয়, পরিণতি কী তা নির্ধারণ করে দেয়। যে শিল্পকলা মনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে, লজ্জার চাদরকে ছিন্ন ভিন্ন ও পবিত্র চেতনাকে বিবশ করে দেয়, সমাজ-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সেটার পরিণতি ভয়াবহ। এ সংক্রান্ত সুকুমার শিল্প আর

[৬১] মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, যোগাযোগ পাবলিশার্স ২০০২-ঈসায়ী পৃ. ১০

পূজার্চনা যে শিল্পজগত রয়েছে সে সম্পর্কে ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম, সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছে। আত্মা বা রূহ, নিষ্কলুষ ও পবিত্র শিল্পকে গ্রহণ করতে চায় বলেই নির্মল আনন্দদায়ক শিল্পের রস আস্বাদনে সে পরিতৃপ্ত হয়।

লিপিকলাকে ইংরেজিতে ক্যালিগ্রাফি বলে। এটি মূলত: গ্রীক শব্দে ক্যালিগ্রাফিয়া থেকে উৎসারিত। গ্রীক শব্দ ক্যালোস অর্থ সুন্দর, চমৎকার আর গ্রাফেইন অর্থ লেখা। শিল্পকলায় এটি লিখনশিল্প হিসেবে বিবেচিত। দর্শক যখন একে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, মূলত তখনই এটি শিল্পরূপে প্রাণ পায়। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বা লাতিন ভাষায় 'ক্যালিগ্রাফিয়া ইসলামিকা' হচ্ছে পবিত্র কুরআন হাদীসের বাণীকে অনিন্দ্যসুন্দর হস্তশৈলীতে লিপিবদ্ধ করার শিল্প। আর এই অনুলিপির সঙ্গে যখন নান্দনিকতা যুক্ত হয় তখন তা হয় লিপিশিল্প। আর লিপি শিল্পকে বলা হয়, 'আল খত আল আরাবী' আর লিপিশিল্পীকে বলে 'খাত্তাত'। ফারসী ভাষায় ক্যালিগ্রাফিকে 'খোশনবীশী' এবং ক্যালিগ্রাফারকে 'খোশনবীশ' বলা হয়। তেমনিভাবে ক্যালিগ্রাফিকে উর্দুতে 'খোশখত' বা 'খুচুতি' এবং তুর্কি ভাষায় 'রূহী হান্দেজ' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রেখাবন্ধনও বলা হয়। আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি:) ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শিল্পমান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। সেসময় একজন কাতিব ও একজন খাত্তাতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন কাতিব শুধু কুরআন অনুলিপি বা কোনো টেক্সট লিখেই দায়িত্ব শেষ করতেন এবং শুধু একটি বা দুটি লিপিতে তিনি পেশাদার হতেন। কিন্তু একজন খাত্তাত প্রচলিত সবগুলো লিপিতে পেশাদার হওয়ার সাথে পুস্তক অলঙ্করণ, বাঁধায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিপণনের কাজেও সমান দক্ষ হতেন। ক্যালিগ্রাফির গোপন সূক্ষ্ম কৌশল এর উপাদানসহ যাবতীয় বিষয়ে একজন খাত্তাত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান রাখতেন। রসূলুল্লাহ (সা:) সুন্দর হস্ত লিখনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা লেখনীর মাধ্যমে জ্ঞানকে বায়ন কর।"

**ক্যালিগ্রাফির বৈচিত্র্যময়তা**

বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বিশ্বের দক্ষ মুসলিম লিপিকাররা লিপিশৈলীর যেসকল নান্দনিক রীতিসমূহ উদ্ভাবন করেন, তা এরূপ:

ক) কুফী, খ) নাসখী, গ) সুল্স ঘ), মুহাক্কাফ, ঙ) রায়হানী, চ) তালিক, ছ) নাসতালিক, জ) জুলফ-ই-আরস, ঝ) শিকাসতা, ঞ) খত্-আল মানসুর ও খত্ আল-হুর।

ট) বিহারী, ঠ) ঘুবার, ড) তুঘরা, ঢ) ইযাযা, ণ) তাজ, ত) সাক্কি, থ) মূসান্না ও আয়নালী, দ) খত-আল-সম্বুল।

**কুফী লিপি**

কুফী লিপি কোণাকৃতির উলম্ব-আনুভূমিক রেখা নির্ভর লিপি। আরবী লিপি চর্চার উষালগ্নে কুফী লিপি সাদামাটা হলেও সত্বর তা অলংকৃত লিপি হিসাবে বিকাশ লাভ করে। কুফী লিপি হলো সুষমামণ্ডিত সমানুপাতিক এবং তীক্ষ্ম ত্রিকোণ ও চৌকোণা দীর্ঘ ও খর্বাকৃতির লম্ব এবং সমতল রেখা সম্বলিত লিপিশৈলী। কুরআন কপি করতে তিনশত বছর ধরে ব্যবহৃত এই লিপি বিশ্বের যেখানেই ইসলাম পৌঁছেছে সেখানেই এটির আগমন ঘটেছে। ইরাকের পূর্বাঞ্চল, আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও ভারতীয় উপমহাদেশে এটা ইস্টার্ন কুফী হিসেবে খ্যাত। ইস্টার্ন কুফির নিদর্শন মেলে

দিল্লীর কুতুব মিনারের গায়ে অলঙ্কৃত শিল্পকর্মে যেখানে 'আলিফ-লাম' বুননকৃত আছে ঝাঁঝরি কাটা বাতায়নরূপে। এছাড়া ইরানে প্রচলিত কুফী লিপির অলঙ্কৃত ধারাটিও বিশ্ববিখ্যাত ঝোঁকপ্রবণ নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের, ফলে অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফী লিপির বহুল ব্যবহার একে পরিপূর্ণতা এনে দেয়। বিশেষত, অলংকরণের কাজে এ লিপির জুড়ি মেলা ভার। তাই তো মিহরাব, খিলান, গম্বুজ, মিনার, কাঠের মিম্বর, রিহাল, দরজা, ধাতব পাত্র, বর্ম, তলোয়ার, বল্লাম-কোঁচা, ঝুড়ি, গহনা-এসবে কুফী লিপির নান্দনিকতা দৃশ্যমান। মুসলিম শাসকগণের উদার মানসিকতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চমকপ্রদ সব কারুকার্য দ্বারা এ লিপি আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে ওঠে। কুফী লিপির নান্দনিকতা আনায়ন ফাতেমী, সেলজুক ও গজনী শাসনামলের ভূমিকা সর্বাগ্রে। মুসলিম সংস্কৃতি যখন ফুলে-ফসলে সুষমামণ্ডিত, কুফী লিপিও তখন আরও বেশি আভিজাত্যিক রূপবৈচিত্র্যময় যার আলঙ্কারিক প্রভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। একপর্যায়ে এই লিপির মাত্রাতিরিক্ত জাঁকজমকতার নিজস্ব ছন্দ হারিয়ে তা শুধু কুরআনের অধ্যায় বা সূরার টাইটেল সর্বস্ব হয়ে পড়ে।

**নাস্‌খী লিপি**

নাস্‌খী অধিক সমাদৃত একটি সহজবোধ্য, সাবলীল ও সুস্পষ্ট রীতি। নাস্‌খী লিপির আনুভূমিক ও উলম্ব রেখাগুলো সামনে-পিছনে এক এবং শব্দগুলো পরস্পর সুবিন্যস্ত। দশম শতকে ইবনে মুকলারের সাধনায় নাস্‌খী লিপি সুনাম অর্জন করে। আর ইবনে বাওয়াব, ইয়াকুত আল মুস্তাসিমী, হাফিজ উসমান একে কুরআনের লিপিতে রূপদান করেন। বাংলার সুলতান হুসেইন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযদান বখশ একডালা দূর্গ নাস্‌খী লিপিতে রচনা করেন। পবিত্র কুরআনের সর্বকালীন কপিগুলোতে নাস্‌খী লিপির বহুল নিদর্শন বিদ্যমান। ১৬ শতকের প্রসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফার শেখ হামিদুল্লাহ আমাসী উদ্ভাবিত নাস্‌খী লিপির একটি কপি তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বাংলার সুলতানী আমলে নাস্‌খী লিপির বহু নিদর্শন দেখা যায়। আরবী ও ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকায় তিনখণ্ডে বুখারী শরীফের একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান মেলে বানকীপুরের খোদাবখ্‌শ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে।

**সুল্‌স লিপি**

সুল্‌স একটি নিশ্চল স্মারকলিপি। দক্ষ ক্যালিগ্রাফারদের নিকট অধিক গুরুত্ববহ সুল্‌স লিপিটি ক্যালিগ্রাফি লিপিসমূহের বাদশাহ্‌ বা জননী রূপে খ্যাত। সুল্‌স লিপি স্থূল গোলাকার প্রকৃতির লিপি যার ছন্দময় গতি ও হরফের আকৃতিগত সৌন্দর্যে তা অন্য যেকোন লিপি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। এটি প্রধানত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও খোদাইকৃত লিপি হিসেবে বহুল প্রচলিত। ইয়াকুত আল. মুস্তাসীমি সুল্‌স লিপিতে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ও পবিত্র কুরআনে ব্যবহার উপযোগী করে একে পরিপূর্ণতা দান করেন। ক্রমান্বয়ে কুফীর ন্যায় এটিও অধিক অলংকরণের ফলে কুরআনের সাধারণ লিপি থেকে সূরার শিরোনাম বা টাইটেলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সুল্স লিপির কুরআনের কপি দুর্লভ, তবে এই লিপিতে লিখিত আল কুরআনের সাতটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সাধারণত কাগজে লিখিত হলেও খোদাইকৃত লিপি এবং স্থাপত্যে সুলস লিপি নতুনত্ব পায়। তুরস্ক ও ইন্দোপাক অঞ্চলের করবস্থানগুলোর স্মৃতি ফলক এই লিপি দ্বারা খচিত, নান্দনিক বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

**মুহাক্কাক লিপি**

সুল্স এবং নাসখীর শৈল্পিক বৈশিষ্টের সমন্বয়ে নির্ভুলভাবে উৎপন্ন মুহাক্কাক লিপি; হরফগুলো দেখতে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট, ঠিক যেন প্রবাহসদৃশ। এ লিপিতে ১১-১৫ শতকে বহু কুরআন অনুলিপিত হয়। যার ফলে এটি 'মাসাহিফ' বা কুরআনের লিপি হিসেবে পরিচিত পায়।

**রায়হানী**

রায়হানী নবম শতকে উদ্ভাবিত এ লিপিশৈলী নাসখ, মুহাক্কাক ও সুল্স এর সমন্বয়ে গঠিত। মামলুক সুলতান বারকুক ও তার পুত্র সুলতান ফারাজ চৌদ্দ শতকে রায়হানী লিপি খচিত পবিত্র কুরআনের একটি দুর্লভ কপি কায়রোর একটি মাসজিদে হাদিয়া দেন।

**তালিক**

তালিক লিপির আভিধানিক অর্থ ঝুলন্ত। এই লিপি পারস্য লিপিকারদের ব্যবহৃত নবম শতাব্দীর বক্রাকার আরবী লিখন পদ্ধতি 'ফিরামুজ' থেকে উদ্ভূত বলে আরব ঐতিহাসিকদের অভিমত। তালিক লিপির গঠন শৈলী এরূপ সুবিন্যস্ত বা 'নাসখী' এবং 'নাসতালিক' লিপি পদ্ধতির মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজমান। আলঙ্কারিক রীতিতে তীর্যকভাবে লিখিত হওয়ায় একে 'ঝুলন্ত' বলে মনে হয়। পারস্যের মৃৎপাত্রে তালিক রীতির ব্যবহার দৃশ্যমান।

**নাসতালিক**

'নাসখ' এবং 'তালিক' এর সমন্বয়ে নাসতালিক শব্দটির উদ্ভব। এর হরফগুলোর বিন্যাস এবং গোলাকৃতি উক্ত লিপিশৈলীকে মাধুর্য এনে দেয়। মুসলিম লিপিশৈলীর অন্যতম আকর্ষণ 'নাসতালিক' যার নান্দনিক ক্যালিগ্রাফিক মাধুর্য লিপিকলাকে স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যায়। এই রীতি মূলত পারস্য এবং ভারত উপমহাদেশে সমধিক মর্যাদা লাভ করে। নাসতালিক লিপির সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল ভঙ্গি ও গতিময়তা হৃদয়গ্রাহী। 'নাসতালিক' লিপি বহু পূর্বে আবির্ভূত হলেও ত্রয়োদশ শতকে এই লিপিতে গ্রন্থাবলি লিপিবদ্ধ হয়। ফারসী কাব্যগ্রন্থ প্রথম এই লিপিতে লিখিত হয়। কুণ্ডলাকৃতি মেঘের আবরণে 'নাসতালিক' এবং সমান্তরাল দুটি লাইনের লিপিবদ্ধ 'নাসতালিক' বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

**জুলফ-ই-আরুশ**

জুলফ-ই-আরুশ এর আভিধানিক অর্থ 'বধুর বেণী' যা নাসতালিক ও 'রায়হানী' লিপির সমন্বয়ে গঠিত লিপিশৈলী। তবে নাস্তালিক শৈলীর অধিকতর নিকটবর্তী আলংকারিক লিপিশৈলী এটি। হরফের সমান্তরাল রেখার শেষভাগ হতে

কুণ্ডলাকৃতির ক্রমশ চিকন বেণী সদৃশ রেখার ৪৫° বরাবর নিচের দিকে নেমে গেলে তখনই সেটি হয় জুলফ-ই-আরুশ।

**শিকাস্‌তা**

প্রকৃতপক্ষে তালিক এবং নাসতালিক থেকে উৎপন্ন এ লিপি এক ধরণের সংকেত লিপি যা ভঙ্গুর বা খাপছাড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই লিপির আসল বৈচিত্র্য হল হরফগুলো সমান্তরাল বা লম্বালম্বিভাবে পরস্পর সুবিন্যস্ত। এই লিপিতে কলমের দ্রুত আঁচড়ে বক্ররেখাগুলো অবিন্যস্ত রেখামালায় রূপান্তরিত হয়।

**খত আল মানসুর ও খত্‌-আল-হুর**

ফিতা বা রিবনের মত জড়ানো রীতির অদ্ভুত ধরণের এ লিপিশৈলী, এর হরফের শেষদিকটা ফাঁসের মত বলে মনে হয়। খত-আল-হুর ও মানুসর এর ন্যায় ফিতালিপি, তবে ফিতার বাঁকগুলো স্পষ্ট। এ লিপি মানুসর হতে কিছুটা আধুনিক শৈলীও বটে।

**বিহারী**

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম লিপিশৈলীর এক বৈচিত্র্যময় শৈলী এ 'বিহারী' লিপি যার প্রচলন আফগানিস্তানে। চতুর্দশ শতকে উদ্ভাবিত এই লিখন রীতির আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সবিশেষ চিত্তাকর্ষক। দৃশ্যত 'নাস্‌খী' এর ন্যায় এ লিপির সমান্তরালভাবে লিখিত অক্ষরগুলো প্রথমে ক্ষীণ হতে শুরু করে বাম দিকে ক্রমশ মোটা হয়ে থাকে। সাফাদীর মতে, "বিহারী লিপিশৈলী পরবর্তীকালে অটোমান সাম্রাজ্য 'সিয়াকা' নামে এক লিখনরীতির উন্মেষে প্রভাব বিস্তার করে।"

**ঘুবার**

ঘুবারের প্রকৃত নাম 'ঘুবার আল হালবাহ', যা নবম শতকে রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত 'রিয়াসী' লিপি থেকে উদ্ভাবিত। প্রাঞ্জল রীতিতে লিপিকৃত এ বক্রাকার লিপি শৈলী 'উড়ন্ত বালুকণা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ উক্ত লিপিতে লিখিত অক্ষরগুলো অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় একে উড়ন্ত বালুকণা বলেই বোধ হয়। অতি ছোট কাগজে ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষরের সমন্বয়ে লিখিত হয় ঘুবার। তৎকালীন যুদ্ধের সময় পায়রার সাহায্যে এরূপ চিরকুটে সংবাদ পাঠানো হত। অসামান্য কর্মনৈপুণ্য ও শৈল্পিক গুণাবলী ব্যতীত কোন লিপিকারের পক্ষে এরূপ ক্ষুদ্র অক্ষরে কুরআন শরীফ কিংবা রাজকীয় চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। ঘুবার লিপিশৈলীর বিশেষত্বের ফলস্বরূপ একসময় সমগ্র কুরআন শরীফকে একটি মুরগীর ডিমের খোলসে লিপিবদ্ধের ন্যায় অসাধ্যও সাধন হয়েছিল। আবার পুরো কুরআন শরীফ ৫০×৪৫ সেন্টিমিটার পরিমাপের একটি কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধের বিরল দৃষ্টান্তও আছে। মিসরের হাসান-আবদ-আল-জাওয়াদ কর্তৃক এমনকি একটি গমের দানায় কুরআন শরীফের তিনটি সূরা লিপিবদ্ধের অভাবনীয় নজিরও মেলে।

**দিওয়ানী**

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইব্রাহিম মুনিফ তুর্কী 'তালিক' থেকে এই লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন। এ লিপিশৈলীটি অটোমান তুর্কি লিপিকারদের সৃষ্ট 'শিকাসতা'র একটি প্রকরণ মাত্র। অফিস আদালতে ব্যবহৃত এই লিপিশৈলী মূলত বক্রাকার এবং অক্ষরগুলো মাত্রাধিক পরস্পর জড়িত। এর অপর নাম 'হুমায়ূণী' বা 'রাজকীয়'। আলঙ্কারিক রীতিতে বিশেষ মোটিভে দিওয়ানী রীতি ব্যবহৃত হয় বলে এটি 'দিওয়ানী জালি' হিসেবে খ্যাত।

**ইযাযা**

এটি একটি গোলায়িত ধারার লিপি। যেটি উলম্ব রেখায় এক চতুর্থাংশ এবং গোলায়িত বাহুতে তিন চতুর্থাংশ অনুপাত বিশিষ্ট। অলংকৃত লিপি হিসেবে এটি বর্তমানে বই-পত্রের টাইটেল পেজ, প্রচ্ছদ ইত্যাদিতে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

**তাজ**

এর হরফগুলোর মাথা গম্বুজাকৃতির যা 'হুরুফ তাজ' হিসেবে খ্যাত।

**তুঘরা**

তুঘরা শব্দের অর্থ স্বাক্ষর। সেলজুক বাংলার সুলতানী আমল, মিশরের মামলুক এবং ওসমানীয় আমলে চার ধরণের তুঘরা লিপি পাওয়া যায়। সিলমোহরের লিপি হিসেবে সুলতান উগুজ খানের সিল মোহরে তুঘরা প্রথম ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণের মাঝে অলংকৃত লিপি হিসেবে এর কদর ছিল অনেক। ব্যবসায়-মনোগ্রাম, লোগো এবং প্যাডে এ লিপির ব্যবহার বিদ্যমান। সাধারণত মুসলিম দেশসমূহে মাসজিদ, রেস্তোরা, ঘরের দেয়ালের শোভাবর্ধন প্রায় সর্বত্রই তুঘরা লিপি ক্যালিগ্রাফির প্রচলন লক্ষণীয়।

**সাক্কি**

গুলজার, তাউসের ন্যায় এটি একটি অভিনব আলংকারিক লিপিশৈলী যাকে লারজাও বলা হয়। এ লিপিশৈলীর স্বাতন্ত্র্য এই, লেখার সময় হাতের কম্পমান অবস্থায় এ প্রক্রিয়ায় লেখা সম্ভব। এ লিপি দাঁতওয়ালা করাতাকৃতির, যা 'বাকানো পল্লব' সদৃশ।

**মূসান্না বা আয়নালী**

মূসান্না বা আয়নালী লিপি দেখতে বহুলাংশে আয়না বা দর্পণের ন্যায়। এটি সরাসরি উল্টোভাবে লিখিত একটি লিপিশৈলী, যাকে প্রতিফলিত লিপিও বলা হয়।

**খত আস সম্বুল**

মনোগ্রামের কাজে ব্যবহৃত বিশেষ আঙ্গিকের লিপি হল এই খত-আস-সম্বুল। উল্লেখ্য, এ লিপির সাহায্যে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম ও লোগো অঙ্কিত হয়ে থাকে। হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ইসলামি ক্যালিগ্রাফি এক উত্তম আদর্শরূপে এগিয়ে চলেছে। কখনই ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে নান্দনিকতা ও হরফের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সামান্যতম অবহেলা

পায়নি। হরফের উপস্থাপনশৈলী যেন কাব্যিক অনুভব এনে দেয় সেজন্য নির্ঘুম অনুশীলন ও চর্চা অব্যাহত রাখতেন ক্যালিগ্রাফি শিল্পীরা।

বিশিষ্ট ইসলামী ক্যালিগ্রাফার মোহাম্মদ আব্দুর রহীমের মতে, "ইসলামী ক্যালিগ্রাফি হল কুরআন-হাদীস নির্ভর লিপিশৈলী; যেখানে হরফগুলোর প্রতিটি অংশের আকার, আকৃতি যথাযথ রেখে কেবল গঠনগত দিকে সৌন্দর্য প্রয়োগ করা হয়। এটিই লিপিশৈলীর প্রকৃত নান্দনিক বৈশিষ্ট্য।"[৬২]

[৬২] মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, পি এইচ ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউণ্ডেশন

# তৃতীয় অধ্যায়

## ইসলামী সাহিত্য ও সঙ্গীতের নন্দন-দর্শন

নৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তার লালন ও উৎকর্ষ সাধন সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃজনকর্ম। সাহিত্য মূলত হৃদয় স্পন্দনের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি যা জীবন- প্রেক্ষিতের প্রতিচ্ছবি। সমাজের ঐতিহ্য সাহিত্যের জীবনদায়িনী রস। মানব চিত্তের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করত: দুর্বলতাসমূহকে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেয়া এবং জীবন সমুদ্রের হাজারো ঝিনুক হতে খুঁজে খুঁজে মুক্তা সংগ্রহ সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য জীবনের প্রতিটি দিক ও কোণে আলোকপাত করে দুঃখ- ক্লেশে ভেঙে পড়া মনকে হাত ধরে উর্ধ্বে তুলে নেয়। সুসাহিত্য মানব হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত জীবনের স্বরূপকে ললিত বাণীর মধুর রসে সিক্ত করে কঠিন বাস্তবতাকে শিক্ষার মানদণ্ডে এনে আলোকিত জীবনের সন্ধান দেয়। সৌন্দর্য চেতনাকে ভারসাম্যময়, সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুধাময় করে তোলা এর অন্যতম সংকল্প। ইসলামী সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের এমন এক নিরঙ্কুশ অধ্যায় যা ঐশী (নান্দনিক) চেতনাবোধের পথনির্দেশক। "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ" ইসলামী সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যে সাহিত্যে ইসলামী জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটে তাই ইসলামী সাহিত্য। আবার যে সাহিত্যে ইসলামী দর্শনের আলোকে নির্মিত সমাজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত, সেটিও ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে তাওহীদ- বিশ্বাসী সমাজের সাহিত্য বহুত্ববাদ বিশ্বাসী সমাজের সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। Walter Patter এর ন্যায়, উঁচু মানের শিল্প সাহিত্য সমালোচক মনে করেন, "উত্তম শিল্প শৈলী এবং অতি উত্তম শিল্প শৈলী এর ন্যায় সাহিত্যেও উত্তম সাহিত্য শৈলী ও অতি উত্তম সাহিত্য শৈলী হতে পারে। যে সাহিত্য মানুষের সুখ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, নির্যাতিত মানবতাকে পরিত্রাণের সন্ধান দেয়, অথবা প্রাচীন বা আধুনিক কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি এমনভাবে সাহিত্য পরিবেশন করে. যার ফলে আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিংবা আমাদের এই দুঃখ-কষ্টময় পৃথিবীর জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে তোলে এবং আমাদের মাঝে আল্লাহপ্রীতি সঞ্চার করে সেটিই মহৎ সাহিত্য।"[৬৩] আজকের তরুণ সমাজ বই পড়ে মুক্তা আনতে গিয়ে যেন পঁচা ঝিনুকের ভাঙ্গা টুকরোই কুড়োচ্ছে। তাদের কোমল হাতে যদি তুলে দেয়া যেত মুসলিম কৃষ্টির জগতখ্যাত সেই সুসাহিত্যিক শেখ সাদী, ফেরদৌসী, মাওলানা রুমী, উমর খৈয়াম, হাফিজ ও আল্লামা ইকবালের ন্যায় কবি সাহিত্যিকদের লেখা, তবে তা তাদের জীবনচরিতে নৈতিক-নান্দনিক রেখাপাত করতো। ইসলামী সঙ্গীত এই সাহিত্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণত সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সঙ্গীত = ছন্দ + সুর; অর্থাৎ দুইটি ছন্দযুক্ত বাক্য সুর করে উচ্চারিত হলে তখন তা হয় গান বা সঙ্গীত। আল্লাহ বারি ওয়া তা'আলা, রসূল (সা:) ও ইসলামী বিধানাবলীর প্রতি পূর্ণ

[৬৩] Water Peter: Appricipation

আনুগত্য ও ভক্তি পোষণ সহকারে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করে যে সঙ্গীত নির্মিত হয় তাই ইসলামী সঙ্গীত।[৬৪] প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত সাধক খালিদ হোসেনের মতে, "আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ও তার প্রিয় হাবিব রসূল (সা:) এর প্রশংসা এবং মহিমা কীর্তন করত: যে সঙ্গীত পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আকুলতায় অন্তরাত্মাকে বিগলিত করে, তাই ইসলামী সঙ্গীত। মুসলিম সংস্কৃতির এই সঙ্গীত"[৬৫] হাম্‌দ-এ-বারী- তা'আলা ও নাত-এ-রসূল এই দুইটি নান্দনিক ধারায় বহমান। লোক সঙ্গীতের সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদের  যোগ্য উত্তরসূরী মোস্তফা জামান আব্বাসীর সঙ্গীত বিষয়ে অভিমত হল- "সব ধরণের সঙ্গীত ইসলামে বর্জনীয় নয়। না হলে সুরের মাধ্যমে যে তিলাওয়াত তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যে সঙ্গীত আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, নবীর নামে ঝরায় অশ্রুর প্লাবন তা হারাম হতে পারে না। সামান্য আনন্দের গান যা মানুষের নৈতিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে তা করতে নিষেধ করেননি স্বয়ং মহানবী (সা:)। যেহেতু মানুষের কর্মফলের মীমাংসা হবে শেষ বিচারের দিন তাই এ ব্যাপারে তর্কে না গিয়ে মহানবী (সা:) কে অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।"

ইসলামী সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিশুদ্ধ বিনোদনের বিকিরণ ঘুমন্ত নান্দনিক নৈতিক মূল্যবোধকে জোয়ারের ন্যায় জাগিয়ে তোলে। এটি এমন এক দুর্বার আলোর দ্যুতি যা মুহূর্তেই মানবাত্মাকে কলুষতা ভুলে পূণ্যার্জনে উজ্জীবিত করে। বিকৃত সংস্কৃতির দোলাচলে দিশেহারা জাতিকে সুপথ প্রদর্শনে ইসলামী সাহিত্য ও সঙ্গীত যেন এক পাঞ্জেরী সদৃশ।

**প্রথম পরিচ্ছেদ: কাব্য সাহিত্যে ইসলাম**

কাব্য ও ছন্দের সমন্বয়ে ভাষা ও সাহিত্য জগতের যাত্রা শুরু। কবিতাই ছিল মানবজাতির সাহিত্য সাধনার আদি নিদর্শন। ইসলামে কবিতা দু'ধরণের- একটি সত্য ও সুন্দরের পথ নির্দেশক অপরটি ধ্বংসাত্মক। ইসলাম একদিকে কল্যাণকর সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়, অপরদিকে সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর ও অশ্লীল সাহিত্য নির্মাণে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। কুরআনুল কারীমে কবিদের নিয়ে সুনিপুণ বর্ণনা সংবলিত "আশ-শুয়ারা" নামক একটি সূরা আছে।

আনুষ্ঠানিক সাহিত্য চর্চা শুরুর পূর্বেই মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়েছে ছন্দোবদ্ধ বাক্য। অর্থাৎ মানবমনে সবযুগেই কাব্যসাহিত্য স্থান দখল করে ছিল। কবিগণ তাদের ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ ও

[৬৪] খালিদ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট, নজরুল একাডেমী। ইন্দোল সঙ্গীত একাডেমী।
[৬৫] মুস্তাফা জামান আব্বাসী, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আব্বাস উদ্দীন আহমদ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইনস্টিটিউট।

জাতির গৌরব গাঁথা। এ অঙ্গন ছিল প্রতিযোগিতাপূর্ণ। যিনি যতবেশি উন্নতমানের কবিতা উপহার দিতে- সক্ষম হয়েছে তিনিই তত বেশি হয়েছেন সমাদৃত।

মহানবী (সা:) যে সময় এ জগতে তাশরীফ আনেন তখন ছিল আরবী কাব্য সাহিত্যের সোনালী যুগ। বিশ্ব বিখ্যাত কবিরা প্রতিযোগিতার অঙ্গনে অবতীর্ণ হতেন আরবের প্রখ্যাত 'ওকাজ' মেলায়। যার কবিতা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতো তাকে বছরের সেরা কবি হিসেবে ভূষিত করা হতো। আর কবিতাকে কাপড়ের উপর সোনালী রঙের কালি দিয়ে লিখে জগতের সবচেয়ে মর্যাদাবান স্থান বায়তুল্লাহর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো। যাকে বলা হতো "মুয়াল্লাকাত" বা 'ঝুলন্ত কবিতা'। বিশ্বসাহিত্যে আজও এমন সাতজন কবির কবিতা নিয়ে রচিত'সাবয়ে মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত কবিতা সপ্তক' সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু আল্লাহর হাবীব রসূল (সা:) এর কাছে অবতীর্ণ আল কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষাশৈলী ও সাহিত্য মাধুর্য আরবের সকল সাহিত্যকে ম্লান করে দেয়। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী কবিগণ কুরআনি সাহিত্যের ভাবগাম্ভীর্য ও রচনা শৈলীতে ছিলেন বিভোর। এর আদর্শই ছিল তাদের সাহিত্য সাধনার মূল উপজীব্য।

দ্বীনের নবী (সা:) ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে এসেছেন। ইসলাম যে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় অঙ্গনের খোরাক দিতে সক্ষম তার উদাহরণ পেশ করলেন সর্বোপরি। কাব্য সাহিত্যেও এর নজীর সত্যিই উজ্জ্বল। যে কা'ব বিন জুহাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর ক্ষুরধার কবিতায় রাসুলের কুৎসা রটনা করে রসূলের পক্ষ থেকে মৃত্যু পরয়ানা পেয়েছিলেন তিনিই আবার ক্ষমার আধার মহানবীর (সা:) চরণতলে এসে তার প্রশংসায় পেশ করলেন 'কাসিদায়ে বোরদার' মতো বিশ্বনন্দিত গীতিকবিতা।

সেসময়ের লেখনীতে কল্যাণ সুকৃতির উপস্থিতি ছিল সামান্য। কবিরা কবিতা আবৃত্তি করতো পরস্পর অহংকার ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। আরবের কবিতা অঙ্গনে যে ধরণের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তা মূলত অশ্লীলতা, শরাব পান কিংবা গোত্রীয় ঘৃণা বিদ্বেষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ বা বংশগত অহংকার। অশ্লীল কবিতা চর্চার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

"আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।"[৬৬]

৬৬ আল-কুরআন ২৬: ২২৪-২২৭

এর প্রেক্ষিতে বলা যায় আয়াতটি নাযিলের পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাস্সান বিন সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক (রা:) প্রমুখ সাহাবী কবি কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ (সা:) এর খিদমতে হাজির হন এবং আরজ করেন ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাওতো কবিতা রচনা করি, এখন আমাদের উপায় কি? তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (সা:) তাঁদের প্রবোধ দিয়ে বললেন-

"আয়াতের শেষাংশ পাঠ করো এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত কবিদের শামিল।"

আলোচ্য আয়াতটিতে বিপথগামী মুশরিক কবিদের চিহ্নিত করে তুলনামূলক পর্যালোচনামাফিক সত্য ও সুন্দরের পতাকাবাহী ঈমানদার কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। পরিশুদ্ধ কবিতাপ্রবণ ভাবাবেগ আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নি'য়ামত। এ নিয়ামতের ফলে তাকওয়াবান কবিগণ আল্লাহ তুষ্টির নান্দনিক কাব্য রচনায় বিভোর থাকেন।

এই নি'য়ামত দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়ে কবিগণ ইসলামসিদ্ধ নান্দনিক রচনায় ব্রতী হন। কবিদের এ ভাবের জগৎ তথা কল্পনাপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। তবে তারা যেন এ ভাবের জগতে বিচরণ করতে গিয়ে বিপথগামী না হয় এজন্য ইসলাম কয়েকটি শর্তারোপ করেছে-

১. একজন কবিকে ঈমানদার হতে হবে।
২. ঈমান আনার সাথে সাথে অসৎ কর্ম বর্জন করে সত্য ও সুন্দরের অনুসারী হতে হবে।
৩. এ ভাবপ্রবণতা ও আবেগী বিচরণ যাতে তাকে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে সে জন্য আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে সদা সর্বদা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।
৪. আর যখনই মানবতা বিপন্ন, নিপীড়িত, নির্যাতিত হবে তখনি কবিকে তা প্রতিরোধে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হবে। মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এবং নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিষয়ে জনগণকে একত্রিতকরণ, কিসে এবং কিভাবে মানবতা বিপন্ন হচ্ছে তা স্পষ্ট করতে সভ্যতার স্বপক্ষে বিপ্লবের বাণী উচ্চকিত করার মুখ্য দায়িত্ব কবিদের।

কবি ও কবিতার এক উর্বর জনপদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রসূলে আরাবী (সা:)। নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই রসূল (সা:) এর মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর একটি অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিল প্রকৃতগতভাবে একজন আরব হওয়ার কারণে। এছাড়া কবি ও কবিতার প্রতি তার একটি স্বভাবসুলভ আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল। রসূলুল্লাহ (সা:) নিজে যেমন কবিতা শুনতে ভালবাসতেন ঠিক তেমনি অন্যদেরও তিনি কবিতার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। যে দুটো মনোরম আভরণে আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বকে সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি।

উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল(সঃ) বলেছেন- "নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় রয়েছে প্রকৃতি জ্ঞানের কথা।"[৬৭]

তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন- "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শেখাও, এতে তার কথা মিষ্টি ও সুরেলা হবে।"[৬৮]

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন- মহানবী (সাঃ) বলেন "তোমরা কাফির মুশরিকদের নিন্দা করে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়। তীরের ফলার চেয়েও তা তাদেরকে বেশি আহত করবে। ইবনে রাওয়াহাকে পাঠানো হল। সম্পূর্ণ মুগ্ধ হতে পারলেন না নবী করীম (সাঃ)। কা'ব বিন মালিককেও পাঠানো হলো। অবশেষে যখন হাস্‌সান এলেন তিনি বললেন, সবশেষে তোমরা একে পাঠালে? ও তো লেজের আঘাতে সংহারকারী তেজোদীপ্ত সিংহ শাবক। কথা শুনে হাস্‌সান (রাঃ) আনন্দে জিভ নাড়তে নাড়তে বললেন, "সেই মহান সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য বাণী সহকারে পাঠিয়েছেন। এ জিভ দিয়ে তাদের চামড়া ছিলে ফেলার মত গাত্রদাহ সৃষ্টি করেই ছাড়ব।"[৬৯]

রসূল (সাঃ) সফরে বের হয়েছেন। মরুপথে উটের পিঠে, রাত ও হয়েছে বেশ। বললেন, হাস্‌সান কোথায়? হযরত হাস্‌সান (রাঃ) এগিয়ে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) এইতো আমি! রসূল (সাঃ) বললেন, আমাদের কিছু 'হুদা' শোনাওতো।" শুরু করলেন কবি। ওদিকে মহানবী (সাঃ) শুনছেন। উট ও চলছে অধীকতর ক্ষিপ্রতায়। উটের দ্রুত চলার কারণে মনে হচ্ছে হাওদা যেন পেছন দিকে ভেঙে পড়ে যাবে। থামতে বললেন রসূল (সাঃ)। আর মন্তব্য করলেন, "কবিতাকে এজন্যই বলা হয় বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুত সঞ্চারক এবং এর আঘাত শেলের আঘাতের চেয়েও ক্ষিপ্র ও ভয়ানক।"[৭০]

এদিন থেকেই আনসারদের মধ্যে তিনজন ইসলামী কবি হাস্‌সান বিন সাবিত কা'ব বিন মালিক এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কাফিরদের বিরুদ্ধে কাব্য লড়াইয়ে নেমে পড়লেন। রসূল (সাঃ) এর উৎসাহ ও প্রেরণায় সাহাবীদের মধ্যে যাদের কাব্য প্রতিভা ছিল তারা প্রায় সকলেই এ কাব্য সাধনা করতেন। সাহাবী কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন- হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ), কা'ব বিন মালিক (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ), আলী ইবনে আবু তালিব, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ), লবীদ বিন রাবিয়াহ (রাঃ), আব্বাস বিন মিরদাস (রাঃ), যুহায়ের বিন জুনাব (রাঃ), সুহায়েম (রাঃ) ও আবু লায়লা (রাঃ), আমর বিন ম'দীকরিব, আল হুতায়'আহ, নাবিমা জ'দী, আবু যু'অয়ব আল হুমলী প্রমুখ।[৭১]

---

[৬৭] ঈমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *আল আদাবুল মুফরাদ*, অনুক- মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, পৃ. ৩৮৭, হাদীস নং-৮৬৬

[৬৮] ঈমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১, হাদীস নং-৮৮১

[৬৯] মুকুল চৌধুরী, *কবি ও কবিতার প্রতি রসূল (সাঃ) এর অনুরাগ ও উৎসাহ*, মজিদ পাবলিকেশন ৩১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ.১৭

[৭০] মুকুল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

[৭১] আ.ত.ম মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ই.ফা.বা. প্রকাশনা, প্রকাশকাল- জুন ১৯৮২, পৃ. ১৪৩-১৪৯

রসূলে আরাবী (সা:) সাহাবী কবিদের মধ্য থেকে কবি হাস্সান বিন সাবিতকে সভাকবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাকে বলা হতো শায়েরুর রসূল বা রসূলের কবি। কবি হাস্সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে নবীজী (সা:) সবাইকে শুনিয়ে বলতেন, "হাস্সানের জিভ যতদিন রসূলের পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে, ততদিন তার সাথে জিব্রীল আমিন (রা.) থাকবেন।"

কবিতা লেখার পুরস্কার হিসেবে কবি হাসসান বিন সাবিত (রা:) জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। কাব্যে অশ্লীলতা বর্জনের ব্যাপারে ইসলামে কঠোর বিধি নিষেধ রয়েছে। কোন মুসলিম দ্বীনের পথে আসার পরও যখন অশ্লীল কাব্যচর্চা ছাড়তে পারলো না সে যেন তার জিভের পবিত্রতা নষ্ট করে ফেলল।

রসূল মাকবুল (সা:) আরও বলেছেন, 'কারো পেট বা হৃদয় যদি পুঁজপূর্ণ হয়ে পঁচে যায়, তবুও সেই পেট বা হৃদয় অশ্লীল কবিতার চেয়ে উত্তম।"[৭২]

প্রিয়নবী (সা:) এর দরবারে একবার কবিদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনাক্রমে জাহেলী যুগের অশ্লীল কবিতার জনক ইমরুল কায়েসের প্রসঙ্গ এলে রসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর সম্পর্কে বললেন, দুনিয়ায় তিনি খ্যাতনামা হলেও আখিরাতে তার নাম নেবার কেউ থাকবে না। কবিদের যে বাহিনী জাহান্নামের দিকে যাবে সে থাকবে তার পতাকাবাহী।"[৭৩]

কবি ও কবিতা সম্পর্কে রসূলে আরাবী (সা:) এর মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক, সুনিপুণ মূল্যায়ন আজকের শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকদের মন্তব্যকেও হার মানায়। নিশ্চয় কবিতা হচ্ছে সুসংবদ্ধ কথামালা। কাজেই যে কবিতা সত্যাশ্রিত সে কবিতা সুন্দর। আর যে কবিতা সত্য বিবর্জিত সে কবিতা অন্ত:সারশূন্য। উট থামাতে পারে তার সুকরুন ক্রন্দন, কিন্তু আরবরা থামাতে পারেনা তাদের কবিতার সুর। আরবদের সুসংবদ্ধ কথা হলো তাদের কবিতা। কবিতার ভাষায় কিছু চাইলে তারা মন ভরে দান করেন। তাদের ক্রোধানল নিভৃত হয় কাব্যের অন্ত:সলিল প্রবাহে। সাহিত্যের আসরে কবিতাই তাদের মনকাড়া শ্রেষ্ঠ উপহার।

**কাব্য সাধনায় পবিত্র কুর'আনুল কারীমের কতিপয় আয়াত ও হাদীসের ভাষ্য:**

"আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৭৪]

"আর এভাবেই আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ।"[৭৫]

"অবশ্যই এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"[৭৬]

[৭২] ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭, হাদিস- ৮৬৮

[৭৩] ডক্টর ওয়ালিদ ক্বাসসাব, *শারহ শাওয়াহিদ আল মুগনী*, পৃ. ৯-১০

[৭৪] আল-কুরআন ১২: ২

[৭৫] আল-কুরআন ২০: ১১৩

[৭৬] আল-কুরআন ২০: ১১৩

“অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।”[৭৭]

“এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।”[৭৮]

“তাহলে তারা কি বলে এটি সে নিজে রচনা করেছে? না এটি তোমার রব হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্কতাকারী আসেনি। হয়তো তারা সৎ পথে চলবে।”[৭৯]

“আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত ও উপমা উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।”[৮০]

“আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কোরআন, এতে নেই কোন বক্রতা (পেঁচানো কথা),যাতে তারা (অন্যায় অপকর্ম হতে) বেঁচে চলতে পারে।”[৮১]

“এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তুমি উম্মুল কুরা (মক্কা শহর) ও তার চারপাশে যারা আছে তাদের সতর্ক করতে পার, আর সতর্ক কর কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (একত্রিত হওয়ার পর) একদল যাবে জান্নাতে, আরেকদল যাবে জাহান্নামে।”[৮২]

“আর এর পূর্বে এসেছিলো মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এটি তার সত্যায়নকারী কিতাব, আরবী ভাষায়; যাতে এটা যালিমদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং তা ইনসাফকারীদের জন্য এক সুসংবাদ।”[৮৩]

ইব্‌ন কায়সান নামে প্রসিদ্ধ খালিদ বলেন, একদা আমি হযরত ইব্‌ন উমর (রা:)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আয়াস ইব্‌ন খায়সামা তার নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, “হে ফারুক তনয়, আমার কিছু কবিতা কি আপনাকে আবৃত্তি করে শোনাবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে কেবল উত্তম কবিতাই শোনাবে। তিনি তাকে তা আবৃত্তি করে শোনাতে থাকেন। পরে কবিতায় ইব্‌নে উমায় (রা:) এর অপছন্দনীয় কিছু এলে তিনি বলেন এবার থামো।”[৮৪]

হযরত কাতাদা (রা:) বলেন, আমি মাতলাফকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, “আমি হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা:) এর সাথে কুফা থেকে বাস্‌রা পর্যন্ত সফর করেছি। খুব কম মাঞ্জিলই এমন ছিল যেখানে তিনি যাত্রাবিরতি করেছেন, অথচ আমাকে কবিতা পড়ে শোনাননি। তিনি বলেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।”[৮৫]

হযরত আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন সারী (রা:) বলেন, আমি আরজ করলাম, “ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নানাভাবে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করেছি। তিনি বলেন, শোনো! তোমার প্রভু তাঁর প্রশংসা অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি এর বেশি আর কিছু বলেননি।[৮৬]

---

[৭৭] আল-কুরআন ২৬: ১৯৫
[৭৮] আল-কুরআন ৩২: ২
[৭৯] আল-কুরআন ৩২: ৩
[৮০] আল-কুরআন ৩৯: ২৭
[৮১] আল-কুরআন ৩৯: ২৮
[৮২] আল-কুরআন ২৬: ৭
[৮৩] আল-কুরআন ৪৬: ১২
[৮৪] ইমাম বুখারী (র), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ ৩৮১, পৃ. ৩৮৬, হাদীস নং-৮৬৪
[৮৫] *আল-আদাবুল মুফরাদ* ৮৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭
[৮৬] ৮৬৭, প্রাগুক্ত

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, "নিশ্চয় কোন কোন কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।[৮৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কবিতাও কথারই মত। রুচি সম্মত কবিতা উত্তম কথাতুল্য এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা কুরুচিপূর্ণ কথাতুল্য।[৮৮]

হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "কবিতার মধ্যে কতক ভালো এবং কতক নিকৃষ্ট। তুমি তার ভালোটা গ্রহণ এবং নিকৃষ্টটা পরিহার কর।[৮৯]

হযরত শারীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদা আমাকে কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সাল্‌তের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন। আমি তাঁকে তা আবৃত্তি করে শুনালাম। নবী (সাঃ) বলতে থাকলেন, "চালাতে থাকো, চালাতে থাকো।" শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে একশত চরণ আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বলেন, "আর একটু হলেই এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত।"[৯০]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা এক বেদূইন নবী (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কথাবার্তা বলল। নবী (সাঃ) বললেন, 'কথায়ও জাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কবিতাও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে পারে।[৯১]

হযরত যায়িদ ইব্‌ন আসলাম বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "নবী করীম (সাঃ) এর যুগে প্রাচ্য থেকে দুই বাগ্মী পুরুষ মদীনায় আসে। তারা দাড়িয়ে বক্তৃতা করল। অতঃপর বসে পড়ল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বক্তা সাবিদ ইব্‌ন কায়েস (রাঃ) দাড়িয়ে ভাষণ দিলেন। কিন্তু, শ্রোতামণ্ডলী পূর্বের দুই বক্তার বক্তৃতায় অভিভূত হল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং বললেন, "মানবমন্ডলী, বক্তব্য সরলভাবে উপস্থাপন করবে, কেননা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলা শয়তানের কাজ। কোন কোন বক্তৃতায় জাদুকরী প্রভাব থাকে।"[৯২]

হযরত নাফি বলেন, হযরত ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাঁর পুত্রকে উচ্চারণের ভুলের জন্য মারধর করতেন।[৯৩]

আবদুর রহমান ইবনে আজলান বলেন, হযরত উমার (রাঃ) এমন দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা তীর ছুড়ছিল। এমন সময় তাদের একজন অপরজনকে লক্ষ করে বলল, "তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়েছ।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেন, "উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপের ভুলের চাইতে মারাত্মক।"[৯৪]

---

[৮৭] ৮৭২, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৩৮২, পৃ. ৩৮৭

[৮৮] ৮৭৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

[৮৯] ৮৭৪, প্রাগুক্ত

[৯০] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ কবিতা শোনানের ফরমায়েশ করা, পৃ. ৩৯০, হাদীস নং-৮৭৭

[৯১] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ কোন কোন কথা যাদুকরী প্রভাব রাখে, হাদীস নং-৮৮০

[৯২] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ বাচালতা, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং-৮৮৩

[৯৩] *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা, পৃ. ৩৯৪, হাদীস নং-৮৮৮

[৯৪] *আল-আদাবুল মুফরাদ* ৮৮৯, প্রাগুক্ত

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ মহানবী (সা.) ও তৎপরবর্তী সাহিত্য

নিখিল জাহানে রসূল (সা:) এর আগমনের মধ্য দিয়ে জাহিলিয়া যুগের বস্তুতান্ত্রিক, ধ্বংসাত্মক, অশ্লীল ও অনৈতিক কাব্যচর্চার বিপরীতে সত্য, সুন্দর ও মানবকল্যাণমুখী কাব্য সাধনার ধারা সূচিত হয়। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূলে মাকবুল (সা:) এর নৈতিক নান্দনিক সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণার কল্যাণে উম্মতে মোহাম্মদী নিশ্চিত অন্ধকার থেকে আলোর পথে ধাবিত হয়।

জাহিলি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের দীর্ঘদিনের অনুশীলনের দরুণ কাব্য বাগ্মীতায় তারা পারদর্শী হয়ে ওঠে। তদোপরি বিশ্বসাহিত্যের আকর গ্রন্থ কুরআন অতীতের সব সাহিত্যিক কীর্তিকে ম্লান করে দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষা মাধুর্য, বিষয়বস্তু ও আয়াত শুনে তাঁরা হতবাক হয়ে বলতে লাগলো আরে হ্যাঁ তা আর এমন কি বাণী! ডাহা পাগলের প্রলাপ এবং অগোছালো চিন্তার একটি আবর্জনার স্তূপ মাত্র। এ সব অলীক কল্পনা হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি, কাজেই এতো এক জাদুকর সে আনয়ন করে দেখাক না এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ আবির্ভূত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ। আবার কখনো বলা হতো সে নিজেই কিছু কবিত্বমূলক ভাব কল্পনা ও ছন্দগাঁথা রচনা করে বলছে এটা আল্লাহর বাণী। রসূল (সা:) এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার সমুচিত জবাব দিলেন এভাবে-

পূর্বে যে সব রসূল পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমি ওহী অবতীর্ণ করতাম তারা মানুষই ছিল, তোমরা যদি না জান তবে কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতো না, তারা চিরস্থায়ী ও ছিল না। অতঃপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে, তোমরা কি বোঝ না?[৯৫]

আরবী সাহিত্য চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনে কুরআন এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। আরবী সাহিত্যিকগণ তাদের রচনাকে প্রাঞ্জল করে তুলতে কুরআনের শব্দ বাক্যাংশ ও বাক্যযুক্ত করেছেন এবং এর ভাব নিজেদের রচনায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছেন। কুরআনকে বুঝতে ও আরবী গদ্য সাহিত্যে সাবলীলতা আনতে যে দ্বিতীয় মূল তথ্যের উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয় সেটি ইসলামি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হাদীস। আর এ সাহিত্যে রসদ যোগায় ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম উপাদান বাগ্মীতা। কুরআন ই মূলত বাগ্মীতার পথনির্দেশক।

---

[৯৫] আল-কুরআন ২১: ৭-১০

P.K Hitti'র অভিমত হলো- "ইসলামি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল আরবে শুরু হয় ইসলামি সংস্কারের কাজ। জাহিলি যুগের বাগ্মিতা ও কবিতায় এবং আরও কোন কোন রীতিনীতিতে ইসলাম দিয়েছে নতুন রূপ। রসূলুল্লাহ (সা:) জাহিলি যুগের বাগ্মিতাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দান করেন। এটি একটি গুণ, একে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। ইসলামের প্রথম যুগে কবিতার তুলনায় বাগ্মিতার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়। কুর'আনের বর্ণনা ভঙ্গিতে বাগ্মিতার বীজ সুপ্ত রয়েছে। কুর'আন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়েছেন। মুসলিম সেনাপতিরা মুজাহিদদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার করেছেন।"[৯৬]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব,মাহাত্ম্য, গুণাবলী বর্ণনা, রসূলের (সা.) জীবনাদর্শ, ইসলামী সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের উদ্বুদ্ধকরণ ও উত্তম চরিত্র গঠনই ছিল ইসলামী কাব্য সাহিত্য ও গদ্যচর্চার মূল উপজীব্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা, বিদেশে দূত প্রেরণ, সন্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে যে সকল চিঠি পত্র আদান-প্রদান হতো তা সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে এবং এগুলো সাহিত্য জগতের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

বাগ্মিতার সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটেছিলো আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী রসূলুল্লাহ (সা.) এর পত্রাবলীতে। যা তিনি সে সময়ের শাসকদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এখানে তার কিছু নমুনা উপস্থাপিত হলো।

তৎকালীন সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত পত্র-

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস সমীপে। হিদায়াত অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম, অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবেন আর আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। কিন্তু যদি আপনি এতে অসম্মত হন তবে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হবেন।"[৯৭]

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট প্রেরিত পত্র-

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর প্রতি। সালাম তাদের প্রতি যারা আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং এ কথায় সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং সমগ্র জগতের লোকদের সতর্ক করার জন্য তিনি আমাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা ও মুক্তি লাভ করবেন। আর যদি তা অস্বীকার করেন তাহলে সমগ্র অগ্নি উপাসক জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাবে।"[৯৮]

ইয়ামামার বাদশা হাওযা ইবন্ আলীর নিকট পত্র-

"পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে হাওযা ইবন্ আলীর প্রতি। হেদায়াতের অনুসরণকারীদের উপর সালাম। আপনি জেনে রাখুন অচিরেই আমার দ্বীন ভূ-ভাগের

[৯৬] P.K. Hitti: *The History of the Arabs* পৃ. ২৪০, সূত্রেঃ মোঃ আবু তাহের, *ইসলামে দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ক্রমোন্নতি*, কবির পাবলিকেশন্স, পৃ. ৪৪৭

[৯৭] Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, No-5, Page-38, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006

[৯৮] Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, No-5, Page-39, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006 ইবন্ জারীর আত তাবরী, *তারীখুত তাবারী* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭) ২য় খন্ড, পৃ. ৯০; শায়খ আলী ইবন্ বুরহানুদ্দীন আল হাকাবী আসযীরাতুল হালাবিয়্যা (মিসরঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ ১৩২৮ হিজরী) ৩য় খন্ড, পৃ. ২৭৭

সে প্রান্তে পৌঁছাবে যে পর্যন্ত ঘোড়া ও উট পৌঁছতে পারে। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করুন এবং আপনার রাজত্ব আপনার হাতেই থাকবে।”[৯৯]

গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধি ও বিকাশে উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ পত্রের পাশাপাশি ইসলাম সিদ্ধ সাহিত্য রসোত্তীর্ণ বক্তৃতামালার অনন্য অবদান রয়েছে। হযরত আবু বাকার (রা) এর উপর খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পিত হওয়ার পর তাঁর প্রদত্ত নিম্মোক্ত ভাষণটিও তেমনি এক নান্দনিক সাহিত্যকর্মের সাক্ষ্য বহন করছে।

“আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,আপনারা যদি চান আমার আচরণ রসূলুল্লাহ (স) এর মত হোক,তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুলত্রুটি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মত আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবী আমি করতে পারিনা। আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক করছি,আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপথগামী হচ্ছি, আমাকে সতর্ক করবেন।”[১০০]

ইসলাম এক নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠা কল্পে আন্দোলন শুরু করলে জাহিলি যুগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত দেখতে পান। স্বাভাবিকভাবে এ আন্দোলন প্রতিহত করতে তারা সচেষ্ট হন। কবিরাও সরদারদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামি আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে মক্কার কবিরাই ছিলেন আগ্রহী। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা, দিরার ইবনুল খাতাব, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস, আমর ইবনুল আস, আযযা আল জুমাহী, আল হারিছ ইবন হিশাম, হুরায়রা বিন ওয়াহাব আল মাখযুমী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব পৌত্তলিক কবি ক্রোধে প্রচণ্ডতায় ফুঁসে রসূলুল্লাহ (সা:), ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ (সা:) এসব কবিতার উত্তর প্রদান প্রয়োজন মনে করেন, কারণ সে কালে কবিতার আক্রমণ তীর তরবারির আক্রমণের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। এতে এগিয়ে আসেন হাস্সান ইবনে ছাবিত, কা'ব ইবনে মালিক ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা প্রমুখ কবি। এভাবেই তৎকালীন আরবে দুটি ধারার কবিতা রচিত হতে থাকে। একটি মক্কার ধারা মূর্তির পক্ষাবলম্বন করে, অপরটি হলো মদিনার ধারায় যা রসূল (সা:) এর পক্ষে থেকে মক্কার কবিদের রচিত কবিতার উত্তর দেন। ইহুদি কবি কা'ব ইবন আশরাফ এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কবিরা মক্কার কবিদের সাথে যোগদান করেন।

তখনকার কবিদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের মহানবী (সা:) নিন্দা করেছেন। তাদের কবিতা মানুষের অমঙ্গল সাধন করেছিল। কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা; যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতাই সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে সে কবিতাতে মঙ্গল নেই। প্রাক ইসলামি যুগের কবি জাহিলি কবি নামে অভিহিত হয়েছেন। আর যে সব কবি প্রাক ইসলামি ও ইসলামি উভয় যুগই পেয়েছেন তারা মুখদারম কবি নামে অভিহিত।

---

[৯৯] Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, No-5, Page-42, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006 আলী ইবন্ বুরহানুদ্দীন আল হালাবী, প্রাগুক্ত, ২৮২

[১০০] ড.মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ ,*আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, বাংলাদেশ  ইসলামিক সেন্টার,ঢাকা:২০০৪,১ম খন্ড,পৃ.২৬

**উমাইয়া সাহিত্য**

উমাইয়া যুগের কবিরা ছিলেন খাঁটি আরব, ইসলামী কবি, ফলে তাদের ভাষা ছিল অবিমিশ্রিত ও নিষ্কলুষ। এ সময় ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রচার, সেনাপতিগণ তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করতে, প্রাদেশিক শাসকগণ তাদের প্রজাদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টিকল্পে বাগ্মিতা বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। হযরত আলী (রা:)'র ছন্দময় গীতি বিষয়ক বক্তৃতা, হাসান বসরী (রহ.)'র দার্শনিক ভাষণ, জিয়াদ ইবনে আবিহ'র দেশাত্মকবোধক বক্তৃতা আরবী সাহিত্যের বিশিষ্ট অংশ। এ যুগে রাজনৈতিক চিঠিপত্রের মাধ্যমে স্বল্প কথায় বেশি ভাব প্রকাশের একটি নতুন রীতির প্রচলন হয়। উমাইয়া যুগের প্রথমার্ধে গদ্যসাহিত্য প্রবলবেগে ধাবিত হলেও শেষার্ধে তা মন্থর অথচ দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলে। গদ্যের উন্মেষে ধর্মীয় প্রভাবের কারণে জাহিলী যুগের ছন্দোবদ্ধ গদ্যের অসংলগ্ন বাক্য পরিত্যক্ত হয়। এ কালের গদ্যে এসেছে গতিময়তা, ভাষার সাথে ভাবের প্রাসঙ্গিকতা, বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যময়তা এবং ভাষায় এসেছে পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা।

কবি ও কবিতার আতুরঘর আরববিশ্ব প্রখর স্মৃতিধর হওয়ায় তারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন। কবিতা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম উপাদান। জীবনের কোলাহল, যুদ্ধ বিগ্রহের উপদ্রব, বিপরীত চিন্তাধারার সমাবেশ ও গোত্রপ্রীতির প্রভাব কবিতার বিষয়বস্তু। কবিতার অধিকাংশই গোত্রীয় কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধ তাদের কবিতাকে দিয়েছে প্রাণশক্তি। শহরাঞ্চলের কবিদের তুলনায় মরু অঞ্চলের কবিদের ভাষাদক্ষতার ফলে সমাজে তাদের কদর বেশি ছিল। প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে উমাইয়া শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা হিজা বা বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করতো। রসূল (সা:) এর যুগে নিছক আনন্দ দানের জন্য এক প্রকারের ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হতো যা উমাইয়া যুগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য পায়। রণাঙ্গনে বীরত্মগাথাকে কেন্দ্র করেও কবিতা চর্চা হতো। যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে যোদ্ধাগণ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ইসলামের মর্মবানী অনুযায়ী শহীদী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। যুদ্ধশহীদদের স্মরণে রচিত হতো ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট শোকগাঁথা। তাদের জন্য স্বর্গীয় সুখ অপেক্ষমান সে কথাও কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। কবি হৃদয় ইসলামী পরশে সিক্ত হলে এ সময়কার কবিতায় ইসলামী ভাবধারার নান্দনিক প্রতিফলন ঘটে।

**আব্বাসীয় সাহিত্য**

উমাইয়া শাসনের অবসানের পর আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। বিদ্যোৎসাহী আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি স্বর্ণযুগে এসে বাগদাদ পরিণত হয় জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতির একটি প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রবিন্দু। পারস্য, গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংশ্লিষ্টতায় এ সকল সভ্যতার জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এ ক্ষেত্রে হারুন অর রশীদ ও আল

মামুনের ভূমিকা সর্বাগ্রে। ৮৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা বিশ্বের আলোকিত মানুষের চারণভূমিতে পরিণত হয়। পীথাগোরাস, প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস, ইউক্লিড, প্লাটিনাস, টলেমি, আর্কিমিডিস, চরক, আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনূদিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক হুনায়ন ইবনে ইসহাক, সাহল ইবনে হারুন, দার্শনিক ও পলিমেথ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দি প্রমুখ ছিলেন অন্যতম প্রধান অনুবাদক। অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক গ্রন্থ রচনায় ও আব্বাসীগণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল খাওয়ারিজমী'র "কিতাবুল জাবর," বানু মূসার "কিতাবুল হিয়াল", আলী আত তাবারীর "ফিরদৌসুল হিকমাহ", খাওয়ারিজমীর "সুরাতুল আরজ" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্যাঙ্গনে আব্বাসীয় বিচরণ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রশস্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে বিপুল পারিতোষিক দেয়া হতো। সে কারণে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত খলিফাদের তোষামোদপূর্ণ প্রশস্তি বর্ণনায় চারণ কবিরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। আব্বাসীয় সাহিত্যে পারসিকদের প্রভাব বর্ণনা করে পি.কে. হিট্টি তার গ্রন্থে বলেন-

"পঞ্চম মুসলিম শতাব্দীতে বাদি আল যামান আল হামদানি, নাইসাবুরের অধিবাসী আলসা' আলিবি ও আল হারিরি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আরবী সাহিত্য উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। এ সময় প্রবন্ধ রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পারসিক সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার ফলে প্রবন্ধগুলির মধ্যে অতিমাত্রায় অলংকার ব্যবহারের একটা প্রবণতা ছিল। অতীতের সহজ, বাহুল্যবর্জিত ও মর্মভেদী প্রকাশভঙ্গী চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছিল- তার পরিবর্তে এসেছিল মার্জিত, রুচিশীল প্রকাশভঙ্গি এবং প্রবন্ধগুলি লেখার মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার প্রাধান্য।"[১০১]

পারসিক সাহিত্যকগণ আরবী কাব্যের জগতে শুধু জাঁকজমকপূর্ণ রচনাশৈলী ই আনেননি, তার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ও মর্যাদাপূর্ণ ভাবুকতা, উপযুক্ত শব্দ ও বাক্য নির্বাচনের সৌন্দর্য, অনুভূতির কোমলতা ও গভীরতা এবং সর্বোপরি উন্নত ও আধুনিক ভাবনা চিন্তার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার বহন করে এনেছিলেন।

**পারস্য সাহিত্য**

প্রিয় হাবীব রাসূলে আকরাম (সা:) থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল ভাষার মুসলমানগণ তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সমুন্নত করেছেন তাওহীদি চেতনার ভিত্তিতে। বিশ্বসাহিত্যে ফারসি মুসলমানদের অবদান চিরস্মরণীয়। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসার পূর্বে ফারসি কবিদের কণ্ঠ ও কলম ছিল অগ্নিপূজক, খোদাদ্রোহী রাজরাজড়াদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু ইসলামের সংস্পর্শে এসে তাদের কাব্যসাহিত্য রূপান্তরিত হয় উন্নত রুচিশীল প্রাণ জুড়ানো সংগীতে। রচিত হলো শত সহস্র কবিতা, গজল, হামদ, নাত ও মানবতার জয়গান। ফারসি কাব্যসাহিত্য জগতে যারাই উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন রসূল প্রেমে মাতোয়ারা। রাসূলে (সা:)

---

[১০১] পি.কে. হিট্টি: *আরব জাতির ইতিহাস* অনু-জয়ন্তসিংহ, সেজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; ১৯৯৯; দশম সংস্করণ, পৃ.-৩৮৩

কারীমের শান, মর্যাদা, জীবন চরিত ও সামগ্রিক কাজকর্ম স্থান পেয়েছে তাঁদের সাহিত্যকর্মে। ফেরদৌসী, শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদী, হাফিজ, জালালউদ্দীন রুমি এদের মধ্যে অন্যতম।

**শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদী**

ইরানের সিরাজ নগরীর অবিসংবাদিত ব্যক্তিসত্ত্বা বহুভাষাবিদ, ভ্রমণপ্রিয়, সূফিসাধক কবি শেখ সাদী ফারসি সাহিত্যাঙ্গনে এক অবিস্মরণীয় নাম। জ্ঞানদীপ্ত অধ্যাত্ববাদী এই কবি তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে যে স্মরণীয় ধারায় রূপায়িত করেছেন, বিশ্বজন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার কাব্যসুধা পান করে ধন্য হচ্ছেন। বাল্যকাল থেকেই তাফসীরে কুরআন, হাদীস, ফিকহ প্রভৃতি ইসলামী ধর্মতত্ত্বে তাঁর অভাবনীয় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং একজন পাক্কা শরী'য়াহত পন্থী হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর পৃষ্টপোষক সুলতান আতাবেগ সাদ ইবনে জংগীর মোঙ্গল-তুর্কিদের হাতে নিহতের পর রাষ্ট্রব্যবস্থায় চরম অরাজকতা দেখা দেয়। দেশের এ অবস্থায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একরকম বাধ্য হয়ে নিজ দেশের মায়া ত্যাগ করে জ্ঞান অন্বেষণে বিদেশ ভ্রমণে ব্রতী হন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নানা দেশে ভ্রমণকালে তিনি আবিসিনিয়া থেকে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে অংশ নেন। খ্রিস্টানদের হিংস্র আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে তিনি নির্জন জঙ্গলে আশ্রয় নেন; সেখানে ফ্রাঙ্ক সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে ত্রিপলিতে দুর্গ খননকার্যে সাধারণ মানুষের কাজ করতে বাধ্য হন। বন্দীত্বের হীন অপমান ও পীড়া থেকে আলেপ্পোর এক ধনাঢ্য দশ দীনার দিয়ে মুক্ত করে তাঁকে নিজের এক বয়স্ক রূঢ় কন্যার সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের পর কবি শেখ সাদী কোন সুখের মুখ দেখতে পাননি। তার স্ত্রী একদিন সহসা বলে উঠল "তুমি কি সে হতভাগ্য নও, যাকে আমার পিতা দশ দীনার মূল্যে অনুকম্পা দেখিয়ে মুক্ত করেছিলেন? প্রতি উত্তরে কবি বললেন, আমি সে হতভাগ্য যাকে তোমার পিতা দশ দিনার দিয়ে মুক্ত করে পনুরায় একশত দিনার মূল্যে তোমার দাসত্বের নিগূঢ়ে আবদ্ধ করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাহর আখিরাতে অনন্ত সাফল্যের নিমিত্তে এরূপ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে তিনি পায়ে হেঁটে চৌদ্দবার হজ্জব্রত পালন করেন, তার ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতামালা, বাকপটুতা বিশ্বদরবারে তাকে শেখের মর্যাদায় আসীন করেন। ভ্রমণশেষে সিরাজ নগরে ফিরে এসে তিনি তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের নৈতিক নান্দনিক চরিত্র গঠনের বাণী সংবলিত কারিমা, গুলিস্তা ও বোস্তা (ফুলবাগান) রচনা করে প্রাচ্যের ঈশপ খ্যাতি লাভ করেন। নৈতিক শিক্ষার স্তম্ভরূপী গুলিস্তার আটটি অধ্যায়ে শাসকদের চরিত্র, দরবেশদের আখলাক, সন্তোষের উপকারিতা, মৌনতার সুবিধা, প্রেম ও যৌবন, দৌর্বল্য ও বার্ধক্য, নীতি শিক্ষার প্রভাব এবং সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ কাহিনীর ভিতর দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অকুণ্ঠ সত্যানুরাগ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। সাদীর সুতীক্ষ্ম লেখনীর উপমা ও অলংকার হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অনবদ্য।

তার কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জুয়েল ওয়াইজলাল বলেন-

“Sadi’s poetry: In this odes pomeggries elegies, other poetical pieces, sadi appears before us as a philosopher and mysite. His utterances are marked for their pure lofly thought, sincerity of expression, breadth of view chaste and easy all, their high moral tone.”[১০২]

শেখ সাদী উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাগদাদ অবস্থানকালে দীক্ষাগুরু সিহাবউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীসহ প্রসিদ্ধ সূফিদের সাহচর্যে তাসাউফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন ও শেষ জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। নৈতিক আদর্শ ও মানবতাবাদী কবির মতে, জীবনপ্রেম হৃদয়ে না জাগলে ইশ্‌কে ইলাহীর প্রেমে নিমগ্ন হওয়া যায় না। তাঁর বিশ্বাস সৃষ্টির সেবার মাঝেই পরিপূর্ণ কল্যাণ নিহিত। সাদীর আধ্যাত্মিক দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটা ছোট পাতাতেও আল্লাহর মহিমা উপলব্ধি সম্ভব। তিনি আল্লাহর অনন্ত রহস্য সন্ধান পেয়ে অতি সাধারন ফুল পাতায়, চন্দ্র-সূর্যে তার অনন্ত মহিমার অভিব্যক্তি দেখেছেন সৃষ্টির প্রতি অনুপরমাণুতে।

সাদী তার গ্রন্থাবলী ভাবের প্রাচুর্যে; ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনা মাধুর্যে এমনভাবে সুসজ্জিত করেছেন যে, এটি বিশ্বের সকল সাহিত্যানুরাগীর হৃদয়ে এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। সাদীর নৈতিক নান্দনিক, ভাবাবেগময় তত্ত্বকথা সম্বলিত কতিপয় কাব্যগাথা এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

“হে ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা থেকেও বৃহত্তর সত্তা! তোমার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছিল, তা শুনেছি ও হারিয়ে ফেলেছি। আর সে দফতর ও শেষ হয়েছে এবং আমাদের আয়ুষ্কাল ও শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমরা এখনও তোমার প্রাথমিক স্তরের গুণাগুণ বর্ণনার পর্যায়েই রয়ে গেছি।”[১০৩]

মেঘ হতে বৃষ্টির এক ফোঁটা জলকণা এসে সমুদ্রে পড়ল। সাগরের বিস্তৃতি দেখে বড়ই লজ্জা পেল। ভাবলো, এ বিশাল সমুদ্রের তুলনায় আমি কী? প্রকৃতই যদি এর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তবে তো আমি কিছুই নই। যখন সে নিজেকে অতি নিকৃষ্ট ভেবে ঘৃণা করল, ঝিনুক তার হৃদয়ক্রোড়ে তাকে প্রতিপালন করলো যে, ফলে সে মূল্যবান মুক্তার রূপ লাভ করলো। জ্ঞানী মাত্রই নম্রতাকে পছন্দ করে আর ফলবান বৃক্ষের শাখা ভূপৃষ্ঠে মাথা নত করে।”[১০৪]

মুহাম্মদের সৌন্দর্যের সম্মুখে
চন্দ্রও হয়ে গেছে নিষ্প্রভ,

---

[১০২] Joul waizlal, *An Introduction History of persian literature*, published by Alma Ram and Sons, 2nd Edition, Delhi India, p.127

[১০৩] শায়খ সা’দী শিরাযী, *গুলিস্তানে সা’দী*, ওয়াকার আলী সম্পাদিত, মাকতাবেই থানভী, সাহরানপুর দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ৪

[১০৪] G.M Wickns, *The Bustan of Sheikh-e-Ajal Sadi*, Iranian National Commission for Unesco, 1987, Tehran Iran, p-97

মুহাম্মদের (দেহ সৌষ্ঠবের) সঙ্গে
নয় তো তুলনীয় দেবদারুর সুউচ্চ কাঠামো।
মুহাম্মদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সম্মুখে
নাই কোন মর্যাদা সুউচ্চ আকাশের।
হে সা'দী! যদি হতে চাও যৌবনদীপ্ত প্রেমিক
মুহাম্মাদ ও তার পরিবারবর্গের প্রেমই হবে
তোমার জন্য যথেষ্ট অধিক।"[১০৫]

সাদীর বক্তব্যকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কাব্যিক ভাষায় লিখেন-
"যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি আশু গৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি।"[১০৬]

চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, আকাশ-বাতাস সবকিছু কার্যরত, যাতে তুমি কর্মক্ষম থাক এবং অলসতা ও অবহেলায় সময় না কাটাও। এরা সবাই তোমার জন্যে পরিশ্রম করছে এবং তোমারই অনুগত। তুমি নিজে (মহান প্রভুর) অবাধ্য থাকবে, এ তো ন্যায় নীতি নয়।

"একদা হাম্মামে মাটির একটি ঢেলা
এক বন্ধুর হাত হতে আসল আমার হাতে
বললাম তাকে: তুমি কি মেশ্‌ক না কি আম্বর?
তোমার প্রাণস্পর্শী সুগন্ধে আমি যে মাতোয়ারা।
বলল সে, আমি ছিলাম তুচ্ছ কাদামাটি
কিন্তু কিছুদিন কাটিয়েছি ফুলের সাথে
সহচরের বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়েছে আমার উপর
নচেৎ আমি তো সেই মাটি যা ছিলাম পূর্বেও।"[১০৭]

---

[১০৫] সম্পাদিত (আব্বাস ইকবালে আশতিয়ানী ও মুহাম্মদ ফররুগীর ভূমিকাসহ), *সাজেমানে ইন্‌তিশা'রাতে জাভিদান*, তেহরান, ইরান, ১৩৭১ ইবানী; ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৩১-৫৩২, সা'দীর আত তাইয়িবাত অংশ
[১০৬] শায়খ সা'দী শিরাযী, গুলিস্তানে সা'দী নুরুল্লাহ ইয়াজদহ পারস্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও এনাতেশারা'তে দা'নেশ ইরান থেকে প্রকাশিত, ১৩৬৭ ইরানী, পৃ. ৩৫
[১০৭] শায়খ সা'দী শীরাযী, *গুলিস্তানে সা'দী*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৫

**মহাকবি মুহাম্মাদ আবুল কাশেম ফেরদৌসী**

মহাকবি ফেরদৌসী জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্ববোধের অগ্নিমশালবাহী, বিশুদ্ধ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পথিকৃত, যিনি আজীবন কাব্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর নির্মিত ষাট হাজার শ্লোক সংবলিত অমর কাব্য "শাহনামা" ফারসি কাব্যজগতের মধ্যমণি।

"ইরানি জাতির বংশ পরম্পরার ঐতিহাসিক সনদ হলো শাহনামা। এ গ্রন্থ পারস্য জাতির শিকড়কে প্রাচীন রূপকথা ও কিংবদন্তীর সাথে যোগ করে। এটি ইরানিদের নিজস্ব তাহযিব ও তামাদ্দুন, কৃষ্টি ও কালচারের এক অনবদ্য ইতিহাস। এতে উপস্থাপিত আফসানে বা কিংবদন্তিগুলো প্রাণহীন শুষ্ক ইতিহাসের পাতা থেকে প্রাণোচ্ছল প্রাচীন ইরানের পরিচিতিকে তুলে ধরে। আবার অতি মানবীয় গ্রন্থ হিসেবে শাহনামার পরতে পরতে মানবজাতির বীরত্বগাঁথা ঝংকৃত হয়েছে বার বার।"[১০৮]

কবি একটি জটিল বিষয়বস্তুকে একটি ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁর কবি প্রতিভার অপূর্ব সংমিশ্রণে তিনি প্রাচীন বীরপুরুষদের অদ্বিতীয়তুল্য চরিত্র চিত্রায়ণ করেছেন। ভাষার উচ্ছল মাধুর্যে, বর্ণনার জাদুকরী চাতুর্যে, চরিত্র অলংকরণে, অপূর্ব শব্দ চয়নে এ রকম অসামান্য রচনাশৈলী আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। শাহানামা মহাকাব্য হলেও এতে ফারসি সাহিত্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নীতিমালা ও দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান। এজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একবাক্যে ফেরদৌসীকে প্রাচ্যের হোমার নামে অভিহিত করেছেন। তার রচনাশৈলীতে অভিভূত হয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন যে আদিরসে তিনি বিদ্যাপতি, বিরহ বর্ণনায় তিনি ভারতচন্দ্র এবং করুণার সে তিনি বাল্মিকী। ইরানী জাতি জাগরণের বাইবেলখ্যাত বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার আবেদন কখনই শেষ হবার নয়।

শাহনামা রচনাকে কেন্দ্র করে গজনীর সুলতান মাহমুদ ষাট হাজার শ্লোকের বিনিময়ে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের কথা থাকলেও চাটুকারদের প্ররোচনায় তিনি তাঁকে বিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিতে মনস্থ হলে কবি বিরাগভাজন হয়ে লেখেন-

"রাজবংশে হতো যদি জন্ম তোমার বরষিতে স্বর্ণমুদ্রা মুকুট সোনার, উচ্চমান নাহি যার বংশের ভিতর কেমনে সহিবে সে মানির আদর।"[১০৯]

জনশ্রুতি আছে, অবশেষে সুলতান রাজকীয় দূত মারফত কবির প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা ফিরদাউসীর সমীপে প্রেরণ করেন। অথচ নিয়তির কি অমোঘ বিধান! রাজকীয় দূত তখন ফেরদৌসী সমীপে উপস্থিত হন, ঠিক তখনই তাঁর মরদেহ দাফনের জন্য আনা হচ্ছিল।

---

[১০৮] তওফিক সোবহানী: *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান-১*, (পায়ামে নূর) বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৩৮৫ সৌরবর্ষ, পৃ. ১৭৭
[১০৯] মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ২০১০, পৃ. ১০০

**মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী**

জালালউদ্দীন রুমী ছিলেন ফারসি ভাষার একজন মনীষী সুন্নী, মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ, অতীন্দ্রবাদী ও সূফিদর্শনে। রুমির দর্শন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে। দিওয়ান ই শামস তাবরেজী, মসনবী ও রুবাইয়া কাব্য ও ফিহ মা ফিহ নামক পত্র সংকলন রুমীর অন্যতম নান্দনিক কীর্তি। ফিহ মা ফিহ পত্রাবলীতে রুমী প্রিয়তম শিষ্য মঈনউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সম্মানমূলক বিষয়ে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করেছেন। 'দিওয়ান ই শামস তাবরেজী' নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি সুলতানুল ফোকারা বা তাপসকুল চূড়ামণি শামস তাবরেজীর শিক্ষা ও জীবনদর্শন আড়াই হাজার গজল আকারে প্রকাশ করেন। তার রচিত ছয় খণ্ডে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার শ্লোক সংবলিত মরমী কাব্য মসনবী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। ইসলামী বিশ্বের চিন্তাচেতনা ও সাহিত্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারকারী সুফিবাদপুষ্ট কাব্যরূপের মসনবী আজ বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার। রুমী আধ্যাত্মিক ভাবধারা সমৃদ্ধ ষোল হাজার রুবাঈ রচনা করে গেছেন। তার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আশাবাদ। পাপময় সংসারে মানুষ জীবন সংগ্রামে জয়ী হবে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা নৈরাশ্য তাঁর কাব্যের কোথাও ছায়াপাত করেনি। দারুণ বিরহের খেদোক্তিগুলো ও তাঁর ভাষায় যেন আশার আলোকে রক্তিম হয়ে ফুটতো। তিনি কবিতাকে সামান্য কাব্যবিন্যাস মনে করতেন না। তিনি বলতেন কবির প্রাণ বাঁশির ন্যায়। যে বেনুবনে এই বাঁশির উদ্ভব সেখানকার শেখা গান এখানে সে নানা সুরে ব্যক্ত করে। যারা কবির শুধু সুর ভোগ করে তারা ভ্রান্ত। কবির বাঁশি যে গান গায় সেই গানের সত্যকে বুঝতে হবে। তবেই সত্য জীবনের ও পরমাত্মার গোপন সন্ধান লাভ করা সম্ভব।

কোরআনী শিক্ষার নির্যাস থাকায় তিনি সচেতনভাবেই এতে কুরআনের বাচনভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। ফলস্বরূপ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে গভীরতর ভাবার্থে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। আল্লামা ইকবাল মসনবীকে ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মের কিতাব আখ্যায়িত করেছেন। এর মধ্যে বর্তমানকালের সেইসব জটিল সমস্যার সমাধান নিহিত যেগুলোর কারণে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের তাকদীর সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। রুমী তার গ্রন্থসমূহে সুফি মতবাদ ও সাধনপ্রণালি ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজবোধ্য করার জন্য অসংখ্য বাস্তব কল্প-কাহিনী ও নীতিগল্প, উপকথা ও রূপক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। যা কিছু অশালীন, অপরিমার্জিত, ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। ধর্মীয় বক্তাগণ তাঁর বহু কবিতা উদ্ধৃত করে তাদের বক্তব্য সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত করে থাকেন।

ইসলামী সাহিত্যে মাওলান রুমীর অবদানের মূল্যায়ন করে Nicholson বলেন,

The influence of his example, his thought and his language is powerfully felt through all the succeeding enturies, every sufi after him capable or reading persian has

acknowledge his unchallenged leadership. To the west, now slowly realizing the magnitude of his genious. Thanks in greatest measure to the work of that fine scholar. He is fully able to prove a source of inspiration and delight not surpassed by any other poet in the world's literature.[১১০]

**আবুল ফাতহ উমর ইবনে ইব্রাহিম আল খৈয়াম**

উমার খৈয়াম বিশ্ববিখ্যাত ইরানি বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ ও রুবাই রচয়িতা কবি যিনি ২৭৫/৩০০ টি রুবাই লিখেছেন। ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (Adward Fitz-Gerald) এর ইংরেজি এবং অতঃপর বাংলাসহ বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় তাঁর রুবাঈয়াতের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। উমার তার দীর্ঘ জীবনব্যাপী বিজ্ঞানের সাধনা করেন। শুধু অবসর সময়ে চার ছত্রের ছোট ছোট কবিতা রচনা করে জীবন ও দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগুলো ছন্দোবদ্ধ করে রাখতেন। আরবী ভাষায় লিখিত তাঁর কবিতায় বৈজ্ঞানিক শব্দ, ধারণা ও উপমা প্রয়োগ হয়েছে। প্রতিটি রুবাই এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা, কোন একটির সঙ্গে আরেকটির ভাবগত স্বাতন্ত্র্য থাকায় এগুলো যেমনি উপভোগ্য তেমনি হৃদয়ঙ্গম করাটাও সহজবোধ্য।

১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক সুলতান জালাল উদ্দীন মালিক শাহ রাজকীয় গবেষণাগারের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করে সৌরবর্ষপঞ্জি নির্মাণের অনুরোধ জানালে সাতজন সহকর্মী বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় অতি অল্পসময় নিখুঁতভাবে সৌরপঞ্জি উদ্ভাবন করেন যা তার নামানুসারে আত তারিখ আল জালালী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি সবপ্রথম এলজাবরার সমীকরণগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করেন এবং বীজগণিত সমাধানে জ্যামিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতি সমাধানে বীজগণিতের ব্যবহার পদ্ধতি চালু করেন। "বাইনোমিয়াল থিউরাম" আবিষ্কারক নিউটনের বহু পূর্বেই উমার খৈয়াম এ তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। অতীত গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অবমূল্যায়নের দরুন বিশ্ববৈজ্ঞানীকদের তালিকায় তো দূরের কথা স্বজাতির মুখে ও এই বৈজ্ঞানিক কবির নাম উচ্চারিত হয় নি। তার অধিকাংশ গ্রন্থই সংরক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি যে এত বড় দার্শনিক, বিজ্ঞানী, অংকশাস্ত্রবিদ ও চিকিৎসক ছিলেন তা মুসলিম জাতির অনেকেই আজও জানে না। আজীবন মানুষের কল্যাণে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

**শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ (হাফিজ)**

কবি হাফিজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কবিদের একজন যিনি গাযাল রচয়িতা কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি তার জন্মভূমি শীরাযকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। শীরাযের মনোহারিত্ব, রুকনাবাদের সুমিষ্ট পানির অনন্য জাদুকরী তৃপ্তিদায়িনী ক্ষমতা ও মূসানা নামক স্থানের উদ্যান ভ্রমণের আনন্দ তথা এর প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিখুঁত বর্ণনা দিতে তিনি কখনই ভুলতেননা। তিনি তার লেখনিতে সব প্রতিকূলতার সাথে সন্ধি স্থাপনে সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা এবং

[১১০] ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন, *প্রেম ও প্রজ্ঞার বাহক রুমি*; জোনাকী প্রকাশনী; ৩৮ বাংলা বাজার ঢাকা; ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৮

আশা ও প্রফুল্ল চিত্ততার কথা বলেছেন। তার লেখনিতে প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত সংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রেমের অবস্থাবলির বর্ণনায় তাঁর গাযাল সমূহের কোথাও নগ্নতার লেশমাত্র নেই। প্রেমের শুরা পানের আনন্দ ও তৃপ্তির বর্ণনা করে গীত রচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশগুলোতে তার জুড়ি নেই। তার কবিতার এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি ও বর্ণনা রীতির প্রেক্ষিতে যদিও তিনি প্রেম ও শরাবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বারা তিনি রূপকার্থক প্রেম ও শরাবকেই বুঝিয়েছেন। কারো কারো মতে তিনি উক্ত রূপ শব্দাবলি দ্বারা মারিফাত ও তরীকাতের বিভিন্ন রূপ, স্তর ও অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। তিনি ফারসি গাযাল রচনা শিল্পকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেন। কবিতা রচনায় বিষয়বস্তু ও বর্ণনায়, তিনি এরূপ এক নতুন প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করেছেন, যার কল্যাণে তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যে আক্ষরিক ও রূপক উভয়বিধ অর্থের নান্দনিক সমন্বয় ঘটেছে। প্রাচীন যুগে তার গাযাল, কাসীদাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতার সমন্বয়ে সংকলিত দীওয়ানের বিপুলসংখ্যক ভাষ্যগ্রন্থ তার কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভের প্রমাণ বহন করে। আধুনিক কবি গেটেসহ একাধিক জার্মান কবি হাফিজের কাব্য প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক ব্রাউন :A literary history of persia" গ্রন্থে এবং মাওলানা শিবলী নু'মানী "শিরু'ল আজম" গ্রন্থে কবি হাফিজের কাব্য প্রতিভার প্রতি অত্যন্ত সন্তোষজনক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন।

**আল্লামা স্যার মুহাম্মাদ ইকবাল**

আল্লামা ইকবাল ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক, ধর্মপরায়ণ তত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক, আল্লাহতে সমর্পিতচিত্ত চিন্তানায়ক, মানবপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা কবি। তিনি 'কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থ্যাকটেগার্টের তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে উচ্চতর ডিগ্রি ও জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "দি ডিভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস্ ইন পারসিয়া নামে খ্যাত তাঁর থিসিস লিখে পি.এইচ.ডি লাভ করেন। তিনি ইসলামী ও প্রাচ্য চিন্তাধারার সাথে পাশ্চত্য সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির কল্যাণকর দিকের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ইকবাল পাশ্চত্যের নিষ্প্রাণ পুঁজিবাদ ও জড়বাদের একদিকে যেমন কঠোর সমালোচনা করেন। অপরদিকে তেমনি প্রাচ্যের জীবনবিমুখ ও কর্মবিমুখ নিছক লোক দেখানো আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির ও কঠোর সমালোচনা করেন। তার মতে, পাশ্চাত্যের আত্মাবিহীন নির্জলা পুঁজিবাদ অধ্যাত্মবাদ নয়, বরং এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। তার কবিতা রচনায় এবং পুস্তক প্রণয়নে আমরা তাঁর কর্মবিমুখ জীবনের পরিচয় পাই। যে বছর তিনি এম.এ পাশ করেন, সেই বছর লাহোরের আঞ্জুমান-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় তাঁর সর্বপ্রথম কবিতা 'নালা-এয়াতিম' পাঠ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার সাহিত্য সেবা অক্ষুণ্ন ছিল। "অনেক জ্ঞানী তাদের জ্ঞান সাধনায় জীবনাতিপাত করেন। তাঁরা গ্রন্থরচনায় বিমুখ থাকেন। কিন্তু কর্মবীর ইকবাল অনেকগুলো অমূল্যগ্রন্থ রচনা করে পৃথিবীকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে গেছেন।"[১১১]

---

[১১১] মুহাম্মদ আলী আল হাবরুক, পত্রিকা আল জমহুরিয়াহ, কায়রো, ০৩-০৩-১৯৬৬

ফার্সি ভাষায় লিখিত তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'আসরার-এ-খুদী', 'জাবিদনামা'। উর্দু ভাষায় তিনি প্রথম অর্থনীতির উপর বই লেখেন। তাঁর উর্দু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "বাল-এ-জিব্রাইল" ও জাবর-এ-তালিম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় লিখিত "The reconstruction of religious thought In Islam."গ্রন্থটি বক্তৃতামালার গ্রন্থনা। এ গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও মৌলিকতার ছাপ মেলে। উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজিতে রচিত তার গ্রন্থাবলী সর্বজন বিদিত।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্য

বাংলা ভাষা সাহিত্যের রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে মাতৃভাষা বাংলার স্থান চতুর্থ। যুগ যুগ ধরে মুসলিম সাহিত্যামোদী বাঙালি জাতিগোষ্ঠী তাদের সাহিত্য সংগীতের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-উচ্ছ্বাস, বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে এসেছে। ফলে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবনধারার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। আব্দুল হাকিম থেকে ফররুখ আহমাদ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে বিশিষ্ট ধারাটি প্রধানত মুসলিম সমাজের সাহিত্য পিপাসা মিটিয়ে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ করতঃ যে সকল ধারা বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে সে ধারার হাতেগোনা কয়েকজন স্বনামধন্য সুসাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম অতি সংক্ষেপে চিত্রায়িত হলো-

### কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্য যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিলো তখন অবহেলিত ও নিগৃহীত জাতির এ চরম দুর্দিনে সাহিত্যের মুহ্যমান তরণীতে যাঁরা শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে মহাকবি কায়কোবাদের নাম সর্বাগ্রে। কায়কোবাদ নামে খ্যাত কাজেম আল কোরায়েশী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলাপূর্বপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক সহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভাগের তিন শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রতিভার একজন হলেন তিনি। মুসলিম সাহিত্য নিগৃহের সচিত্র ব্যথিত চিত্তে কবি তুলে ধরেছেন এভাবে-

"সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন; তারা বলতেন, মুসলমানরা বাংলা লিখতে জানে না। এসব শুনে আমাদের বড়ই আঘাত লাগতো। তিনি আরও বলেছেন: "মুসলমান জাতিকে লক্ষ করে এসব কটূক্তি করাতে বড়ই মর্মাহত হয়েছিলাম। বলতে কি! ওরা কোন বই হাতে নিয়ে মুসলমান গ্রন্থকারের নাম দেখলেই ফেলে দিত" ।[১১২]

[১১২] মোহাম্মদ শামসুজ্জামান "*যুগ যুগান্তরের মুসলিম মনীষা*". প্রকাশক: ইব্রাহিম খলিল (পারভেজ), প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বর্ণবিন্যাস: জবা কম্পিউটার, পৃ.: ২৫৩

এ কঠিন অবস্থার সমুচিত জবাব দিতে কবি শুদ্ধ বাংলায় সাহিত্য রচনার ব্রত নেন।

"মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষায় দখল আছে কিনা, মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখতে জানে কিনা তাহা দেখাবার জন্যই আমি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখতে আরম্ভ করি।"[১১৩]

কবির একনিষ্ঠ মুসলিম সাহিত্য চর্চার বদৌলতে বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার ধোঁয়াশা কেটে সর্বজন গৃহিত একটি নতুন সাহিত্য ধারা সূচিত হয়। কবি হৃদয়ে সুপ্ত বাসনা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের বীরত্ব ও গৌরবগাঁথাকে সমুন্নত রাখতে এক মহাকাব্য রচনা করবেন যা তাঁর অমরকীর্তি "মহাশ্মশান" নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়।

কবি হিন্দু মুসলমান বিভেদ স্থলে চেয়েছেন সাম্য, ঐক্য ও সহিষ্ণুতা। তাঁর কালজয়ী মহাকাব্য মহাশ্মশানের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-

"আমার এ কাব্যে কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই, হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন-চাপরাশি-কুলি মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া বাহবা লইয়াছেন, ভুরু, চানা নেড়ে মামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই, তবে যুদ্ধ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান পরস্পর গালাগালি করিয়া শেষে হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে প্রাণের জ্বালা মিটাইয়াছেন, যে স্থানে যেটুকু হওয়া দরকার এবং যাহা না হইলে কাব্যের অঙ্গহানি হইত, আমি কেবল তাহাই চিত্রিত করিয়া উহার প্রকৃত বর্ণনা ফুটাইয়া দিয়াছি। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি।"[১১৪]

১৮৯৬ সালের ২ এপ্রিল কবিকে লিখিত এক চিঠিতে নবীনচন্দ্র সেন আবেগাপ্লুত হয়ে লিখেন-

"মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না, অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।"[১১৫]

মহাশ্মশানের ভূয়সী প্রশংসা করে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে উল্লেখ করেন-

"তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গভাষার রাণী'র কোহিনূরের ন্যায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার মহাশ্মশান বাস্তবিকই বিশ্বজয়ী বিপুল গৌরবশালী মুসলমানদের অনন্তকীর্তির মহাগোরস্থান। এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবিত্বের অমৃতলহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।"[১১৬]

কায়কোবাদ ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় সাদাসিধা ও ধর্মানুরাগী ছিলেন যা তাঁর লিখনশৈলীতেও সুস্পষ্টতার ছাপ রেখেছে।

---

[১১৩] খন্দকার মাহমুদুল হাসান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রকাশক: মুহাম্মদ আরিফুর রহমান নাইম, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৯৪

[১১৪] খন্দকার মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

[১১৫] খন্দকার মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

এরই ধারাবাহিকতায় আব্দুল মান্নান সৈয়দের ভাষ্য-

"নজরুল ইসলামী কবিতাকে অসাধারণ জায়গায় নিয়ে গেছেন, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কায়কোবাদ অনতিক্রম্য রয়ে গেছেন। যেমন- আযান কবিতাটি। নজরুলও 'আজান' কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কায়কোবাদের আযান কবিতাটি আযান বিষয়ক আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা।"[১১৭]

কায়কোবাদের আযান কবিতাটি নিম্নরূপ

আযান

<u>কায়কোবাদ</u>

"কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।
কি মধুর আযানের ধ্বনি!
আমি তো পাগল হয়ে সে মধুর তানে,
কি যে এক আকর্ষণে, ছুটে যাই মুগ্ধমনে
কি নিশীথে, কি দিবসে মসজিদের পানে।
হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোণিত ধারে,
কি যে এক ঢেউ উঠে ভক্তির তুফানে
কত সুধা আছে সেই মধুর আযানে।
নদী ও পাখির গানে তারই প্রতিধ্বনি
ভ্রমরের গুণ-গানে সেই সুর আসে কানে
কি এক আবেশে মুগ্ধ নিখিল ধরণী।
ভূধরে, সাগরে-জলে, নির্ঝরিণী কলকলে,
আমি যেন শুনি সেই আযানের ধ্বনি।
আহা যবে সেই সুর সুমধুর স্বরে,
ভাসে দূরে সায়াহ্নের নিথর অম্বরে,
প্রাণ করে আনচান, কি মধুর সেই আযান,

[১১৭] আব্দুল মান্নান সৈয়দ "*বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* ১৯৯৮, পৃ. ৯৯

তারি প্রতিধ্বনি শুনি আত্মার ভিতরে।
নীরব নিঝুম ধরা, বিশ্বে যেন সবই মরা,
এতটুকু শব্দ যবে নাহি কোন স্থানে,
মুয়াযযিন উচ্চৈ:স্বরে দাঁড়ায় মিনার পরে
কি সুধা ছড়িয়ে দেয় উষার আযানে!
জাগাইতে মোহমুগ্ধ মানব সন্তানে।
আহা কি মধুর ওই আযানের ধ্বনি!
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।"

নিচে এ কবিতাটির নান্দনিক সার কথা ব্যক্ত হলো-

মহাকবি কায়কোবাদের আযান কবিতাটি মুসলিম কৃষ্টির একটি কালোত্তীর্ণ নান্দনিক সৃজনকর্ম যাতে স্রষ্টার প্রতি কবির প্রগাঢ় অনুরাগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। আযানের ধ্বনি মাধুর্যে কবি হৃদয় এতটাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে দিন নাই রাত নাই যখনই আযানের ধ্বনি শুনতে পান স্রষ্টার প্রতি গভীর টান অনুভব করেন। প্রকৃতির সবখানে যেমন- নদীর কল্লোলে পাখির কলরবে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, ঝর্ণা ধারায়। তিনি আযানের সুর ব্যঞ্জনায় শিহরিত হন। সন্ধ্যাকালে প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় সুললিত আযান কল্‌বে ঢেউ তোলে। তন্দ্রাচ্ছন্ন নিঝুম ধরণীতে সুউচ্চ মিনারে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিনের অমৃতসুর সুধাময় করে তুলে ঊষার প্রহর। হৃদয় গহীনে রণিত সে সুরধ্বনি কবির ধমনীতে প্রাণ সঞ্চার করে।

**গোলাম মোস্তফা (১৮৫৭-১৯৬৪)**

মুসলিম সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণে যে সকল কবি সাহিত্যিকগণ অনন্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার নাম অগ্রগণ্য। মীর মশাররফ হোসেন, শাহাদাত হোসেন, গোলাম মোস্তফা এবং কাজী নজরুল ইসলামের ন্যায় কালজয়ী প্রতিভাধর কবি সাহিত্যিকের হাত ধরে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ মুসলিম সাহিত্য পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কবি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী না হয়ে ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাহিত্য সচেতন ও সৌন্দর্য মূল্যায়ন, বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে আপোষ না করে, তিনি নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বিখ্যাত পত্রিকা সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে "এড্রিয়ানোপল উদ্ধার" কবিতাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সমাজে তাঁর কবি প্রতিভার বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বাংলার মুসলিম তৎকালীন সমাজে আধুনিক কবি হিসেবে অভিষিক্ত গুণধর এ

কবির লিখনীর ভাবব্যঞ্জনা, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গি ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রক্তরাগ" রবিঠাকুরকে উপহার দিলে রবি প্রফুল্লচিত্তে তাঁকে লক্ষভেদী কবিতার দুটি চরণ শুনিয়ে দেন-

তব নব প্রভাতের রক্তরাগ খানি

মধ্যাহ্ন জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।

গোলাম মোস্তফার যুগশ্রেষ্ঠ "বিশ্বনবী"তে হযরত মুহাম্মাদ (সা:) এর নান্দনিক জীবনাচরণ এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতির পরিস্ফুটন ঘটেছে। কুরআনিক ঘটনার অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বনিআদম' নামে একটি মহাকাব্য লিখেছেন যা অমর ও অক্ষয় কীর্তি।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজ দাশগুপ্ত "বিশ্বনবী" পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন যে-

"আপনার বিশ্বনবী পড়লাম। জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতের একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌঁছাবার আপনার এ সেতু রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তি। ভাষা, কবিত্ব-ঝংকার ও ভাবের লালিত্যে অপরূপ মহিলা লাভ করেছে।"[১১৮]

এখানে গোলাম মোস্তফা বিরচিত একটি হৃদয়স্পর্শী নাতে রসূল ও তার নান্দনিক গীতি মাধুর্য বর্ণিত হলো-

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি

আমার মোহাম্মদ রসুল

কুল মাখলুকাতের গুলবাগে

যেন একটি ফোটা ফুল॥

নুরের রবি যে আমার নবী

পূণ্য করুণা ও প্রেমের ছবি

মহিমা গায় তারি নিখিল কবি

কেউ নয় তাঁর সমতুল॥

পরম করুণাময়ের সমুদয় সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম সৃষ্টি হলেন আল্লাহর হাবিব রাসূলে আকরাম (সা:), বিশ্বময় যিনি এক ফুটন্ত পুষ্প সদৃশ। তাঁর অতুলনীয় জীবনদর্শন ও চারিত্রিক মাধুর্য অনাদিকাল ধরে গুণী জনের লেখনীর রসদ যুগিয়ে আসছে, প্রেম, মহানুভবতা, বদান্যতায় তিনি অনন্যসাধারণ।

---

১১৮

পিয়ারা নবী যেই এলো দুনিয়ায়

হাসিল নিখিল আলোক-আভায়

পুলক লাগিল তরু ও লতায়

খুশিতে সবাই মশগুল॥

আধার রাতের সে যে চাঁদের কিরণ

মরু সাহারার বুকে সুধা বরিষণ

নীরব ধরার গুল বাগিচাতে যেন

গান গেতে এলো বুলবুল॥

দ্বীনের নবীর আগমনী বার্তায় তামাম জাহান চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা পুলকিত হয়ে ওঠে। জগৎজ্যোতি আমার নবী অমানিশায় পূর্ণিমার চাঁদ, তপ্ত মরুর বুকে সুশীতল ছায়া, নিষ্প্রাণ ধরণীতে এক নতুন প্রাণের স্পন্দন। [গীতিকার: গোলাম মোস্তফা] [শিল্পী: আব্বাস উদ্দিন আহমাদ]

**কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮১৯-১৯৭৬)**

বাংলা সাহিত্যাকাশে যে কয়জন জ্বলজ্বলে তারকার নাম চিরভাস্বর তার মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম সর্বাগ্রে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর নজরুল ছিলেন একাধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, সংগীত পরিচালক, সঙ্গীত শিক্ষক, বাদক, কবি, নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সমালোচক, চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক, শিশু সাহিত্যিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯১৯ সালে মাসিক সওগাত পত্রিকায় “বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী” প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যসাধনার যাত্রা শুরু হয়। ক্ষণজন্মা (১৮৯৯-১৯৭৬) এ কবি অতি অল্প সময় (মাত্র ২৩ বছর) সাহিত্যাঙ্গনে বিচরণের সুযোগ পেয়েছেন; নিয়তির কি অমোঘ বিধান! মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে কবি চিরতরে কলম ধরার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। নজরুলের আগে অনেক প্রতিভাবান মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলেও কেবল নজরুলই স্বত:প্রণোদিত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁর রচনাবলীর প্রতি উৎসাহী করতে সক্ষম হন। এমনও দেখা যায় হিন্দু সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় নজরুলের লেখা ছাপার পাশাপাশি কোন্ কোন্ সংখ্যায় নজরুলের কোন্ কোন্ লেখা ছাপা হবে তার আগামবার্তাও দেয়া হতো। রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে এসে নজরুল নিজেকে স্বতন্ত্র ধারায় মেলে ধরলেন, বাঙালী মুসলমানদের আধুনিক বাংলা কবিতায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি “ইসলামী সংগীত” নামক একটি নতুন ধারা সংযোজন করেন। সাড়ে চার হাজার ইসলামী সংগীত রচয়িতা নজরুলের প্রথম গজল “আসে বসন্ত ফুলবনে” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। তিনি তাঁর রচনাবলীতে বিপুল আরবী-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, ফারসি কাব্যানুবাদে মাত্রা ও ছন্দকে বাংলায় অটুট রাখেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে বিদ্রোহী কবিতা, কারার ঐ লৌহ কপাট, কাণ্ডারী

হুশিয়ার, দুর্গম গিরি কান্তার মরু প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক কালজয়ী সংগীত তাকে যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মুকুট এনে দেয়। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট নজরুল সম্পাদিত "ধূমকেতু" প্রকাশিত হলে আশীর্বাদ বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেন-

আয় চলে আয় ধূমকেতু

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

সামাজিক অসঙ্গতি, ধর্মের নামে শোষণ, আমলাতন্ত্র ও শাসনযন্ত্রের পীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার কলম ছিল সোচ্চার। ঔপনিবেশিক শাসকদের মর্মমূলে আঘাত হানা অগ্নিঝরা "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাটি ছাপা হলে নজরুল গ্রেফতার হন এবং তাঁর যুগবাণী প্রবন্ধ বাজেয়াপ্ত হয়। কবি বন্দিদশায় জেলখানায় বসেও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। বিষয়টিকে ঘিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নজরুল জাতীয় সংবর্ধনা (কলিকাতা) ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯ সালে অভিমত রাখেন,

"কারাগারে আমরা অনেকেই যাই কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ। তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বে-রসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইতে ইচ্ছে হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারিনা। নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয়না। কবি নজরুল যে স্বপন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির।"[১১৯]

তিনি সমকালীন সমাজের নানা অনাচারের ব্যঙ্গাত্মক দৃশ্যপট চিত্রায়িত করেন যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে নিরন্ন মানুষের অভাবের যে চিত্র তিনি এঁকেছিলেন তা আজও মানুষকে সমানভাবে নাড়া দেয়।

নজরুল সমগ্র বাঙালী জাতির নিকট পরম আদরনীয়। তিনি অসংখ্য সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত। ১৯২৩ সালে কারামুক্তির পর, ১৯২৮ সালে রংপুরে, ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে তাকে সংবর্ধিত করা হয়। বিংশ শতকের বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিক খান মোহাম্মদ মইনউদ্দীন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রমুখ চিকিৎসাভাবে মৃত্যু পথযাত্রী নজরুলকে সমবেদনা জানাতে ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে নজরুল সাহায্য রজনীর আয়োজন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল কালাম সামসুদ্দীন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সওগাতে প্রকাশিত "কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রথমবারের মতো নজরুলকে "বাংলার জাতীয় কবি" এবং "যুগ প্রবর্তক" হিসেবে আখ্যা দেন। ১৯২৯ সালে কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে নজরুল সংবর্ধনা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৫ নভেম্বর এলবার্ট হলে মহাসমারোহে তাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায় "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক", ১৯৬০ সালে ভারত সরকার "পদ্মভূষণ"।

---

[১১৯] রফিকুল ইসলাম; *নজরুল জীবনী*, প্রচ্ছদ রবি সরদার; প্রকাশকঃ নজরুল ইন্সটিটিউট কবিভবন; প্রথম মুদ্রণঃ একুশে গ্রন্থমেলা; ২০১৩

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি (২৪শে মে, ১৯৭২) আবু সাঈদ চৌধুরী ধানমন্ডি কবিভবনে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন,

"আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আর বাংলাদেশের তরফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাংলাদেশে আগমন একটি ঐতিহাসিক ভাবনা। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।....... স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমরা নজরুলের কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।"[১২০]

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট, ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশে পদকে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালে ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তনে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। অত্র অনুষ্ঠানে কবির সমীপে সম্মানপত্র পেশ করেন তদানিন্তন উপাচার্য ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী, "দেশকালের জরা-শোক অবক্ষয় অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে প্রজ্জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যারা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তারাই মহৎ। তেমনি এক মহৎ প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।...... ব্রিটিশের রাজরোষ, কারাগার আপনাকে বন্দী করেছে। কিন্তু আপনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্জ্বলিত হয়েছেন সত্যের স্বপক্ষে।... বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনি একমাত্র কবি প্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন স্বচ্ছন্দ ও নির্দ্বন্দ্ব।..... আপনার কবিত্ব প্রতিভার প্রবল আবেগ বিচিত্র উৎসের শব্দাবলী ব্যঞ্জনায় হয়েছে পুষ্পিত। সংগীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্রধর্মী ও স্বতন্ত্র।....... আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার সাহসী অভিযাত্রী মানসের সৃষ্টি ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত। আপনার দু দশকের সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠুন।আজ আপনাকে সম্মান জানানোর সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি।"[১২১]

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নজরুলের কথামালা ধ্বনিত হয়েছে এভারে

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী।
শস্যশ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী॥
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন,
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও
মানি চাইনা মানি,
খোদা তোমার মেহেরবাণী॥

[১২০] আব্দুল মুকিত চৌধুরী, *'শেষ সালাম'* 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ
[১২১] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৫১৮-৫১৯

চক্ষু শীতলকারী ফুল, সুমিষ্ট ফল, পরম তৃপ্তিদায়ক জলধারা ও শস্যদায়িনী উর্বর মৃত্তিকা এ সবই আল্লাহ সুবহানাহু উয়া তা'লার সুন্দরতম সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। শুধু তাই নয়, পরওয়ারদিগার আপন মহিমা বলে তাঁর সকল বান্দাহকে নিঃশর্ত রহমতে নিয়ত ধন্য করে থাকেন।

খোদার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে,
পথ না ভুলি তাই ত দিলে,
পাক কোরআনের বাণী॥

কবি বিনম্রচিত্তে তাঁর মহান রবের মহানুভবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নিদর্শন ইহজাগতিক ও পারলৌকিক নৈতিক নান্দনিকজ্ঞানের পথপ্রদর্শক রসূল (সা:) ও পরিপূর্ণ নীতি জ্ঞানের অনবদ্য গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীমের কথা স্মরণ করে চমৎকৃত হয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাধভাঙ্গা আনন্দ প্রতিটি স্তরে ছুঁয়ে যাবার নান্দনিকতা তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন

"ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।"[১২২]

সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঐ দূর গগনে মিষ্টি হেসে এক খণ্ড চাঁদ উঁকি দিতেই আসমান ও জমিনবাসী একে অপরকে মুবারকবাদ জানাতে মুখরিত হয়। সেই সাথে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এ গানটির নান্দনিক সুরের মূর্ছনায় এক অনাবিল আনন্দের স্রোতের আবেশে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে বাঙালী মুসলিম সমাজ।

"তোর সোনা-দানা, বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ,
দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিঁদ
আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।"

একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ বিধান কল্পে যে দান-সাদাকা বা যাকাত আদায় হয়, তাই ধনী-গরিবের মাঝে এক আত্মিক (নান্দনিক) সেতুবন্ধনের ভিত রচনা করে। আবার একই কাতারে দাড়িয়ে সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে ঈদগাহ যেন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এক মধুর (নান্দনিক) মিলনস্থলে পরিণত হয়।

[১২২] গীতিকার: কাজী নজরুল ইসলাম] [শিল্পী: আব্দুল আলীম ]

“আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে,

তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।”

এক অনন্য উৎসবমুখর পরিবেশে আত্ম-সংযমের পর শিরনি-দাওয়াতে মহানন্দে মেতে ওঠে ধনী-গরিব, দোস্ত-দুশমন, ইয়াতীম-মিসকিন নির্বিশেষে, সকল বিভেদ ভুলে ক্ষমার দু'য়ার খুলে মুসলিম জাহান এক হয়ে যায় সৌহার্দ্যের পতাকা তলে।

ইসলামী সংগীত ও কাব্য সাহিত্যের জগতে এক জ্বলজ্বলে তারকা কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী এ গানের নান্দনিকতা ধ্বনিত হয়েছে লোক সংগীতের সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এবং তাঁর সহশিল্পীবৃন্দের আল্লাহ প্রদত্ত সুললিত কণ্ঠে।

**ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)**

চল্লিশের দশকের মুসলিম জাতিসত্তার শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদের কবিতা তৎকালীন বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের যেন এক দীপ্তিমান শিখা। প্রখর মেধা সম্পন্ন ফররুখ আহমদ ইংরেজি বিভাগে স্নাতক (সম্মান) অধ্যায়নকালে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অর্থাভাবে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষাগুরু কবি গোলাম মোস্তফা প্রাথমিক জীবনে কবিত্ব বিকাশে তাকে আন্তরিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ, অনাহার-ক্লিষ্টের করুণ পরিণতি, জরাগ্রস্ত বাস্তবতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা ও সমকালীন সংকট নিরসনে তিনি শক্ত হাতে কলম তুলে নেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর ভাষা বিতণ্ডা প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে কবি স্বক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৪৭ সালে মাসিক সওগাত পত্রিকার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায় ‘পাকিস্তানঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য’ নিবন্ধে লিখেন- “গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যারা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীদের সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।” তাঁর ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক "মধুর চেয়েও মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা" গান ও তদানীন্তন পাকিস্তান শাসকদের ব্যঙ্গ করে "রাজ-রাজরা" নামক নাটকটি সে সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী অভিনীত এ নাটকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চায়িত হয়। মুসলিম পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ এ কবির রচনাশৈলীতে ইসলামী আদর্শ ও আরব ইরানের ঐতিহ্যের পরিস্ফুটন ঘটেছে। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতার মাঝে "লাশ" কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অনন্যস্থান দখল করে আছে যা সুকান্ত ভট্টাচার্যের "আকাল" কবিতা সংকলনে প্রকাশ পায়।

জীবদ্দশায় কবি বাংলা একাডেমী (১৯৬০), প্রেসিডেন্ট পদক "প্রাইড অব পারফরমেন্স" (১৯৬৫), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৬), ও মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পদক (১৯৮০) লাভ করেন। মানবতাবাদী যে কবি সারাজীবন তাঁর কবিতায় অপরের দুঃখ দুর্দশার চিত্রায়ন করলেন সেই কবি নিজেই নিদারুণ কষ্টে পতিত হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে ১৯৭৫ সালে পরলোক গমন করেন।

“সাত সাগরের মাঝি” ফররুখ আহমদের এক বিস্ময়কর সৃজনকর্ম যার আবেদন সাহিত্য ভুবনে আজও এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন যে মুসলিম বিশ্ব আদর্শিক স্খলনের দরুণ পশ্চাৎপদ সেই স্বজাতিকে কবি পুনর্জাগরণের আহবান জানান।

"সাত সাগরের মাঝি" এর অন্তর্গত বিখ্যাত "পাঞ্জেরী" কবিতাটির সার কথা উদ্ধৃত হলো-

**পাঞ্জেরী কবিতার নান্দনিকতা**

**পাঞ্জেরি**

**ফররুখ আহমদ**

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান মেঘে?
সেতারা, হেলার এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শুন্যতা ঘেরি।
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
দীঘল রাতের শ্রান্তষফর শেষে
কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা
পড়েছি এসে?

রূপক অর্থের আলংকারিক শৈলীতে চিত্রায়িত কবিতাটির মমার্থ জাতীয় জীবনের দুর্যোগের আভাস এবং সংকট নিরসনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের অগ্রযাত্রার কাণ্ডারীকে প্রতীকী তাৎপর্য দেয়া হয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করনার্থে, মূলত ফররুখ আহমদ একটা দীর্ঘ দুর্যোগের অবসানের পর সোনালি দিনের সূচনার প্রয়াস পেয়েছেন তার চিন্তা ও চেতনায়। পথহারা পথিককে অতীত ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন একই সাথে মাজলুমদের করেছেন অধিকার সচেতন। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষমাণ জাতির আকুলতার যে বহিঃপ্রকাশ  ঘটেছে তা নিজের অনুভূতির সংমিশ্রণে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে সৌন্দর্যের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে নিম্নোক্ত সংগীতে-

“দুনিয়া সুন্দর, মানুষ সুন্দর
আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর
সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা
জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ।”

বিশ্ব জাহানের বাদশাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের সামগ্রিক কল্যাণার্থে প্রতিটি বিষয়কে এতে কার্যকর গুণাগুণসম্পন্ন ও মনোমুগ্ধকর করে সৃজন করেছেন যেন একে অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে সৌন্দর্য প্রকাশ করে। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তায়া'লার অসীম সৌন্দর্য বিষয়ে বান্দাহ ক্ষুধাতুর হৃদয় জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল।

ঝর্ণা ছুটে চলে একেবেকে
পৃথিবীর পটে কত ছবি এঁকে
নদীরও কলতানে
সাগরের গর্জনে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেয় পাল্লা।
বাগানে ফুটে ফুল রাশি রাশি
রাতেরই তাঁরা ভরা চাঁদের হাসি
গুন গুন গানে ডেকে
মৌমাছি মধু চাকে
ফুলে ফুলে করে হল্লা॥
দখিনা বাতাস গায়ে পরশ বুলিয়ে
তার টানে পাল তুলে নৌকা চলে
তোমারি নামে মনে
ভাটিয়ালি সুরের তানে
দাড় টেনে যায় মাঝি মাল্লা॥”[১২৩]

ঝর্ণার বয়ে চলা, নদীর কলতান, সমুদ্রের গর্জন, বাগানে ফুলের সমাহার, নক্ষত্রখচিত আকাশ, চাঁদের রূপছটা, মৌমাছির গুঞ্জন, দখিনা সমীরণ, নৌকার পাল তুলে বেয়ে চলা, মহান রবের নাম নিয়ে মাঝির দাড়টানা- সবই বিশ্ব অধিপতির সৃষ্টির অপরূপ নিদর্শন যা শিশু শিল্পীর নান্দনিক গায়কি ঠাঁই পেয়েছে হৃদয়ের মণিকোঁঠায়।

“কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি
কে দিয়েছেন ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতী॥
বিশ্ব নিখিল কোন মহানের ক্ষমতার অধীন??॥

১২৩ শিশুশিল্পী, কলরব শিল্পগোষ্ঠী

রব্বুল আ'লামিন, তিনি যে রব্বুল আ'লামিন॥

উক্ত সংগীতে শিশুশিল্পীবৃন্দ প্রশ্নমালার আকুলতায় মহান রবের নেয়ামতরাজির নান্দনিকতা ব্যক্ত করেছেন।

"কে দিয়েছেন সাগরনদী ভরা এতো জল?

কার ইশারায় অনন্তকাল পাহাড় অবিচল?॥

কার ছোঁয়াতে ফুলকলিরা সুরভি ছড়ায়?

মিষ্টি সুরে বুলবুলিরা কার মহিমা গায়?

কে ঢেলেছেন মায়ের কোলে শান্তি সীমাহীন?"

মহান রব্বুল আলামীন প্রতিনিয়ত তাঁর অজস্র রহমতের বারিধারায় আমাদের সিক্ত করে চলেছেন। পরকালে বেহেশত যেরূপ চির সুখ ও শান্তির অনন্ত ভান্ডার, ইহকালে মায়ের সান্নিধ্যের কোমল পরশও অনুরূপ নিরাপদ ও চির প্রশান্তির আকর।

কে দিয়েছেন মুখের ভাষা, কণ্ঠ ভরা সুর....?

জ্ঞানের আলোয় কে করেছেন অজ্ঞতা বিদূর...?॥

কে পাঠালেন পথ দেখাতে নবীয়ে রহমাত...?

কার করুণায় আমরা পেলাম ঈমানী দৌলত...?

কে দিয়েছেন জীবন বিধান কুরআনুল কারীম...?॥

সর্বোত্তম নান্দনিক ভাষাশৈলী, অন্ধকার দূরীভূত এবং ঈমানী জ্যোতি এ সমুদয় নান্দনিকতার আধার আরশের মহান অধিপতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নবীকুলের শিরোমণি মুহাম্মাদ মোস্তফা (স) এবং তাঁরই উপর নাযিলকৃত ঐশীগ্রন্থ কুরআনুল কারীমকে মহান রব সুশোভিত করেছেন মানবজাতির মুক্তির দিশারীরূপে।

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সংগীত ও ইসলাম**

সংগীত মানব হৃদয়ের আবেগ অনুভূতির প্রকাশের এক তারবিহীন সঞ্চালন প্রক্রিয়া। স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবন ও তাঁর সৃষ্টিলোকের সৌন্দর্যান্বেষণের সঞ্জীবনী শক্তি হলো ইসলামী সঙ্গীত। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার আত্মিক সেতুবন্ধনের লক্ষ্যে বার বার তাঁর স্তুতি ও সর্বশ্রেষ্ঠ নি'য়ামত কুরআন আবৃত্তির নির্দেশ এরুপ-

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ও রহমাতের দোয়া করেন- অন্ধকার থেকে তোমাদের আলোতে আনার জন্য। আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।"[১২৪]

[১২৪] সূরা আল আহযাব (৪১-৪৩)

কুরআনের আয়াত পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতের ফলে বান্দাহর অন্তরে এক ধরণের আধ্যাত্মিক সুরব্যঞ্জনা জাগ্রত হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য- ইসহাক আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১২৫]

আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ) কে যে মধুময় (নান্দনিক) কণ্ঠস্বর দিয়েছেন তা যে কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠস্বরকে হার মানায়।

সূফী সাধকগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভে যিকর বা সঙ্গীতের চর্চা করে থাকেন। সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনে সূফীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সূফী দার্শনিক হাসান আল বসরীর ধ্যান ধারণা এমন-

"আল্লাহর প্রতি আনুগত্য সৃষ্টিতে গান বা সঙ্গীত সহায়ক। এর মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে আল্লাহর ভালোবাসার অনুভূতি দৃঢ় হয়, যদি ঐ সঙ্গীতের ভাবধারা তৌহিদ ভিত্তিক হয়।"[১২৬]

আবহমান কাল ধরে উচ্চস্বরের বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীলবাক্য বিনিময়ে সমাজ সভ্যতা যে সঙ্গীত লালন করে আসছে তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কুরআনে এ জাতীয় সংগীতকে শয়তানের আওয়াজের সাথে তুলনা দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। "এদের মধ্যে যাকেই পারো তুমি তোমার আওয়াজ দিয়ে গোমরাহ করে দাও, তোমার যাবতীয় অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী নিয়ে তাদের উপর চড়াও হও, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তুমি তাদের সাথে সাথী হয়ে যাও এবং (যত পার) তাদের (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দিতে থাকো; আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।"[১২৭]

উক্ত আয়াতে বিশিষ্ট সাহাবীগণ 'শয়তানের আওয়াজ'কে গানের আওয়াজ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ

"It is related that some of the commentators from the generation of the tabieen, such as Mujahhid and AD-Dahhak, interpreted Satan's exiting mankind with his voice to mean throught the use sound of music, song and amusement."[১২৮]

অশিষ্ট সংগীত মানুষকে স্রষ্টার স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়। আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতটি আমাদের সামনে তাই ব্যক্ত করেঃ

"এগুলো কি (তাহলে) সেসব বিষয় যার ব্যাপারে তোমরা (আজ) হাসাহাসি করছ, অথচ (পরিণামের কথা ভেবে) তোমরা মোটেই কাঁদছো না। মনে হয় তোমরা সবাই উদাসীন হয়ে রয়েছো।"[১২৯]

উক্ত আয়াতে 'উদাসীন' শব্দের আরবী সামিদুন। সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে ইবন্ কাছীরে 'সামিদুন' শব্দের ব্যাখ্যায় দেখানো হয়েছে- "হযরত ইবন্ আব্বাস (রা.) বলেন, সামাদুন ইয়ামানী শব্দ। ইহার অর্থ হইল গান

---

[১২৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ* ৭০১৯, অধ্যায়ঃ জাহমিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওওহীদ প্রসঙ্গ, অনুচ্ছেদঃ ৩১৪৬, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬২১, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭

[১২৬] ইবনে আবদ রাব্বিহিঃ *ইকদ আল ফরিদ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৯

[১২৭] আল-কুরআন ১৭: ৬৪

[১২৮] Abu Bilal Mustafa al-kanadi; *Islamic Ruling on music and singing,* Bangladesh Islamic Centre, 230 New Elephant Road, Dhaka-1205

[১২৯] আল-কুরআন ৫৩: ৫৯-৬১

বাদ্য। আয়াতের অর্থ তোমরা তো গান বাদ্যে লিপ্ত। ইকারিমা (রা.) ও এইরুপ মত পোষণ করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত ইবন্ আব্বাস (রা.) বলেন سمدون অর্থ معرضون অর্থাৎ বিমুখ। মুজাহিদ ও ইকরিমা (রহ.) এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাসান (রহ.) বলেন, سمدونঅর্থ غافلون অর্থাৎ উদাসীন। আলী (রা.) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবন্ আব্বাস (রা.) হইতে আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, লন سمدون অর্থ تستكبرون অর্থাৎ তোমরা দাম্ভিক অহংকারী।"[১৩০]
অথচ নির্মম সত্য এই যে ইসলামী চেতনাবোধের নৈতিক আদর্শিক বলয়ের বাইরে এসে মুসলমানসহ পুরো বিশ্ব এ জাতীয় সঙ্গীত সাধনায় ই আজ বিভোর। পুণ্যের পথ ভুলে (ইসলামের মর্মবাণী) পঙ্কিলতায় মুহ্যমান এ জাতির প্রতি কুরআনুল কারীমের হুশিয়ারী এরুপ-

"আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য কেউ কেউ অসার বাক্য (গান বাজনা) ক্রয় করে এবং এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"[১৩১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আচার অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য দফ (মৃদু স্বর বিশিষ্ট এক মুখা ঢোল) বাজানো ও সরল আমোদ করা মোবাহ কাজ হিসেবে গন্য।

মুসাদ্দাদ (রহ.)..... হযরত রুবাই বিনত মুআব্বিয ইবন্ আফসা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী (সা.) এলেন এবং আমার চাদরের উপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের বাচ্চা মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ চাচাদের শোকগাথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ কথা বলে ফেললেন যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ কথা বলা ছেড়ে দাও এবং পূর্বে যা বলেছিলে, তাই বল।"[১৩২]

হযরত ইবনু আব্বাস (রহ.) বলেন, "বিবি আয়িশা তাঁর এক আনসারী আত্মীয়া মেয়েকে বিবাহ দিলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা.) আসলেন এবং বললেন, "মেয়েটাকে কি স্বামীর সাথে পাঠিয়েছ। লোকেরা বলল 'হ্যাঁ'। হুজুর বললেন, গান করতে পারে এমন কাউকেও তার সহিত পাঠিয়েছ কি? আয়িশা বললেন, না। তখন রসুলুল্লাহ (সা.) বললেন আনসারীরা এমন সম্প্রদায় যাদের মধ্যে গানের ঝোক রয়েছে। যদি তার সাথে এরূপ লোক পাঠাতে (ভাল হতো) যে গাইতঃ তোমাদের নিকট আমরা এসেছি। আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন এবং আমাদেরও দীর্ঘজীবী করুন।"[১৩৩]

অনাদিকাল ধরে আল্লাহ প্রেমীরা তাঁর রাজিখুশির জন্য আল্লাহর সত্ত্বা, গুণাবলী, কুরআনের আয়াত, নবী-রসূলগণের জীবনদর্শন নিয়ে সংগীত সাধনা করে আসছেন। তবে নৈতিক চরিত্রের স্খলন ঘটায় যেমন মদ-জুয়া ও নারীর প্রতি আসক্তির জন্ম দেয় এ সমস্ত বিষয় নিয়ে সংগীত চর্চা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। যে সংগীত মালা যাবতীয় অশ্লীলতামুক্ত এবং যা মানব সমাজকে আলোর পথের সন্ধান দেয় এমন সংগীত পরিবেশনে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ

[১৩০] হাফিয আল্লামা ইমানুদ্দীন ইবন্ কাছীর (র.), *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, অনুবাদকঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, খন্ডঃ পৃষ্ঠা: ৫৪৮

[১৩১] আল-কুরআন ৩১: ৬

[১৩২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.); *বুখারী শরীফ*-৫৭৭৪ অধ্যায়- বিয়ে শাদী, অনুচ্ছেদঃ বিবাহ অন্যষ্ঠানে এবং বিবাহ ভোজে দফ বাজানো; ২৬৯৪, খণ্ডঃআট, পৃষ্ঠা ৪৩৬, প্রাগুক্ত।

[১৩৩] মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (র.); *মেশকাত শরীফ*-৩০২১;, ১৫৪, প্রথম প্রকাশঃ ৭ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং, এমদাদিয়া প্রেস, ৫, গিরদে উর্দু রোড ঢাকা ১১ হতে এম এ হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত, খণ্ডঃ ষষ্ঠ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিবাহের বিজ্ঞপ্তি, গান, খোতবা, শর্ত ও মোতা বিবাহ, পৃষ্ঠাঃ ২২৬

করেছে। এ কথা উজ্জ্বল সত্য যে, উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ইসলাম অননুমোদিত। তবে দফ ব্যবহারে ইসলামে এক ধরণের মৌন সম্মতি রয়েছে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## ইসলামে শিক্ষার নৈতিক-নান্দনিক ধারাপাত

মহান রব্বুল আলামীন আপন মহিমা বলে সৃষ্টিগতভাবেই মানুষকে সবচেয়ে বড় নিয়ামাত বিপুল প্রতিভা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ প্রতিভাকে যতই কাজে লাগানো যায়, ততই তা শাণিত হয়। আর উত্তম শিক্ষাই এটি বিকাশের অন্যতম সোপান, শিক্ষাই পারে মানুষকে হক বাতিল, আলো-অন্ধকার, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে। শিক্ষা দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সহায়তা করে। মানুষ আমৃত্যু নানা প্রক্রিয়ায় দেখে দেখে, শুনে শুনে ও অনুভবের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করে থাকে।
পবিত্র কোরআনে নাযিলকৃত প্রথম পাঁচটি আয়াতই শিক্ষা সংক্রান্ত।
"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[১৩৪]
উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত ছাড়াও কোরআন মাজিদে অসংখ্যবার শিক্ষার আবশ্যকতা ব্যক্ত হয়েছে। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে নবী! বলুন, যারা মূর্খ ও যারা বিদ্বান তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[১৩৫]
এ থেকেই পরিষ্কার অনুধাবন করা যায় যে, ইসলামে শিক্ষার মাহাত্ম্য কতটা উর্ধ্বে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অসংখ্য বার শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার একটি মহৎ উদ্দেশ্য হলো নান্দনিক পথ নির্দেশনায় ব্যক্তির নৈতিক গুণাবলীকে প্রস্ফুটিতকরণ। একমাত্র ইসলামী নন্দনবোধ সম্বলিত শিক্ষাই ব্যক্তির মাঝে নৈতিকতার বীজ অঙ্কুরিত করে সেটিকে শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্লবে সুশোভিত করে তোলে। নৈতিকতা ও নান্দনিকতা সমন্বিত শিক্ষার পরশেই অন্ধকারে নিমজ্জিত কোন জাতি নতুন দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।
নৈতিকতাবোধ ও শিল্পরুচিসম্মত জ্ঞানের উপস্থিতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যক্তিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে নিশ্চিত আলোর পথ দেখায়। ফলশ্রুতিতে মানুষ তার জীবন প্রণালীতে সৎ তাকওয়াবান, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজে নৈতিক শিক্ষার সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব অপরাধ প্রবণতাকে দিন দিন এতটাই বাড়িয়ে তুলেছে, যার কালো ছায়ায় নৈতিকতা আজ বিলুপ্তপ্রায়। তারই করাল গ্রাসে

[১৩৪] আল-কুরআন ৯৬: ১-৫
[১৩৫] আল-কুরআন ৩৯: ৯

পিতামাতা পাচ্ছেনা তাঁদের যথাযথ মর্যাদা, সন্তান পাচ্ছে না নৈতিক পরিচর্যা, শিক্ষক পাচ্ছেনা তাঁর প্রাপ্য সম্মান এবং ছাত্র পাচ্ছে না সঠিক দিক নির্দেশনা। এভাবে খুঁজতে গেলে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশিক্ষার নেতিবাচক প্রভাবের করুণ চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এমতাবস্থায় একটি সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ইসলামকে নিছক ধর্ম হিসেবে না নিয়ে, তার নৈতিক শিক্ষার নির্যাসটুকু গ্রহণের আবশ্যকতা আজ চরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতা সমন্বিত শিক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি হিসেবে মুসলিম দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, রসায়নবিদ, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদ, সুস্থ রাজনীতিবিদ, নীতিবান শাসক ও বিচারক, যোগ্য সেনাপ্রধান, প্রকৌশলী ও বৈমানিক, রাষ্ট্রদূত, নিষ্ঠাবান সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী গড়ে তোলা সম্ভব।

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ শিক্ষার স্বরূপ**

মানব জীবনকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষা এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যার পরিব্যাপ্তি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। মূলত ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক সর্বোপরি নান্দনিক গুণাবলী পরিস্ফুটনের প্রধান নিয়ামক শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে নৈতিক-নান্দনিক স্রোতধারায় সিক্ত করতঃ সুমহান আদর্শে এমনভাবে উজ্জীবিত করে যেন সে পরিবার থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত সংযম ও ত্যাগের সর্বোচ্চ স্ফুরণ ঘটাতে পারে। সুশিক্ষার সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বত্র নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষার সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যাপৃত থাকে। নিম্নে শিক্ষার পরিচিতি আলোকপাত করা হল।

**আভিধানিকঃ**

পবিত্র কুরআন হাদীস ও আরবী ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হিসেবে পাঁচটি পরিভাষা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হল-

- (তা'লীম)
- (তারবিয়্যা)
- (তা'দীব)
- (তাদরীব)
- (তাদরীস)

(তা'লীম) শব্দটি আরবী (ইলম) থেকে উদ্ভূত। এর মানে শিক্ষা দান। Teaching, Training, Schooling Education.[১৩৬]

---

১৩৬ মু'জামুল লুগাতুল আরবিয়াতুল মু'আসিরাহ, By J.Milton Cowan.

(তারবিয়্যাহ) শব্দটি আরবী (রব্বু) থেকে নির্গত, মানে লালন-পালন করা। To grow up, to raise, Bring up, to teach, instruct, to develop.

(তা'দীব) শব্দটি গঠিত (আদব) শব্দ থেকে। 'আদব' অর্থ শিষ্টাচার, Culture, Good Manners, Decorum. তা'দীব দিয়ে Discipline ও বুঝায়।[১৩৭]

(তাদরীব) অর্থ শিক্ষাদান, Habitation, Practice, Coaching, Tutoring.[১৩৮]

(তাদরীস) শব্দটি এসেছে (দারস) শব্দ থেকে। তাদরীস মানে- পড়া, জানা, To Study, to learn, to teach, tution.[১৩৯]

আভিধানিক অর্থ থেকে পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ভাব ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন-পাঠন, শিক্ষাদান ও পাঠদানের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

Education শব্দটি ল্যাটিন ēducātiō থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ A breeding, a bringing up, a rearing.

Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হল: শিক্ষাদান ও প্রতিপালন।

শিক্ষা দেওয়া মানে

To bring up and instruct, to teach, to train. অর্থাৎ, প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো।[১৪০]

Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' এবং 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে 'তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকশিতকরণ।'[১৪১]

A.M Chowdhury-র মতে, "Education denotes the realization of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge."[১৪২]

---

[১৩৭] প্রাগুক্ত

[১৩৮] প্রাগুক্ত

[১৩৯] প্রাগুক্ত

[১৪০] *Samsad English-Bengali. Dictonary,* Calcutta 22nd pression, September 1990.

[১৪১] Joseph T. Shiply; *Dictonary of word origins*.

[১৪২] A'M Chowdhury; *Education in Islamic Society*

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আজহার আলীর মতে, Education শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক।[১৪৩]

**পারিভাষিক:**

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর (র) মতে, "জ্ঞান হচ্ছে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথার্থভাবে জানা।"[১৪৪]

প্রখ্যাত কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "মানুষের খুদির বা রূহের উন্নয়নই আসল শিক্ষা।"[১৪৫]

বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মতে, "It developes in the body and soul at the pupil and the beauty and all the perfection he is capable of."[১৪৬]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটলের মতে, "শিক্ষা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পরম কল্যাণ, সৌন্দর্য ও সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।"[১৪৭]

Edwyn Bevan বলেন, "মূলত অবস্থা ও ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধ অধ্যয়নই হচ্ছে শিক্ষা।"[১৪৮]

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন- "শিক্ষা হলো অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোর প্রকাশ।"[১৪৯]

"ইসলামী শিক্ষা হল ব্যক্তিক ও সামষ্টিক ব্যবস্থা যা ইসলামকে গ্রহণ এবং তা থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠি জীবনে প্রয়োগের দিকে নিয়ে যায়। অন্য কথায়, তা হলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের লক্ষ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মানুষের চেতনার উন্নয়ন এবং তার আবেগ ও আচরণকে দ্বীনে ইসলামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।"[১৫০]

"শিক্ষা হলো ইসলামী ব্যক্তিত্বের চৈন্তিক, শারীরিক ও সামাজিক সকল দিকের উন্নয়ন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের লক্ষ বাস্তবায়নে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী তার আচরণকে সুন্দর করা।"[১৫১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।"[১৫২]

জন মিল্টনের মতে, "Education is the harmonius development of mind, body and soul."[১৫৩]

A.N. whitehead-র মতে, "Education is the acquisition of the art of the utilization of knowledge."[১৫৪]

---

১৪৩ মোহাম্মদ আজহার আলী: *পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগঠন*, বাংলা একাডেমী- ১৯৮২

১৪৪ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম: *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি* , খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, আগস্ট, ২০১২ ঈসায়ী, পৃ. ১২৬

১৪৫ আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি*, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, নভেম্বর, ১৯৯৭ ঈসায়ী, পৃ. ৭২৫

১৪৬ আবদুস শহীদ নাসিম, পৃ. ৭১, প্রাগুক্ত

১৪৭ আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত

১৪৮ Edwyn Bevan: *Symbolism of belief*, 1938

১৪৯

১৫০ আব্দুর রহমান নিহলাওয়ী, *উসূলুত তারবিয়্যাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২৭

১৫১ শাইখ আমিন মুহম্মদ আউস, *আসালিবুত তারবিয়া ওয়াত তালীম ফিল ইসলাম*, পৃ. ৩৪

১৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *মানবধর্ম*

১৫৩

১৫৪ A.N. Whitehead, *The aim of Education and other Essay*

**শিক্ষার উদ্দেশ্য**

নৈতিক আচরণ, আত্মপরিচয়, দায়িত্বানুভূতি ও সার্বিক সৌন্দর্য বিকাশে উন্নতি সাধনই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির আপন সত্তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সাবর্জনীন শিক্ষার এমন এক সামাজিক কর্ম পদ্ধতি, যা একটি সমাজকে স্বীয় অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ও বিকশমানতাকে গতিশীল করে।

"ইসলামের আনীত আকীদা, মূল্যবোধ ও শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে সর্বাঙ্গীনভাবে একজন মুসলিমকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৫৫]

বিখ্যাত ইসলামি স্কলার আল্লামা ইকবালের মতে, "পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৫৬]

প্লেটোর মতে, "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।"[১৫৭]

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।"[১৫৮]

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেছেন, "শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ।"[১৫৯]

শিক্ষাবিদ জন লকের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্তকরণ।"[১৬০]

হার্বাট স্পেন্সার বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের কাঙ্ক্ষিত প্রকাশ।"[১৬১]

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফ্লোয়েবেল এর মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি।[১৬২]

কমেনিয়াসের মতে, "শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর মানুষের শেষ লক্ষ হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ।"[১৬৩]

পার্কার বলেছেন, "পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্য যেসব গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন।"[১৬৪]

জীন জ্যাক রুশোর মতে, "সু অভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৬৫]

---

[১৫৫] মিকদাদ ইয়ানজি, পৃ. ২০
[১৫৬] আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি*, পৃ. ৭২
[১৫৭] আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি*, পৃ. ৭১
[১৫৮] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৫৯] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৬০] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৬১] আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি*, পৃ. ৭২, প্রাগুক্ত।
[১৬২] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৬৩] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৬৪] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত।
[১৬৫] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত

Bartrand Russel এর মন্তব্য হল, "The education system we must aim at producing in the future is one which gives every boy and girl an opportunity for the best that exists."[166]

স্যার পার্সীনান বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, চরিত্র গঠন পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা।"[১৬৭]

ড. হাসান জামান বলেছেন, "প্রত্যয় দীপ্ত মহৎ জীবন সাধনায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৬৮]

ড. খুরশীদ আহমদের মতে, "স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৬৯]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে শিক্ষার মোট ৩০টি লক্ষ ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলোঃ

- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীর মনে কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশত্ববোধ ও জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা। শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

[১৬৬] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত
[১৬৭] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত
[১৬৮] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত
[১৬৯] আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত

- বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।
- সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহিত করা।
- পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

**শিক্ষার লক্ষ**

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতক্রমে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। এর অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষা দানের লক্ষ থাকবেঃ

ক) শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ।

খ) মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

গ) শিশুর পিতা-মাতা ও তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্ত্বা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

ঘ) সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা নারী পুরুষের সমধিকার এবং সকল মানুষ নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি।

ঙ) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

বিশ্বের প্রথিতযশা রাষ্ট্রনায়কদের মাঝেও নিজ সন্তানদের নৈতিকতা ও নান্দনিকতাপূর্ণ জীবনমুখী শিক্ষাধারায় অবগাহনের আকুতি দেখতে পাই।

উদাহারণস্বরূপ, আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক পুত্রের প্রধান শিক্ষকের নিকট লিখিত ঐতিহাসিক চিঠির মূল বার্তা উপস্থাপিত হলো

শিশুর প্রধান শিক্ষালয় পরিবার হলেও জীবন গড়ার কারিগর হিসেবে দীক্ষা গুরুর ভূমিকা সর্বাগ্রে। এ সত্য উপলব্ধি করে আব্রাহাম লিংকন তার সন্তানকে চিঠিসহ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করলেন। দিক নির্দেশনামূলক এ চিঠিতে লিংকন বোঝাতে চেয়েছেন সকলকেই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে, পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আসলে সব মানুষ সত্যনিষ্ঠ নয়। আমরা অনুমান নির্ভর হয়ে মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা করে বসি অথচ সে সকল মানুষের মাঝেও লুকায়িত থাকতে পারে মহত্তর গুণ। একটি ইংরেজি প্রবাদ- “Failure

is the pillar of success" এর সাথে আব্রাহাম লিংকনের ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। আবার বিজয় উল্লাসকালীন আত্মসংবরণের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে এ চিঠিতে। অপরের কথায় তাড়িত না হয়ে সরল সঠিক পথে অটল থাকতে সে যেন নিজের প্রতি আস্থাশীল থাকে। দুনিয়াতে ভাল ও মন্দ দুই-ই বিরাজমান, এর মাঝ থেকে বিবেক খাটিয়ে সে যেন এর নির্যাস টুকু গ্রহণ করতে পারে। এমনকি দু:খে অতি কাতরতা প্রকাশ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, সেই সাথে কান্না যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এতে কোনরূপ হীনমন্যতা যেন তার মাঝে কাজ না করে সে ভাষ্যটি চিঠিতে প্রতিফলিত হয়েছে। উত্তম দিক নির্দেশনামূলক জ্ঞানগর্ভ এ পত্রের শেষান্তে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহসিকতা ও ধৈর্যের সমন্বয় সাধনের আবশ্যকতা প্রতিভাত হয়েছে।

নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে অজানাকে জানা এবং সেটিকে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন একমাত্র মানুষকেই দিয়েছেন। তাই পৃথিবীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের উপর অর্পণ করেছেন। (রহ.)

শিক্ষা মূলত দুইটি ধারায় প্রবহমানঃ জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনী শিক্ষা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নি'য়ামত ইলম বা জ্ঞান। এ মর্মে কুরআনুল কারীমের বাণী- "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আলাহ্ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন বহুগুণ।"[১৭০]

দ্বীনী ইসলাম হাসিলের শর্ত হলো ইখলাস। বস্তুত দ্বীনী কাজকে পরিপূর্ণতা দিতে জাগতিক শিক্ষা প্রয়োজন। তবে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে প্রতিটি বিষয় ইসলামের বিধান মাফিক সম্পাদনে দ্বীনী শিক্ষার বিকল্প নেই। আর এ দ্বীনী ইলমের অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে বান্দাহর অন্তরে নৈতিক নান্দনিক বোধ জাগ্রতসহ ঈমান আমল ও আখিরাত মুখীতার সৃষ্টি হয়। কাজেই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলম চর্চা ও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য। বাস্তবতা এই যে, কোন একজন ব্যক্তি একই সাথে সব ধরণের জ্ঞান আহরণ বা পারদর্শিতা লাভে সক্ষম নন। তাই ইসলামের ভাষ্য এই যে, প্রয়োজন অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি সবিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করবে এবং তাকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলেই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

পেশা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র স্বত্ত্বেও যে বিষয়টি সবাইকে মেলবন্ধনে আবদ্ধ করবে তাহলো ঈমান ও ইসলাম। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও সবার বিশ্বাস ও আদর্শ হবে অভিন্ন। আর এই আদর্শিক চেতনার ভিত্তিতে সকল মুসলিম যেন একই সূত্রে গাঁথা। একসময় মুসলিম জাতি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন। মুসলিম সমাজের সেই গৌরবময় অতীত ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে জীবনের সুশিক্ষার সংস্পর্শে এসে নৈতিক-নান্দনিক মূল্যবোধের আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন ও হাদীসের আলোকে জ্ঞানান্বেষণ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন। যে জ্ঞানের সাহায্যে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, মানুষের স্বীয় আত্মা ও মহান স্রষ্টাকে জানতে ও চিনতে পারা যায় তাই কোরআন ও হাদীস নির্দেশিত শিক্ষা। বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ বা নিয়ামত হলো, আল কুরআন ও

[১৭০] আল-কুরআন ৫৮: ১১

রাসূল (সা.) এর শেখানো হাদীস, যাতে স্পষ্টত লিপিবদ্ধ আছে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যার নৈতিক ও এক অতি নান্দনিক সমাধান। সূর্য কিরণ যেমন প্রকৃতিতে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে নতুন দিনের সন্ধান দেয়, তদ্রুপ কোরআন ও হাদীসলব্ধ জ্ঞানও বান্দাকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির দিশারী তথা প্রকৃত আলিম হতে সহায়তা করে। ইসলামে এ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ইবাদতের সাথে তুলনা করে সকল বান্দাকে কুরআন সুন্নাহর মর্মবাণী উপলব্ধি করতঃ নৈতিক নান্দনিক জ্ঞানান্বেষণের জোর তাগিদ দিয়েছেন।

একালের মানুষের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল যে কুরআন ও সুন্নাহ নিতান্তই সংকীর্ণ ধর্মীয় শিক্ষার বাহনমাত্র, তা পড়লে মোল্লা হওয়া যায়, বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। অথচ কুরআন প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ ও অনুধাবনের খোলাখুলি নির্দেশ দিয়েছে। এর স্বপক্ষে দার্শনিক Oliver Leaman তাঁর The Qur'an: An encyclopedia বইয়ে যথার্থই বলেছেন-

"The Qur'an exhorts Muslims to study nature and investigate the truth."

কাজেই কোরআনকে যদি নির্ভুল ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে শেখানো হয় তাহলে লব্ধজ্ঞানের বদৌলতে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানী তৈরী হতে পারে।

এখানে শিক্ষা সংক্রান্ত মানব মুক্তির মহা সনদ আল- কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস সন্নিবেশিত হল।

**সকল জ্ঞানের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা:**

- "সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা।"[১৭১]
- "আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।"[১৭২]
- "আর আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[১৭৩]
- "তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি দয়াময় করুণাধার।"[১৭৪]
- "তারা কি জানেনা, আল্লাহ তাদের গোপন কথা, গোপন শলাপরামর্শ সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।"[১৭৫]

**জ্ঞান অনুসন্ধানে মহান আল্লাহর তাগিদ:**

- "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৭৬]
- "তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"[১৭৭]

---

[১৭১] আল-কুরআন ৪৬: ২৩
[১৭২] আল-কুরআন ২৪: ৫৮-৫৯
[১৭৩] আল-কুরআন ৬৫: ১২
[১৭৪] আল-কুরআন ৫৯: ২২
[১৭৫] আল-কুরআন ৯: ৭৮
[১৭৬] আল-কুরআন ৯৬: ১
[১৭৭] আল-কুরআন ১৬: ৪৩

- "যতোটা কুরআন সহজে পাঠ করতে পারো, পাঠ করো।"[১৭৮]
- যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে।"[১৭৯]
- "এবং তোমরা যেন বছর ও মাসের হিসাব জানতে পারো।"[১৮০]
- "আল-কুরআন পাঠ করো তারতীবের সাথে।"[১৮১]

**জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা:**

- "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।"[১৮২]
- "আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন। কারণ তাকে অঢেল মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।"[১৮৩]
- "ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানে না, এই উভয় ধরণের লোক কি সমান হতে পারে?"[১৮৪]
- "জ্ঞানের অধিকারী লোকদের অন্তরে তো এগুলো উজ্জ্বল নিদর্শন।"[১৮৫]
- "আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাকে ভয় করে।"[১৮৬]
- "কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বলল, তোমাদের অবস্থার জন্য দুঃখ হয়। যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তার জন্য তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।"[১৮৭]
- "এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকরাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"[১৮৮]
- "বিস্তর জ্ঞান ছিলো এমন এক ব্যক্তি বললো, আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই ওটি এনে দিচ্ছি।"[১৮৯]

**আল্লাহই সকল জ্ঞানের দিশারী:**

- "পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।"[১৯০]

---

[১৭৮] আল-কুরআন ৭৩: ২০
[১৭৯] আল-কুরআন ২৭: ৯৮
[১৮০] আল-কুরআন ১৭: ৪৩
[১৮১] আল-কুরআন ৭৩: ৪
[১৮২] আল-কুরআন ৭৩: ১১
[১৮৩] আল-কুরআন ২: ২৪৭
[১৮৪] আল-কুরআন ৩৯: ৯
[১৮৫] আল-কুরআন ২৯: ৪৯
[১৮৬] আল-কুরআন ৩৫: ২৮
[১৮৭] আল-কুরআন ২৮: ৮০
[১৮৮] আল-কুরআন ৩: ১৮
[১৮৯] আল-কুরআন ২৭: ৪০
[১৯০] আল-কুরআন ৯৬: ৩-৫

- "আল্লাহ তোমার প্রতি আল-কিতাব এবং হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন আর তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিখিয়েছেন।"[১৯১]
- "নিঃসন্দেহে সে আমার দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিলো।"[১৯২]
- "দয়াময় মেহেরবান আল্লাহই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।"[১৯৩]
- "আর আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।"[১৯৪]
- "তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"[১৯৫]
- "আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন।"[১৯৬]

**নবী রসূলগণের আগমন হয়েছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য**

"অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদাইআত [অর্থাৎ নবী ও কিতাব] আসবে তখন যারা আমার নবী ও কিতাবকে অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ বেদনা থাকবে না।"[১৯৭]

"যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়। তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে। তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জানো না সেগুলো তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়।"[১৯৮]

"এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যেনো বিরতি দিয়ে দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর আমি এটা পর্যায়ক্রমে নাজিল করেছি।"[১৯৯]

**শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি**

- "তোমার প্রভুর নামে পাঠ আরম্ভ করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[২০০]
- "যখন কুরআন পঠিত হবে তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নীরবতা অবলম্বন করবে। সম্ভবত এতে করে তোমরা রহমত লাভ করবে।"[২০১]

---

[১৯১] আল-কুরআন ৪: ১১৩
[১৯২] আল-কুরআন ১২: ৬৮
[১৯৩] আল-কুরআন ৫৫: ১-৩
[১৯৪] আল-কুরআন ১৮: ৬৫
[১৯৫] আল-কুরআন ১৭: ৮৫
[১৯৬] আল-কুরআন ২: ৩১
[১৯৭] আল-কুরআন ২: ৩৮
[১৯৮] আল-কুরআন ২: ১৫১
[১৯৯] আল-কুরআন ১৭: ১০৬
[২০০] আল-কুরআন ৯৬: ১
[২০১] আল-কুরআন ৭: ২০৪

- “পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।”[২০২]
- “অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।”[২০৩]
- “অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।”[২০৪]
- অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।”[২০৫]
- “আর বলো, প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।”[২০৬]
- “এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।”[২০৭]

**শিক্ষাদান পদ্ধতি**

- “অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।”[২০৮]
- “আমি তোমাকে সহজ পদ্ধতির সুবিধা দিচ্ছি।”[২০৯]
- “শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো যতক্ষণ তা উপকারী হয়।”[২১০]
- “আমি কুরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।”[২১১]
- “তোমাদের এই সাথী না কখনো সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে আর না সঠিক চিন্তাভ্রষ্ট হয়েছে আর না সে নিজের খেয়াল-খুশিমত কথা বলে।”[২১২]
- “এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ যে তুমি তাদের প্রতি বড় কোমল। তুমি যদি কর্কশভাষী কিংবা কঠিন হৃদয়ের হতে তবে এরা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।”[২১৩]

---

[২০২] আল-কুরআন ৯৬: ৩-৪
[২০৩] আল-কুরআন ১৬: ৯৮
[২০৪] আল-কুরআন ৭৩: ৪
[২০৫] আল-কুরআন ৭৫: ১৮
[২০৬] আল-কুরআন ২০: ১১৪
[২০৭] আল-কুরআন ২০: ২৮
[২০৮] আল-কুরআন ৭৫: ১৮
[২০৯] আল-কুরআন ৮৭: ৮
[২১০] আল-কুরআন ৮৭: ৯
[২১১] আল-কুরআন ১৭: ১০৬
[২১২] আল-কুরআন ৫৩: ২-৩
[২১৩] আল-কুরআন ৩: ১৫৯

**হাদীসের আলোকে জ্ঞান আহরণ**

- মাহমুদ ইবন্ গায়লান (র.) ... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম: যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।"[২১৪]
- নাসর ইবন আলী (র.) ... আনাস ইবন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[২১৫]
- রসূল (সা.) আরো বলেন, "যে ইলম অনুসন্ধানে বের হয় সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।"[২১৬]
- মুয়াবিয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) অন্যত্র বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যাকে প্রভূত কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।"[২১৭]
- "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তা অর্জন করছে তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পারে তবু একগুণ প্রতিদান রয়েছে।"[২১৮]

ইবনে মাসউদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন। যার বদৌলতে সে বিচার ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।"[২১৯]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রহ.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য পেলেও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। আর বণী ইসরাইলদের থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃত কর। এতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্মাণ করে নেয়।"[২২০]
মুহাম্মদ ইবন্ হাতিম মুআদ্দিব (র.).... হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যে সব বস্তু রয়েছে সে সবও অভিশপ্ত। তাহলে অভিশপ্ত নয়, কেবল আল্লাহর যিকর ও তাঁর আনুগত্য এবং আলেম ও ইলম হাসিলকারী।"[২২১]

---

[২১৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.) *বুখারি শরীফ*:ই.ফা.বা. পঞ্চম সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, খ.৮ম,অধ্যায়: ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদ: ২৬৩০, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং-৪৬৬১

[২১৫] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ* অনু: মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, ই.ফা. বা. মার্চ ২০০৭, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ: ৫ম , অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইল্‌ম অন্বেষার ফযীলত, পৃ:১০৯, হাদীস নং-২৬৪৮

[২১৬] ইমাম নববী (রহ:), *রিয়াদুস সলেহীন*: ১৩৮৬, ৩য় খণ্ড, তিরমিযি: ২৬৪৭

[২১৭] ইমাম বুখারী (রহ), *বুখারী শরীফ* ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী -৭১ অধ্যায়: ইলম প্রথম খন্ড, পৃ.: ৫৮

[২১৮] দারমি।

[২১৯] ইমাম বুখারী (রহ) *বুখারি শরীফ*: সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৭৩ অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ৫৩, খন্ড: ১ম, পৃ. ৫৯

[২২০] ইয়াহইয়া বিল শারফ আন নববী (রহ), *রিয়াদুস সালেহীন*- মীনা বুক হাউস-২০১৫ ঈসায়ী, ১৩৮১ অধ্যায়: ইলম-জ্ঞান- প্রজ্ঞার তৃতীয় খন্ড, পৃ.: ৬০০

[২২১] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ* ,অনু: মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, ই.ফা. বা. জুন ১৯৯২, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ: ৪র্থ , অধ্যায়: সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুচ্ছেদ: দুনিয়া অভিশপ্ত, পৃ:৬০৮, হাদীস নং-২৩২৫

মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল আলী (র.) ... হযরত আবু উমামা (রহ.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আবিদের উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলিমের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্য যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শেখায়, আল্লাহ তার ফেরেশতাগণ এবং জমিনের ও আসমানের অধিবাসীবৃন্দ এমনকি সমুদ্রের মাছ, গর্তের পিপীলিকা, মাছি পর্যন্তও তাদের জন্য দু'আ করে।"[২২২]

আহমদ ইবন্ বুদয়েল কুরায়শ যামী কুফী (র.). . . হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে দ্বীনের কোন ইলম, ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে (জানা সত্ত্বেও) তা গোপন করে তাকে মহাপ্রলয়ের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।"[২২৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ইলমের সাহায্যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে ইলম যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে মহাপ্রলয়ের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।[২২৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ্ ইলম (দ্বীনী জ্ঞান) এমনভাবে উঠিয়ে নেবেন না যাতে মানবদের হতে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয় বরং ওলামায়ে কিরামের ইন্তেকালের মাধ্যমে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন। এমনকি শেষে একজন আলেমও বেঁচে থাকবেন না। তখন মানুষ জাহেলদের নিজেদের ইমাম বা নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে মাসায়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ইলম ব্যতীত ফাতওয়া (মীমাংসা) দিয়ে দেবে, এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরও পথভ্রষ্ট করবে।"[২২৫]

হযরত আবু দারদা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য রাস্তা অতিক্রম করে আল্লাহ তার জান্নাতে প্রশস্ত রাস্তা আসান করে দেয়। আর ফেরেশতাগণ তালেবে ইলমদের (ইলম অর্জনরত ছাত্র) জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। আর আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এমনকি পানির মাছও আলেমের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে। আর আবিদের (ইবাদত গুযার) ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সমগ্র তারকামণ্ডলীর ওপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। অবশ্য আলেমগণ হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দিনার রেখে যাননি। তাহলে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইলম (জ্ঞান) রেখে গিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে সে বিপুল অংশ হাসিল করেছে।[২২৬]

---

[২২২] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ* , খ: ৫ম , অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের উপর ফিক্‌হের (দ্বীনী ইলমের) ফযীলত, প্রাগুক্ত, পৃ:১৩২, হাদীস নং-২৬৮৫

[২২৩] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, অনুচ্ছেদ: ইল্‌ম গোপন করা, প্রাগুক্ত পৃ:১১০, হাদীস নং-২৬৫০

[২২৪] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, খ: ৫ম, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করে, প্রাগুক্ত পৃ:১১৪, হাদীস নং-২৬৫৬

[২২৫] ইমাম বুখারী (রহ) *বুখারী শরীফ*- ই.ফা.বা.-২০০৬ ঈসায়ী ,-১০১. অধ্যায়-ইলম: প্রথম খণ্ড পৃ.-৭৪

[২২৬] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের উপর ফিক্‌হের (দ্বীনী ইলমের) ফযীলত, প্রাগুক্ত পৃ:১৩০, হাদীস নং-২৬৮২

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: মানুষ যখন মারা যায় তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তিনটি আমলের সওয়াব জারী থাকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে, এমন ইলম যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[২২৭]

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের সিঁড়ি

শিক্ষা এমন এক পূত-পবিত্র ঐশী শক্তি যা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করতঃ মানুষকে স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। আর এ শিক্ষার সংস্পর্শে হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিগুলো পরাভূত করে সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগ্রত করে। ফলে ব্যক্তি তার সকল মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। জীবন জগৎ ও মহাজাগতিক শক্তির মাঝে যে ঐকতান বয়ে চলেছে তা উপলব্ধিতে সহায়তা করতঃ মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার জন্ম দেয়। এমনিভাবে, শিক্ষার এই নান্দনিক স্রোতধারা সুশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে নিখিল বিশ্ব আলোকিত হয়। আর এ মহান শিক্ষা আমরা অর্জন করি বিভিন্ন মাধ্যমকে কেন্দ্র করে। আমাদের জ্ঞানার্জনের যাত্রা শুরু হয় পরিবারের মধ্য দিয়ে। শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক দুই-ই হতে পারে। মানুষ নিরন্তর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। বেঁচে থাকার এ সংগ্রামে সহায়ক যা কিছু সবই শিক্ষার অঙ্গীভূত।

#### ১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নির্দিষ্ট মেয়াদকালীন যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ শিক্ষার যাত্রা শুরু করে। এরপর যে যত ধাপ অতিক্রম করে সে তত বেশি অগ্রসর হয়। এর জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্নরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাজমান।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও কার্যক্রম নিম্নে দেখানো হল।

#### মাকতাব ও মাসজিদ

... শব্দটি আরবী। যার শাব্দিক অর্থ লিখার স্থান। আর .... শব্দের অর্থ সিজদা করার স্থান। সাধারণত এ দুই-ই মাসজিদ ভিত্তিক। মসজিদে শিক্ষা বিতরণ ও আহরণ ব্যবস্থা রসূল (সা.) এর যুগ থেকেই প্রচলিত। তখনকার সময়ে

---

[২২৭] ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.) *সহীহ মুসলিম* অনু: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ২০০২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০, খ: ৬ষ্ট, অধ্যায়: কিতাবুল অসিয়ত, অনুচ্ছেদ: মানুষের মৃত্যুর পর যে সমস্ত কাজের প্রতিদান সংয়োজন হবে, পৃ:১১, হাদীস নং: ৪০৭৬

আসহাফে সুফফার অধিবাসীরা মাসজিদে বহুমুখী জ্ঞানচর্চা করতেন। কিন্তু বর্তমানে শুধু কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা মাকতাবে আছে। সাধারণত গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা ফজরের পর মসজিদে গিয়ে কুরআন শিক্ষা করে। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও তার পরিধি বিস্তারে মাকতাব শিকড় হিসেবে কাজ করে। শিশুর ইসলামিক জ্ঞান বিকাশকল্পে মাকতাবের ভূমিকা অপরিসীম। মাসজিদ ভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি শিশুদেরকে শুরু থেকেই ইসলামিক জ্ঞানার্জন তথা কুরআন হাদীস, মাসালা-মাসায়েল ও জীবন ঘনিষ্ঠ কর্ম সম্পাদনে ইসলামী ভাবধারার মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়।

**মাদরাসা**

মাদরাসা শব্দটি আরবী (দরস) থেকে এসেছে। ..... মানে হল পাঠ। আর মাদরাসা মানে হল যেখানে পড়ানো হয় বা বিদ্যালয়। আমাদের দেশে কয়েক ধরণের মাদরাসা আছে। প্রথমে একে একে মাদরাসাগুলোর পরিচয় দেয়া হলঃ

**নূরানী/তালিমুল কুরআন/ফোরকানীয়া মাদরাসা**

নামে ভিন্ন হলেও এ মাদরাসাগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা একই- মাখরাজ, মাদ, গুন্নাহ তথা তাজবীদের সাহায্যে কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ানো। আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন শিখানোর জন্য এ মাদরাসাগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

**হাফেজী মাদরাসা**

হাফেজী মাদরাসায় কুরআন শরীফ মুখস্ত করানো হয়। এতে সাধারণত দুই থেকে চার বছর সময় লাগে। কুরআন মুখস্তকারীকে হাফেজে কুরআন বলা হয়। মুখস্ত শেষে হাফেজদেরকে মাদরাসার পক্ষ থেকে পাগড়ী প্রদান করা হয়।

**আলীয়া মাদরাসা**

আলীয়া মাদরাসা মূলত আধুনিক মাদরাসা হিসেবে অবিহিত। স্কুল কলেজের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদরাসার সিলেবাস প্রণীত হয়। দাখিলকে এস.এস.সি, আলিমকে এইচ.এস.সি, ফাযিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান দেওয়া হয়। মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় একসময়ে ইংরেজি বাংলায় পূর্ণ নম্বরের (২০০) সিলেবাস না থাকায় মাদরাসার ছাত্রদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ভর্তির সুযোগ ছিল না। তবে ২০১৫ সাল থেকে মাদরাসার সিলেবাসেও ২০০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এখন মাদরাসার ছাত্ররা যেকোন বিষয়ে ভর্তি হতে পারছে। ফাজিল ৩ বছর মেয়াদী ডিগ্রীর সমমানের কোর্স এবং কামিল দুই বছর মেয়াদী এম.এ সমমানের কোর্স। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইবতেদায়ি, জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফাজিল এবং কামিল বর্তমানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে এইচ.এস.সি পর্যন্ত বিজ্ঞান ইংরেজিসহ অন্যান্য আধুনিক বিষয় পড়ানো হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও আছেন যারা আলিয়া মাদরাসা থেকে পড়াশোনা করেছেন। ফাজিল এবং কামিলেও আধুনিক কিছু বিষয় পড়ানো হয়। কামিলে চার বিষয়ে মাস্টার্স করার সুযোগ আছে। এগুলো হল কুরআন, হাদীস, আরবী ও ফিকহ।

**কওমী মাদরাসা**

কওম অর্থ গোত্র। কওমী মাদরাসাগুলো সরকারি অনুদান ব্যতীত স্থানীয়দের সহায়তায় পরিচালিত হয়। কওমী মাদরাসা খারিজী, নিজামী, দেওবন্দ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে প্রায় ১৫০০০ কওমী মাদরাসা আছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। এতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বাংলা, অংক, ইংরেজি এবং পরের ক্লাসগুলোতে আরবী ও ইসলামি বই শিক্ষা দেয়া হয়। এ মাদরাসার শ্রেণিগুলোর নামও বিভিন্ন আরবী এবং ইসলামী কিতাবের নাম অনুসারে যেমনঃ মিযান, নাহুমীর, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া শরহে জামি, মিশকাত এবং সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরা।

কওমী মাদরাসার বোর্ড হল বেফাকুল মাদারিস যা বেসরকারি। তবে বর্তমানে কওমী মাদরাসাকে আধুনিকীকরণের বিষয়টি সামনে আসায় অতি সম্প্রতি সরকার দাওরাকে মাস্টার্সের সম্মান প্রদান করেছে।

**স্কুল বা বিদ্যালয়**

স্কুল বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যা কোন আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত হোক বা না হোক যেখানে প্রাক প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। সাধারণত সরকারি অর্থায়ন ও ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় বাংলাদেশে বিদ্যমান। যেমনঃ প্রাইমারি স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, প্রি-ক্যাডেট স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, কারিগরি, হাই স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ক্রীড়া স্কুল। উচ্চতর শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি স্কুলে থাকতেই নির্বাচন করতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল- আর্টস, সায়েন্স ও কমার্স। নবম শ্রেণিতেই এর থেকে যেকোন একটি নির্বাচন করে নিতে হয়।

**বিশ্ববিদ্যালয়**

বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরণের গবেষণামূলক কাজ পরিচালিত হয়। সাধারণত কলেজ তথা দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত দুটি পর্যায় থাকে। অনার্স চার বছর মেয়াদী এবং মাস্টার্স হল এক বছর মেয়াদী। উচ্চতর শিক্ষা লাভে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম যেমনঃ এম.ফিল, পি.এইচ.ডি, অনার্স, মাস্টার্স শেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সম্পাদন হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বুকে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হল "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়"। বিহারে গড়ে ওঠা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন সময়ের উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র।

মাদীনায় অবস্থিত সৌদি আরবের মাদীনা ইসলামী বিশ্বদ্যিালয় এবং মিশরের কায়রোতে অবস্থিত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সালে সৌদি সরকার কর্তৃক পবিত্র মাদীনা শহরে এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ৯৭০ বা ৯৭২ সালে ফাতেমীয় বংশ দ্বারা কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসলামী নীতিবোধ সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

**কারিগরি ও চিকিৎসা**

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের একটি অধিদপ্তর। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তর এর মূল কাজ ৪টি। যথা- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, একাডেমিক কার্যক্রমের তদারকীকরণ এবং কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এ অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ১১৯টি।

তিনটি স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যথা- সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী স্তর। সার্টিফিকেট পর্যায়ে রয়েছে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ১টি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ডিগ্রী পর্যায়ে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৪টি।

**চিকিৎসা**

সাধারণত এ শিক্ষা পাঠ্যক্রম সম্পাদনে পাঁচ থেকে ছয় বছরের প্রয়োজন পড়ে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করে।

এমবিবিএস (ব্যাচেলর অফ মেডিসিন, ব্যাচেলর অফ সার্জারী) এই কোর্সটি মূলত পাঁচ বছরের একটি কোর্স এবং পরবর্তীতে এক বছরের ইন্টার্নশীপ করতে হয়।

এমবিবিএস কোর্সের ব্যাপ্তি মূলত ৪ ধাপে বিভক্ত-

১. প্রথম ধাপ ১.৫ বছরের।
২. ২য় ধাপ ১ বছরের।
৩. ৩য় ধাপ ১ বছরের।
৪. ৪র্থ ধাপ ১.৫ বছরের।

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সসমূহ-

১. MD (Doctor of medicine)/MS (Master of Surgery) ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টির জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী এবং বেসিক মেডিকেল স্যায়েন্স এর জন্য ২-৪ বছর মেয়াদী।
২. FCPS (Fellow of College of Physicians and Surgeons Bangladesh) ৩-৪ বছর মেয়াদী।
৩. Diploma ২ বছর মেয়াদী।
৪. MCPS (Membership of College of Physicians and Surgeons) ১ বছর মেয়াদী।

বাংলাদেশের বাইরে সহজলভ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্সসমূহ-

১. MRCP (Membership of Royal College of physicians)
২. MRCS (Membership of Royal College of Physicians and Surgeons)
৩. FRCP (Fellow of Royal College of Physicians and Surgeons)

**২. অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা**

শিক্ষা মানবীয় কল্যাণের জাদুকাঠি। শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মানুষ প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হয়। শিক্ষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর নেই। এ শিক্ষার ফলেই মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উঠে আসে। এজন্যই হিশাম ইবন্ আম্মার (র.) .. আনাস ইবন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেন- "জ্ঞানার্জন প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয।"[২২৮]

কিছু শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির মাঝে অর্জিত হয়। তবে অধিকাংশ শিক্ষাই মানুষ জন্মের পর নিজস্ব পরিমণ্ডল তথা- পরিবার, পরিজন, পরিবেশ, সমাজ, মিডিয়া, পারিপার্শ্বিকতা হতে অর্জন করে থাকে। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই সে নানামুখী শিক্ষা বহুবিধ উপায়ে অর্জন করে। সভ্যতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-স্নেহ ও পরোপকারী এবং উদার মানসিকতা এগুলো কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নয় বরং পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করে।

**পারিবারিক শিক্ষা**

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রথমে আদম (আ.) অতঃপর তার পাঁজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। তাদের উভয়ের ঐকান্তিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

"হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[২২৯]

মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি পরিবার। একটি সন্তান জন্মের পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে ৪-৫ বছর পরিবারে বেড়ে উঠে। এ সময়টিতেই তার মানসিক বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠন হয়ে থাকে। শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তার মায়ের কোলে। পরিবার থেকেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। পরিবার মানব শিশুর প্রধান শিক্ষা

[২২৮] ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবানী (র.) *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ মাওলানা সাঈদুল হক, ই.ফা.বা. খঃ১ম, অনুঃ আলিমগণের ফযীলত এবং ইলম্ অর্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান, পৃঃ১২১, হাদীস নং-২২৪
[২২৯] আল-কুরআন ৪: ১

নিকেতন। সন্তানের মানবিক মূল্যবোধ, আখলাক, চেতনা ও বিশ্বাস জন্ম নেয় পরিবার থেকেই। পিতা মাতার আদর্শই সন্তান ধারণ করার চেষ্টা করে।

আদম (আ.) . . . . আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

"প্রত্যেক নবজাতক স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজক বানায়।"[২৩০]

জন্মের পর একটা সময় পর্যন্ত শিশুর অবস্থান পরিবারের পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শিশু পরিবার থেকেই জীবনের সর্ববিধ নৈতিক নান্দনিক মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার পরেও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার মধ্যে থেকে যায়। পারিবারিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই শিশু বেড়ে ওঠে। এখানকার শিক্ষাই তাদের জীবনের আসল শিক্ষা হিসেবে থেকে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

"তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"[২৩১]

আল্লাহর এই নির্দেশ অনুযায়ী পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন সুশিক্ষার। এ দিকে ইঙ্গিত করে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেন- "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।"[২৩২]

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই শিশু সমাজ, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সবকিছুই পরিবারের সদস্য তথা মা-বাবা-ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক সমাজ ও ধর্মই শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে। অভিভাবকগণই সেই নীতিবোধ শিশুর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। নৈতিক শিক্ষা যখন ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা সহনশীলতা ও ন্যায় বোধের দ্বারা পরিচালিত হবে যাতে তা অন্য সম্প্রদায়ের নীতিবোধে আঘাত না হানে। শিশুকে এ ধরণের নৈতিক ও নান্দনিক শিক্ষা, পরোপকার, দয়া, দানশীলতা, স্নেহ-মমতা, ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ভালবাসা, ন্যায়নিষ্ঠা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, শালীনতা, বিনয়, সুন্দর আচরণ- এরকম আরো নৈতিক শিক্ষা শুধু পরিবারই দিতে পারে।

সন্তানকে ধর্মীয় ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবকগণের অবদানই সর্বাগ্রে। আর একমাত্র পারিবারিক সুশিক্ষাই পারে সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। এজন্য ইসলাম শিক্ষাদানের বিষয়ে তাগিদ দিয়েছে।

---

[২৩০] ইমাম বুখারী (রা.), *বুখারী শরীফ*: ১৩০২, সপ্তম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৭, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়: জানাযা, অনুচ্ছেদ: মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসঙ্গে, ৮৭৫, খন্ড: ২য়, পৃ. ৪২৬

[২৩১] আল-কুরআন ৬৬: ৬

[২৩২]

হাদীসে এসেছে-

নাসর ইবন্ আলী (র.) ... আয়্যুব ইবন্ মূসা তার পিতা তার পিতামহ থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, "উত্তম শিষ্ট াচার শিক্ষাদানের চেয়ে বড় দান কোন পিতা তার সন্তানের জন্য করতে পারেননি।"[২৩৩]

আরব কবি হাফেজ ইব্রাহীম উত্তম জাতি গঠনে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন- "মাতা হলেন জ্ঞানালোকের প্রথম বাতি, তাকে যদি বুঝতে পার জন্ম নেবে সত্য জাতি।"[২৩৪]

সন্তানকে সঠিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জোর দিতে গিয়ে রসূল (সা.) আরো বলেন- "তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শিক্ষা দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।"[২৩৫]

সন্তানকে শিক্ষা দানের আদেশ ও গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের উদ্দেশ্যে আল্লাহ লুকমান (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে কি এবং কীভাবে শিক্ষা দিবে তারই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

"লুকমানের কথা স্মরণ করো। সে তার পুত্রকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল: হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। অবশ্য শিরক এক বিরাট জুলুম, অবিচার।"[২৩৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

"হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করো এবং যতো বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য, দৃঢ়তা অবলম্বন করো। এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"[২৩৭]

পরিবার যে সন্তানকে আদব শিক্ষাদানের অন্যতম কারিগর তার বর্ণনা দিতে মহান আল্লাহ লুকমানের আরেকটি আদেশ সম্পর্কে উদাহরণ দেন যা লুকমান তার পুত্রকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, লুকমান তার ছেলেকে বলল-

"পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর, নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[২৩৮]

সন্তানকে শিক্ষা দানে রসূল (সা.) এর দিক নির্দেশনাও নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে। যেমন: মুআম্মাল ইবন্ হিশাম... আমর ইবন্ শুআয়েব (রহ.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "সাত বছরে পদার্পণ করলে তোমরা তোমাদের

---

[২৩৩] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, খ: ৪র্থ, অধ্যায়: সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুচ্ছেদ: সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া, প্রাগুক্ত পৃ:৩৮৫, হাদীস নং-১৯৫৮

[২৩৪] *মাজাল্লাতুল বুগুস আল-ইসলামিয়্যা*-২ খণ্ড, পৃ. ৪৫২

[২৩৫] বায়হাকী, *ওয়াক্কুল ঈমান*: ৮৬৪৯

[২৩৬] আল-কুরআন ৩১: ১৩

[২৩৭] আল-কুরআন ৩১: ১৭

[২৩৮] আল-কুরআন ৩১: ১৯

সন্তানদেরকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও, দশ বছরে পদার্পণ করলে তাদেরকে সালাত আদায় করার জন্য দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[২৩৯]

অন্যত্র রসূল (সা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও-

১. নারীর প্রতি ভালবাসা।
২. তার পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা।
৩. কুরআন তিলাওয়াত।

কুরআনের ধারকরা নবী-রসূল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের সাথে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। যখন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।"[২৪০]

ইমাম গাযালী (রহ.) তার ইহইয়াউ উলুমুদ্দিনের মধ্যে শিশুকে কুরআন, হাদীস, পুণ্যবানদের জীবনকথা ও তারপর দ্বীনের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়ার পরামর্শ দেন।"[২৪১]

আব্বাস ইবন্ ওয়ালীদ হিশাম (র.) ...আনাস ইবন্ মালিক স(রা.০ হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) আরো বলেন-"তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালবাসা দাও এবং তাদেরকে সর্বোত্তম শিষ্টাচারিতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দাও।"[২৪২]

রসুল (সা.) বলেছেন, "পিতার উপর সন্তানের হক হল, তার জন্য সুন্দর একটা নাম রাখবে এবং তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও চরিত্রগুণে গড়ে তুলবে।"[২৪৩]

কুতায়বা (র.)...জাবিন বাবন্ সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) আরো বলেন, "সন্তানকে একটা উত্তম শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেয়া আল্লাহর পথে এক সা' পরিমাণ বস্তু সাদকা করার চাইতে উত্তম।"[২৪৪]

ইসলামের এ সুমহান নিদের্শনাবলীর আলোকে যারা সন্তানকে প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ দিবে তাদের সন্তানই হবে আদর্শ ও সুশিক্ষিত। আর এ লক্ষ বাস্তবায়নে পরিবারের শিক্ষাই সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

**প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা:**

মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতাই মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। স্বভাবতই মানুষ জ্ঞান-পিপাসু। সে সর্বদা জ্ঞান আহরণে উৎসুক। এ জ্ঞান মানুষকে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধনপূর্বক স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালভাবে চিনতে শেখায়। এ জ্ঞান মহান আল্লাহ প্রকৃতির পরতে পরতে ঢেলে দিয়েছেন। মানুষ প্রতিনিয়তই

---

[২৩৯] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ আস আস সিজিস্তানী (র.) *আবূ দাউদ শরীফ*, অনু: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, ড: আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ই.ফা.বা. আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ: ১ম, অধ্যায়: কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ: বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে, পৃ:২৭২, হাদীস নং-৪৯৫

[২৪০] জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *জামেউল আহদীস*: ৯৬১

[২৪১] আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবানী (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ*, অনু: মাওলানা মুহাম্মদ মূসা আবু তাহের মেসবাহ, আবুল বাশার আখন্দ, ই.ফা.বা. মার্চ ২০০২, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, খ: ৩য়, অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনু: পিতার সদাচারণ ও ইহ্সান কন্যাদের প্রতি, পৃ: ৩৪৪, হাদীস নং-৩৬৭১

[২৪২] *ইবনে মাজাহ*: ৩৮০২

[২৪৩] *মাজযাউস যওয়াযেদ*: ১২৮২৯

[২৪৪] ইমাম তিরমিযী (র.) *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত পৃ:৩৮৪, হাদীস নং-১৯৫৭

মনের অজান্তে প্রকৃতির বিভিন্ন নিদর্শন ও স্বভাব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পাখি, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ এরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের স্বভাবজাত কারিশমা দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে অসংখ্যবার মু'মিনদের প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপে গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন-

"তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।"[২৪৫]

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশে ভ্রমণ করেনি? যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ হয় না। কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"[২৪৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি-শক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।"[২৪৭]

প্রাচীন বাগদাদ নগরীতে ইব্রাহীম বাগদাদী নামে এক ব্যক্তি বাস করত যার আদব ছিল অত্যন্ত অসাধারণ। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল- হে ইব্রাহীম, এত আদব তুমি কোথায় শিখলে? সে বলল, আমি আদব শিখেছি বেয়াদবের কাছ থেকে। ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করল- এটা কী করে সম্ভব? উত্তরে ইব্রাহীম বলল, বেয়াদব যা করে আমি তা করি না। এভাবেই প্রকৃতি ও চারপাশ থেকে অনুপম শিক্ষা লাভ করা যায়।

### স্রষ্টার আনুগত্য

প্রকৃতি মহান আল্লাহর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। গাছপালা, পশু-পাখি সর্বদাই মহান রবের ইবাদত ও স্তুতি বর্ণনা করে। তারা আমাদেরকে স্রষ্টার আনুগত্য ও ইবাদত করার শিক্ষা দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-

"তুমি কি দেখনা যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করত: আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত।"[২৪৮]

"আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না।"[২৪৯]

[২৪৫] আল-কুরআন ৩৪: ১৮
[২৪৬] আল-কুরআন ২২: ৪৬
[২৪৭] আল-কুরআন ২৪: ৪৩
[২৪৮] আল-কুরআন ২৪: ৪১
[২৪৯] আল-কুরআন ২৭: ১৮

**নিয়মানুবর্তিতা**

প্রকৃতির অপরিহার্য উপাদানগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, শীত-গ্রীষ্ম, দিন-রাত সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মকে অনুসরণ করে। এদিক ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন-

"তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি। আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি। তখনই তারা অন্ধকারে ঢেকে যায়। সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।"[২৫০]

"সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।"[২৫১]

**শৃঙ্খলা ও আনুগত্য**

মানব জীবনে নেতার আনুগত্য ও শৃঙ্খলা আনয়নে শিক্ষা অপরিহার্য। আর এ শিক্ষাও আমরা প্রকৃতি ও প্রাণীকুল থেকে নিতে পারি। এ কল্পেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে প্রাণীকুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, "যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পিষ্ট করে ফেলবে।"[২৫২]

পতঙ্গ বিজ্ঞানীদের মতে, পিঁপড়াদেরও মানুষের মতো সমাজব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে তারা দলবদ্ধভাবে বাস করে। আর তাদের প্রধান হচ্ছে নারী পিঁপড়া। আর পুরুষ পিঁপড়া ঘর সংরক্ষণ ও পাহারা দেয়। নারী শ্রমিক পিঁপড়া দীর্ঘ ছয়মাস যাবত পরবর্তী ছয়মাসের খাদ্য সঞ্চয় করে। আলোচ্য আয়াতের সারসংক্ষেপ হল নারী পিঁপড়া তার দলকে সতর্ক করার ফলে সকলেই তার আনুগত্য করে গর্তে ঢুকে পড়ে। আর পিঁপড়ার এ জীবনপ্রণালী থেকে আমরা ব্যক্তি জীবনে আনুগত্য ও শৃঙ্খলার শিক্ষা লাভ করতে পারি।

**সহনশীলতার শিক্ষা:** যেকোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলার এ গুণটি প্রকৃতির থেকে শেখা উচিত। গভীর জঙ্গলে কিংবা ধূধূ মরু এলাকায় পশুপাখি কিন্তু ঠিকই তার খাবার খুঁজে নেয়। কিন্তু মানুষ অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং সহজেই হাল ছেড়ে দেয়। তাই প্রকৃতি থেকে আমরা সহনশীলতার শিক্ষা নিতে পারি। গাছ যেমন, তার সুনিবিড় ছায়া ও সুমিষ্ট ফল দিয়ে অনবরত পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, মানব জীবনেও অনুরূপ সহনশীলতা শিক্ষার আবশ্যকতা একান্ত কাম্য।

[২৫০] আল-কুরআন ৩৬: ৩৭-৩৮
[২৫১] আল-কুরআন ৩৬: ৪১
[২৫২] আল-কুরআন ১৬: ৪৯

**নিজেকে মেলে ধরা**

প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরতে পছন্দ করে। নিজের গুণ, সৌন্দর্য, স্বভাব নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকাটাও প্রকৃতিজগতের কাছ থেকে শিক্ষণীয় একটি বিষয়। অনেক মানুষই আছে যারা নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। তাই কারো সাথে না মেশা, নিজের মেধা প্রকাশে ভয় পাওয়া এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলার মতো সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরে মেধা বিকাশের পদ্ধতি শেখায়।

**শূন্য থেকে শুরু**

শীতে ঘাস একদম শুকিয়ে যায়। তখন মনে হয় হয়তো কখনোই আর ঘাসগুলো সবুজ হয়ে উঠবে না। একইভাবে গাছের পাতাও ঝরে যায়। শীত শেষে ঠিকই সবুজ শ্যামলিমায় ভরে উঠে। অনেক সময় মানুষ সব হারিয়ে শূন্য হয়ে যায়। প্রকৃতি তাকে শূন্য থেকে পুনরায় সবকিছু ফিরে পাওয়ার শক্তি সঞ্চার করতে শেখায়।

**ভাঙ্গা-গড়াঃ**

যখন প্রচণ্ড ঝড় উঠে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ সব গাছপালা তছনছ করে দেয়। কিন্তু ঝড় থেমে গেলেই আবার সব ধীরে ধীরে থেমে যায়। কখনও কখনও মানুষের জীবনেও কিছু কঠিন সময় পার করতে হয়, যা সবই সাময়িক। মানুষ প্রকৃতির এই ভাঙ্গা গড়া থেকে শিক্ষা নিয়ে সাহস সঞ্চয় করে নতুনভাবে জীবন শুরু করার নান্দনিক শিক্ষা নিতে পারে।

**মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাঃ**

মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারায় শিক্ষার্জনের মাধ্যম হিসেবে যে অভাবনীয় সাফল্যের ফল্গুধারা বয়ে এনেছে, তা এক কথায় আশাতীত। প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন এ মিডিয়া বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এর সাথে ইতিবাচক উপাদানের সম্পৃক্ততা প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। একবিংশ শতাব্দীর এই যুগে পৃথিবীর যে কোন জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্য, ছবি, ও ভিডিও মুহূর্তেই পাওয়া যায়।

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ আরবে ইসলামী শিক্ষার পটভূমি**

"যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ আসান করে দেন।"[২৫৩]

হাদীসের মর্মবাণী এই যে, দুনিয়াবী শিক্ষা অপেক্ষা দ্বীনি শিক্ষার তাৎপর্য অনেক অনেক উর্দ্ধে কেননা এতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়মুখী কল্যাণই নিহিত। অর্থাৎ আল্লাহর তুষ্টির নিমিত্ত যে শিক্ষা আহরিত হয় একমাত্র সে শিক্ষাই পারে নৈতিক নান্দনিক পথ ও মতের উপর সুদৃঢ় রেখে বান্দাহর জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা বিধান করতে। রসূল (সা.)

---

[২৫৩] আন-নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, (*মুসলিম*-২৬৯৯) অধ্যায়ঃ ইলম-জ্ঞান-প্রজ্ঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৬০১

নবদীক্ষিত শিষ্যদের ইসলামের বিধিবিধান মাফিক যে অনুপম জীবনাদর্শে দীক্ষিত করে তোলেন, এতে করে উম্মাতে মোহাম্মাদীর অন্তরে প্রবলভাবে নৈতিক-নান্দনিক মূল্যবোধের জ্ঞান সঞ্চার হয়। তৎকালীন জ্ঞানপিপাসু আরব সমাজকে শিক্ষার অমিয়বাণী এতটাই মোহিত করে তোলে যে সুদূর প্রান্তর অতিক্রম করে তারা দ্বীনি শিক্ষার সন্ধানে ছুটে আসত। নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষার অগ্রদূত রসূল (সা.) এর নেতৃত্বে দ্বীন ইসলামী শিক্ষার সঞ্জীবনী শক্তি নিকিল ভুবনে আলোক স্তম্ভ রূপে ধারাবাহিকভাবে অদ্যাবধি দোজাহানের মুক্তির পথ প্রদর্শন করে চলেছে যার সুফল কাল কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

নবুয়াত লাভের পর রসূল (সা.) কাবাকে প্রথম শিক্ষালয় হিসেবে ব্যবহার করেন এবং মক্কা নগরীর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িতে "দারুল আরকাম" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মহানবী (সা.)নিজেই এখানে হযরত আবু বকর (রা.), ওসমান (রা.), আলী (রা.) সহ নবদীক্ষিত শিষ্যদের ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাসজিদই ছিল প্রথম ও প্রধান শিক্ষায়তন।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। মদিনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। নবী করিম (সা.) এর জীবদ্দশায়ই মদিনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৯টি মাসজিদ তৈরি হয়েছিল। এসব মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

**১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ও মক্কার শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ:**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রসূল (সা.) সর্বপ্রথম পবিত্র কাবা শরীফকে শিক্ষানিকেতন হিসেবে গ্রহণ করেন। তারপর রসূল (সা.) মাসজিদ সমূহে শিক্ষার আসর বা বৈঠক বসাতেন। অসংখ্য সাহাবী স্ব স্ব গৃহে বৈঠক বসিয়ে মানুষকে তা'লীম দিতেন। পরবর্তীতে সেই সুন্নাহ অনুসারে "আলিমগণ মাসজিদসমূহে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদানের কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী দু'তিন বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময়কালে শিক্ষাদানের জন্য অথবা শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক কোন স্থাপনা নির্মাণ হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায় না।

মক্কা মুকাররমায় ইসলাম প্রচারে বিরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান সত্ত্বেও কোন না কোনভাবে কুরআন শিক্ষা অব্যাহত ছিল। রসূল (সা.) এর মাক্কী জীবনে সেখানে কোন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাজ্জ মওসুমে এবং সময় ও সুযোগমত জনসাধারণকে কুরআন শোনাতেন। (এ সময় মাসজিদে আবু বকর, দারুল আরকাম, ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের বাড়ি, শি'আবী তালিব প্রভৃতি স্থান শিক্ষালয়ের কাজ করত)।

সেই প্রতিকূল পরিবেশেও মক্কায় বেশ কিছু ক্বারিও মু'আল্লিম তৈরি হয়েছিল যারা অন্যদের পবিত্র কুরআন ও দ্বীনের নানান বিষয় শিক্ষা দিতেন। ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের গৃহে খাব্বাব ইবনে আরাত, নাকী, আল-খাদিমাতে উমাইর

ও ইবন উম্মে মাকতুম, মাসজিদে জুরাইক এ রাফি, ইবনে মালিক যারকী (রহ.) শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন। এদের সকলেই ছিলেন উল্লেখিত মক্কার শিক্ষালয়গুলোর কৃতী ছাত্র।

এছাড়াও রসূলুল্লাহ (সা.) যে সকল আমীর ও কর্মকর্তাকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ করেন তারা নিজ নিজ স্থানের ইমাম ও শিক্ষক ছিলেন। এক্ষেত্রে তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হত যারা কুরআন, সুন্নাহ ও দ্বীনি জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন।

শিক্ষার্জনে সফরের প্রচলনও ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তিবর্গ রসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। আলী ইবনুল জাদ (রা.) . . . আবু জামরা (রা.) থেকে বর্ণিত,

আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সা.) কে বললেন, আমরা বহু দূর থেকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এসেছি। পথে কাফির গোত্র মুবা এর আবাসস্থল। এ কারণে আমরা কেবল পবিত্র হারাম মাসে আপনার নিকট আসতে পারি। উবাবা ইবনে হারিছ (রা.) মাত্র একটি মাসায়ালা জানার জন্য মদীনায় রসূলুল্লাহর (সা.) খিদমতে হাজির হন।[২৫৪]

কুরআনের শিক্ষা হতো সাধারণত মৌখিকভাবে। মৌখিক কোন মাসহাফের ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালে আরবে লেখা-লেখির তেমন প্রচলন ছিল না। এতদসত্ত্বেও ওহী লেখা হতো এবং শিক্ষার্থীদের হাতে কিছু কিছু সূরা লিখিতরূপেও পাওয়া যেত।

তৎকালে পাথরে, পশুর চামড়ায়, গাছের বাকলে, মাটিতে ও বিভিন্ন রকমের খোদাই করে লেখা হত। মক্কাতে ফাতিমা বিনত খাত্তাবের গৃহে একটি সহীফা থাকার কথা জানা যায়।

প্রথম পর্বে শিক্ষার্থীদের থাকা ও খাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার দারুল আরকাম-এ অবস্থানকারী সাহাবীগণের খাওয়ার ব্যবস্থা স্বচ্ছল সাহাবীগণের গৃহে করে দেন। যাকে জায়গীর নামেও অভিহিত করা যায়।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এমন কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় ছিল না যেখানে অবস্থান করে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শেখা ও শেখানোর ধারা অব্যাহত রাখতে পারতেন। রাতদিন সর্বক্ষণ বিভিন্ন চিন্তা ও ঘটনার জট লেগেই থাকতো। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র সত্ত্বাই ছিল চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে কিছু সদস্য চুপিসারে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতেন। রসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়াও আবু বকর (রা.), খাব্বাব ইবন আরাত (রা.) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন শিক্ষক। এই সময়কালে এমনসব স্থান ও

---

[২৫৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রা.) *বুখারী শরীফ*: ৫১, সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ,অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: গণীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভূক্ত ৪০, খন্ড: ১ম, পৃ. ৪১

বৈঠককে শিক্ষালয় হিসেবে অভিহিত করা যায় যেখানে নাজুক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কোন না কোনভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হত।"[২৫৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ হলো

**দারুল আরকাম**

আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.) প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তার বাড়িটি মক্কার প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গৃহটিকে 'দারুল ইসলাম' ও মুখতাবা নামে অভিহিত করা হয়।

নবুয়্যতের ৬ষ্ঠ বছরে মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে রসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দারুল আরকামে আশ্রয় নেন।

এখান থেকেই রসূল (সা.) ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং সেখানে অবস্থান করেই সাহাবীগণকে কুরআনের তা'লীম দিতেন। কুরআনের যতটুকু নাযিল হতো তা তাদেরকে মুখস্ত করাতেন।[২৫৬]

ইবনে সা'দের তাবাকাত ও আল-হাকিমের আল-মুসতাদরিকে এসেছে:

রসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামের সূচনা লগ্নে এই গৃহে অবস্থান করতেন এবং মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর এখানে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেন।"[২৫৭]

আবূল ওয়ালীদ আল-আযরাকী তাঁর 'আখবারু মাক্কাহ' গ্রন্থে লিখেন-

রসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবীগণ দারুল আরকামে সমাবেত হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে কুরআন পড়াতেন ও দ্বীনের তা'লিম দিতেন।"[২৫৮]

দারুল আরকাম শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে উমার (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণকারী দু'ব্যক্তিকে কোন স্বচ্ছল মুসলিমের দায়িত্বে দেয়া হত। তারা সেই স্বচ্ছল লোকটির বাড়িতে থাকতো, খেতো। এই দারুল আরকামে একবার রসূল (সা.) প্রায় একমাস অবস্থান করে গোপনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত ও দ্বীনি তা'লীম দিতে থাকেন। এটি ছিল শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসস্থল।

দারুল আরকামে ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবীরা সাহসী হন এবং উল্লিখিত স্থান ছাড়াও মক্কায় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) দু'জন, চারজন একত্র হয়ে কুরআন পড়তেন ও পড়াতেন।

---

[২৫৫] ড. মুহম্মদ আবদুল মাবুদ, *রসূলুল্লাহ (সা:) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি*, প্রকামক এ.কে.এম. নাজির আহমদ, পরিচালক বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ মে ২০১১, পৃ.: ১৮১

[২৫৬] ড. মুহাম্মাদ আল-আজ্জাজ আন-খাতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন* (বৈরুত), পৃ. ৩৭

[২৫৭] আবূ আবদিল্লাহ হাকিম, *আল-মুসতাদরিক*, খণ্ড: ৩, পৃ. ৫২২

[২৫৮] আল-আসরাকী, *আখবারু শারাকাহ* (শাক্কাহ মুবারামাহ), খণ্ড-২, পৃ. ২২০

এছাড়াও শিআবী আবী তালিব এ অন্তরীণ থাকাকালীন প্রায় তিন বছর রসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে মুসলিমদেরকে কুরআন শুনাতেন এবং তাদের পড়া শুনতেন।

**মাসজিদে আবু বকর (রা.)**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার দুর্বিষহ জীবনে অনেকের মতে আবু বকর (রা.) ও হাবশায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে ইয়েমেনের 'বারক আল গিসাহ' নামক স্থানে 'আল-কারা' গোত্রের নেতা ইবনু আদ-দাগিনা আবু বকর (রা.) এর সাথে দেখা করে বলেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, "এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে নিশ্চিন্তে আমার প্রভুর ইবাদত করতে পারি। ইবনে আদ দাগিনা আবু বকর (রা.) কে বলেন- আপনার মত মানুষ বের হয়ে যেতে পারেন না, বের করে দেওয়াও যায় না। কারণ আপনি বিত্তহীনদের জন্য উপার্জন করেন। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন। ইয়াতীম, দুস্থদের ভার বহন করেন। অতিথিদের আহার করান এবং সত্যের পথে আগত বাধা বিপত্তিতে সাহায্য করেন। অতএব আমি আপনার আশ্রয়দানকারী। আপনি ফিরে চলুন এবং আপনার শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন।"[২৫৯]

অতঃপর আদ-দাগিনা নিজ নিরাপত্তায় আবু বকর (রা.) কে নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাকে বাড়ির ভিতরে ইবাদতের শর্তসাপেক্ষে মক্কায় থাকার অনুমতি দেন।

অতঃপর আবু বকর (রা.) প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাড়ির ভিতরেই ইবাদত ও সালাত আদায় করতে লাগলেন এবং তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্রন্দনশীল হওয়ায় তার পাশে কাফির নারী ও শিশু ভিড় করে কুরআন শুনতো। এতে করে মুশরিক কুরাইশ নেতারা শংকিত হয়ে ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালেন। ইবনুদ দাগিনা আবু বকর (রা.) কে বললেন, আপনি জানেন আপনার সাথে আমার কি অঙ্গীকার হয়েছিল। হয় আপনি তা মেনে চলুন নয়তো আমার নিরাপত্তার অঙ্গীকার আমাকে ফিরিয়ে দেন। তখন আবু বকর (রা.) বলেন, "আমি আপনার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট থাকছি।"[২৬০]

মসজিদে আবু বকর-এ কোন মুয়াল্লিম, কারী ও শিক্ষার্থী না থাকলেও এটা ছিল মক্কার প্রথম তিলওয়াত কেন্দ্র। কাফিরদের ছোট্ট শিশুরা এখানে কুরআন তিলাওয়াত শুনতো।

**ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের গৃহ:**

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ছিলেন উমার ইবনে খাত্তাবের বোন। ইসলামের সূচনালগ্নে তিনি স্বামী সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা.) এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনই নিজেদের গৃহে খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) এর নিকট

---

[২৫৯] ড. মুহম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[২৬০] বুখারী, *কিতাবুল কিফাল*, বাবু জিওয়ারু আবী বকর আস- সিদ্দীক, ইবন কাছীর, *আস- সীরাতু আন-নাবাবিয়্যাহ (বৈরুত)*, খণ্ড-১, পৃ. ২৭৮-২৮০

কুরআন শিখতেন। উমার (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাওবারী হাতে নিয়ে বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন বোন ও বোনের স্বামী উভয়ে কুরআন পাঠ করছেন। সীরাত ইবন হিশামে এসেছে-

“তাদের দুজনের নিকট খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) ছিলেন। তার নিকট সহীফা ছিল যাতে সূরা ত্ব-হা লিখিত ছিল এবং তিনি তাদের দুজনকে তা পাঠ করাচ্ছিলেন।[২৬১]

সীরাতে হালাবিয়্যাতে উমার (রা.) এর কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমার ভগ্নিপতির গৃহে দুজন মুসলিমের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের একজন খাব্বাব ইবন আরাত (রা.) এবং অন্যজনের নাম আমার স্মরণ নেই। খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) আমার বোন ভগ্নিপতির নিকট যাওয়া আসা করতেন এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রা.) আরো বলেন, এ দলটি যারা তাদের কাছে ছিল বসে বসে সহীফা পাঠ করছিল। ফাতিমার গৃহটি কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র এবং এটিকে শিক্ষালয় বলা যেতে পারে। এছাড়া ওমরের বর্ণনায় কওম দিয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ বোঝায়।

**মদীনার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ**

মদীনার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মক্কা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ স্বেচ্ছায় সানন্দে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তারা অনায়াসেই কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও দান করত। রসূল (সা.) এর হিজরতের পূর্বেই মদীনায় মাসজিদ নির্মাণ ও কুরআনের তা'লীমের কাজ শুরু হয়ে যায়।

জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এখানে আগমনের দু'বছর পূর্বেই আমরা মাসজিদসমূহ নির্মাণ ও সালাত আদায় করতাম।

মদীনার প্রথম কেন্দ্রটি ছিল মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত মসজিদে বানু যুরাইকে। দ্বিতীয়টি শহরের দক্ষিণে মসজিদে কুবায় এবং তৃতীয় কেন্দ্রটি মদিনা থেকে কিছু দূরে উত্তর দিকে “নাকীউল খাদিমাত” এলাকা।

**মাসজিদে বানু যুরাইক:**

সর্বসম্মতিক্রমে এটি নিশ্চিত যে, মাসজিদে যুরাইক মদীনার প্রথম মাসজিদ যেখানে প্রথম কুরআন পাঠ করা হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের মু'আল্লিম ও কারী ছিলেন রাফি ইবনে মালিক যারকী (রা.)। আকাবার প্রথম বাইয়াত শেষে তিনিই প্রথম মদীনায় সূরা ইউসুফ তা'লীম দেন। তার এলাকার একটি উঁচু স্থানে বসে তিনি তা'লীম দিতেন। পরবর্তীতে এই চত্বরেই মসজিদে বানু যুরাইক নির্মিত হয়।

---

[২৬১] *সীরাতু ইবন হিশাম* (মিশর), খণ্ড-১, পৃ. ৩৪৪

রসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা আগমনের পর রাফি ইবন মালিক (রা.) এর দ্বীনী দাওয়াত, শিক্ষা কার্যক্রম ও সুস্থ স্বভাব প্রকৃতি দেখে খুশী হন। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উস্তাদ এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের যুরাইক শাখার মুসলিমগণ।[২৬২]

**মাসজিদে কুবাঃ**

মাদীনার দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত মদীনার দ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রটি ছিল মাসজিদে কুবা। আকাবার বাইয়াতের পর বহু সাহাবী হিযরত করে কুবায় এসে উঠতে লাগলেন। এসব মুহাজিরদের মধ্যে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রহ.) ছিলেন কুরআনের বড় আলিম। তাই তিনিই মাসজিদে কুবাতে তা'লীম দিতেন ও ইমামতি করতেন। আব্দুর রহমান ইবনে গানাম বলেন- "রসূলুল্লাহ (সা.) এর দশজন সাহাবী আমাকে বলেছেন, মাসজিদে কুবায় আমরা দ্বীনী ইলম পরস্পর শিখতাম, শেখাতাম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা পড়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুযায়ী আমল না করবে প্রতিদান পাবে না।"[২৬৩]

ইবরাহীম ইবন মুনযির (রা.). . . আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের পূর্বে প্রথম পর্বের মুহাজিরগণ যখন কুবার "আল উসবা" নামক স্থানে আসেন তখন তাদের ইমামতি করতেন সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা.)। তিনি তাদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন।[২৬৪]

**নাকী আল খাদিমাতঃ**

মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে আস'আদ ইবনে যূরারার (রা.) গৃহে মদীনার তৃতীয় শিক্ষালয়টি অবস্থিত। আর এর অবস্থান ছিল হাররা বানী বায়াদাতে। এ জনপদটি বানু সালামার আবাসস্থলের পরে "নাকী আল খাদিমাত" নামক এলাকায় অবস্থিত। এটি ছিল উর্বর সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে। এখানে "খাদীসা" নামক এক প্রকার নরম দেখতে সুন্দর ঘাস জন্মাতো। পরবর্তীকালে উমর (রা.) এটাকে জিহাদের জন্য পালা ঘোড়ার চারণভূমি বানান। ইয়াকুত আল-হামাবী স্থানটির পরিচয়ে বলেন- নাকী আল-খাদিমাত হলো সেই স্থান যেটাকে উমর ইবন আল খাত্তাব (রা.)মুসলিমদের ঘোড়ার চারণভূমি বানান। আনসারদের অনুরোধক্রমে রসূল (সা.) মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) কে দ্বীনী তালিম দেওয়ার জন্য মদীনার নাকী আল খাদিমায় প্রেরণ করেন। মুসআব ইবন উমাইর (রা.) ছাড়াও ইবন উম্মি মাকতুম (রা.) ও এখানে তা'লীম দিতেন।[২৬৫]

---

[২৬২] আল-বালাযুরী, *ফুতূহ আল-বুলদান* (মিশর), পৃ. ৪৫৯

[২৬৩] ইবন আবদিল বার আল-আন্দালুসী, *জ্যামিউ বায়ান আল-ইলম* (মিসর), খণ্ড-২, পৃ. ৬

[২৬৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রা.) *বুখারী শরীফ*ঃ ৬৫৯, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের ইমামতি, ৪৪৬, খন্ডঃ ২য়, পৃ. ৮১, প্রাগুক্ত

[২৬৫] ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত), খণ্ড-৫, পৃ. ৩৪৮

**২. হিজরতের পরবর্তী মাদীনার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ**

হিযরত পূর্ব মাদীনার তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেখানকার অনেক মসজিদে জ্ঞানচর্চা হত। হিজরতের পরই নবী কারীম (সা.) মাসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করে তাতে কেন্দ্রীয় মাদরাসা স্থাপন করেন। মদীনার অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলো এ মাদরাসার অধীনে পরিচালিত হতো। মহানবী (সা.) মদীনার বাইরে ইয়ামান, বাহরাইন, ওমান, সিরিয়া, তারিফ, মক্কা প্রভৃতি স্থানে মুয়াল্লিম ও মকুরীদীগকে প্রেরণ করেন।

**মাসজিদে নববীঃ**

রসূল (সা.) এর হিজরতের পর মাসজিদে নববীতে কেন্দ্রীয় মাদরাসার অবতারণা হয়। যা মাজলিস বা হালাকা নামে পরিচিত। রসূল (সা.) ফজর নামাজান্তে আবু লুবাবা (রা.) এর খুঁটির নিকটে বসে আসহাবে সুফফা, দুর্বল, হতদরিদ্র মানুষদের তা'লীম দিতেন।

আবু মূসা আল আশআরী (রা.) বলেন, রসূল (সা.) সালাতুল ফাজর শেষ করলে আমরা তার পাশে বসে যেতাম এবং আমাদের কেউ তাকে কুরআন বিষয়ে, কেউ ফারায়েজ বিষয়ে, আর কেউ স্বপ্নের তাবীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন।[২৬৬]

জাবির ইবন সামুরা (রা.) বলতেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) এর মজলিসে গিয়ে যেখানে জায়গা পেতাম, বসে যেতাম। প্রথম পর্যায়ে মজলিসে বসার বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। যে যেখানে জায়গা পেত বসে যেত। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ (সা.) যথারীতি হালাকা বা বৃত্ত তৈরি করেন।

আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। সাহাবীদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল রসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখা। তা সত্ত্বেও তাকে আসতে দেখে দাড়াতেন না। কারণ তারা জানতো এ কাজ তার পছন্দ নয়।

নবী (সা.) এর শিক্ষা মজলিসের ভাব-গাম্ভীর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, অংশগ্রহণকারীগণ গভীরভাবে মনোযোগী থাকতেন।

**আসহাবে সুফফাঃ**

রসূল (সা.) এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসহাবে সুফফা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তারা সর্বক্ষণ রসূল (সা.) এর সান্নিধ্যে থাকতেন। তারা শুধু ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ও জ্ঞানার্জনে নিমগ্ন থাকতেন।

আবু হুরাইরা (রা.) নিজেও আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি তাদের সকলের পানাহারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি বলেন- আমাদের মুহাজির ভাইগণকে বাজারের কাজকর্মসমূহ ব্যস্ত রাখতো, আমাদের আনসার ভাইগণ ব্যস্ত থাকতেন বাগান, ক্ষেত খামার ও বিষয় সম্পদ দেখাশুনার কাজে। আর আবু হুরাইরা (রা.)

---

[২৬৬] মুহম্মদ ইবন সুলায়মান, জাম'উল ফাওয়ায়িদ (মিসর), খণ্ড-১, পৃ. ৪৮

পেটে পাথর বেঁধে রসূলুল্লাহ (সা.) এর সেবায় পড়ে থাকতেন এবং এমনসব সময় ও স্থানে উপস্থিত থাকতেন, যেখানে ঐ সব লোক উপস্থিত থাকতেন না।[২৬৭]

আবু হুরাইরা (রা.) এর এ বর্ণনা যেন আসহাবে সুফাফার মুখপাত্র।

**৩. ইসলামে শিক্ষার শৈশব:**

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (সা.) কে আল কুরআন ও আল হিকমতের শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এ ধরাধামে শিক্ষক হিসেবেই তিনি প্রেরিত। রাত-দিন, ভিতরে বাইরে সর্বাবস্থায়, সকল স্থানে তিনি ছিলেন চলমান শিক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রায় এক লাখ সাহাবী তার থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- "আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রসূল পাঠিয়েছেন। যে তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে তাদেরকে, পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"[২৬৮]

রসূল (সা.) আমৃত্যুই আদর্শ শিক্ষক হিসেবে উম্মাহর মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (রা.) . . . আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন-

"আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই মুষলধারার বর্ষণের মত যা ভূমিতে পড়ে এবং উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, তার এমন একটা পরিচ্ছন্ন অংশ পানি শোষণ করে নেয়। তারপর সেখানে প্রচুর ঘাস ও লতা-গুল্ম জন্মায় আর সেই ভূমির অপর একটি অংশ উদ্ভিদ অঙ্কুরোদগম অনুপযোগী, যা বর্ষিত পানি ধরে রাখে। আল্লাহ সেই পানি দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে সেই পানি পান করে। অন্যদেরকে পান করায় এবং তা দ্বারা কৃষি ভূমিতে সেচ দেয়। আর ভূমির একটি অংশ হলো প্রস্তরময় প্রান্তর ও পাহাড়-পর্বত, যা পানি ধরে রাখে না এবং সেখানে উদ্ভিদও গজায় না। এ হলো সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন যে আল্লাহর দ্বীনকে ভালো মত বুঝেছে, আমার 'ইলম ও হিদায়াত তার উপকারে এসেছে। তা নিজে শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আর সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে 'ইলম ও হিদায়াত আসার পর মূর্খতা থেকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি এবং আল্লাহর হিদাইআত যা সহকারে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কবুল করেনি।"[২৬৯]

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: উপমহাদেশের তৎকালীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা**

মক্তব বা মাদ্রাসা নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষানুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত কেননা এ শিক্ষালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নৈতিক নান্দনিকতার মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর।

অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই উপমহাদেশে নৈতিক নান্দনিক শিক্ষার অনুশীলন শুরু হয় যখন কি না উপমহাদেশ কোন মুসলিম শাসনের অধিভুক্ত হয় যার সূত্রপাত ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে। সিন্ধু

---

[২৬৭] *সহীহ আল-বুখারী*, বাবু হিফজিল ইলম।

[২৬৮] আল-কুরআন ৩: ১৬৪

[২৬৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রা.) *বুখারী শরীফ*: ৭৯, সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট, ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত, ৬২, খন্ড: ১ম, পৃ.: ৬৩

বিজয়ের হাত ধরে ভারতে মাদ্রাসা শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু হলেও প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এরও বেশ কিছুকাল পর।

মুহাম্মদ ঘুরী ১২০০ শতকের শেষের দিকে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৯১ সালে তিনি আজমীরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মোঘল আমলে ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-i-Studies on Compulsory Education এ উল্লেখ করা হয় যে, মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঅঙ্গীন বিবেচনা করা হতো। পবিত্র কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম পরিবারের শিশুর হাতেখড়ি হতো। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ এ.আর. মল্লিক বলেন-

"বাংলার মুসলমানদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যখন কোন সন্তানের বয়স চার বছর চার মাস চার দিন পূর্ণ হতো তখন তার বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কোরানের কিছু অংশ শিশুকে পাঠ করে শোনানো হতো। শিশু তা পুনরাবৃত্তি করতো। এ ছিল প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।"[২৭০]

**সুলতানি আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা**

বাংলায় প্রথমবারের মত মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলার একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল নদীয়া জয়ের মাধ্যমে। ভারতে প্রায় (১২০৬-১৫২৬) ৩২০ বছর পর্যন্ত দিল্লী সালতানাত কায়েম ছিল। চারজন তুর্কি একজন আফগান বংশোদ্ভূত সুলতান এই দীর্ঘ সময় দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তুর্কি সুলতানগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরবী-ফারসি ভাষা শিক্ষা, কুরআন-সুন্নাহ অধ্যায়ণসহ অশ্বচালনা, যুদ্ধবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সংস্কৃত, হিন্দি, ব্রজবুলি, মারাঠা, বাংলা, তেলেগু, ভাষার প্রচলন থাকলেও ফারসিই ছিল দাপ্তরিক ভাষা। আমীর খসরু, মিনহাজ-ই- সিরাজ শামস-ই-সিরাজ, আফিফ, জিয়াউদ্দীন বারানী, ইয়াহিয়া বিন আহমাদ সরহিন্দ প্রমুখ শিক্ষিত শ্রেণি সুলতানী দরবার অলংকৃত করতেন। এ সময় সুলতানগণ ভারতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল মাসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ। শামসুদ্দীন ইলতুতমিশের আমলে (১২১১-১২৩৬) দিল্লীতে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। গোটা দিল্লী নগরী তাঁর শাসনামলে ভারতে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গৌরব ও মর্যাদার আসনে আসীন হয়। দিল্লী সালতানাতের পাঁচটি রাজবংশের মধ্যে তুঘলকদের আমলে অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পঁচিশ বছরের শাসনামলে কেবল দিল্লীতেই প্রায় এক হাজার মাদ্রাসা নির্মিত হয়। শিক্ষা প্রসারে ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর রাজত্বকালে মোট ১,৩০,০০,০০০ (এক কোটি ত্রিশ লাখ) টাকা ব্যয় করেছিলেন। এ থেকে আলিম ও শিক্ষকরা পেয়েছেন ৩৫,০০,০০০ (পঁয়ত্রিশ লাখ) টাকা এবং বাকি অর্থ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রকাশনা ইত্যাদি খাতে ব্যয় হতো।

মাদ্রাসা ও মক্তবগুলোতে ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির সামরিক অভিযানের পর থেকে শাসকদের নিকট হতে অনুদান পেতে থাকে। বখতিয়ার খলজি নিজে এবং তার পরবর্তী শাসকগণও বেশ কিছু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[২৭০] A. R. Mollic, *British Policy & Muslim in Bengal* Page: 149

**মোঘল আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা**

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক উপমহাদেশে মোঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত। মধ্য এশিয় মুঘল সম্রাটগণ শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ছিলেন। তাঁদের জীবনচরিত থেকে যার প্রমাণ মেলে। বাবরের আমলে দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে, জনসাধারণের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা শাসকের অন্যতম দায়িত্ব।

মোঘল আমলে মাদ্রাসার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সম্রাট আকবর শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে একটি বিশেষ আইন জারি ছিল যে, যখন কোন বিদেশী নাগরিক বা কোন দেশীয় ব্যবসায়ী কোন উত্তরাধীকার না রেখে মৃত্যুবরণ করতেন, তখন তার রেখে যাওয়া ভবনগুলো মেরামত করে মাদ্রাসা কিংবা অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেয়া হতো।

মোঘল শাসকদের সঙ্গে মাদ্রাসায় শিক্ষিত উলামাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উলামাগণ রাজপরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, আদালতে কাজিগিরি বা বিচারকের দায়িত্ব পালন ও সম্রাটের বিভিন্ন রকম দাতব্য কাজকর্মের তদারকি করতেন।

তৎকালীন সমাজে উলামাদের অবস্থান বর্ণনা করে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হান্টার বলেনঃ-

"কাজি অথবা মুসলমান আইনজ্ঞরা দেওয়ানি আদালতে বিচার করতেন, এমনকি আমরা সর্বপ্রথম শিক্ষিত মহলে বিলাতিদের দিয়ে এ দেশের বিচার কাজ চালানোর চেষ্টা করলাম, তখনো মুসলমান আইনজ্ঞরা আইনের পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের সঙ্গে রীতিমতো উঠাবসা করতেন। ইসলামী বিধি ব্যবস্থাই এ দেশের আইন-কানুন ছিল এবং সরকারী ছোটখাটো অফিসগুলো মুসলমানদেরই সম্পত্তি ছিল। তারাই সরকারি ভাষা বলতে পারত এবং প্রচলিত ফারসি অক্ষরে লেখা সরকারি নথিপত্র একমাত্র তারাই পড়তে পারতো।"[২৭১]

**ইংরেজ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা**

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পলাশী যুদ্ধে পরাজয় (১৭৫৭) এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবেরপর সমগ্র পাক ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াদের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র কায়েম হয়। ক্ষমতায় বসেই তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের সমূলে উৎপাটন করতে উদ্যত হয়। ব্রিটিশরা ভাবতে লাগলো রাজ্যহারা মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সর্বস্বান্ত করতে না পারলে তারা সুযোগ পেলেই ক্ষমতা দখলে নেমে পড়বে। তাই তারা শিক্ষাঙ্গনে আমূল পরিবর্তনে মনোনিবেশ করে। তারা প্রথমেই তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী শিক্ষা মাধ্যম কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করার ফন্দি আঁটে। গবেষক এ জেড এম শামসুল আলম লিখেছেন,

"বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের পর থেকে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত সুবে বাংলা ছিল জ্ঞান চর্চার একটি কেন্দ্র। মুসলিম সুবেদার, সুলতান, নায়েব ও নাজিমগণ মাদ্রাসা ও খানকার জন্য উদার হস্তে দান করতেন। নগদ অর্থ যা দিতেন, লাখেরাজ সম্পত্তি দিতেন তার থেকে বেশি।"[২৭২]

পলাশীর যুদ্ধ, উদয়ননালা-বক্সারের পরাজয়ের পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর নামে মাত্র মোঘল বাদশাহ শাহ আলম সুবে বাংলার দেওয়ানি বা রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্ব বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা নজরানার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। ১৭৬৫ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর সম্পাদিত নবাব মীর জাফর ও রবার্ট ক্লাইভ চুক্তিসমহূকে

[২৭১] উইলিয়াম হান্টার, *দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস*, আব্দুক মওদুদ অনূদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০৯

[২৭২] এ জেড এম শামসুল আলম, *মাদ্রাসা শিক্ষা*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০২, পৃষ্ঠা ৩-৪

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নবাব মীর জাফরকে আদায়কৃত রাজস্ব থেকে প্রদান করতো ৫৪,৮৬,১৩১ টাকা। এ সামান্য টাকার বিনিময়ে বাংলার জনগণের ভাগ্য বিক্রয় হয়ে গেল ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা সুবে বাংলার ৮০ হাজার মাদ্রাসা, মক্তব ও খানকার লাখেরাজ জমির উপর খাজনা আদায়ের জন্য দৃষ্টি দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমেই এই লাখেরাজ সম্পত্তি আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন ও জোরজবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের ইজারা দিতে থাকে। এ সংক্রান্ত তিনটি বিধান হলোঃ (১) ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন-১৯,

(২) ১৯১৮ সালের রেগুলেশন-২

(৩) বিরাজমান ল অব ১৮২৮ ( লাখেরাজ ভূমি পুনঃগ্রহণ আইন)। ফলে মাদ্রাসার আয় কমতে থাকে। বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। গুটি কয়েক মাদ্রাসা কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৭৬৫ সাকে সালে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। ২০০ বছর পর ১৯৬৫ সালে এ সংখ্যা ২ হাজারের নিচে নেমে আসে।"

এ ব্যাপারে হান্টারের বক্তব্য হলো-

"শত শত মুসলিম পরিবার ধবংস হয়ে গেল এবং তাদের শিক্ষাপ্রণালী যা লাখেরাজে ওয়াকফর জমিজমার উপর নির্ভরশীল ছিল মারাত্মক আঘাত পেল। মুসলমান আলিম সমাজ (ওয়াকফর জমিজমার মামলা নিয়ে)প্রায় আঠারো বছরের হয়রানির পর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"[২৭৩]
এদিকে কওমি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা ধবংস করে ইংরেজরা মুসলমানদের ধর্ম শেখাতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপন প্রতিষ্ঠা করেন। এ জেড এম শামসুল আলম লিখেছেন, "ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। কলকাতা মাদ্রাসার মুসলিম অধ্যক্ষ ছিলেন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সালে নিযুক্ত শামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহমাদ। এর আগে প্রথম অধ্যক্ষ ড. এ স্পেনজার থেকে আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি পর্যন্ত ২৫ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ নাসারা। ১৭৮০ সালে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ পর্যন্ত ১০ বছর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকায় দারসে নেজামিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল। অতঃপর মাদ্রাসা সিলেবাস থেকে হাদীস, তাফসীর বাদ দেয়া হয়। ১১৮ বছর পর ১৯০৮ সাকে কলকাতা আলিয়া মাদ্রসায় হাদীস, তাফসীর শিক্ষা চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে নাম দেয়া হয় টাইটেল।"[২৭৪]

তৎকালীন আলেম সমাজের উদ্যোগে ভারতের দেওবন্দে প্রথম কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সাকে যেটি ছিল ইংরেজদের দুই ধারার শিক্ষানীতির বিপরীত। বস্তুত এরই হাত ধরে মুসলমানদের পুনরায় ধর্মীয় শিক্ষায় সম্পৃক্ততাসহ এ উপমহাদেশে একটি ত্রিমুখী শিক্ষা ধারা সূচিত হয়।

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: কাঙ্ক্ষিত শিক্ষণ পদ্ধতি**

মানুষের মন আদর্শিক শূন্যতার মাঝে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রত্যয় হলো তার একমাত্র অবলম্বন। আর শিক্ষাই এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে। বস্তুত শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত ও ইতিবাচক পরিবর্তন, সেই সাথে সূক্ষ্ম ও সুকোমল হৃদয়াবেগেরও পরিমার্জন। শিক্ষার এ নীতিদর্শন "পড় তোমার প্রভুর নামে"-মহান এ বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষার সোপান ইসলাম।

---

[২৭৩] উইলিয়াম হান্টার: *ইণ্ডিয়ান মুসলমান*, পৃষ্টা ১২২

[২৭৪] *মাদ্রাসা শিক্ষা* প্রাগুক্ত পৃষ্টা ৪

একটি সভ্য ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির শিক্ষক আদি পিতা প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীই ছিলেন শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত এবং সুশিক্ষার ধারক ও বাহক। এরই ধারবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা.) আমাদেরকে উত্তম শিক্ষাদানের পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তিনি তাঁর কার্যকর পদ্ধতি ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতির মাধ্যমে একটি অজ্ঞ জাতিকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন।

রসূল (সা.) এর শিক্ষা মিশন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

"তিনিই সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন। তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের শিক্ষা দেবে কিতাব ও প্রজ্ঞা যদিও ইতোপূর্বে তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিলো।"[২৭৫]

নিম্নে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রসূল (সা.) এর অনুসৃত কয়েকটি শিক্ষা পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

**উপযুক্ত পরিবেশ**

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ, স্থানের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের ঘাটতি সুষ্ঠু শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। রসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দেয়ার সময় উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন। হাজ্জাজ (র)...জারীর (রা) থেকে বর্ণীত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী (সা) তাকে বললেনঃ তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন : 'আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।"[২৭৬]

অর্থাৎ রসূল (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিতেন। অতঃপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করতেন।

**থেমে থেমে পাঠদান**

রসূলুল্লাহ (সা.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজতর হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এতো ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম পন্থায় থেমে থেমে পাঠ দিতেন। হযরত আবু বাকরাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন,

"তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? এটি কোন মাস? এটি কি জিলহজ্ব নয়? এটি কোন শহর?"[২৭৭]

প্রতিটি প্রশ্নের পর রসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রসূল ভালো জানেন।

---

[২৭৫] আল-কুরআন ৩৯: ২

[২৭৬] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায়: ইলম, পরিচ্ছেদ : অপছন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা, প্রাগুক্ত

[২৭৭] ইমাম, বুখারী (র:), *বুখারী শরীফ*-৬৮ম পরিচ্ছেদ যাদের কাছে হাদিস পৌঁছানো হয়.. । অধ্যঅয়-ইলম, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫-৫৬

**রেখাচিত্রের দ্বারা স্পষ্টকরণ**

কখনো কখনো কোন বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রসূল (সা.) রেখাচিত্র ও অংকনের সাহায্য নিতেন। যেনো শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে। সাদাকা ইবন্ ফাসল (র.)... হযরত আবু মাসঊদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

"রসূল (সা.) একটি চারকোনা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোনের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ, চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।"[২৭৮]

এভাবে রসূল (সা.) রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও তার সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুললেন।

**ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয়**

রসূল (সা.) দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠদান করতেন। তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন তখন তাঁর মাঝে আনন্দের স্ফুরণ দেখা যেতো। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রঙ বদলে যেতো। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেতো। আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেত। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।"[২৭৯]

**গল্প বলার মিষ্টিভঙ্গি**

শেখানোর প্রয়োজনে রসূল (সা.) এমন মিষ্টি ভঙ্গিতে গল্প বলতেন যে, তা প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠতো। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "দোলনায় কথা বলেছেন তিনজন। হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আ.).....

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি (মুগ্ধ হয়ে) রসূল (সা.) এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি আমাকে শিশুদের কাজ সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি তার মুখে আঙ্গুল রাখলেন এবং তাতে চুমু খেলেন।"[২৮০]

অর্থাৎ তিনি শিশুদের মতো ঠোঁট গোল করে তাতে আঙ্গুল ঠেকালেন।

**উপমা দিয়ে বোঝানো**

নবী করিম (সা.) বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম ও স্পষ্ট করণার্থে উপমা প্রয়োগ করতেন। আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহাব (র) ...ে হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হযরত সাহাল (রা.) বলেন, রসূল (সা.) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।[২৮১]

---

[২৭৮] ইমাম, বুখারী (র) *বুখারী শরীফ*-৫৯৭৫, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড; ১০ম ,অধ্যায়: কোমল হওয়া, অনুচ্ছেদ আশা এবং এর দৈর্ঘ্য-২৬৮৬, , পৃঃ ৩৭

[২৭৯] *সহীহ মুসলিম*, ৪৩

[২৮০] *মুসনাদে আহমদ* : ৮০৭১

[২৮১] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৫৭৯, ই.ফা.বা, খণ্ড : ৯ম, অধ্যায় : আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছেদ : ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারীর ফযীলত-২৪৫৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

**শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণ**

রসূল (সা.) পাঠদানের সময় নিজে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতেন যেনো তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (রা) .....হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে মুয়াজ! তুমি কি জানো বান্দাহর নিকট আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। রসূল (সা.) বলেন, তাঁর ইবাদত করা এবং তাঁর শরিক না করা।[২৮২]

অপর হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসূল (সা.) কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন, কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নিবে। নবী করিম (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, তাকে তাওফীক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হিদাইআত দেওয়া হয়েছে।"[২৮৩] উল্লেখ্য, রসূল (সা.) প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি এবং সাহাবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন।

**বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা**

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণী কক্ষে অনেক বেশি মনোযোগী হয়। রসূল (সা.) পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন। মূসাদ্দাদ (রা)... হযরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) তাকে বলেন, "মাসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম রসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কুরআনে সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতঃপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আ'লামিন।"[২৮৪]

**আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন**

ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের কৌশল হিসেবে রসূল (সা.) আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। "হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন।"[২৮৫]

---

[২৮২] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৬৮৬৯, ই.ফা.বা. খন্ড : ১০ম অধ্যায় : জাইমিয়াদের মতের খন্ডন ও আতওহীদ প্রস্‌গ, অনুচ্ছেদ : মুহান াল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি উম্মতকে নবী (সা)-এর দাওয়াত-৩০৯৭, প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৩৪

[২৮৩] ইমাম আবুল হমায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), *মুসলিম শরীফ*, ই.ফা.বা. মে ২০০২, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, পরিঃ যে ঈমানের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং যে ব্যক্তি তার উপর আদিষ্ট বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরবে সে জান্নাতে যাবে, পৃঃ৯৩, হাদীস নং-১২

[২৮৪] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৪১২২, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত অধ্যায় : তাফসীর, অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা (ফতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে- ২২৫৪, খণ্ড : ৭ম, পৃ : ২৫৪

[২৮৫] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ই.ফা.বা. জুন ১৯৯২, খঃ৪র্থ, অধ্যায়ঃ সংসারের প্রতি অনাসক্তি, অনুঃ যে হারাম কাজসমূহ থেকে নিবৃত্ত থাকে সে সর্বাপেক্ষা ইবাদতকারী, পৃঃ৬০০, হাদীস নং-২৩০৮

**গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি**

রসূল (সা.) তার পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াহইয়া (র.)... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভাল ভাবে বোঝা যায়। [২৮৬]

**বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ**

কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত করতে রাসূলে আকরাম (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে বার বার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) ..... হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেন, "তোমরা কুরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে।"[২৮৭]

**প্রায়োগিক পদ্ধতিতে শিক্ষা**

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল প্রাকটিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষা। রসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে নিজে আমল করে সাহাবীদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে কলমে। এজন্য হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, "তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কুরআন। রসূল (সা.) বলেন, তোমরা নামায আদায় কর। যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো।"[২৮৮]

**ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান**

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী রসূল (সা.) ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। মুহাম্মাদ ইবন কাসীর (র) ...হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রহ.) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহর রসূল! আমি নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামায দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতার রসূল (সা.) কে সেদিনের তুলনায় আর কোনদিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। রসূল (সা.) বলেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামায আদায় করবে, সে তা যেন হালকা করে (দীর্ঘ না করে), কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল ও জুল হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে।"[২৮৯]

**শাস্তিদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান**

গুরুতর অপরাধের জন্য রসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো তার শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে শিক্ষাদান করতেন। তবে অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ (সা.) শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন।

---

[২৮৬] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, খ: ৬ষ্ঠ, অধ্যায়: শামাইল, অনু: রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাচনভঙ্গির বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৮২, হাদীস নং-৪১৭২

[২৮৭] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৪৬৬৭, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত অধ্যায় : ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদ : কুরআন শরীফ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ করা-২৬৩২, খন্ড : ৮ম, পৃ. ৩৬৪

[২৮৮] *সুনানে বায়হাকি* : ৩৬৭২

[২৮৯] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৯০, , ই.ফা.বা প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ইলম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : অপছন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায নসীহ বা শিক্ষাদানের রাগ করা-৯০ খণ্ড : ১ম, পৃ : ৭০

যেমন:

শিক্ষাদানে রসূল (সা.) এর চেয়ে নান্দনিক দ্বিতীয় জন আর কেউ নেই। নান্দনিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে এক অপূর্ব শিক্ষণ পদ্ধতি তিনি সমগ্র উম্মাহকে দেখিয়ে গিয়েছেন। এর স্বপক্ষে রসূল (সা.) স্বয়ং বলেছেন, "নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।" একথা স্বত:সিদ্ধ যে, তাঁর মত শিক্ষক এ ধরাধামে আর আসেননি। শিক্ষা প্রদানে তিনি কখনো কঠোরতা, প্রহার ও গালমন্দের পন্থা অবলম্বন করেননি।

আর শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের চূড়ায় আরোহনে সর্বোত্তম শিক্ষকের নীতি আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। রসূল (সা.) পতনুমুখ একটি জাতিকে তার কার্যকর নৈতিক-নান্দনিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছিলেন। তাঁর এ অনুপম শিক্ষাদর্শন শুধু ইহকালীন সাফল্যই বয়ে আনেনি বরং তা পরকালীন জীবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কাজেই ইসলামী নীতিবোধ ও নান্দনিকতা সম্পন্ন একটি সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রসুলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করাই বাঞ্চনীয়।

ইসলামী শিক্ষাদর্শন অনুসারে শিক্ষার চরম লক্ষ হল আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভীতি ও ভালবাসাকে জাগ্রত ও তেজস্বী করে তোলা। ইসলামের আনীত আকীদা, মূল্যবোধ ও শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ব্যক্তিকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলাই ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

শিক্ষা মানুষকে সততা, সত্যবাদিতা, সৌন্দর্য, নৈতিকতা ও সদাচারের মাঝে শৃঙ্খলাবিধান করে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে শেখায়। আর এ শিক্ষাই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন করতঃ নৈতিক ও নান্দনিক ধারাপাতে গতি সঞ্চার করে। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই হল মানুষের উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধের নির্ভুল চেতনা জাগিয়ে তোলা, যা শুধু ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ করবে না বরং তা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপায়নেরও নিয়ামক হবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## ইসলামে চিকিৎসাস শৈলীর নান্দনিক সত্ত্বা

রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া মাখলুকের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ডাক্তারী চিকিৎসা বা পরামর্শ অনুযায়ী ঔষুধ সেবন, স্বাস্থ্যসম্মত রকমারী খাবার গ্রহণ এবং যে কোন অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক চিকিৎসা সেবার মান যথেষ্ট উন্নতি সাধন সত্ত্বেও নতুন নতুন কঠিন রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এখন যদি আমরা মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করি, তাতে দেখতে পাই, আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন- "আমি কুরআনে যা অবতীর্ণ করেছি তা হল মু'মিনদের জন্য সকল রোগের নিরাময় ও রহমত।"[২৯০]

আলোচ্য আয়াতের সারকথা অনুযায়ী রোগ- শোক, বালা-মুছিবত এবং যাবতীয় দুঃখ- কষ্টে আমাদের উচিৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করা। কেননা নিম্নোক্ত হাদীসটি যথার্থ প্রমাণ বহন করে।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন; হে আল্লাহ, রোগ কি কারণে আর আরোগ্যই বা কি কারণে ঘটে? জবাব আসল: 'উভয় কার্যই আমার আদেশে ঘটে থাকে।' অতঃপর মূসা (আ.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'ডাক্তার, চিকিৎসক তবে কোন কাজের জন্য।' জবাব আসল: 'চিকিৎসক শ্রেণী চিকিৎসা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং আমার বান্দাহগণকে রোগ ব্যাধিতে প্রফুল্ল রাখবে, এ উদ্দেশ্যেই চিকিৎসক সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৯১]

তবে এ কথাও ধ্রুব সত্য যে চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামী বিধানের পাশাপাশি চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্বও আমাদের জীবনে অনস্বীকার্য। অসুস্থতায় পতিত ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণের তাৎপর্য অনুধাবন পূর্বক মূসা (আ.) এর জীবদ্দশার একটি ঘটনা তুলে ধরা হল।

হযরত মূসা (আ.) একবার পীড়িত হলে, বণি ইসরাঈল গোত্রের অভিজ্ঞ লোকেরা তাঁকে চিকিৎসা নিতে বললে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন: 'আমি ঔষধ সেবন করব না। আল্লাহ তা'আলা রোগ দিয়েছেন তিনি তা আরোগ্য করে দেবেন।' তাঁর রোগ ক্রমশ: বেড়ে গিয়ে ভীষণ আকার ধারণ করল, সকলে তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। 'সে ঔষধটি এ রোগের বিখ্যাত ঔষধ এবং বহু রোগীকে সেবন করিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে, আপনি ব্যবহার

---

[২৯০] আল-কুরআন ১৭: ৮২

[২৯১] ইমাম গাযযালী (রহঃ) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, অনুক- মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, প্রকাশক- মীনা বুক হাউস, বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার, কমপ্লেক্স, দোকানং নং- ২০৮ (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, মার্চ, ২০১৭ইং ,পৃ. ৯৬৫

করুন’। তিনি উত্তর করলেন: ‘আমি কিছুতেই ঔষধ সেবন করব না , আল্লাহ তা’আলাই আমার রোগ নিরাময় করে দিবেন।’ কিন্তু তাঁর রোগ বেড়েই চলল। ইতোমধ্যে ওহি নাযিল হলো: ‘হে মূসা! আমি ইজ্জতের শপথ করে বলছি, যতদিন তুমি ঔষধ সেবন না করবে, ততদিন আমি কিছুতেই তোমার রোগ নিরাময় করব না। অতঃপর তিনি ঔষধ সেবন করে পূর্ণ স্বস্তি ফিরে পেলেন। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে হযরত মূসা (আ.) এর মনে ভীষণ খট্‌কা বাঁধল। আবার তাঁর প্রতি ওহী আসল, ‘হে মূসা! তুমি কি নিজের তাওয়াক্কুল দ্বারা আমার সৃষ্টি প্রতিপালনের হেকমত বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিলে? ঔষধ সমূহের মধ্যে রোগ নিরাময় করার গুণ আমি ছাড়া আর কে স্থাপন করেছে?[২৯২]

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষ্যমতে ঔষধ ও ডাক্তারই হলো রোগ নিরাময়ের একমাত্র পথ-নির্দেশনা। নীতিগতভাবেই ইসলামের অবস্থান প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির আনুকূল্যে। তবে এটিই যে আশু সমাধান বা আরোগ্য লাভের একমাত্র অবলম্বন ইসলাম এমনটি মনে করে না। ঔষধ তখনই রোগ মুক্তির কারণ বা অসীলা হয় যখন আল্লাহ তা ইচ্ছা করেন। তিনি না চাইলে কোন ঔষধই কার্যকরী হয় না। এই মর্মে সুরা শু’য়ারার ৮০নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর যবানীতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন-

“এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।”[২৯৩]

তিব্বুন নববীর মূল কথা হচ্ছে-

“Every sickness has cure” প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে।”

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, “প্রত্যেক রোগেরই প্রতিষেধক আছে। সুতরা যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে।”[২৯৪]

চিকিৎসা গ্রহণ প্রসঙ্গে নানাবিধ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক শ্রেণির লোক তৈরি ঔষধ ও ডাক্তারের উপরই পূর্ণ আস্থাশীল। আর এক শ্রেণি যারা এ্যালোপ্যাথিক এর উপর বিশ্বাসী নয়। তারা কবিরাজি, হেকিমি, হোমিওপ্যাথী প্রভৃতিতে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তৃতীয় আর এক ধরণের লোক রয়েছে যারা চিকিৎসা গ্রহণ কে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি মনে করে।

তবে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ইসলাম কি মাহাত্ম্য ধারণ করে নিম্নোক্ত দলীল তার সুন্দর প্রমাণ বহন করে- “একদা হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা’আলার নিকট প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ থেকে? মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল আ’লামিন বললেন, আমার পক্ষ থেকে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঔষধ কার পক্ষ থেকে? মহান

---

[২৯২] ইমাম গাযযালী (রহ:) *কিমিয়ায়ে সা’আদাত*, অনুক: মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, প্রকাশক: মীনা বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, মার্চ ২০১৭, পৃ. ৯৬৫

[২৯৩] আল-কুরআন ২৬: ৮০

[২৯৪] ইমাম আবুল গুসাইন মুসলিম (র:) *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-৫৫৫৫, অধ্যায় সালাম, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বললেন, ঔষধ আমার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে চিকিৎসকের প্রয়োজন কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, চিকিৎসকের মাধ্যমে ঔষধ পাঠানো হয়।[২৯৫]

যিনি রোগ দিয়েছেন প্রতিকারও তিনিই দিয়েছেন। তাই বলা যায় চিকিৎসা খোদায়ী বিধান। রোগমুক্তিতে চিকিৎসা গ্রহণ রসূল (সা.) এর সুন্নাত। যার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত হাদীসটি,

"রসূল (সা.) এর যামানায় জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেলে ক্ষতস্থানে তার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। উপস্থিতদের একজন বনী আসবার গোত্রের দুই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন উভয়ই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখেন। তখন রসূল (সা.) বললেন: তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কে ভাল জানে? একথা শুনে উভয়েই বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর রসূল চিকিৎসাতেও কি কল্যাণ আছে?" বর্ণনাকারী যায়িদ ইবনে আসলাম (রা.) ধারণা করেন যে রসূল (সা.) আরো বলেছেন, যিনি রোগ দিয়েছেন চিকিৎসাও তিনি দিয়েছেন।[২৯৬]

শরীরে অসুস্থতা বোধ করলে, সুস্থতা লাভের আশায় ব্যক্তি ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে, এটিই আল্লাহর অমোঘ বিধান। রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে অন্তরের সবটুকু আশা ভরসা নিয়ে আমরা কেবল ডাক্তারী পরামর্শ ও ঔষধপত্রের উপরই নির্ভর করে থাকি। এক্ষেত্রে আল্লাহর অপার রহমত স্বরূপ ইসলামও যে আরোগ্য লাভের অতি চমৎকার সমাধান বাতলে দিয়েছে, মানব কল্যাণে তার সুফল লাভের বিষয়টি আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা নিতান্তই জরুরী।

সকল চিকিৎসকের পথ নির্দেশক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন ও তাঁর রসূলের শেখানো চিকিৎসা পদ্ধতিই প্রকৃতপক্ষে বান্দাহর সুস্থতা লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

কেননা এ চিকিৎসা পদ্ধতির মাঝে এমন এক নান্দনিক সত্তার উপস্থিতি লক্ষণীয় যা একদিকে বান্দাহর রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে সহজসাধ্য এবং একই সাথে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। আবার, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া এ নিয়ামাত (ঔষধ) গ্রহণ করত শিফার উদ্দেশ্যে যেভাবে আল্লাহর স্মরণে দিনাতিপাত করে, তাতে তার অন্তরে যে নান্দনিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। সেটি আল্লাহর সাথে উক্ত বান্দাহর আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করে তোলে।

অধ্যায়টিতে রোগ নিরাময়ের ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন এমন সব প্রাকৃতিক উপাদানাবলী বিশ্লেষিত হয়েছে, যার কার্যকারিতা ঔষধ হিসেবে তো বটেই, এর পরিধি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য পর্যন্ত বিস্তৃত। কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে দেখা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত কল্যাণ সাধনে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাতরাজি যেমন: গাছ-গাছড়া এবং জীবন রক্ষাকারী তরল দ্রব্য- পানি, দুধ প্রভৃতির ব্যবহার বিদ্যমান।

---

[২৯৫] ইবনুল কাইয়িম- *য়াদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ি খায়রিল ইবাদ, সু"আসসাসাতুর রিসালা*, বৈরুত, লেবানন, ৪র্থ মুদ্রণ ১৪২৪ (হিজরী) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ.-২৯

[২৯৬] ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) *আল মুয়াত্তা*, হাদীস নং-১৭৫৭, ৩৪৭৪ অধ্যায়, রোগীর চিকিৎসা ২/২৬০ (১০১) কিতাবুল আরাবী, বৈরুত লেবানন, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে আরোগ্য লাভ**

আলোচ্য পরিচ্ছেদটিতে এক অতি নান্দনিক চিকিৎসাশৈলীর সমাবেশ ঘটেছে। তারই আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ মুক্তির কতিপয় দিকনির্দেশনা এখানে তুলে ধরা হল।

**জ্বর**

অধিকাংশ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ জ্বর। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সব বয়সের মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জ্বর নানা রোগের উপসর্গ, যা রক্ত পরীক্ষা দ্বারা বোঝা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এ রোগের প্রকোপ বেশি- সেসব স্থানে জ্বর প্রায় ১০৫-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যায়। জ্বর নিরাময়ে রসূল (সা.) এর দিকনির্দেশনামূলক বাণীসমূহ উদ্ধৃত হল।

হযরত ফাতিমা বিনতে মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেন, "যখনই জ্বরে আক্রান্ত কোন মহিলাকে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) নিকট আনা হতো, তখন তিনি তার জন্য দু'য়া করতেন এবং তার শরীরে ও বুকে কিছু পানি ছিটিয়ে দিতেন বা গা মুছে দিতেন। এবং বলতেন, আল্লাহর রসূল (সা.) আমাদেরকে পানি দ্বারা জ্বর নিরাময় করতে আদেশ করতেন।[২৯৭]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রসূল (সা.) এর রুগ্নাবস্থায় তার খিদমতে গেলাম। তখন তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তার শরীরে হাত দিলাম এবং বললাম আপনার জ্বরের তীব্রতা তো ভীষণ! নবী কারিম (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দুজন লোকের সমপরিমাণ জ্বর আমার একার। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব (সম্ভবত তাই) তখন নবী কারিম (সা.) বললেন, কোন মুসলমান যদি কষ্ট পায়, তা রোগ যন্ত্রণায় হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ দূর করে দেন, যেভাবে বৃক্ষের পাতাগুলো ঝরে যায়।"[২৯৮]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের হাঁপরসমূহের মধ্যকার একটি হাঁপর এক উত্তপ্ত পাত্রবিশেষ। তোমরা ঠাণ্ডাপানি ঢেলে একে ঠাণ্ডা করো।[২৯৯]

ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ থেকে। অতএব পানি দ্বারা এর তাপ কমিয়ে দাও।[৩০০]

---

[২৯৭] ইসমাঈল আল বুখারি (রহ.) *সহীহ বুখারী*, ৫৩০৪ অধ্যায়, চিকিৎসা, আধুনিক প্রকাশনী ২৫ শিশির দাস লেন, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, সর্বশেষ প্রকাশকাল-১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

[২৯৮] ইসমাঈল আল বুখারি (রহ.) *সহীহ আল বুখারী*, ইসমাঈল আল বুখারি (রহ.) হাদীস নং-৫২৫৬, অধ্যায় পানীয় দ্রব্য, প্রাগুক্ত

[২৯৯] ইবনে মাজাহ (রহ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, ৩৪৭৩ অধ্যায়ঃ চিকিৎসা আধুনিক প্রকাশনী বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, অক্টোবর, ২০০০

[৩০০] ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ) *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং-৩০২৬, ৫৩০৩, অধ্যায়- রোগ ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি জ্বরে আক্রান্ত হও, তখন পরপর তিনদিন প্রত্যূষে সূর্য ওঠার আগে কিছু ঠাণ্ডাপানি শরীরে ছিটিয়ে দাও।[৩০১]

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত "জ্বরে আক্রান্ত কোন নারীকে তার নিকট আনা হলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তার গলদেশে ঢালতেন আর বলতেন ঠাণ্ডা। তিনি আরও বলেছেন, একে পানি ঢেলে ঠাণ্ডাকরো। তিনি আরো বলেছেন, এটি হল জাহান্নামের উত্তাপ থেকে।"[৩০২]

হযরত সাওবান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, জ্বর হল দোযখের টুকরা তোমাদের কারও জ্বর হলে সে যেন তা পানি ঢেলে নিভায়।[৩০৩]

**হৃদ রোগ ও বুক ব্যথা**

আল্লাহ প্রদত্ত দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহের মধ্যে হৃদরোগ বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হৃদরোগ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) এর সুন্দর পরামর্শ নিম্নরূপ-

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, "একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী কারিম (সা.) আমাকে দেখতে তশরীফ আনেন। তিনি স্বীয় হস্ত মোবারক আমার বুকের উপরে রাখলেন। তার পবিত্র হস্তের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। অতঃপর নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করলেন তুমি অন্তরের কষ্ট অনুভব করছ। (তুমি হার্টের রোগী) কাজেই তুমি সাকীফ গোত্রের অধিবাসী হারিস ইবনে কালাদাহর নিকট যাও। কারণ সে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আর সে যেন মদীনার সাতটি আজওয়া খেজুর নিয়ে বীচিসহ পিষে তোমার জন্য তা দিয়ে সাতটি ট্যাবলেট তৈরি করে  দেয়।[৩০৪]

হযরত সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি উৎকৃষ্ট মানের (আজওয়া) খেজুর খাবে। সেদিন বিষ বা জাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩০৫]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সা.) এর সামনে আলোচনারত ছিলাম। আমরা ছত্রাকের উল্লেখ করলে কতক সাহাবী বলেন, ছত্রাক জমিনে বসন্ত রোগ। কথাটি রসূল (সা.) এর কর্ণগোচর হলে তিনি বলেন ছত্রাক হল মান্না এর অন্তর্ভুক্ত। আজওয়া হল জান্নাতের খেজুর এবং বিষের প্রতিষেধক।[৩০৬] (ইবনে মাজাহ)

---

[৩০১] আব্দুল্লাহ আল হাকীম আন নিশাপুরী (রহ) *আল-মুসতাদরাকে হাকীম*, কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ খ্র. অধ্যায়: চিকিৎসা, হাদীস নং-৭৪৩৮

[৩০২] ইবনে মাজাহ (রহ) *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়- চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৪৭৪, প্রাগুক্ত

[৩০৩] ঈসা আত্-তিরমিযী (রহ), *জামে আত-তিরমিযী*, অনু ও সম্পাদনা: মাওলানা মোহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং, প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, আগস্ট, ২০০০ অধ্যায়: চিকিৎস,া হাদীস নং-২০০৪

[৩০৪] আবু দাউদ (রহঃ), *আবু দাউদ শরীফ*, অনুক: অধ্যক্ষ মোঃ ইয়াকুব শরীফ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ১ম-৫ম খণ্ড, আগস্ট, ২০০৬ অধ্যায়: চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৮৩৫

[৩০৫] ইসমাঈল আল বুখারী (রা:) *সহীহ বুখারি*, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ, হাদীস নং-৫০২২, প্রাগুক্ত

[৩০৬] ইবনে মাজাহ (রহ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়- চিকিৎসা,  হাদীস নং-৩৪৫৫, প্রাগুক্ত

আজওয়া খেজুর উন্নতমানের খেজুর যা তৃপ্তিদায়ক। প্রখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট প্রফেসর ড. গাজনবী খালেদ বলেন, সাদ (রা.) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী সাতটি খেজুর ও তার বীচি গুড়ার মাধ্যমে বুকের ব্যথা দূর করা বর্তমানে Modern bypass surgery এর চেয়ে উত্তম।

**রক্তক্ষরণ, প্রদাহ ও জখম নিরাময়ে খেজুর পাতার ছাই**

হযরত সহুল ইবনে আস সায়িদী (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, নবী কারিম (সা.) কীভাবে আহতদের চিকিৎসা করাতেন অথবা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতেন? তিনি উত্তরে বলেন, (উহুদের ময়দানে) যখন রসূল (সা.) এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ হয়ে গেল। তার মুখ-মণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। এবং দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন আলী (রহ.) ঢাল ভর্তি করে পানি এনে তা ঢালতে লাগলেন। এবং ফাতেমা (রহ.) তার মুখমণ্ডলে রক্ত ধুতে লাগলেন কিন্তু ফাতেমা (রা.) যখন দেখলেন যে, পানির তুলনায় রক্ত বেশি তখন তিনি (খেজুর পাতার) একটি চাটাইয়ের কিছু অংশ পোড়ালেন এবং নবী কারিম (সা.) এর ক্ষতস্থানে (ছাই) লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।[৩০৭]

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল, খেজুর পাতার ছাইয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধের কার্যকরী উপাদান বিদ্যমান। খেজুর পাতার ছাই এ Antihaemorrhogic principles এর উপস্থিতি থাকায় এটি রক্ত প্রবাহ থামাতে তরল রক্তকে শুকাতে এবং ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা কমাতে সক্ষম। এছাড়া এতে drying property সম্পন্ন উপাদানও রয়েছে।

**চক্ষু রোগের চিকিৎসায় কুম্বী**

চোখের রোগ নিরাময়ে কুম্বী প্রয়োগের সফল দৃষ্টান্ত রসূল (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়- সাদ ইবনে যায়িদ (রা.) বলেন যে, আমি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি "কুম্বী মান্নার মতোই অথবা এক প্রকার মান্না এবং এর নিংড়ানো পানি বা রস চক্ষু রোগের ঔষুধ।[৩০৮]

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী কারিম (সা.) এর কথা শুনে আমি কয়েকটি (৩/৫/৭) কুম্বী সংগ্রহ করে চিপে রস করে একটি শিশিতে জমা করলাম। পরে তা আমার দাসীর চোখে প্রয়োগ করলাম। এতে তার চোখের ব্যথা দূর হয়ে গেল এবং তার চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে আসল এবং সে রোগ হতে আরোগ্য লাভ করল।[৩০৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সা.) আমাদের বলেছেন, "বেহেশত হেসেছিল যখন কুম্বী বা (truffles) এসেছিল, আর পৃথিবী হেসেছিল যখন কাব্‌রা বা কাবের এসেছিলেন।"[৩১০] (আস-সুয়ূতী)

---

[৩০৭] ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.), *সহীহ আল বুখারী*, অধ্যায়- রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং-৫৩০২, প্রাগুক্ত

[৩০৮] প্রাগুক্ত, অধ্যায়- চিকিৎসা, হাদীস নং-৫২৯৩

[৩০৯] ইসা আত তিরমিযী (রহ.), *জামী আত-তিরমিযী*,অধ্যায়- চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২০

[৩১০] জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস সুয়ূতী (রহ.)), *আল জামিউস সাগীর ফী আহাদীরিল বাশীরিন নাযির*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৯১

সাদ ইবনে যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রহ.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, ছত্রাক হল মান্নার অন্তর্ভুক্ত যা বনী ইসরাঈলের আহারের জন্য পাঠিয়েছিলেন, এর নির্যাস চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।[৩১১]

কুম্বী বর্তমানে মাশরুম হিসেবে পরিচিত। বাংলায় ব্যাঙের ছাতা বলা হয়। এতে ভিটামিন বি' 'খাদ্যপ্রাণ যথা- রিবোফ্লোবিন, নায়াসিন এবং প্যান্টেথেনিক এসিড এবং খনিজ উপাদান যথা- সেলেনিয়াম, কপার এবং পটাশিয়াম থাকে। তবে এটি ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে। কেননা কোন কোনটিতে বিষাক্ত উপাদানও রয়েছে। বিষাক্ত মাশরুমগুলো উজ্জ্বল বর্ণ, অম্ল ও ঝাঝালো  গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। এবং ব্যাসিডিও স্পোর বেগুনী রঙের হয় যা প্রখর রোদেলা স্থানে জন্মে না।

**পোকা মাকড় ও বিচ্ছুর দংশন**

রসূল (সা.) পোকামাকড়ের দংশনে তাৎক্ষণিক লবণ পানি ব্যবহার করতেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, একরাতে আল্লাহর রসূল (সা.) নামায আদায়কালে হাত মাটিতে রাখলে অনুকারে একটি বিচ্ছু তাকে দংশন করে। তৎক্ষণাৎ তিনি একটু লবণ চেয়ে নিয়ে পানিতে মেশালেন। অতঃপর ঐ লবণ পানি দংশিত স্থানে ঢালছিলেন। আর অন্য হাত দিয়ে ক্ষতস্থান বা আক্রান্ত স্থান মালিশরত অবস্থায় পবিত্র কুরআনের সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করছিলেন।[৩১২]

**নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের প্রদাহ**

উক্ত রোগের চিকিৎসায় কুসতে বাহ্‌রী (চন্দন কাঠ), যয়তুন তেল এবং বান জাফরান বা সালপান (ওয়ার্‌স) এর ব্যবহার করতে মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

বিখ্যাত সাহাবী যায়িদ ইবনে আকরাম (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) আমাদেরকে কুসতে বহুরী (চন্দন কাঠ) এবং যয়তুন  তেল দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করতে নির্দেশ দিয়েছন।[৩১৩]

যায়িদ ইবনে আকরাম (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল  (সা) ফুসফুস আবরক  ঝিল্লি প্রদাহে ওয়ার্‌স ঘাস, চন্দন কাঠ ও যয়তুন  তেল (পিষে একত্রে) মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা করতেন।[৩১৪]

হযরত যায়িদ ইবনে আকরাম (রা.) এর অপর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা যয়তুন (জলপাই) ফল খাও এবং এর তেল মালিশ কর কেননা এটা বরকতময় ও প্রাচুর্যময় গাছের ফল।[৩১৫]

---

[৩১১] ইবনে মাযাহ (রাঃ) *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়- চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৪৫৪, প্রাগুক্ত

[৩১২] ওয়ালীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযী (রহ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*,(অনুঃ মু. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ) আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৫ খ্রি. অধ্যায়- চিকিৎসা, হাদীস নং-৪৫৬৭

[৩১৩] ইবনে মূসা আত-তিরমিযী (রহঃ), *জামে-আত-তিরমিযী*, অধ্যায়- চিকিৎসা,হাদীস নং-২০২৯,প্রাগুক্ত

[৩১৪] ইবনে মাজাহ (রাঃ) *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়- চিকিৎসা ,হাদীস নং-৩৪৬৭, প্রাগুক্ত

[৩১৫] ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে-আত-তিরমিযী*, অধ্যায়- যয়তুন খাওয়া, হাদীস নং-১৮০০, প্রাযুক্ত

উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা.) বলেন যে, নবী কারিম (সা.) বলেন, তোমরা ইন্ডিয়ান উড (চন্দন কাঠ) ব্যবহার কর। এতে সাত ধরণের রোগের নিরাময় রয়েছে। যার মধ্যে Pleurisy বা ফুসফুসের বহিরাবরণের প্রদাহ অন্যতম।[৩১৬]

- কুসতে বাহরী (চন্দন কাঠ) বাংলায় কুঠ, আগর কাঠ, কুশ্‌তা, পাচুক, নামে অভিহিত।
- আর যয়তুন তেলকে জলপাই তেল বা Olive oil বলা হয়।
- বান জাফরান বা সালপান (ওয়ারস) এক প্রকার রং জাতীয় উদ্ভিদ। এর আরবী নাম ওয়ারস।

**পেটের পীড়া, ডায়রিয়া ও আমাশয়**

উক্ত রোগ প্রতিরোধে রসূল (সা.) মধুর বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।

প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রসূল (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, "আমার ভাইয়ের পেটে ব্যথা অথবা সে আমাশয় বা ডায়রিয়ায় ভুগছে"। নবী কারিম (সা.) বললেন, "তাকে মধু পান করিয়ে দাও।" সে ব্যক্তি চলে গেল তবে আবার ফিরে এসে বলল, "আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু মধুতে কোন উপকার হয়নি।" তখন তিনি পুনরায় তাকে মধু পান করাতে বললেন। এভাবে আরো দুবার মধু পান করাতে বললেন। এভাবে আরো দুবার এসে একই কথা বলল, আমাশয় বা পায়খানা বেড়ে গেছে। নবী কারিম (সা.) চতুর্থবার বললেন, "আল্লাহই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান করাও।" সুতরাং সে ব্যক্তি তার ভাইকে পুনরায় মধু পান করাল এবং সে সুস্থ হয়ে গেল"।[৩১৭]

আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী একাধিকবার মধু পানের বিষয়টি বর্তমানে স্যালাইন খাওয়ার সাথে তুলনীয়। কেননা উভয়টিই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হয়।

**নিতম্বের ব্যথা**

এ রোগটি থেকে সুস্থতা লাভের ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর বেশকিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়। সেগুলো হল-

- হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, "আমি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি দুম্বার লেজে নিতম্বের বেদনা রোগের (পাছার বাত রোগের) শিফা রয়েছে। এটাকে দ্রবণ করে বা গুলিয়ে তিনভাগ করবে এবং তা খালি পেটে তিনদিন সেবন করবে।"[৩১৮]

---

[৩১৬] ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (রহঃ), *আল মুসনাদ (মুসনাদে আহমদ)* বৈরুত-২০০৮ খ্রি, অধ্যায়- হাদীস উম্মে কায়স বিনতে মিহসাম মুআসসাসাতুর রিসালাহাদীস নং-২৬৯৯৭, ২৭০০০

[৩১৭] আল- বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়ঃ রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং-৫২৭৩, প্রাগুক্ত

[৩১৮] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা ,হাদীস নং- ৩৪৩৩, প্রাগুক্ত

- ইবনুল কাইয়্যিম (রা.) বলেন, রসূল (সা.) এর এ হাদীস হিজায ও তার আশেপাশের লোকজন ও বেদুইন আরবদের জন্য প্রযোজ্য এবং এটা তাদের জন্য এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কারণ এ রোগের উত্তম নিরাময়ই হচ্ছে Laxative ব্যবহার করা।[৩১৯]
- আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) নিতম্বের কোনো রোগের চিকিৎসায় আরবীয় মাঝারি ধরণের দুম্বার লেজ গলিয়ে তিনদিন সেবন করার চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। বর্ণনাকারী আনাস (রহ.) আরও বলেন, আমি তিনশত জনেরও অধিক লোককে এ চিকিৎসা প্রদান করেছি এবং তারা সবাই এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে।[৩২০] (মুসতাদরাকে হাকীম)

**স্মরণশক্তি লোপ**

যে সকল লোকের স্মৃতিশক্তি কম তারা লোবান বা কুন্দুর খুটি সেবন করতে পারেন। উল্লেখ্য এ রোগটি আলঝেইমার্স বা বার্ধক্য জনিত কারণে না হলে লোবানের সাহায্যে আল্লাহর রহমতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

- আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন লোবান গ্রহণ কর। এটা রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে নিংড়ানো পানি খালি পেটে সেবন করবে। কারণ এটা স্মৃতিশক্তির জন্য উপকারী। [৩২১]
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি যদি এক মিসকাল (৪.৩৭৪ গ্রাম) পরিমাণ কুন্দুর খুটির সাথে এক মিসকাল পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করে চূর্ণ করে উক্ত গুড়া পাউডার করে খালি পেটে সেবন করে বা গিলে খায়, তবে তার প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা দূর হবে এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস রোগের জন্য উপকারী হবে।[৩২২]

**লোবান পরিচিতি**

লোবান আরবী শব্দ 'লুবান' থেকে এসেছে। লোবান গাছগুলো বহু প্রজাতির ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এটি যে কোন পরিবেশে এমনকি নিরেট পাথরেও জন্মে। এটি এক ধরণের সুগন্ধী বৃক্ষ নির্যাস, যা আগরবাতি ও আতরে ব্যবহৃত হয়।

**শিঙ্গা বা হিজামা**

শিঙ্গা বা হিজামার সাহায্যে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় কাপিং থেরাপি নামে পরিচিত। এটি একটি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যাকে আমাদের দেশে সাধারণ অর্থে শিঙ্গা লাগানো বলা হয়। বাংলায় রক্তমোক্ষণ বলে। হিজামা শব্দটি আরবী শব্দ আল-হাজম থেকে এসেছে। এর অর্থ চোষা বা টেনে নেওয়া। এ প্রক্রিয়ায় সূচের মাধ্যমে নেগেটিভ প্রেসার দিয়ে নিস্তেজ প্রবাহহীন দূষিত রক্ত বের করে আনা হয়, এতে শরীরের

---

[৩১৯] ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয্যা (রহঃ), *জাদুল মা 'আদফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ*, মু'আসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৩ খ্রি. পৃ. ৭৫

[৩২০] আব্দুল্লাহ আল-হাকীম আন নিশাপুরী (রহঃ), *মুসতাদরাকে হাকীম*, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৪৬১

[৩২১] ইবনুল কাইয়্যিম আল জাত্তাসিয়্যা (রহঃ), *জাদুল মা'আদ ফী হাদ্য়ী খায়রিল ইবাদ*, প্রাগুক্ত ,পৃ. ৩৩৭

[৩২২] আবু বকর আস সুয়ূতী (রহঃ), *আল জামিউস সাসীর ফী আহাদীসিল বাশীরিন নাযীর*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১৯২

* ইবনুল কাইয়্যিম আল জাত্তাসয়্যা (রহঃ), *জাদুল মা'আদ ফীহাদ্য়ী খায়রিল ইবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৭

মাংসপেশীগুলোর রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয় এবং পেশী, চামড়া, ত্বক ও শরীরের ভেতরের অর্গানগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এটি হযরত মোহাম্মদ (সা.) নির্দেশিত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা।

হিজামা বা কাপিং থেরাপি এমন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে স্থানিক রক্তাধিক্য তৈরি করা হয়। কাপের ভিতরে আংশিক বায়ু শূন্যতা সৃষ্টি করে ত্বকের ওপর তা বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নেগেটিভ পাম্প ব্যবহার করে ত্বকের ভেতরে বায়ু শূন্যতা তৈরি করা হয়। এটি ত্বকের নিচের টিস্যুতে টান দেয়। ত্বকের উপর কয়েক মিনিট কাপ বসিয়ে রাখলে কাপের নিচে দূষিত রক্ত কেন্দ্রীভূত হয়। দেহের মেরিডিয়ানকে প্রতিবন্ধকতামুক্ত করার জন্য বর্তমানে কাপিং থেরাপি উন্নত করা হয়েছে। উল্লেখ্য মেরিডিয়ান হল দেহের অভ্যন্তরের নালী যার ভেতর দিয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গে ও টিস্যুতে শক্তি প্রবাহিত হয়। দেহের অভ্যন্তরে মেরিডিয়ান নালীগুলো বন্ধ হলে রোগ ও অসুস্থতা ঘটে। এই নালীগুলো মুক্ত করলে রোগ মুক্তি দ্রুততর হয়। সম্ভবত কাপিংই হল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি যার মাধ্যমে মেরিডিয়ানগুলো মুক্ত করা যায়। এটি আরবী হিজামার আধুনিক রূপ। হিজামা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হল-

- হযরত আনাস (রা.) থেকে  বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, তোমরা যে সব পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করছে তার মধ্যে শিঙ্গা লাগানো এবং কুসতে বাহরী (চন্দন কাঠ) অতি উত্তম ব্যবস্থা।[৩২৩]
- হযরত নাফে (রা.) বর্ণনা করেন, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একদা বলেন, আমার রক্তের মধ্যে বিশেষ চাপ, উত্তেজনা বা স্ফুটন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই একজন হাজ্জাম বা শিঙ্গা লাগানোওয়ালাকে ডাকো। সে যেন যুবক হয়, বৃদ্ধ বা অল্পবয়সী না হয়। অতঃপর ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি, "খালি পেটে শিঙ্গা লাগানো খুবই উত্তম। এতে রোগমুক্তি ও বরকত রয়েছে। এতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, মেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়।[৩২৪]
- আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) এর পা মোবারকে যে ব্যথা ছিল তার জন্য ইহরাম অবস্থায় তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।[৩২৫]
- হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, "নবী কারিম (সা.) তাঁর উভয় কাঁধের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফোলা অংশে রক্তমোক্ষণ করাতেন।"[৩২৬]
- হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (সা.) স্বীয় ব্যথার কারণে মাথায় এবং ক্লান্তি ও অবসন্নতার কারণে স্বীয় রানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন।[৩২৭]

---

[৩২৩] আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং-৫২৮৫
[৩২৪] ইবনে মাজাহ (রহ:), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত,অধ্যায়: চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৮৭
[৩২৫] ইবনে শুয়াইব আন-নাসাঈ (রহ:), *সুনানে আন-নাসাঈ*, অধ্যায়- হজ্জের বিধিবিধানসমূহ, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা , বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১১০০, অক্টোবর, ২০০২,৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং-২৮৫১
[৩২৬] ঈমাম আবু দাউদ সুলায়মান (রহ:), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত অধ্যায়ধ: চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৮২০
[৩২৭] প্রাগুক্ত, অধ্যায়: চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৮২৪

- হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) তার ঘোড়া থেকে একটি খেজুর গাছের উপর ছিটকে পড়লে তাঁর পা মচকে যায়। ওয়াকী (রা.) বলেন, ব্যথার কারণে তিনি মচকে যাওয়া স্থানে রক্তমোক্ষণ করান।[৩২৮]
- আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "কোন ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ করাতে চাইলে যেন মাসের ১৭, ১৯ বা ২১ তারিখকে বেছে নেয়। তোমাদের কারও যেন উচ্চরক্তচাপ না হয়। কারণ তাতে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে।"[৩২৯]
- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, মেরাজের রাতে যখন আমি প্রতিটি ফেরেশতা দল অতিক্রম করি, তখন তারা আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ (সা.) তোমার জাতিকে শিঙ্গা লাগাতে (রক্তমোক্ষণ করাতে) নির্দেশ দাও।[৩৩০]
- আছেম (রা.) থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) 'মুকান্না' নামে এক ব্যক্তিকে সেবা শুশ্রুষা করতে গেলেন। অতঃপর বললেন, তুমি রক্তমোক্ষণ না করানো পর্যন্ত আমি যাবো না। কেননা আমি রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, এতে রোগের নিরাময় রয়েছে।"[৩৩১]
- হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) বর্ণনা করেছেন, শিঙ্গা লাগালে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতি ও মেধাশক্তি প্রখর হয়।[৩৩২]

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বৃক্ষ-লতা ও ফলমূলের কার্যকারিতা

আমাদের দেশে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন প্রদত্ত প্রায় পাঁচ হাজার উদ্ভিদ রাজির সন্ধান মেলে। এর প্রায় সাড়ে পাঁচশত উদ্ভিদই ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। ইউনানী, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিসহ বিভিন্ন প্রসাধনীতে ভেষজ উপাদানসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিশেষ উপকারী ভেষজ গাছগাছালিসমূহ হল- খেজুর, কালিজিরা, ঘৃতকুমারী, হালিম, ডুমুর, মেহেদি, সোনামুখী, বিহিদানা, লাউ, মেথি, কাসমী, মুররু, থানকুনি, অর্জুন, আমলকী, হরিতকি, কালমেঘ, নিম, বহেরা, বসাক, উলটকমল, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, তুলসী, বাবলা, শতমূলী, ইসবগুল, আদা, হলুদ, রসুন, পিঁয়াজ ইত্যাদি।

[৩২৮] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, হাদীস নং-৩৪৮৫
[৩২৯] প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৮৬
[৩৩০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৭৭
[৩৩১] আল বুখারী (রহঃ), *আল বুখারী*, , প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস সহীহ নং-৫২৮৫
[৩৩২] আব্দুল্লাহ আল হাকীম আন-নিশাপুরী (রহঃ), *মুসতাদারেক হাকীম*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, হাদীস নং-৭৪৮১, ৭৪৭৯

এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল:

### খেজুর (Date palm)

খেজুরের অশেষ উপকারিতার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত। সূরা আনআম, সূরা নাহল, সূরা মারিয়ামসহ সমগ্র কুরআনে ২০ বার খেজুর কথাটি এসেছে। খেজুর সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী কারিম (সা.) বলেন, আমাকে বল যে, কোন গাছটি একজন মুসলমানের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ? তখন সাহাবীগণ মরুভূমিতে জন্মে এমন বেশকটি গাছের কথা উল্লেখ করলেন। তখন নবী কারিম (সা.) বললেন, এটি হচ্ছে খেজুর গাছ।[৩৩৩]
- ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) এর জন্য সাহাবীগণ রাতে খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রাখতেন। তিনি সেদিন এবং তার পরের দিন সেই পানি পান করতেন। তার পরদিন বিকেলেও তিনি সেই খেজুর পানি পান করতেন এবং অপরকেও তা পান করতে দিতেন।[৩৩৪]
- হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, "মদীনার উঁচু এলাকার আজওয়া খেজুরে রোগ মুক্তির উপাদান রয়েছে।"[৩৩৫]
- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোযা রাখে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কারণ পানি পবিত্র বা পবিত্রতা সৃষ্টিকারী।[৩৩৬]
- হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা (তাঁর মা ও অন্যান্যরা) আমাকে মোটা করার জন্য সবকিছু করেছেন। কিন্তু আমি মোটা হইনি। তখন তারা (মা ও অন্যান্যরা) আমাকে শসা ও পাকা খেজুর একত্রে খেতে বলেন। ফলে আমার শরীরের ওজন বেড়ে যায়। আমি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠি।[৩৩৭]
- হযরত মূসা আল-আশআরী (রা.) বলেন, আমার একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু ছিল। আমি তাকে নবী কারিম (সা.) এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম। এরপর একটি খেজুর চিবিয়ে রস নিয়ে তা শিশুটির মুখের ভিতর লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তার বরকতের জন্য নবী কারিম (সা.) দুআ করলেন। তারপর তাকে আমার কাছে ফেরত দিলেন। এ ছিল মূসা আল-আশআরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান।[৩৩৮]

---

[৩৩৩] আল-বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যগ্রহণ, হাদীস নং-৫০৪৪

[৩৩৪] আল কুশাইরী আন নিশাপুরী (রহ:), প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানীয় দ্রব্য, *সহীহ আল মুসলিম*, হাদীস নং- ৫০৬০, ৫০৬১

[৩৩৫] প্রাগুক্ত, অধ্যায়: পানাহারে শিষ্টাচার ও রীতিনীতি, হাদীস নং-৫১৭০

[৩৩৬] শুয়াইব আন-নাসাঈ (রহ:), *সুনানে আন-নাসাঈ কুবরা*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়- উত্তম ইফতার,হাদীস নং-৩৩১৭

[৩৩৭] আবু দাউদ (রহ:), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: মোটা হওয়া ,হাদীস নং-৩৮৫৩

[৩৩৮] আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আকীক্বাহ ,হাদীস নং- ৫০৬২

খেজুর স্বাস্থ্য সহায়ক ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ। এটি রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। এছাড়া খেজুরে ভিটামিন এ, বি সহ Nicotinic Acid বিদ্যমান যা Pellegra প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী। হযরত মারিয়াম (আ.) এর জন্য বেহেশত থেকে খেজুর খাদ্য হিসেবে আসত।

**কালিজিরা (Black cumin)**

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন প্রদত্ত দানাদার উদ্ভিদরাজির মধ্যে কালিজিরার সুফল সর্বাধিক। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় কালিজিরা ক্যান্সার, নিম্ন রক্তচাপ, দুর্বল শ্বাস- প্রশ্বাস, বাত ও ব্যথা বেদনা, রোগ প্রতিরোধ এবং বার্ধক্য প্রতিরোধে সক্ষম। কালিজিরার উপকারিতা উল্লেখপূর্বক নবী কারিম (সা.) এর বাণীসমূহ নিম্নরূপ-

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি, কালিজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা বা নিরাময় রয়েছে।[৩৩৯]

- খালিদ ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, "আমরা গালিব ইবনে আবযার এর সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন আমরা মদীনায় ফিরে আসি তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন ইবনে আবি আতিক তাকে দেখতে এসে বলেন, তাকে কালিজিরার সাহায্যে চিকিৎসা প্রদান করো। এবং পাঁচ- সাতটি কালিজিরার বীজ গুড়ো করে তেলে মিশিয়ে উভয় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাও। কারণ আয়িশা (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি নবী কারিম (সা.) থেকে শুনেছেন যে, কালিজিরা একমাত্র সাম ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন সাম কী? তিনি উত্তর দেন সা'ম অর্থ মৃত্যু।[৩৪০]

**ঘৃতকুমারী (Aloe vera)**

এই ঔষধি গাছটির উপকারিতা রসূল (সা.) এর নিকট পছন্দনীয় ছিল। ইয়েমেনের উপকূলীয় অঞ্চল 'সোবত্র' নামক স্থানে উৎকৃষ্টমানের ঘৃতকুমারী পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর নির্দেশনা হল:-

- হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন আবু সালামা (রা.) এর মৃত্যুর পর নবী কারিম (সা.) আমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসেন। ঐ সময় আমার চোখে মূসাব্বর লাগিয়ে রেখেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? আমি বললাম এটি মূসাব্বর। এতে কোন সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন, এটি মুখ-মণ্ডল উজ্জ্বল করে অথবা এটি চেহারাকে রঞ্জিত করে। সুতরাং তুমি এটি দিনে মুছে ফেলবে। তুমি এটি রাতে ব্যবহার করবে।[৩৪১]

---

[৩৩৯] আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং-৫২৭৭, অধ্যায় রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত

[৩৪০] প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ, রোগী ও চিকিৎসা হাদীস নং-৫২৭৬

[৩৪১] ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ:), *আল মুয়াত্তা*, কিতাবুল আরবী, বৈরুত, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি:, অধ্যায়: স্বামীর মৃত্যুতে সাজসজ্জা পরিহার করা, ১/৪০৪ (৯৩), হাদীস নং-১২৭৫

- হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি যে ইহরাম অবস্থায় ছিল, রসূল (সা.) এর কাছে এসে তার চোখের অসুস্থতার কথা বলল, তখন  তিনি তাকে বললেন, ঘৃতকুমারীর প্রলেপ লাগিয়ে দাও।[৩৪২]

ঘৃতকুমারীর নির্যাস থেকে Baby oil, face cream এবং স্বাস্থ্যকর জুস ও জেল তৈরি হয়ে থাকে।

**হালিম (Cress)**

এটি আরবীতে আছ-ছাফ্‌ফা এবং বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে হালিম নামে পরিচিত। এর ফলগুলো সাদা এবং এর উৎপত্তি হিজায ও নাজদ প্রদেশে।

- কায়েস ইবনে রাফে আল কায়সী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "কোন দুটো তিক্ত জিনিসে রোগ নিরাময় হয়ে থাকে? তিনি নিজেই প্রশ্ন করে আবার নিজেই উত্তর দেন। তিনি বলেন, এদুটো জিনিস হচ্ছে ঘৃতকুমারী ও হালিম।"[৩৪৩] (ইবনুল কাইয়্যিম)

উল্লেখ্য স্যুপের সাথে রান্না করে খেলে এটি বুক পরিষ্কার করে ও চুল পড়া বন্ধ করে। হালিম কাচা খাওয়া যেতে পারে। এর সতেজ পাতা স্যুপে দেওয়া যায়। এছাড়া হালিম থেকে তৈরি Infusion আমাশয় ও বমি দূর করতে কার্যকর। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং সামান্য পরিমাণে ভিটামিন এ, বি এবং ক্যারোটিন আছে। তাছাড়া আরও আছে সালফার, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং antibiotic property সম্পন্ন উপাদান।

**ডুমুর (Fig)**

আমরা জানি মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সূরা আত-ত্বীনে ডুমুরের বিষয়টি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। নবী (সা.) ও ডুমুরের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

- হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, তোমরা ডুমুর খাও। এটি অর্শ্ব রোগ দূর করে এবং গিটবাতে উপকারী।[৩৪৪]

ডুমুরের আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম ব্যবহার হচ্ছে কিডনী ও মূত্রথলির পাথর দূরীকরণের এটি নির্ভরযোগ্য Laxative ঔষধ। Asthma ও Sexual debility তেও এটি বেশ কার্যকর।

গবেষণায় আরো জানা যায়, ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান ডুমুরে ৬৪ ভাগেরও বেশি চিনি জাতীয় পদার্থ আছে। এছাড়া ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস কপার, সাইট্রিক এসিড, ম্যালিক এসিডসহ বেশ কতগুলো Inorganic Acids রয়েছে।

---

[৩৪২] আল কুশাইরী আন নিশাপুরী (রহ:), *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-২৭৫৬, অধ্যায়: ইহরাম বাধা, প্রাগুক্ত

[৩৪৩] ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যা (রহ:), *জাদুল মা'আদ ফী হাদ্‌য়ী খায়রিল ইবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ;২১৭

[৩৪৪] আবু বকর আস সুয়ূতী (রহ:), *আল জামিউস সগীর ফী আহদীসিল বাশীরিন নাযীর*, প্রাগুক্ত,হাদীস নং-৬৩৯৩, পৃ. ৩/২৯১

## লাউ (Groud)

লাউ এমন একটি খাদ্য উপাদান যা মহানবী (সা.) এর অধিক প্রিয় ছিল। এটি খুব সহজেই বাড়ির আঙ্গিনা থেকে শুরু করে জমিতেও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা যায়। লাউয়ের বিশেষ গুণাগুণ সম্পর্কে রসূল (সা.) এর হাদীস নিচে দেওয়া হলঃ

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) জনৈক দর্জি রসূল (সা.) কে খানা খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমন্ত্রণকারী যবের রুটি ও স্যুপ পরিবেশন করেন যার মধ্যে লাউ ও শুকনো গোশতো ছিল। রসূল (সা.) তরকারী পাত্রের কিনারা থেকে লাউয়ের টুকরা খুঁজে খুঁজে বের করে খাচ্ছিলেন। ঐদিন থেকে আমিও সর্বদা লাউ খাওয়া পছন্দ করতাম।[৩৪৫]

- রসূল (সা.) বলেন, লাউ বা কদু মানুষের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে এবং মস্তিস্ক সতেজ রাখে।[৩৪৬]
- হযরত আবূ হুরাইরা (রহ.) তিনি বলেন, "আমি আনাস (রহ.) কে দেখতে গেলাম। তখন তাকে লাউ খেতে বলতে শুনেছি। হে লাউ গাছ! আমি তোমাকে কত পছন্দ করি, কারণ আল্লাহর রসূল (সা.)ও তোমাকে পছন্দ করতেন তাই আমিও তোমাকে খেতে ভালাবাসি"[৩৪৭]
- হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, "যে কেউ লাউ ও ডাল একত্রে খাবে তার বর্ধিত হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গমশক্তি বৃদ্ধি পাবে।"[৩৪৮]

গবষণায় জানা যায়, লাউয়ে ৯৬% পানি, ২% আমিষ জাতীয় পদার্থ, ১% চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং ২.৫% শর্করা জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। এছাড়াও এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, কিছু পরিমাণ ভিটামিন বি ও সি আছে। এটি হজম কারক এবং সবজি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। নিদ্রাহীনতা, মাথাব্যথা উপশম, কৃমিনাশক, পিপাসা দূরীকরণ প্রস্রাব বৃদ্ধি ও শোথরোগ দূর করতে লাউ উপকারী।

## মেথি (Fenugreek)

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রোগমুক্তিসহ বিভিন্ন কাজে মেথির ব্যবহার করে আসছে। রসূল (সা.) ও তার সাহাবাদের মাঝেও মেথির ব্যবহার দেখা যায়।

---

[৩৪৫] আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং- ৫০৩৬, অধ্যায়ঃ তরকারীর মাল, প্রাগুক্ত

[৩৪৬] আশ-শামী আত-তাবারানী (রহঃ), *আল-মু'জামুল কাবীর*, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ,হাদীস নং-১৮০০৩, অধ্যায়ঃ ২২/৬৩ (১৫২)

[৩৪৭] আত-তিরমিযী (রহঃ), *জামে-আত-তিরমিযী*, হাদীস নং-১৭৯৭, অধ্যায়ঃ আহার ও খাদ্যদ্রব্য, প্রাগুক্ত

[৩৪৮] আবু বকর আস সুয়ূতী (রহঃ), *আল জামিউস সাগীর ফী আহদিসীল বাশিরীন নাযির*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৫

নিচে মেথির গুণাগুণ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা হল।

- হযরত কাছিম ইবনে আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, "তোমরা রোগ নিরাময়ে মেথি ব্যবহার কর।[৩৪৯]
- একদা রসূল (সা.) সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) নামে একজন প্রখ্যাত সাহাবীকে দেখতে যান। তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে একজন চিকিৎসক ডাকার পরামর্শ দিলেন। হারিস ইবনে কালাদাহ (রা.) এলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি বললেন, তার তেমন কিছু হয়নি। শুধুমাত্র কিছু মেথি, বার্লি ও নরম আজওয়া খেজুর একত্রে মিশিয়ে স্যুপ তৈরি করে তাকে খাওয়াও।[৩৫০]

মেথি এমন একটি উপকারী বীজ যা ব্লাড কোলেস্টোরেল হ্রাস, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও পরিপাকতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, মূত্রনালীর রোগ, পেটব্যথা, Hypoglycemia ডায়াবেটিস এবং ক্লান্তি অবসাদ দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

### সোনামুখী (Senna)

সোনামুখী হল বহুবিধ গুণাগুণ সম্পন্ন ভেষজ উদ্ভিদ। সোনামুখী কোষ্ঠকাঠিন্য দূর, রক্ত পরিষ্কার, বুদ্ধিহীনতা, গীটবাত এবং শ্বাস- প্রশ্বাস স্বাভাবিক কারণে ব্যবহৃত হয়। এর উপকারিতা সম্পর্কে নবী **কারিম** (সা.) বলেন, হযরত উবাই ইবনে উম্মে হারাম (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রসূলকে  বলতে শুনেছেন, তোমরা অবশ্যই সিনা ও শুলফা ব্যবহার করবে। এ দুটোতে সা'ম ছাড়া সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রসূলুল্লাহ সা'ম কী? তিনি বললেন, মৃত্যু।[৩৫১]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেন, তিনটি জিনিসে সকল রোগের নিরাময় রয়েছে। একমাত্র ক্যান্সার ব্যতীত। এগুলো হচ্ছে সিনা ও শুলফা। তারা বলল আমরা সিনা সম্পর্কে অবহিত কিন্তু শুলফা কী? রসূল (সা.) বলেন, ইনশাআল্লাহ, তোমরা সত্যি জানতে পারবে। তারপর বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয় জিনিসটির নাম আমি ভুলে গেছি।[৩৫২] (আন-নাসায়ী)

একদা নবী কারিম (সা.) আসমা বিনতে উমাইস (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের চিকিৎসা কর? তিনি বললেন শুররুম এর  সাহায্যে। তখন নবী **কারিম** (সা.) বললেন, এটি বেশ গরম ও শক্তিশালী জোলাপ। তখন আসমা (রহ.) বললেন, অতঃপর আমি সিনাও ব্যবহার করে থাকি। তখন নবী **কারিম** (সা.) বললেন, এমন কোন প্রতিষেধক যদি থাকত যা মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সক্ষম তাহলে তা হতো সিনা।"[৩৫৩]

---

[৩৪৯] ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ), *জাদুল মা'আদ ফী হাদয়ী যয়বিল ইপাপ*,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

[৩৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

[৩৫১] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদীস নং-৩৪৫৭, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, প্রাগুক্ত

[৩৫২] শুয়াইব আন-নাসায়ী (রহঃ), *সুনানে আন-নাসায়ী*, হাদীস নং-৭৫৭৭, অধ্যায়ঃ সানা দ্বারা চিকিৎসা, প্রাগুক্ত

[৩৫৩] ঈসা আত-তিরমিযী (রহঃ), *জামে-আত-তিরমিযী*, হাদীস নং-২০৩১, অধ্যায়ঃ সানা দ্বারা চিকিৎসা, প্রাগুক্ত

**বিহিদানা (Quince)**

বিহিদানা অম্ল জাতীয় টক মিষ্টি ফল। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়। এর আরবী নাম Safarzal। বিহিদানা প্রসঙ্গে নবী **কারিম** (সা.) এর হাদীস নিচে দেওয়া হল।

হযরত তালহা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী **কারিম** (সা.) বলেছেন, তোমরা বিহিদানা খাও, কারণ এটি চিত্তকে প্রশান্ত করে। আল্লাহর এমন কোন নবী বা রসূল (সা.) নাই যিনি বেহেশতের বিহিদানা খাননি। কারণ বিহিদানা কমপক্ষে ৪০ জন মানুষের শক্তি জোগায়।[৩৫৪]

হযরত তালহা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা বিহিদানা খাও কারণ এটি চিত্তকে কোমল করে ও অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং সন্তানের গঠন সুন্দর করে।[৩৫৫]

বিহিদানা তৃষ্ণা নিবারণ, বমি বমি ভাব হ্রাস, মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি,কফ প্রশমন, গলা ব্যথা ও স্বরভঙ্গ রোধে এবং এর ঘন নির্যাস লিভার ও আত্মাকে সতেজ ও শক্তিশালী করে। বিহিদানা থেকে তৈরীকৃত সিরাপগুলো হলোঃ Astringent syrup, lime syrup, simple syrup ইত্যাদি।

**মেহেদীঃ (Henna)**

মেহেদী এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এর আরবী নাম হচ্ছে হিন্না বা ফাগিয়া এবং বৈজ্ঞানিক নাম Lawsonia, incrmis.

নবী কারিম (সা.) মেহেদী পাতাকে ঔষুধ হিসেবে প্রায়ই ব্যবহার করতেন। যেমনঃ শরীরে বা পায়ে কাটা অথবা অন্য কিছু বিঁধলে, ব্যথা পেলে বা কোন ফোড়া হলে তা পাকানোর জন্য মেহেদী ব্যবহার করতেন। মেহেদীতে জীবাণু নাশক গুণ থাকায় তা আহত স্থানে লাগিয়ে রাখলে ব্যথা উপশম হয়। মেহেদী পাতা পিষে Sodium benzoate সামান্য পানিতে মিশিয়ে তা মেহেদী Paste এর সাথে মিশ্রিত করলে উক্ত Paste অনেকদিন ব্যবহার করা যাবে। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু রাফে (রা.) বলেন যে, একদা নবী কারিম (সা.) হাত দিয়ে দাড়ি নাড়াচাড়া করলেন এবং বললেন, তোমরা মেহেদী ব্যবহার কর। এটি হচ্ছে সকল প্রকার রঙের রাজা যা মানুষের ত্বককে সুন্দর করে এবং সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি করে।"[৩৫৬]

সালমা উম্মে রাফে (রা.) বর্ণনা করেন নবী কারিম (সা.) কখনো আঘাত পেলে বা তার শরীরে কাটা বিদ্ধ হলে তিনি আহত স্থানে মেহেদী লাগাতেন।"[৩৫৭]

---

[৩৫৪] আবু বকর আস সুয়ূতী (রহঃ), *আস জামিউস সাগীর ফী আহদিসীল বাশিরীন নাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[৩৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[৩৫৬] শুয়াইব আন নাসারী (রহঃ), *সুনানে নাসায়ী*, অধ্যায়ঃ খিযাব, হাদীস নংঃ৫০৭৮-৫০৮২

[৩৫৭] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*,অধ্যায়ঃ চিকিৎসা, মেহেদী, প্রাগুক্ত, হাদীস নংঃ৩৫০২

আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) একদা বলেছেন, "তোমাদের সাদা চুল পরিবর্তন করার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে মেহেদী এবং কাতামের রং লাগানো।"[৩৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী কারিম (সা.) বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সুগন্ধি গাছগাছড়ার মধ্যে উত্তম হচ্ছে মেহেদী।"[৩৫৯]

আর তাছাড়া মেহেদী ছত্রাক রোধ ও পোকা দমনে উপকারী। মেহেদী ফুল থেকে সুগন্ধিও তৈরি করা হয়।

"কাঁধের ব্যথা সারাতে মেহেদী পাতার রসের সাথে সরিষার তেল মালিশ করলে ব্যথা কমে যায়, চুল পড়াও কমে।"[৩৬০]

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পানি, মধু ও দুধ**

**রোগ নিরাময়ে পানি**

মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন সূরা আম্বিয়ায় ইরশাদ করেন, "আমরা প্রাণবন্ত সবকিছু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।[৩৬১] এ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার অনন্ত অসীম অনুগ্রহ রাজির ভেতর সমগ্র মাখলুকাতের জীবন ধারণে পানির ভূমিকা সর্বাগ্রে। তাই দেখা যায়, সর্বোপরি অপরিহার্যতার ন্যায় রোগ নিরাময়েও পানি যথেষ্ট কার্যকরী।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃষ্টির পানিতে গোসল করলে চামড়ার উপরিভাগের ক্ষত দূর হয় এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে নিয়মিত গোসল করলে অনেক অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়।

সাধারণ পানি বিষয়ক রসূল (সা.) এর একটি হাদীস দেয়া হল।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সা.) এর সঙ্গে ছিলাম যখন বৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। নবী **কারিম** (সা.) তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক থেকে বাইরের পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেললেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তাঁর পবিত্র শরীরে বৃষ্টির পানি না পড়ছিল, তখন তিনি ইরশাদ করেন, "এটি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[৩৬২]

**মহা ঔষধরূপী যমযমের পানি**

সমগ্র মানবজাতির মহাকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন এমন এক নিয়ামাত নাযিল করেছেন যার সুফল কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর সেই অপার অনুগ্রহটি হল যমযম কূপের পানি। নিম্নে তারই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

---

[৩৫৮] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*: ৩৬২২, অধ্যায়ঃ পোশাক, মেহেদী, প্রাগুক্ত

[৩৫৯] গুসাইন আল-বায়হাকী (রহঃ) *শুয়াবুল ঈমান-দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ*, বৈরুত; ১৯৯০ খ্রি.অধ্যায়ঃ গোশত খাওয়া,হাদীস নং:৫৯০৪

[৩৬০] আব্দুল খালেক মোল্ল্যা সম্পাদিত *লোকমান হেকীমের কবিরাজি চিকিৎসা*, অক্টোবর ২০০৯, পৃ.: ২৫০-৫১

[৩৬১] আল-কুরআন ২১: ৩০

[৩৬২] আবু দাউদ (রহঃ), *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং- ৫০১২, অধ্যায়ঃ বৃষ্টিবর্ষণ, প্রাগুক্ত

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যার (রা.) কাবা শরীফ ও তার আশপাশের এলাকায় যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোন পানীয় গ্রহণ বা খাদ্যদ্রব্য না খেয়ে ত্রিশদিন অবস্থান করেন। নবী কারিম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতদিন সেখানে অবস্থান করেছিলে?" আবু যার (রা.) উত্তর দেন, "ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত"। নবী কারিম (সা.) তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "এই দীর্ঘ সময় কে তোমাকে খাইয়েছে"? তিনি উত্তর দেন, "যমযমের পানি ছাড়া আমার নিকট আর কোন পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য ছিল না এবং আমি অনেক মোটা হয়ে গেছি এবং আমার পেটের চামড়ায় ভাজ পড়েছে। আমি কোন ক্লান্তি বোধ করিনি এবং ক্ষুধায় দুর্বল হইনি এবং জীর্ণ-শীর্ণও হইনি"। তখন নবী কারিম (সা.) বললেন, "নিশ্চয়ই এটি বরকতময় পুষ্টি এবং এটি এমন এক খাদ্যদ্রব্য যা পুষ্টিকর"।[৩৬৩]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "যমযমের পানি যে উপকারের আশায় পান করা হবে তা অর্জিত হবে"।[৩৬৪]

যমযমের পানি দ্বারা ক্যান্সার নিরাময়ের চমৎকার একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হল।

"বিস্ময়কর এ ঘটনাটি ঘটে লায়লা আল হেলু নামে জনৈকা মরোক্কান ভদ্রমহিলার জীবনে। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ায় তার পুরো chest এ তা ছড়িয়ে পড়ে। তার চিকিৎসক তাকে বললেন যে, তিন মাসের বেশি তিনি আর বাঁচবেন না।

কারণ ক্যান্সার তার শরীরে metastasized তার স্বামী তাকে পবিত্র মক্কা শরীফে উমরাহ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি হেরেম শরীফের মহিলাদের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থানে এক কোণায় নিজেকে আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে যমযমের পানি পান করতে থাকেন। আর খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র এক টুকরো রুটি ও একটা ডিম প্রতিদিন খেতেন। নামাযের সময় ছাড়া বাকি সবসময় তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় কান্নাকাটি করতেন ও কুরআন পড়তেন। চারদিন তিনি বলতে পারেননি যে কখন দিন বা রাত হয়েছে। এ সময়ের মাঝে তিনি বেশ কয়েকবার কোরআন খতম দিয়েছেন। তিনি তার সেজদার সময়কে দীর্ঘায়িত করতেন। এবং জীবনে যে সমস্ত ইবাদাত করতে পারেননি তার জন্য কাঁদতে থাকতেন। আর তিনি সর্বদা জিকির ও দু'আয় লিপ্ত থাকতেন। এর কয়েকদিন পর তিনি লক্ষ করলেন যে, তার সারা শরীরে যে লালচে স্পট ছিল তা দূর হয়ে গেছে এবং তিনি অন্তরে অনুভব করলেন যে, তার কোন কিছু ঘটেছে। তিনি তখন প্যারিসে ফিরে গিয়ে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে মনস্থ করলেন। তার চিকিৎসকরা কয়েকবার পরীক্ষা করার পর বললেন, তার বুকে ক্যান্সারের কোন লেশ নেই।[৩৬৫]

---

[৩৬৩] আল কুশাইরী আন- নিশাপুরী (রহঃ), *সহীহ আল মুসলিম*, অধ্যায়ঃ ফাযায়েলে আবু যর (রহঃ), প্রাগুক্ত,হাদীস নং:৬১৩৭

[৩৬৪] ইবনে মাজাহ (রহঃ), *সুনানে ইবনে মাজাহ*,অধ্যায়ঃ হজ্জ, প্রাগুক্ত,হাদীস নং:৩০৬২

[৩৬৫] সূত্রঃ সৌদি আরবের দারুস সালাম কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত ইউসুফ আলহাজ্জ আহমদ কর্তৃক সংকলিত এবং ওদা খাত্তাব সম্পাদিত "*ইসলামিক মেডিসি,*" পৃ.: ৪৪-৪৫

ইসমাঈল (আ.) থেকে শুরু করে নবী কারিম (সা.) সহ আজ অবধি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যমযমের পানি ব্যবহার করে আসছে। প্রায় তিন হাজার বছর যাবত একই ধারায় পানি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অবাক করার বিষয় এই যে, এর কোন কমতি নেই। এর পানি প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ১১-২০ লিটার। সাধারণ পানির তুলায় এ পানিতে প্রতি লিটারে প্রায় ২০০০ মি:গ্রা: পরিমাণ উপকারী elements এবং ২৫০ মি:গ্রা: সোডিয়াম, ২০০ মি:গ্রা: ক্যালসিয়াম ২০ মি:গ্রা: পটাশিয়াম এবং ৫০ মি:গ্রা: ম্যাগনেশিয়াম আয়ন বিদ্যমান যা অন্যান্য পানির তুলনায় অনেক বেশি।

উল্লেখ্য বরকতময় এ পানিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোরাইড থাকায় দিনের পর দিন সংরক্ষণ করলেও পচে না।

**রোগ নিরাময়ে মধু**

মানবদেহকে সুস্থ সুন্দর ও প্রাণবন্ত রাখার তরে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে যে সকল জীবন রক্ষাকারী উপাদেয় বস্তু নাযিল হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত মধু। মধুর বহুমুখী উপকারিতা অর্থাৎ এটি যে একটি মহৌষধ তা কুরআন ও হাদীসে অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

"মৌমাছির উদর থেকে একটি বিবিধ রঙের পানীয় বা শরবত বের হয় যার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাময় বা শিফা।[৩৬৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

"বেহেশতে স্বচ্ছ মধুর নহর প্রবাহিত হবে।[৩৬৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের জন্য অবশ্যই দুটি ঔষধ রয়েছে। একটি হচ্ছে কুরআন অপরটি মধু।"[৩৬৮]

আল্লাহর রসূল (সা.) রোগমুক্তির সোপান হিসেবে কোরআন ও মধুর শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের ভিতর মধু আর আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন কেননা মধু মানুষের স্বাস্থ্য ও দৈহিক রোগ নিরাময়ে এক অব্যর্থ মহৌষধ আর আল কুরআন দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার চাবিকাঠি।

---

[৩৬৬] আল-কুরআন ১৬: ৬৯

[৩৬৭] আল-কুরআন ৪৭: ১৫

[৩৬৮] ইবনে মাজাহ (রহ:) *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়: চিকিৎসা, প্রাগুক্ত,হাদীস নং:৩৪৫২

মধু দ্বারা চিকিৎসার উপর আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উদ্ধৃত হল। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের চিকিৎসা গুলোর মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিঙ্গা লাগানো, মধুপান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া আমি পছন্দ করি না।"[৩৬৯]

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) মিষ্টি ও মধু খেতে পছন্দ করতেন।[৩৭০]

আল্লাহর রসূল (সা.) এর একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল বেলা খালি পেটে এক কাপ মধু ও পানি পান করতেন। (আস-সুয়ূতী)[৩৭১]

আজকের দিনে অধিকাংশ মিষ্টি জাতীয় খাদ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এগুলোতে ৯৯ ভাগ Saccharose বিদ্যমান। পক্ষান্তরে মধুতে Glucose, fructose, arabinose, Saccharose, galactose, dextrin, maltose, xylose ইত্যাদি উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে।

মধুর উপকারিতা বা কার্যকারিতা বিজ্ঞানসম্মত। এইডস রোগীকে যদি তিন মাস মধুর সাথে কালিজিরা মিশিয়ে খাওয়ানো হয় তাহলে সে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবে।

এছাড়াও মধুতে বহুবিধ রোগের উপশম রয়েছে। যেমন- ব্যথা, গিটব্যথা, চুলপড়া, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দাঁত ব্যথা, ঠাণ্ডালাগা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটের পীড়া, রক্তে কোলেস্টোরেলের আধিক্য, হজমহীনতা, মুখের ব্রন, মুখের দুর্গন্ধ শারীরিক দুর্বলতা, ক্যান্সার, অকালে চুল পাকা ইত্যাদি।

সুদূর অতীতে গ্রিক ও মিশরীয়গণ Preservative হিসেবে মধুকে মৃত ব্যক্তির দেহ যুগযুগ ধরে সংরক্ষণে ব্যবহার করতো।

এইডস বর্তমানে ঘাতকব্যাধি রূপে বিস্তার লাভ করলেও ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম এ রোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল।

হাদীস শরীফে এসেছে, রসূল (সা.) বলেন, "যখন কোন জাতি প্রকাশ্যে বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য লজ্জাহীনতার পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং এসব পাপকার্য মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের জন্য আকাশ থেকে নতুন নতুন ঘাতক ব্যাধি পাঠানো হবে। যাদের নাম তারা কিংবা তাদের পূর্বপুরুষের কেউ শোনেনি।"[৩৭২]

**রোগ মুক্তিতে দুধ**

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বেহেশতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে যার স্বাদ বা গন্ধ কখনও পরিবর্তিত হবে না[৩৭৩]

---

[৩৬৯] আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, হাদীস নং: ৫২৭২, ৫২৮৮, ৫২৯০

[৩৭০] অধ্যায়: পানীয়, প্রাগুক্ত, হাদীস নং: ৫২৭১

[৩৭১] আস-সুয়ূতী (রহ:) , *জামিউস সাগীর ফী আহদিসীল বাশিরীন নাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০

[৩৭২] ইবনে মাজাহ (রহ:) *সুনানে ইবনে মাজাহ*,অধ্যায়:কলহ বিপর্যয়, প্রাগুক্ত, হাদীস নং:৪০১৯

[৩৭৩] আল-কুরআন ৪৭: ১৫

সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের জন্য দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার। এ বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন, "স্বচ্ছ নির্মল, নির্ভেজাল ও খাটি দুধ পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।[৩৭৪]

দুধ পানের উপকারিতা সম্বলিত রসূল (সা.) এর উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হলঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মিরাজের রাতে ইলিয়া নামক স্থানে আল্লাহর রসূল (সা.) কে দুটো কাপ প্রদান করা হল। দুটোর একটিতে ছিল দুধ অপরটিতে ছিল মদ। তিনি দুটো কাপের দিকে তাকালেন এবং পরে দুধের কাপটি গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) তাকে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আপনাকে স্বাভাবিক জিনিসের দিকে পরিচালিত করেছেন। (অর্থাৎ সত্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন)। যদি আপনি মদের কাপটি গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার অনুসারীরা বিপথগামী হত।[৩৭৫]

তারিক ইবনে শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার জন্য তিনি ঔষধ পাঠাননি। সুতরাং (তোমরা) গাভীর দুধ পান কর, কারণ গাভী সকল প্রকার ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে।[৩৭৬]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) গাভীর দুধ পছন্দ করতেন।"[৩৭৭]

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, গরুর দুধ আরোগ্য দানকারী, এর ঘি হল ঔষধ এবং এর মাংস হল 'রোগ'।[৩৭৮]

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) দুধ পান করার পর মুখের অভ্যন্তর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতেন এবং বলতেন যারা জ্বরে আক্রান্ত বা মাথাব্যথায় ভুগছেন তাদের জন্য দুধের চর্বি অনুপকারী।[৩৭৯]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, ড্রপসি রোগে আক্রান্ত কতিপয় অসুস্থ ব্যক্তি রসূল (সা.) এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাদের আল- হেরা এলাকায় পাঠিয়ে দেন নিজের কয়েকটি উটনী সহ। তখন তারা উটের দুধ পান করে সুস্থ হয়ে ওঠে।[৩৮০]

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, উত্তম সদকা হচ্ছে দুগ্ধবর্তী এমন উটনী অথবা অতিশয় দুগ্ধবতী একটি বকরী দান করা; যা প্রত্যূষে এক পাত্র দুধ আর বিকেলে এক পাত্র দুধ সরবরাহ করে থাকে।[৩৮১]

---

[৩৭৪] আল-কুরআন ১৬: ৬৬

[৩৭৫] আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*, অধ্যায়ঃ পানীয়, প্রাগুক্ত, হাদীস নংঃ৫১৬৭

[৩৭৬] শুয়াইব আন নাসায়ী (রহঃ), *মাসায়ী কুবরা*,অধ্যায়ঃ গরুর দুধ দ্বারা চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নংঃ৭৫৬৭

[৩৭৭] আস-সুয়ূতী (রহঃ), *জামিউস সাগীর ফি আহদিসীল বাশিরীন নাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪

[৩৭৮] ইবনে গুসাইন আল বায়হাকী (রহঃ), *শু'আবুল ঈমান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯০ (ঈসায়ী)*, অধ্যায়ঃ খাদ্য ও পানীয় ( গোশত ভক্ষণ),হাদীস নংঃ৫৯৫৬

[৩৭৯] ইবনে আব বকর আস-সুয়ূতী (রহঃ) ,*আল-জামিউস সাগীর ফি আহদিসীল বাশিরীন নাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪

[৩৮০] আল বুখারী (রহঃ),*সহীহ আল বুখারী*,অধ্যায়ঃ রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নংঃ৫২৭৪

[৩৮১] আল-বুখারী (রহঃ), *আল-বুখারী*, অধ্যায়ঃ পানীয়, প্রাগুক্ত, হাদীস নংঃ ৫১৯৮

**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রোগ শোক আল্লাহর রহমতের নিদর্শন**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

"নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।"[৩৮২]

আল্লাহর রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, "কোন মু'মিন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ ব্যথা- বেদনা, রোগ- ব্যাধিবা দুঃখ- কষ্ট আসে না, এমনকি চিন্তা ভাবনা, পেরেশানি পর্যন্ত, যার বিনিময়ে তার কোন পাপ মার্জনা হয় না।[৩৮৩]

ইসলামের বিধানমতে অসুস্থতা কোন আযাব কিংবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়। বরং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথপ্রদর্শক। অপরদিকে রোগ ব্যাধি গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। এখন প্রশ্ন থাকে যে, রোগ আবার কীভাবে গুনাহের কাফ্ফারা হবে? এর উত্তরে বলা যায় আগুনের উত্তাপ দ্বারা লোহার মরিচা দূর অথবা স্বর্ণকারের স্বর্ণ যেভাবে খাঁটি করা হয় ঠিক  তেমনিভাবে রোগ বা বালা মুসীবত বান্দাহর অন্তরে অনুতাপ, অনুশোচনা কোমলতা, বিনয়, নম্রতা, বশ্যতা, আল্লাহভীতি, পরকালের স্মরণ এবং ধৈর্য ও শুকরিয়া আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টি করে। এর ফলে বান্দাহ স্বীয় অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে আর গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করে। আর রোগীর অসহায়ত্ব বা আকুতি দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

রোগ- ব্যাধি বা বালা মুসীবত নিঃসন্দেহে বান্দার বিরাট কষ্ট বা পরীক্ষার বিষয়। মহাসংকটে পতিত হওয়া সত্ত্বেও বান্দার তার মহান রবের রাজি খুশির নিমিত্ত জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যখন ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সক্ষম হয় তখনই তাদের দ্বারে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে মহাসাফল্যের। ইসলামে এ বিষয়টি অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হল এরূপ-

সুরা আল বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন "তোমরা কি মনে করে নিয়েছ এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? তাদের উপর যা কিছু  নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের উপর সে সব নেমে আসেনি। তাদের উপর নেমে এসেছিল অত্যাচার, নির্যাতন, কষ্ট, ক্লেশ ও বিপদ-মুসীবত। আঘাতে আঘাতে তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল (সা.) ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল। আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদের এ বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।[৩৮৪]

---

[৩৮২] আল-বুখারী (রহ:) *সহীহ আল বুখারী*, অধ্যায়: রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫২৩০

[৩৮৩] আল কুশাইরী আন নিশাপুরী (রহ:) *সহীহ আল মুসলিম*, অধ্যায়: সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৩৩৬

[৩৮৪] আল-কুরআন ২: ২১৪

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফসলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।[৩৮৫]

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "দুঃখ-কষ্ট সৎকর্মশীলদের জীবনে বেশি আসে। যখনই কোন মু'মিন বালা-মুসীবত বা দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় সেটা কাটা বিধক বা তার চেয়ে বড় কিছু হোক না কেন এর ফলে তার একটি পাপ মার্জনা করা হয় এবং জান্নাতে তার মর্যাদা এক ধাপ বেড়ে যায়।[৩৮৬]

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাহর কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তার কোন অকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। তিনি আরও বলেন, বিপদ যত মারাত্মক, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যদি তারা তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। যারা অসন্তুষ্ট হয় তারা আল্লাহর রোষ ছাড়া কিছুই পাবে না।"[৩৮৭]

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত, "নবী কারিম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দুজন ফেরেশতা পাঠিয়ে বলেন, দেখ হে ফেরেশতা! সে তার শুশ্রুষাকারীদের সাথে কি কথাবার্তা বলছে। যদি সে অসুস্থ হবার কারণে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের গুণকীর্তন করতে থাকে তবে সে খবর ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট নিয়ে যান।"

যদিও আল্লাহ স্বয়ং সবকিছু জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি যদি তাকে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করাই তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যদি তাকে রোগমুক্তি দেই তবে তার খারাপ গোশতকে উত্তম গোশত দ্বারা আর দূষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দেব। এবং তার পাপরাশিকেও দূর করে দেব।[৩৮৮]

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "নবী কারিম (সা.) বলেছেন, এই পৃথিবীতে আল্লাহর নবী (সা.) বেশি দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার ভোগ করে থাকেন। তারপর আল্লাহর ওয়ালীগণ, তারপর সৎকর্মশীল বান্দাহগণ। একজন মানুষের দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে দ্বীনের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার গভীরতার উপর। এ পৃথিবীর বুকে অলীগণের জীবন থেকে দুঃখ-কষ্ট কখনও দূর হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তায় চলেন এবং তাদের কৃতকর্মকে বিশুদ্ধ রাখেন।"[৩৮৯]

---

[৩৮৫] আল-কুরআন ২: ২১৪

[৩৮৬] ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ:), *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়: জানাযা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯০৭

[৩৮৭] ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ:), *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়: পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি, প্রাগুক্ত হাদীস নং-২৩৩৮

[৩৮৮] ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ:) *আল মুয়াত্তা*, অধ্যায়: রোগীর সওয়াব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৫০, ৩৪৬৫

[৩৮৯] ইবনে মাজাহ (রহ:), *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অধ্যায়: কলহ-বিপর্যয়, প্রাগুক্ত হাদীস নং- ৪০২৩

ইয়াহহিয়া ইবনে সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারিম (সা.) এর যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলে কোন একজন লোক উক্ত মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল, কতই না সুন্দর মৃত্যু হয়ে গেলো। একথা শুনে নবী কারিম (সা.) বললেন, তোমার জন্য আফসোস তুমি কি জানো না, আল্লাহ  কোন ব্যক্তিকে রোগে ফেললে, এর কারণে তার পাপরাশি মার্জনা করে দেন?[৩৯০]

আতা আবী রাবাহ (রা.) এ মর্মে বর্ণনা করেন, একদা আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, 'আমি কি আপনাকে এক জান্নাতি মহিলা দেখিয়ে দেবো না'? আমি বললাম, 'কেনো দেখাবেন না? অবশ্যই দেখান'। তিনি বললেন, 'ঐ কালো মহিলাকে দেখুন'। এই মহিলা একদা নবী কারিম (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! যখনই আমার মৃগীরোগের চাপ সৃষ্টি হয় তখন আমার সতর খুলে যায়। তাই আল্লাহর দরবারে আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করুন।' জবাবে নবী (সা.) বললেন, 'তুমি পারলে ধৈর্যধারণ করো, তাহলে তুমি জান্নাত পাবে'। আর যদি চাও তবে আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করি। উক্ত মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ধৈর্যধারণ করবো'। অতঃপর সে বলল, 'তবে আপনি আল্লাহর নিকট এই দু'য়া করুন যেনো আমার সতর খুলে না যায়'। নবী কারিম (সা.) তখন তার জন্য দু'আ করলেন।[৩৯১]

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'মুসলমানদের উপর যে কোনো বিপদ-মুসীবতই আসে, আল্লাহ এর বদলে তার গুনাহ মোচন করে দেন, এমনকি তার শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হলে তার দ্বারাও।'[৩৯২]

হযরত উম্মুল আলা (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি অসুস্থ  ছিলাম, 'এমন সময় নবী কারিম (সা.) আমাকে দেখতে এসে বললেন, উম্মুল আ'লা তোমার জন্য সুসংবাদ। মুসলমানদের রোগ তাদের গুনাহকে দূর করে দেয় যেমনি অগ্নি সোনারূপার মরিচা দূর করে থাকে।'[৩৯৩]

**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ চিকিৎসা সেবায় ডাক্তারের ভূমিকা**

নানাবিধ সেবাধর্মী কার্যক্রমের মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম মহান পেশা। যার সাথে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন মরণের বিষয়টি বহুলাংশে জড়িত। আর তাই চিকিৎসককে রোগীর প্রতি বন্ধু সুলভ আচরণ তথা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হওয়া একান্ত জরুরী। চিকিৎসকের দায়িত্বনিষ্ঠ কর্মপন্থা (উত্তম আচরণ) রোগীর সুস্থতার পেছনে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

---

[৩৯০] ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহঃ) *আল মুয়াত্তা*, অধ্যায়ঃ রোগীর প্রতিদান, হাদীস নং-১৭৫৩, ৩৪৬৮

[৩৯১] আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*, অধ্যায়ঃ রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২৪০

আল কুশাইরী আন নিশাপুরী (রহঃ), *সহীহ আল মুসলিম*, অধ্যায়ঃ সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, প্রাগুক্ত, হাদীস  নং- ৬৩৩৯

[৩৯২] আল বুখারী (রহঃ) *সহীহ আল-বুখারী*, , অধ্যায়ঃ রোগ, রোগী ও চিকিৎসা, প্রাগুক্ত,আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহঃ), *সহীহ আল মুসলিম*, অধ্যায়ঃ সদাচার, সদ্ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, প্রাগুক্ত. হাদীস নং, ৬৩৩১, ৬৩৩৩, ৬৩৩৪, ৬৩৩৫

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহঃ), *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায়ঃ রোগীর প্রতিদান, প্রাগুক্ত হাদীস নং-১৭৫১, ৩৪৬৬

[৩৯৩] আবু দাউদ (রহঃ) *সুনানে আবু দাউদ*, অধ্যায়ঃ জানাযা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৭৯

পবিত্র কুরআনের বাণী:

“আল্লাহর পরম অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত,এবং তুমি যদি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ ত্যাগ করতো। অতএব তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সমন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতপর তুমি যখন সংকল্প কর, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীকে ভালবাসেন।”[৩৯৪]

আবার নবীজী (সা.) বলেন,

“তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা চরিত্র ও আচরণে উত্তম।”[৩৯৫]

ডাক্তারের নিকট যখন কোনো লোক চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আসে, তখন তাকে সম্পূর্ণ আমানতদারির সাথে পরামর্শ প্রদান জরুরি। ইবনে মুছান্নার (র.) ...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেছেন, “যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।”[৩৯৬]

একজন চিকিৎসককে আল্লাহ তা’আলা দিয়েছেন বিরাট সম্মান ও পবিত্র জীবিকা, যিনি পীড়িত জনের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘবে এগিয়ে আসেন।

যেখানে হাসিমুখে কথা বলাও একটি সাদাকাহ, সেখানে হৃদযন্ত্রের ব্যথা বা পেটের পীড়ায় সেবা দান কতই না উত্তম সেবা।

রোগীর প্রয়োজন পূরণের সপক্ষে বলা যায়,

কুতায়বা ইবন্ সাঈদ (র.) ...সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে নিয়োজিত, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন।”[৩৯৭]

ইসলাম চিকিৎসার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন,

“তুমি পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গণিমত (সুবর্ণ সুযোগ) মনে করবে বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।”[৩৯৮]

রোগে হতাশ হতে নেই। বার্ধক্য ছাড়া কোন রোগই স্থায়ী নয়। আল্লাহর ইচ্ছায় চিকিৎসক রোগ নির্ণয় এবং যথার্থ ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগ সেরে যাবে।

---

[৩৯৪] আল-কুরআন ৩: ১৫৯

[৩৯৫] সহীহ আল-বুখারী: ৫৬৮৮

[৩৯৬] ইমাম আবূ দাউদ (র.), *আবূ দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: নিদ্রা সম্পর্কীয়, অনু: পরামর্শ সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:৬০৬, হাদীস নং-৫০৪০

[৩৯৭] ইমাম আবু দাউদ (র.) *আবূ দাউদ শরীফ*, অনু: ডা. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, ই.ফা.বা. আগস্ট ২০০৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, খ: ৫ম, অধ্যায়: আদব, অনু: সৌ-ভ্রাতৃত্ব, পৃ:৫০৫, হাদীস নং-৪৮১৩

[৩৯৮] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, *সহিহুল জামে*,  হাদীস নং-১০৭৭

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে। সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে।[৩৯৯]

রোগীকে যথাযথ সেবার মাধ্যমে উভয় জাহানে কল্যাণ সাধিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আদর্শ ডাক্তার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ্ আল উসাইমিনের মতে, "এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে ফারজে কিফায়া।"[৪০০]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র ব্যতীত কেউ যদি অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরিচয়ে চিকিৎসা দেয়, আর তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হয়, তবে সে দায়ী থাকবে।

আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে নবী কারিম (সা.) বলেছেন:

"যদি কেউ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করে কারো চিকিৎসা করে, তা হলে সেই রোগীর জন্য সে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী থাকবে।"[৪০১]

রোগীর স্বীয় অবহেলায় অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে এ দায়ভার রোগীর উপর বর্তাবে।

চিকিৎসা প্রদানে পুরুষের ন্যায় নারীরও ভূমিকা রয়েছে। মহিলা ডাক্তার কিভাবে পর্দা বজায় রেখে চিকিৎসা দিবেন তা নিয়ে বহু ফাতোয়া থাকলেও প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত যে মানবজাতির জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলা ডাক্তারও অত্যাবশ্যক।

**চিকিৎসা ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা:**

আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগীর একমাত্র ভরসা সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতাল। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতালগুলোতে বেতনভুক্ত ডাক্তার নিয়োজিত থাকলেও প্রয়োজনে তাদেরকে প্রায়ই কর্মস্থলে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায় রোগীকে যথাযথ চিকিৎসা সেবা না দিয়ে ব্যক্তিগত চেম্বারে দেখা করতে বলেন। এটা দায়িত্বে অবহেলার শামিল।

বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি ডাক্তারকে মোটা অঙ্কের কমিশন দিয়ে তাদের ঔষধ রোগীকে বিহিত করতে বলেন। অনেক ডাক্তার সেটি গ্রহণ করে রোগীর পক্ষে যা উত্তম তা বিবেচনা না করেই ব্যক্তি স্বার্থে নির্দিষ্ট কোম্পানির ঔষধ দিয়ে থাকেন। এটি ঘুষের শামিল।

ডাক্তার বিভিন্ন ডায়গনিস্টিক সেন্টারের সাথে চুক্তি এবং অধিক লাভের আশায় নিজেই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে রোগীকে সেই ল্যাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরীক্ষা- নিরীক্ষা করিয়ে থাকেন।

---

[৩৯৯] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম (র:) *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় সালাম, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, , হাদীস নং- ৫৫৫৫

[৪০০] শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আল উসাইমিন, *ফাতওয়া নুর আল দারর* টেপ নং: ৯

[৪০১] ইমাম আবু দাউদ (রহ:) *সুনানে আবু দাউদ*, অধ্যায়: রক্তপণ, হাদিস নং- ৪৫১৭

বর্তমানে বাংলাদেশে সিজারিয়ান একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ামাত্র। নব্বই শতাংশ গাইনী বিশেষজ্ঞ প্রাকৃতিকভাবে ডেলিভারি করতে অনাগ্রহী।

পরীক্ষালব্ধ সঠিক জ্ঞানের অভাবে রোগীর জন্য যেটি উত্তম তার পরিবর্তে সিজার একমাত্র অবলম্বন করে ভয় ভীতি দেখিয়ে বা ঔষধ প্রয়োগ করে বোঝান বাচ্চা বেশি বড় কাজেই সিজার অবধারিত। ইউরোপ- আমেরিকার ন্যায় উন্নত দেশগুলো মায়ের শরীর সুস্থ রাখতে সিজারিয়ানকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। গবেষণায় জানা যায় সিজার করতে গিয়ে শরীরের বাইরে ও ভেতরে যে পরিমাণ অস্ত্রোপচার করা হয় তা গর্ভবতী মায়ের কর্মক্ষমতাকে ৭০% কমিয়ে দেয়।

সঠিক রোগ নির্ণয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা জরুরী। ভুল চিকিৎসার কবলে পড়ে। অর্থকড়ি খুঁইয়ে নিঃস্ব সরল প্রাণ মানুষগুলো কখনো হয় মৃত্যুকুলে পতিত আবার কেউ বা হয় চির বিকলাঙ্গ।

কোন মানুষই রোগ- শোকের উর্ধ্বে নয়। যে নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক আমৃত্যু জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবস্থানকারী অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, তিনিও যখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুকুলে পতিত হন, তখন অন্য কোনো ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারেন না। এ যুক্তির স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত:

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৪০২]

একথাগুলো দ্বারা সমালোচনা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল এই যে, ইসলাম চিকিৎসা প্রদানে ডাক্তারকে যে সর্বোত্তম (নান্দনিক) দিক নির্দেশনা দিয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ- সাবলীল জাতি বিনির্মাণের দ্বার উন্মোচিতকরণ।

[৪০২] আল-কুরআন ৬: ১৭

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ইসলামে জীবিকা নির্বাহে নৈতিক রূপরেখা:

সমগ্র সৃষ্টিকুলের শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের সাথে বায়ুর সম্পর্ক যেরূপ অনিবার্য, জীবন ধারণের জন্য সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তাও তদ্রুপ অপরিহার্য। মানুষের ইহকালীন জীবনের উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহনের মূল হচ্ছে তার স্বচ্ছ, পবিত্র জীবিকা নির্বাহ। আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী-রসূল স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহের অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জীবন নির্বাহের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে-

"অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"[৪০৩]

"জীবন ধারণের জন্য মানুষের যেসব উপায়, উপকরণ এবং সহায়-সম্বল প্রয়োজন সেগুলোর বিকল্পকেই অর্থ সম্পদ বা জীবিকা বলা হয়।"[৪০৪] "সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনিই এই বিশ্বলোককে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বের করে এনে অস্তিত্বসম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে প্রয়োজন পূরণ ও খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে লালন-পালন করে ক্রমশ বৃদ্ধি দান করে, এই সীমাহীন বিশ্বলোক, এই পৃথিবী এবং এই অন্তহীন বস্তু, জীব ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তই তাঁর এই সৃষ্টি ও বিকাশ দানের কাজ প্রতিটি অনু ও রেনুতে পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর। তাই তিনি যেমন এর স্রষ্টা-মালিক, তেমনি এর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশদানকারীও। তাঁর এই 'রুবুবিয়াত' বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত। তিনিই একমাত্র রব্বুল আ'লামীন। এই সৃষ্টিকুলকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়- প্রস্তর, উদ্ভিদ ও প্রাণী। প্রস্তর নির্জীব, নিষ্প্রাণ, তার জন্য জীবিকার প্রয়োজন নেই। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য জীবিকা একান্তই অপরিহার্য। এই কারণে স্পষ্ট লক্ষণীয়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সকল পর্যায়ের সৃষ্টির জন্য জীবিকার ব্যবস্থা সদা কার্যকর। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি প্রবণ। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তরে রূপান্তর অব্যাহতভাবে চলছে। একটি বীজ থেকে প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে যে অংকুর নির্গত হয়, তাই ক্রমান্বয়ে বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শুক্র জীবাণু ক্রমবিকশিত হয়ে পূর্ণবয়স্ক এক জীবন্ত শাবক (বাচ্চা) হয়ে উঠে। এই শাবক ও বাচ্চা ক্রমাগত পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে বিরাটকায় জন্তু বা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘ গতিতে এই ক্রমবৃদ্ধি চলে এবং এ কারণে এসবের জন্য জীবিকার একান্ত প্রয়োজন।"[৪০৫]

---

[৪০৩] আল-কুরআন ৬২: ১০

[৪০৪] আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা*

[৪০৫] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, খায়রন প্রকাশনী; ঢাকা: ১৯৮৩

আল্লাহ তা'আলা জীবন ধারণের প্রয়োজনে একদিকে যেমন এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য কর্মক্ষেত্র করেছেন, সে সাথে জীবিকা নির্বাহের নানাবিধ ব্যবস্থাও রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

"তিনিই তো আমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর পথে প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তার রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর, আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।"[৪০৬]

দুনিয়ার জীবন আখিরাতের শস্যভাণ্ডার। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক জীব পানাহারের মুখাপেক্ষী। তাই এ প্রয়োজন মেটাতে সকলকে জীবিকা নির্বাহের কোন না কোন পথ অবলম্বন করতে হয়। জীবন নির্বাহের আঞ্জাম দিতে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর তুষ্টির বিষয়টিও খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কেননা যে কোন পার্থিব সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে দেহ-মন ঢেলে অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত থাকে সে নিতান্ত হতভাগ্য বরং যিনি রিয্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা রেখে সর্বদা নিজেকে আখিরাতের রসদ সংগ্রহে মগ্ন রাখেন তিনি অতিশয় সৌভাগ্যবান। তবে এ উভয় প্রকারের মধ্যম পন্থা হলো, মানুষ পার্থিব সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত থাকবে এবং সেই সাথে আখিরাতের পাথেয়ও সংগ্রহ করবে। নিজ পরিবার বর্গকে পর মুখাপেক্ষী না রেখে হালাল জীবিকার মাধ্যমে তাদের ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত নেক কাজ এবং সাদকা হিসেবে পরিগণিত।

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান। ইসলামেও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই পরিবারের সদস্য তাই পরিবারের জীবন নির্বাহে তাকে উপার্জন করতে হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর সন্তানের পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।"[৪০৭] আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে চিন্তা, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন, দুটি হাত দিয়েছেন, যাতে সাবলম্বী হওয়া যায়। অপরের নিকট হাত পাততে না হয়। উপার্জন করার মত কল্যাণকর বিষয়ে দু'আ করার ভাষা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনে- "আর তাদের মধ্যে এমন আছে যারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন আর আখিরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[৪০৮] তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না।"[৪০৯] ইসলামে নিজের অবর্তমানে সন্তান-সন্ততির জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে যাওয়ার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়ার নির্দেশে হাদীসে এসেছে, "ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) আমাকে এভাবে বলেছেন, তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী রেখে যাওয়া

---

[৪০৬] আল-কুরআন ৬৭: ১৫
[৪০৭] আল-কুরআন ২: ২০৩
[৪০৮] আল-কুরআন ২: ২০১
[৪০৯] ইমাম বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*: ১৩৮৯, ই.ফা.বা ২০০৬ ঈসায়ী, তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায়-যাকাত, পৃ. ৪৬

তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।"[৪১০] আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের কল্যাণের অধীন করেছেন, যা থেকে মানুষ নির্দেশিত পথে জীবিকা অন্বেষণ করবে। এ মর্মে ইমাম গাজ্জালী (রা.) এর কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থে দুটো হাদীস উল্লেখ হয়েছে, "হযরত ঈসা নবী (আ.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কী কাজ করো? সে ব্যক্তি জবাবে বলল, আমি ইবাদত করি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার খাবার পাও কোথা থেকে? লোকটি বলল, আমার এক ভ্রাতা আমার খাবার জোগাড় করে থাকেন"। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, "তোমার ভ্রাতা তোমার অপেক্ষা অধিক আবেদ তথা ইবাদাতকারী।"[৪১১]
"হযরত উমার ফারুক (রা.) বলেছেন: পরিবার বর্গের খাবার যোগানের উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করে হালাল জীবিকা উপার্জনকালে আমার মৃত্যু ঘটলে আমি সে মৃত্যুকে অপরাপর সকল স্থানের মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয় বলে মনে করি।"[৪১২] মানব জীবনে জীবিকা নির্বাহের সাথে যে সকল নিয়ামক নিগুঢ় সূত্রে আবদ্ধ তন্মধ্যে নৈতিকতার আবেদন সর্বাগ্রে। অর্থ উপার্জন করতে গিয়েই মানুষ অধিকাংশ সময় ফিতনার সম্মুখীন হয়ে পরে, অথচ নৈতিকতার কঠোর মনোবৃত্তি তার জীবননির্বাহে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা এনে দেয়। নিজ হাতে উপার্জনের এ নীতি-আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বয়ং নবী-রসূল, সাহাবা ও মহা-মনীষীগণ। আল্লাহর মনোনীত এসব মহান ব্যক্তিবর্গ দেখিয়ে গেছেন আয় উপার্জনে যাবতীয় হারাম পরিহারপূর্বক হালালকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে নৈতিকতার পথ পরিক্রমায় কিভাবে আল্লাহর রাজি-খুশি সম্ভব। বেঁচে থাকার তাগিদে প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন পেশা যেমন: ব্যবসা, চাকুরি, কৃষি ও শিল্পকর্মসহ নানা পেশা অবলম্বন করতে হয়। জীবিকা উপার্জন বিষয়টি যেহেতু ব্যক্তিগত থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই পারস্পারিক হক প্রতিষ্ঠায় তৎসংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতার সফল বাস্তবায়ন আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

**প্রথম পরিচ্ছেদঃ শ্রেষ্ঠতম মানবদিগের জীবন-নির্বাহ**

প্রথম মানব আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকেন নি, বরং নিজ হাতে উপার্জন করতেন। তাদের এ নীতি আদর্শ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, স্বহস্তে জীবিকা-নির্বাহে কোন গ্লানি নেই উপরন্তু তা অত্যন্ত সম্মানজনক। "লোকেরা কোন কাজকে হীন জ্ঞান করে কিন্তু নবী কারিম (সা.) তা সমর্থন করেন নি। তিনি তার সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন, যে কোন কাজই হোক না কেন, তাতেই সম্মান ও পরিপূর্ণ ইজ্জত নিহিত এবং লোকদের সাহায্য গ্রহণে ও তাঁর ওপর নির্ভরতা রয়েছে সর্ব প্রকারের যিল্লাতি ও অপমান। তিনি বলেছেন: কোন ব্যক্তির রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া

---

[৪১০] ইমাম বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*: ৬২৭৭, ই.ফা.বা. অনু ও সংকলন প্রকাশনা: ১১৯, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩, খণ্ড- ১০, অনুচ্ছেদ: কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার, পৃ. ১৮৯
[৪১১] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), অনুক: মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, মীনা বুক হাউস, ঢাকা- ২০১৭ইং, প্রাগুক্ত, ১০
[৪১২] প্রাগুক্ত

ও নিজের মাথায় কাষ্ঠের বোঝা বহন করে নিয়ে আসা ও তা বিক্রয় করে উপার্জন করা, যার ফলে আল্লাহ তার ইজ্জতের সংরক্ষণ করে দেবেন লোকদের কাছে যা ভিক্ষা চাওয়ার তুলনায় অনেক ভাল ও কল্যাণময়। যেখানে লোকেরা তাকে দেবে কি না দেবে তারও কোন নিশ্চয়তা যখন নেই। অতএব, মুসলমান ব্যক্তির উচিত কৃষি, ব্যবসা, শিল্প ও এ ধরণের যেকোন কাজ বা চাকরি করে উপার্জন করা যতক্ষণ না তা হারাম কাজে জড়িত হয়ে পড়ার মতো কোন কাজ হবে।"[৪১৩]

"কাজ করে খাওয়া কোন ত্রুটি নয়। লজ্জার কিছু নয়। তাওয়াক্কুলের খেলাপ নয়। উপার্জন দ্বারা মানুষের ইজ্জত রক্ষা পায়। এক ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) কাঠ কাটতে আদেশ দিয়ে তা বিক্রয় করে খেতে বললেন; তাওয়াক্কুল করতে বললেন না। আসলে উট বেঁধে তাওয়াক্কুল করাই হল শরিয়া তাওয়াক্কুল। আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর উপর যেরূপ তাওয়াক্কুল করতেন, সেরূপ তাওয়াক্কুল কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। তবুও তারা রুযি-রোযগারের পথ হিসেবে এক একটি পেশা অবলম্বন করেছেন। বলা বাহুল্য, আদম (আ.) চাষ করেছেন।[৪১৪] তিনি একজন রাজমিস্ত্রিও ছিলেন।[৪১৫] রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায় তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[৪১৬] ইবনু আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, "দাউদ (আ.) ছিলেন বর্ম নির্মাতা, আদম (আ.) ছিলেন কৃষক, নূহ (আ.) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি, ইদ্রীস (আ.) ছিলেন দর্জি এবং মূসা (আ.) ছিলেন রাখাল।"[৪১৭]

"আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যাকারিয়া (আ.) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রি।"[৪১৮]

"ইদ্রীস (আ.) যিনি সুতার তৈরি সেলাইযুক্ত পোশাক তৈরি করতেন।"[৪১৯] নূহ (আ.) নিজ কওমের ছাগল চরাতেন।"[৪২০] তিনি কাঠ মিস্ত্রীও ছিলেন।[৪২১] তিনি প্লাবনের পূর্বে স্বহস্তে কাঠের নৌকা তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল। আর যখনই তার কওমের প্রধানদের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করত, তখনই তার সাথে উপহাস করত।"[৪২২]

---

[৪১৩] আল্লামা-ইউসুফ আল-কারযাভী, অনুক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহঃ), খায়রন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.: ১৭৬

[৪১৪] আবদুল হামিদ ফাইমী, *হারাম রুযি ও রোযগার*, পৃ. ১৯

[৪১৫] *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তলাবির রিযক*, পৃ. ২৬

[৪১৬] ইমাম বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল-বুখারী*- ১৯৪২, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পরিচ্ছেদঃ লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা, পৃ. ১৭

[৪১৭] *ফাৎহুল বারী* ২০৭২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

[৪১৮]

[৪১৯] আবদুল হামিদ ফাইযী, *হারাম রুযি ও রোযগার*, পৃ. ১৯

[৪২০] প্রাগুক্ত

[৪২১] প্রাগুক্ত

[৪২২] আল-কুরআন ১১: ৩৮

ইবরাহীম (আ.) চাষের কাজ করতেন এবং তিনি কাপড়ের ব্যবসাও করতেন।[৪২৩] সুলায়মান (আ.) খেজুর পাতা ইত্যাদি জাল বুনতেন।[৪২৪] লুকমান (আ.) দর্জি অথবা কাঠমিস্ত্রি বা ছুতোর ছিলেন।[৪২৫] সালেহ (আ.) ব্যবসায়ী ছিলেন।[৪২৬] শুআইব (আ.) বকরী বা উট চরিয়েছেন।[৪২৭] ত্বালুত (আ.) চামড়া পবিত্র করণের কাজ করতেন।[৪২৮] যদিও বলা হয়ে থাকে ত্বালুত কোন নবী ছিলেন না, তিনি রাজা ছিলেন।[৪২৯] মূসা (আ.) আট অথবা দশ বছর ধরে মজদূরী করেছেন ও ছাগল চরিয়েছেন।[৪৩০]

মূসার দৈহিক শক্তি ও আমানতদারিতার কারণে আট বা দশ বছর শুআইব (আ.) এর ছাগল চরানোর বিনিময়ে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই কর্মচারী হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[৪৩১] ইউসূফ (আ.) ছিলেন মিসরের অর্থ বিভাগের প্রধান। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "ইউসূফ বলল, আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"[৪৩২] নবী রসূলগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা স্বহস্তে কর্ম সম্পাদনকে অধিক পছন্দ করতেন। প্রিয়নবী (সা.) এর প্রাথমিক জীবনে ছাগল চরানো ও পরবর্তীতে খাদিজা (রা.) এর ব্যবসায়িক দায়িত্ব পালনে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে।

আমাদের সমাজে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাজকে হেয় প্রতিপন্ন ও অবজ্ঞা করার প্রবণতা বিদ্যমান। অথচ ইসলামের অবস্থান এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেখানে কোন কাজকেই খাটো করে দেখার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বরং প্রত্যেক পেশাকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নবীকূলের শিরোমণি মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) সহ অপরাপর সকল নবীই ছাগল চরিয়েছেন। এ মর্মে খাতামুন্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। "আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।"[৪৩৩] উক্ত হাদীস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর নিকট সম্মানজনক। নিষ্কর্ম বসে থেকে জীবিকার জন্য অপরের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজ হাতে উপার্জন করতে ইসলাম বরাবরই উৎসাহিত করেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ মানবই জীবন-নির্বাহের তাগিদে কোন না কোন হালাল পেশা অবলম্বন করেছেন।

---

[৪২৩] আবদুল হামিদ ফাইযী, *হারাম রুযি ও হারাম রোযগার*, পৃ. ১৯
[৪২৪] প্রাগুক্ত
[৪২৫] প্রাগুক্ত
[৪২৬] প্রাগুক্ত
[৪২৭] প্রাগুক্ত
[৪২৮] প্রাগুক্ত
[৪২৯] প্রাগুক্ত
[৪৩০] প্রাগুক্ত
[৪৩১] আল-কুরআন ২৮: ২৬, *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তালবির রিযক*, পৃ. ৬৪
[৪৩২] আল-কুরআন ১২: ৫৫
[৪৩৩] ইমাম বুখারী (রহ), *সহীহ আল-বুখারী*- ২১১৯, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৪, পরিচ্ছেদ: কয়েক কীরাতের বিনিময়ে বকরী চরানো, পৃ. ১১২

**খোলাফায়ে রাশেদীন ও অপরাপর সাহাবাদের জীবন নির্বাহ:**

রাসূলে আকরাম (সা.) এর জীবনাদর্শ থেকে জীবিকা নির্বাহের বিষয়ে আমরা যে শিক্ষা পাই তারই ধারাবাহিকতায় সাহাবাগণের জীবনেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাদের প্রত্যেকেই জীবন নির্বাহে কর্মনিষ্ট ছিলেন। রসূল (সা.) এর সর্বাধিক প্রিয় পাত্র আবু বকর সিদ্দীক (রা.) জাহেলী যুগ থেকে ছিলেন একজন সৎ ব্যবসায়ী। শৈশব থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত পিতা আবু কুহাফার উপর নির্ভরশীল হলেও তার মৃত্যুর পর মাত্র বিশ বছর বয়সেই সকল ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব, দক্ষতার সাথে নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) এর অধিকাংশ বাণিজ্য সফরের সঙ্গী ছিলেন। প্রায়ই ব্যবসার কাজে তিনি সিরিয়া যেতেন। ইসলাম কবুল করার পর তার সকল গোলাম আজাদ করে দেন ও সমস্ত সম্পদ ইসলামের কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু যখন তিনি খলিফা নিযুক্ত হন তখনও কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য বের হন।[৪৩৪]

উমার (রা.) কৈশোরে উটের রাখালী করতেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী ‘দাজনান’ নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তার খিলাফতকালে একবার এই মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে। এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে উট চরাতাম।”[৪৩৫] উমার (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৪৩৬]

উসমান (রা.) যৌবন থেকেই ব্যবসা করতেন। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৪৩৭] তিনি জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে কাপড় বিক্রি করতেন এবং এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৪৩৮] সততা ও বিশ্বস্ততার গুনে ব্যবসায়ে অভূতপূর্ণ সফলতা লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে ‘গনী’ উপাধি লাভ করেন।

তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.) ছিলেন একজন মর্যাদাবান ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জীভূত করার লালসা তার ছিল না। আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি খেজুরের বিনিময়ে কূপ থেকে পানি তুলে অন্যের জমিতে সেচ দিতেন। তাঁর কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছাতো যে হাতে রশির দাগ পড়ে যেত।[৪৩৯] অসংখ্য সাহাবী যখন রাসূলে কারিম এর আহ্বানে জন্ম ভূমি মক্কা ও অন্যান্য স্থান ত্যাগ করে মদীনায় গিয়েছিলেন তখন তারা ছিলেন সর্বহারা। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর কিছুই ছিল না। হযরত সা'য়াদ তাকে মূলধন দেওয়ার প্রস্তাব করলেন ব্যবসার জন্য। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন: আমাকে বাজারের পথ

---

[৪৩৪] ফাৎগুল বারী, হাদীস ২০৭২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য
[৪৩৫] তাবাকাত: ৩/২৬৬-৩৭
[৪৩৬] *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবহাত ফি তলাবির রিযক*, পৃ. ৬৮
[৪৩৭] প্রাগুক্ত
[৪৩৮] প্রাগুক্ত
[৪৩৯] *ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শূবহাত ফি তলাবির রিযক*, পৃ. ৬৮

দেখিয়ে দাও। আমি নিজস্বভাবে উপার্জন করবো। তিনি বস্তুতই বাজারে পনির ও মাখন বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে দিলেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তার দারিদ্র্য মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্য মুহাজিরও তাঁর এ স্বয়ম্ভরতার উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৪৪০]

খাব্বাব ইবনে আরত ছিলেন কর্মকার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন রাখাল, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) তীর প্রস্তুতকারী ছিলেন। সালমান ফারসী ক্ষুরকার ও খেজুর গাছে পরাগায়নের কাজ করতেন। বারা ইবনে আযেব ও যায়েদ বিন আরকাম ছিলেন ব্যবসায়ী।[৪৪১] হালাল জীবিকা নির্বাহ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নবী-রসূল, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অপরাপর সাহাবীগণ যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা আমাদের সকলের নিকট অনুকরণীয়। কেননা দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ বৈভবই জীবনের সবকিছু নয়। আখিরাতে এ সম্পর্কে বান্দাহ অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। হুমায়দ ইবন্ মাসআদা (র.) ..ইবন্ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "তার সম্পদ সম্পর্কে (জিজ্ঞেস করা হবে) সে কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে।"[৪৪২]

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব**

সকল প্রকার হারাম পরিহারের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। আর জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে হারাম থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি তো আরও অধিক গুরুত্বের দাবিদার। যা মানুষকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দেখানো সরল ও সুন্দর পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বলুন! ভাল ও মন্দ এক নয়। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। কাজেই হে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৪৪৩]

অত্র আয়াতে ভাল মন্দ তথা হালাল হারামকে মর্যাদার মানদণ্ডে পরিমাপ করে দেখানো হয়েছে। এখানে এ কথা অনুধাবন করানো হয়েছে যে, হারাম জিনিস বা হারাম পথে অর্জিত জিনিস যত বেশি চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয়ই হোক না কেন সেটা বিন্দু পরিমাণ হালাল জিনিসের তুলনায় ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া আবর্জনার মত। কেননা এ চাকচিক্য কেবল পার্থিব জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর আখিরাতে এর কোন স্থান নেই। কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে এক পয়সাও হালাল পন্থায় উপার্জন করে তাহলে সেটাই আখিরাতে তার জন্য কাজে লাগবে। আর যদি কোন ব্যক্তি হারাম পন্থায় উপার্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, তাহলেও কিয়ামতের দিন সমস্ত সম্পদ ধূলার মতো উড়ে গিয়ে বাতাসের সাথে মিশে যাবে। এর সামান্য পরিমাণ অংশও তার কোন কাজে আসবে না। কোনটি হালাল এবং

[৪৪০] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, খায়রন প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯৬, তৃতীয় প্রকাশ, পৃ. ৬৭-৬৮

[৪৪১] প্রাগুক্ত

[৪৪২] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, খ:৪র্থ, অধ্যায়: কিয়ামত, অনু: কিয়ামত প্রসঙ্গে, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬২, হাদীস নং-২৪১৯

[৪৪৩] আল-কুরআন ৫: ১০০

কোনটি হারাম আল্লাহ তা'আলা তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি কেবল হালাল পথে উপার্জন করতে, হালাল বস্তু ভক্ষণ করতে এবং হারাম বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উপার্জনের ক্ষেত্রে এবং আহারের ক্ষেত্রে হারাম পথ বেছে নিল সে যেন আল্লাহর নির্দেশকেই অমান্য করল এবং নিজেকে শাস্তির যোগ্য করে নিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন, "আর যারা কুফরী করেছে তারা দুনিয়ায় কিছুদিনের স্বাদ ভোগ করছে এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মত খাওয়া-দাওয়া করছে। তবে জাহান্নামই হল তাদের ঠিকানা।"[৪৪৪]

হযরত আবু হুরাইয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, মানুষের সামনে এমন এক যুগ উপস্থিত হবে যখন কোন লোক যা থেকে (সম্পদ) আয় করছে সেটা হালাল বা হারাম কিনা এর পরোয়া করবে না।[৪৪৫]

যেহেতু হালাল উপার্জন এবং ভক্ষণ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত সুতরাং হারাম বস্তু ভক্ষণকারী কিংবা হারাম পন্থায় উপার্জনকারীর কোন ইবাদত আল্লাহ তা'আলা কবুল করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক আমল কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবগত আছি।"[৪৪৬]

হাদীস শরীফে আছে, "আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত মালের সাদকা গ্রহণ করেন না।[৪৪৭]

ইসলাম স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ, আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ভিতর বাহির হতে হবে সমান্তরাল। সেক্ষেত্রে সাদাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে পবিত্রতা রক্ষা করতে জোর তাগিদ দিয়েছে। সাদাকা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার দ্বারা বান্দাহ অজস্র নেকি অর্জন করে থাকে। অথচ যদি কোন ব্যক্তির সাদাকা খারাপ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা কখনোই কবুল করবেন না। বরং এর মাধ্যমে উল্টো গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা এটা আল্লাহর সাথে উপহাসের শামিল। বিষয়টি এমন- আল্লাহ তা'আলা হারাম উপার্জন করতে নিষেধ করলেন আর কেউ তার অবাধ্য হয়ে সেই পন্থায় উপার্জন করে তাকেই উপহার দিলো। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন, "ইয়াহুদিদের বাড়াবাড়ি ও সীমা-লঙ্ঘনমূলক আচরণের কারণে এমন অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম যা তাদের জন্য পূর্বে হালাল ছিল। এটা এ জন্য যে এরা অনেক মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে। তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তাদেরকে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ

[৪৪৪] আল-কুরআন ৪৭: ১২

[৪৪৫] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযী (রহঃ), *মিশকাত শরীফ*- ২৬৩২, অনু: মাওলানা শামসুল হক, সোলেমানীয়া বুক হাউজ, ৩৬/৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, এপ্রিল ২০১০ (ঈসায়ী), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.- ৪৫২

[৪৪৬] আল-কুরআন ২৩: ৫১

[৪৪৭] ইমাম আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসাই (রহঃ), *সুনানে আন-নাসাই*- ১৩৯, অনুচ্ছেদ- পবিত্রতা

করা হয়েছিল। এবং তারা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে (ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে) গ্রাস করে নিত। সুতরাং আমি এসব কাফিরদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।”[৪৪৮]

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত কাব ইবনে উযরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে কাব ইবনে উযরা। যে দেহের গোশত হারাম সম্পদ দিয়ে গঠিত হয়েছে তার জন্য জাহান্নামই সমীচীন।[৪৪৯]

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অত্যাচার করে নেবে (মহাপ্রলয়ের দিন) তার গলায় সাত তবক জমিন পরিধান করানো হবে।[৪৫০]

হযরত আবূ উমামা কর্তৃক ইয়াস ইবনে সালাবা আল হারেসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি (মিথ্যা শপথের মাধ্যমে) কোন মুসলিমের হক আত্মসাৎ করে মহান আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করবেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ, যদি তা তুচ্ছ বস্তুও হয়?তিনি বলেন, তা যদি পিলু গাছের একটি কাটা বা ডালই হোক না কেন।[৪৫১]

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব খুবই মারাত্মক। হারাম উপার্জনের ফলে মানব জীবনের সব ধরণের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয়। রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। জুলুম, অন্যায়, প্রতিহিংসা, রেষারেষি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হারাম ভক্ষণকারী পরিবার-পরিজন ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অথচ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ফরজ। আল্লাহ তা’আলা কোরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, “হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে ঐ অগ্নি থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৪৫২]

### হারাম উপার্জনসমূহ

হারাম উপার্জন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। তাই উভয় জাহানে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে সকল প্রকার হারাম বর্জন করা অত্যাবশ্যক। একজন মুসলিমের পক্ষে কখনোই হারাম উপার্জন কাম্য নয়। নিম্নে কতিপয় হারাম উপার্জনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল-

### চুরির দ্বারা রুযি

সম্পদের মালিককে কোন কিছু না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে কিছু অংশ নিজের করে নেওয়াকে চুরি বলা হয়। এ ধরণের রুযি পুরোপুরি হারাম যা ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়ানক অপরাধ। আল্লাহ তা’আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ

---

[৪৪৮] আল-কুরআন ৪: ১৬০-১৬১

[৪৪৯] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, ই.ফা.বা. জুন ২০০৭, খ: ২য়, অধ্যায়:সফর, অনুচ্ছেদঃ সালাতের ফযীলত, পৃ:২৫৫, হাদীস নং-৬১২

[৪৫০] আবু যাকারিয়া ইয়াহহিয়া বিন শারযা আন-নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*- ২০৬, অনু-ফজলুর রহমান, মীনা বুক হাউজ, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, জানুয়ারী ২০১৫ (ঈসায়ী), ১ম খণ্ড, পৃ.- ১৫১,বুখারী- ২৪৫৩. ৩১৯৫, মুসলিম- ১৬১২

[৪৫১] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম্, পরিঃ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক তসরুফকারী (বিনষ্টকারী) প্রতি জাহান্নামের হুমকি, প্রাগুক্ত, পৃ:১৮৯, হাদীস নং-২৫২

[৪৫২] আল-কুরআন ৬৬: ৬

করেন- “নর ও নারী চোরের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে তা তারই শাস্তি এবং এটা আল্লাহর নিকট থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তবে যে জুলুম করার পর তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি আবার তার দিকে ফিরে আসবে। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৪৫৩]

**জিনিস ধার নিয়ে অস্বীকার**

সাধারণত মানুষের কিছু ধার নিলে তা থেকে সাময়িক উপকৃত হয়ে ফেরত দিয়ে দেয়। এমন কাজ সামাজিক সৌহার্দ্যপূর্ণ হলেও এক শ্রেণীর হীন মানুষ আছে যারা ধার নিয়ে তা আর ফেরত দেয়না। চাইতে গেলে অস্বীকার করে। এরাও চোরের কাতারে পড়ে। যেমন: হাদীসে এসেছে, সাঈদ ইবন্ সুলাইমান (রা.) . . . আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) এর যুগে, “(উচ্চবংশীয়) মাখযুমী মহিলা অনুরূপভাবে লোকের কাছ থেকে জিনিস ধার নিত। অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে তার নিকট আত্মীয়সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না যায় সে চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (সা.)এর সঙ্গে কে কথা বলবে? পরিশেষে তারা বলল, আল্লাহর রসূল (সা.) এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়েদ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দু:সাহস করবে? সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন। (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সেই ব্যাপারে সুপারিশ করলেন।) এর ফলে রসূল (সা.) বললেন, হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধি সমূহের একটি দণ্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।”[৪৫৪]

**ডাকাতি করে আয়**

কারও নিকট থেকে প্রকাশ্যে ডাকাতি করা হারাম এবং এ পথে উপার্জিত সকল সম্পত্তিও হারাম এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা কুরআন মাজীদে এসেছে, “যারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে

---

[৪৫৩] আল-কুরআন ৫: ৩৮-৩৯

[৪৫৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৬৩৩১, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০০৭, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ দশম, অধ্যায়ঃ শরীয়তের শাস্তি, অনুচ্ছেদঃ বাদশাহর কাছে যখন মুকাদ্দমা পেশ করা হয় তখন শরীয়তের শাস্তির বেলায় সুপারিশ করা অসমীচীনঃ ২৮৩২, পৃ.ঃ ২১৪

ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।[৪৫৫]

হাজ্জাজ ইবন্ মিনহাল. . . আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী **কারিম** (সা.) লুটতারাজ ও অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।[৪৫৬]

**মুক্তিপণ আদায়**

কাউকে আটক রেখে মুক্তিপণ দাবি নিঃসন্দেহে এক প্রকার ডাকাতি। শিশু ও নারীদের বন্দি রেখে মুক্তিপণ আদায় করতে না পারলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া অথবা একেবারে মেরেই ফেলা জমিনে ভয়াবহ ফ্যাসাদ ডেকে আনে। আবার বিবাহের নামে স্ত্রীকে পণবন্দি করে যৌতুক নেয়া এক শ্রেণীর ভদ্র ডাকাতের অর্থ আদায়ের সুন্দর কৌশলও বটে। এরা যে বড় মাপের হারামখোর তা বলাই বাহুল্য। যেমন নবী কারীম (স) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ওসিলা বানিয়ে (তার কোন ক্ষতি সাধন করে অথবা তাকে কষ্ট দিয়ে) এক গ্রাসও কিছু ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ গ্রাস জাহান্নাম থেকে ভক্ষণ করাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ওছিলা বানিয়ে অনুরূপ কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে অনুরূপ কাপড় জাহান্নাম থেকে পরিধান করাবেন।"[৪৫৭]

**সুদী কারবারি বা বানিজ্য**

সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করে মূলধনের উপর অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করার নাম হচ্ছে সুদ। যা ইসলামে নিকৃষ্টতর হারাম। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৪৫৮]

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৪৫৯]

অপরদিকে সুদী ব্যাংক ও বীমাগুলোতে চাকুরি করলে তাদের সহযোগিতা করা হয়, বিধায় এসব চাকুরিও হারাম। হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (সা.) লা'নত করেছেন যে সুদ খায় তার প্রতি। যে সুদ দেয়, যে দলিল লেখে এবং যে দুজন সুদের সাক্ষী হয় তাদের প্রতি। রসূল (সা.) এটাও বলেছেন যে, গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ায় তারা সকলেই সমান।[৪৬০]

---

[৪৫৫] আল-কুরআন ৫: ৩৩

[৪৫৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৫১২০, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ নবম, অধ্যায়ঃ যবাহ করা, শিকার করা এবং শিকারের সময় বিসমিল্লাহ বলা, অনুচ্ছেদঃ পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর দ্বারা হত্যা করা ও চাঁদমারী করা মাকরুহ- ২১৯১, পৃ.ঃ ১৮০

[৪৫৭] আহমদ, আবু দাউদ, *সহীউল জামে*- ৬০৮৩

[৪৫৮] আল-কুরআন ৩: ১৩০

[৪৫৯] আল-কুরআন ২: ২৭৮

[৪৬০] আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযি (রহঃ), *মিশকাত শরীফ*- ২৬৭৫, মীনা বুক হাউজ ৩৬/৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, এপ্রিল ২০১০ (ঈসায়ী), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.: ৪৫৮

**ব্যবসায় নেশাজাত দ্রব্য হারাম**

নেশা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার দ্রব্য হতে উপকার লাভ হারাম। কেননা এর সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রকার মানুষের উপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল লা'নত করেছেন। যেমনঃ হাদীস শরীফে এসেছে, উসমান ইবন্ আবী শায়বা (র.)... হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন রসূল (সা.) বলেছেন, মদের উপর, তা পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়, এদের সকলকে আল্লাহ লা'নত করেছেন।[৪৬১]

যেহেতু নেশাজাতীয় সকল প্রকার দ্রব্যই হারাম সুতরাং তা হালাল করার জন্য যত প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হোক না কেন সেটা হারাম হিসেবেই সাব্যস্ত হবে এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদও হারাম হবে।

হুমাইদী (রা.) . . .ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে খাত্তাব (রা.) এর নিকট সংবাদ পৌছাল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বা মদ বিক্রি করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানেনা যে, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদিদের সর্বনাশ করুন তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত।[৪৬২]

**জুয়া বা লটারি দ্বারা আয়**

জুয়া, লটারি ধোকা বা প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে যেমন এক পক্ষ লাভবান হয় তেমনি অপরপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামে এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআনে মাজীদের ঘোষণা- "হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ-জুয়া, প্রতিমা পূজা ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর তো কেবল ঘৃণার বস্তু। শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলোকে বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ স্মরণ ও সালাতে বাধা দেয়। অতএব তোমরা কি বিরত হবে না?"[৪৬৩]

**ঘুষের দ্বারা কামাই**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে খেয়ো না এবং শাসকদের সামনেও এগুলোকে এমন কোন উদ্দেশ্যে পেশ করো না যার ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের সম্পদের কিছু অংশ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও।"[৪৬৪]

কারও পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য া গ্রহণ করা হয় এবং যা প্রদান করা হয় তাই ঘুষ।

---

[৪৬১] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খণ্ডঃ৪র্থ, অধ্যায়ঃ পানীয়, অনুচ্ছেদঃ মদ তৈরির জন্য আগুর নিংড়ানো সম্পর্কে, পৃঃ৪৮৮, হাদীস নং-৩৬৩৩

[৪৬২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ২০৮০, , পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ চতুর্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তুও চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয়-১৩৭৯, পৃ.ঃ ৮৬

[৪৬৩] আল-কুরআন ৫: ২০-২১

[৪৬৪] আল-কুরআন ২: ১৮৮

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আমর ইবন আল আস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।[৪৬৫]

কোন নেতা, উচ্চপদস্থ অফিসার, ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তা ইত্যাদি কারও দ্বারা কোন কাজ আদায়ের জন্য যে কোন প্রকার উপঢৌকন ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া কর্তব্যরত ব্যক্তির উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত সেটি ভুলে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করা অথবা যে কাজ করা অন্যায় সেটি করে দেওয়ার মাধ্যমে কোন বিনিময় গ্রহণ অথবা সত্যকে ঢাকার জন্য কোন কিছুর বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। উবায়দ ইবন্ ইসমাইল (রা.). . . আবূ হুমাইদ সা'ঈদী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) লুতবিয়্যা নামক এক লোককে বনী সুলায়ম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে আসল তখন তিনি তার নিকট হিসাব নিকাশ নিলেন। সে বলল এগুলো হল আপনার মাল আর এগুলো (আমাকে দেওয়া) হাদিয়া। তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমার বাবা-মা'র ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে এমন কোন কাজে নিয়োগ করি যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ করে এসে বলে এ হল তোমাদের মাল আর এ হল আমাকে দেয়া হাদীয়া। তাহলে সে কেন তার বাবা-মার ঘরেই বসে থাকল না। সেখানে এমনিতেই তার কাছে হাদীয়া পৌঁছে যেত? আল্লাহর কসম তোমরা যে কেউ অন্যায় পন্থায় কোন কিছু গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালভাবে চিনব যে, সে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে। আর উট আওয়াজ দিতে থাকবে, অথবা গাভী বহন করে সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বকরী বহন করে আর সেটা ডাকতে থাকবে। তারপর তিনি আপন হাত দুটি এতদূর উত্তোলন করলেন যে তার বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার দুচোখ সে অবস্থা দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে।"[৪৬৬]

**ভাগ্য গণনা নিষিদ্ধ**

গণক বা জ্যোতিষী বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে যারা হস্তরেখা দেখে অথবা বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ এবং তারার উদয় অস্তাচলের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোন লক্ষণ দেখে বা তিথি গণনা করে অথবা শয়তানের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বানী করে এবং ইলমে গয়েবের দাবী করে। ইসলাম এসব গণক ও জ্যোতিষীদের সকল প্রকার উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

[৪৬৫] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, অধ্যায়ঃ বিচার, অনুচ্ছেদ:ঘুষের অপকারিতা সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৪, হাদীস নং-৩৫৪২

[৪৬৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৬৫০৮, প্রাগুক্ত, খণ্ডঃ ১০ম, অধ্যায়ঃ কূটকৌশল, অনুচ্ছেদঃ বখশিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন-২৯২৮, পৃ.ঃ ৩২৪

হাদীস শরীফের বর্ণনা, আব্দুল্লাহ ইবন্ ইউসুফ. . .

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।”[৪৬৭]

**পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন**

নারীদেহ কেন্দ্রিক ব্যবসায় পতিতাবৃত্তি হিসেবে গণ্য। ইসলামে এটি সম্পূর্ণ হারাম।

হাদীস শরীফে এসেছে, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেছেন, কুকুরের বিক্রয়মূল্য, গণকের ভেট এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে আয় ভক্ষণ করা হালাল নয়।[৪৬৮]

এর সাথে সম্পৃক্ত সমাজে বহুল প্রচলিত যেসব হারাম উপার্জন রয়েছে তার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হল। যেমন-

- ব্যভিচারের মাধ্যমে।
- ব্লু ফিল্ম তৈরি, প্রচার ও বিক্রির মাধ্যমে।
- নৃত্য পরিবেশন ও শেখানোর মাধ্যমে।
- গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে।
- দোকানে সুন্দরীদের ছবি দিয়ে সাজিয়ে ক্রেতাকে আকর্ষিত করে ব্যবসা।
- বিজ্ঞাপন তৈরির জন্য নারীর দেহকে বিক্রি করার মাধ্যমে উপার্জন।
- পত্রিকায় প্রচারের উদ্দেশ্যে সুন্দরী নারীদের ছবি ছাপানো।

**আমানতের খিয়ানাত**

আমানতের বিপরীত খিয়ানাত। আমানত এমন সব চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মাঝে কিংবা জাতি ও জাতির মাঝে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এটা সংরক্ষণ করা ওয়াজিব। এবং ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “খিয়ানাত করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না। যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে কিয়ামতের দিন সে নিজের খিয়ানাত করা জিনিস সহকারে হাজির হয়ে যাবে। তারপর, প্রত্যেকেই তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান পেয়ে যাবে। এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।[৪৬৯]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেবুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানত সমূহের খিয়ানাত করো না।”[৪৭০]

---

[৪৬৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ২০৯৫, অধ্যায়ঃ ক্রঢ-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ কুকুরের মূল্য-১৩৮৮ , খণ্ডঃ ৪র্থ, পৃ.ঃ ৯৩, প্রাগুক্ত

[৪৬৮] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বানিজ্য, অনু: কুকুরের মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:৪০৮, হাদীস নং-৩৪৪৮

[৪৬৯] আল-কুরআন ৩: ১৬১

[৪৭০] আল-কুরআন ৮: ২৭

আমানতের খিয়ানাতকারী বিরাট পাপে পতিত হয়। ফলে তার সকল উপার্জন হারাম সাব্যস্ত হয়। এখানে খিয়ানতের কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হল।

জনসাধারণের নামে সরকারী অনুদান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আত্মসাৎ করা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত এলাকায় সরকারি অনুদান এলে এমন অনেক লোক আছে যারা অনুদান আত্মসাৎ করে। অথচ তারা তার হকদার না, তাছাড়া রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যে টাকা সরকারি কোষাগার থেকে আসে তার অনেকটাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কুক্ষিগত করে।

মালিকের অগোচরে কর্মচারী কর্তৃক দোকান থেকে বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো।

মালিক কর্তৃক নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে মাল বিক্রি করে বাড়তি টাকা আত্মসাত করা।

দর্জি কর্তৃক মাপ নেওয়ার সময় অতিরিক্ত মাপ নিয়ে কাপড় চুরি করা।

কর্মকার কর্তৃক সোনা-রূপা থেকে কিছু অংশ চুরি করা এবং তার জায়গায় খাদ ভরে দিয়ে ওজন পূর্ণ করা।

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মালিক জানা সত্ত্বেও গোপন করে তা ভক্ষণ করা।

আমানত স্বরূপ গচ্ছিত টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে লাভ ভোগ করা যেমনঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার যারা এ ধরণের কাজে টাকা পয়সার দায়িত্বে থাকেন তাদের দ্বারা ঐ ফান্ড বা মাল থেকে নিজের স্বার্থ হাসিল করা।

সার্টিফিকেট, ভাউচার জালিয়াতি করে অর্থ উপার্জন এবং দলিল নকল করে জমি দখল।

মালিকের গাড়ির ভাড়া গোপন করে ভক্ষণ।

চাকুরীর স্থলে কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করে গাফিলতি করা।

ডাক্তার কর্তৃক রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় না করে ভুল প্রেসক্রিপশন করা অথবা, কম গুরুত্বের সাথে রোগী দেখা।

**মূর্তি বা ছবির ব্যবসা হারাম**

মূর্তি ও ছবি শিরকের কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে ইসলাম যেকোন ধরণের মূর্তি বা ছবি তৈরি নিষিদ্ধ করেছে। এর দ্বারা সকল উপার্জন হারাম। এ মর্মে হাদীসের ভাষ্য,

আব্দুল্লাহ্ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব (রা.)... সাঈদ ইবন আবুল হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ইবন আব্বাস (রা) রর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আব্বাস! আমি এমন এক ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এসব ছবি তৈরি করি। ইবন্ আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন ( এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আমি যা বলতে শুনেছি তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে সে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। ( এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা

ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবন্ আব্বাস (রা) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ নাই ছাড়তে পার, তবে এ গাছ পালা এবং সে সকল জিনিসের প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পার।"[৪৭১]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে কতিপয় অবৈধ উপার্জন উল্লেখ করা হল।

- সরাসরি মূর্তি তৈরি ও বিক্রি।
- বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অঙ্কন ও বিক্রি।
- গ্রাফিক্স ডিজাইনের সাহায্যে প্রাণীর ছবি তৈরি ও তার ব্যবসা।

**গান ও বাদ্যযন্ত্র অবৈধ**

গান বাজনা হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা। এর দ্বারা মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকে এবং পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি এ পথে উপার্জন নিষিদ্ধ।

কুরআনে এসেছে, "আর মানুষদেরই মধ্যে এমন কেউ আছে, যে মনোমুগ্ধকর কথা কিনে আনে। কোনরূপ জ্ঞান ছাড়াই মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং এ পথের আহ্বানকে হাসি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। এ ধরণের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৪৭২]

হাদীসে এসেছে, হিশাম ইবন্ আম্মার (রা.) .. "আব্দুর রহমান ইবনু গানাম আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আবু আমীর কিংবা আবু মালিক আশ'আরী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমার কাছে মিথ্যা বলেননি। তিনি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।[৪৭৩]

এর সাথে সম্পৃক্ত যে সকল বিষয় জড়িত তা হল-

- গান গেয়ে ও বাদ্য বাজিয়ে বিনিময় গ্রহণ।
- বাদ্যযন্ত্র ও গানের ক্যাসেট বিক্রির ব্যবসা।
- মেমোরিতে গান লোড করে দেওয়ার ব্যবসা।
- গানের মঞ্চ তৈরি করে অর্থ আয়।
- গান-বাজনার সরঞ্জামাদি ভাড়া দেওয়া।
- নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে উপার্জন।

[৪৭১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-২০৮৪, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়,পরিচ্ছেদঃ প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ-১৩৮০, পৃষ্ঠাঃ ৮৭, প্রাগুক্ত

[৪৭২] আল-কুরআন ৩১: ০৬

[৪৭৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৫০৮৯, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ পানীয় দ্রব্যসমূহ, পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মাদককে ভিন্ন নামে নামকরণ করে হালাল মনে করে-২২২৫, পৃ.ঃ ২১৭, প্রাগুক্ত

**হারাম ও মৃত প্রাণী বিক্রয় দ্বারা উপার্জন**

যেসব প্রাণী ভক্ষণ হারাম, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। এর বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করতে আল্লাহ ও তার রসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। কুরআনে এসেছে, "তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেসব প্রাণী যা আল্লাহ, ব্যতীত অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।"[৪৭৪]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসূল (সা.) কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয়মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।"[৪৭৫]

হালাল প্রাণীসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যবেহকৃত প্রাণীসমূহ থেকেই খাওয়া ও বিক্রি করা বৈধ করেছেন। কিন্তু যেসব প্রাণী বৈধ পন্থায় যবেহ করা বা শিকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মৃত্যুবরণ করে সেসব প্রানীর গোশত খাওয়া, বিক্রি করা এবং তা থেকে অন্য কোন উপায়ে উপকার লাভ করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

হাদীসে এসেছে, "হযরত আবু মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা.) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচার বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।"[৪৭৬]

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ ও তার মূল্য, মৃত্যু প্রাণী ও তার মূল্য এবং শূকর ও তার মূল্যকে হারাম করে দিয়েছেন।"[৪৭৭]

**জাদু দ্বারা আয় রোজগার**

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার নিকৃষ্ট পন্থা হল জাদু। এ কাজে শয়তানের প্ররোচনা বিদ্যমান। এতে ব্যক্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এহেন মন্দ পন্থায় উপার্জন ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে,

"জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল (সা.) কে জাদু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এগুলো শয়তানের কার্যকলাপ।"[৪৭৮]

এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো হারাম বলে বিবেচিত-

- জাদু শিক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট খেলা প্রদর্শন।

---

[৪৭৪] আল-কুরআন ২: ১৭৩

[৪৭৫] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, খ: ৩য়, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, অনু: কুকুর ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য মাকরুহ, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৫৬, হাদীস নং-১২৮২

[৪৭৬] ইসমাঈল আল-বুখারী (র.), *সহীহ আল-বুখারী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ২০০৩, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭, খ:৪র্থ অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, হাদীস নং-২০৯৫

[৪৭৭] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (রহ:), *আবু দাউদ শরীফ*, অনুচ্ছেদ: ইজারা (ভাড়া ও শ্রম বিক্রয়), ৩৪৮৫

[৪৭৮] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *দাউদ শরীফ*, ই.ফা.বা. আগস্ট ২০০৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, খ: ৫ম, অধ্যায়: চিকিৎসা, অনু: শয়তানের নামের মন্ত্র পাঠের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে, পৃ:৩১, হাদীস নং-৩৮২৮

- মানুষকে ভয় দেখিয়ে এবং এতে আবদ্ধ করে রোজগার।
- জাদুর খেলা দেখিয়ে লোক জমা করে পণ্য বিক্রি।

**ওকালতি ও বিচারকার্যে অনৈসলামিক পথে আয় উন্নতি**

যেসকল লোক ওকালতি ও বিচার ফয়সালার অনৈসলামিক বিধি অনুসরণ করে রোজগার করে থাকে তার উপার্জনের পুরোটাই হারাম কারণ ইসলামের পরিভাষায় তাদের তাগূত বলা হয় যারা আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার সম্পন্ন করে থাকে।

পবিত্র কুরআনে তাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়-

"আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায় যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"[৪৭৯]

"আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন যারা সে অনুযায়ী বিচার মিমাংসা করে না তারা কাফের।"[৪৮০]

"আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন যারা সে অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করে না তারা জালেম।"[৪৮১]

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসেক।"[৪৮২]

**তাবিজ ব্যবসায়ের বিধান**

তাবিজ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। সেগুলো হল:

১. এক প্রকার তাবিজ আছে, যা একটি কাগজের মধ্যে নক্সা বানিয়ে সংখ্যা লিখে অথবা কোন ফেরেশতা জিন কিংবা শয়তানের নাম ছক আকারে লিখে অথবা কোন জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অবোধগম্য বাক্য লিখে তৈরি করা হয়।

২. আরেক প্রকার তাবিজ আছে, যা কোন ধাতুর, পশু-পাখির হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে অথবা মাসজিদ, পীরতলা, কবরে জড়ানো চাদরের অংশ, কাবা ঘরের গিলাফের সুতো, মক্কা মদীনার মাটি ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়। আবার এমন তাবিজও আছে গাজাখোর ফকীরদের গাজার ছাই বা অন্য কোন নোংরা জিনিস দিয়ে তৈরি করা হয়।

   এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই দুই প্রকার তাবীজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই দুই প্রকার তাবীজের মাধ্যমে যত ধরণের আয় উপার্জন হবে সবগুলো বাতিল ও হারাম হিসেবে গণ্য হবে।

---

[৪৭৯] আল-কুরআন ৪: ৬০
[৪৮০] আল-কুরআন ৫: ৪৪
[৪৮১] আল-কুরআন ৫: ৪৫
[৪৮২] আল-কুরআন ৫: ৪৭

৩. তৃতীয় আরেক প্রকার তাবীজ আছে, যা কোরআনের আয়াত কাগজে লিখে তৈরি করা হয়। এ প্রকার তাবীজের ব্যাপারে কেউ কেউ জায়েজ বললেও তা ব্যবহার করা যাবে না।

কারণ রসূল (সা.) সাধারণভাবে সকল প্রকার তাবীজ ব্যবহারকে শিরক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। হাদীসে এসেছে, "হযরত উকাবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রসূল (সা.) এর নিকট দশজন লোক বাইয়াতের জন্য উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি নয়জনের কাছ থেকে বাইয়াত নিলেন এবং একজনের কাছ থেকে বাইয়াত নিলেন না। তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল। আপনি নয়জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একজনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন না কেন? তিনি বললেন ওর দেহে তাবিজ আছে। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তা ছিড়ে ফেললেন। তারপর তার নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শিরক করলো।"[৪৮৩]

**ভিক্ষাবৃত্তির হুকুম**

ভিক্ষাবৃত্তি বর্তমান সমাজে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন অনেক লোক আছে যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা নানাবিধ পদ্ধতিও অবলম্বন করে। ইসলামে এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করে বলেছে-

হাদীসে এসেছে, আবদান (রা.) . . .হাকিম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.) এর নিকট কিছু চাইলাম তিনি আমাকে দিলেন, আবার চাইলাম তিনি আমাকে দিলেন অতঃপর আবার চাইলাম তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে হাকীম, এ সম্পদ সুস্বাদু, যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে সেটি তার জন্য বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরে লোভসহ তা গ্রহণ করে তা তার জন্য বরকতময় হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।"[৪৮৪]

**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ হালাল উপার্জনের মাহাত্ম্য**

"আল্লাহ তোমাদেরকে যে সকল বৈধ পবিত্র রিয্ক দিয়েছেন তা তোমরা খাও আর আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় কর যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদতকারী হও।"[৪৮৫]

পূর্বাকাশে উদিয়মান প্রত্যক্ষ সূর্যের মতই একথা উজ্জ্বল সত্য যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহর উপর যে সকল আদেশসমূহ কার্যকর হয়েছে হালাল পন্থায় জীবিকা অর্জন তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হালাল এবং হারামের মাঝে পার্থক্যকারী নির্ভুল তুলাদণ্ড ইসলাম। হালাল উপায়ে জীবিকার্জন আল্লাহর ইবাদতের সামিল, একটি

---

[৪৮৩] মুসনাদে আহমেদ: ১৭৪৫০৮

[৪৮৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১৩৮৭, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ ৩য়, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাচনা থেকে বিরত থাকা-৯৩২, পৃ.ঃ ৪৫

[৪৮৫] আল-কুরআন ১৬: ১১৪

মহৎ নেক কাজ। যার বিনিময়ে আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে বিশুলভাবে পুরস্কৃত করবেন। পাশাপাশি ইসলাম মু'মিনদের জন্য গুরুদায়িত্ব স্বরূপ নির্ধারণ করে দিয়েছে তার নিজের এবং তার পরিবারের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জন। হালাল জীবিকা নৈতিকতা এবং নান্দনিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামের নীতি বহির্ভূত কোন উপায়ে জীবিকার্জন, আমাদের তিলে তিলে ব্যর্থতা এবং হতাশার দিকেই নিয়ে যায়।

অন্য দিকে, নৈতিকতা বজায় রেখে সৎ পথে জীবিকা উপার্জন করলে আমরা নিশ্চিতভাবে দুনিয়া এবং আখিরাত, উভয় জাহানে সফলকাম হব। উপার্জনের জন্য হালাল পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আমাদের জীবনে সক্রিয় এবং স্বতন্ত্রভাবেই চলে আসে সুশৃঙ্খল নন্দনময়তা। ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতা সমন্বিত একটি আদর্শ জীবন অতিবাহিত করার জন্য হালাল উপায়ে জীবিকার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খালিক ইবন মাখদাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোক তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। তার পবিত্র ও হালাল বস্তু ব্যতীত আল্লাহর দিকে কোন কিছু আগে গিয়ে পৌঁছে না।[৪৮৬]

আয় রোজগারের চেষ্টায় নিয়োজিত প্রত্যেকেরই কিভাবে তা সঠিক ও হালাল হয় এবং হারাম ও ত্রুটিপূর্ণ হয় তা জানা অবশ্য কর্তব্য, যাতে তার লেনদেন সঠিক হয় এবং আয়ব্যয় ত্রুটিমুক্ত হয়। বর্ণিত আছে, উমার (রা.) বাজারে ঘোরাফেরা করতেন, কোনো কোনো ব্যবসায়ীকে চাবুক মারতেন এবং বলতেন: যে ব্যক্তি শারিয়াতের বিধান জানে সে ব্যতীত আমাদের বাজারে কেউ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। কেননা যে শারীয়তের বিধান জানে না, সে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সুদ খাবেই।

আজকাল বহু মুসলমান লেনদেনের নিয়ম কানুন জানার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না এবং এই দিকটি অবহেলা করে থাকে। তারা শুধু বাড়তি মুনাফা অর্জনে এবং আয় বৃদ্ধিতেই উদগ্রীব থাকে এবং হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা করে না। এটা মারাত্মক অন্যায়। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কর্তব্য, এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। হালাল-হারাম বাছ-বিচার করে চলা, উপার্জনকে বৈধ ও হালাল রাখা এবং সাধ্যমত সন্দেহভাজন লেনদেনও এড়িয়ে চলা। খালিদ ইবন্ মাখলাদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। আর পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহর দিকে কোন কিছু অগ্রগমনকরতে পারে না। তারপর এটি তার মালিকের জন্য লালন পালনের ও দেখাশোনা করতে থাকে, তোমরা যেমন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাকো। পরিশেষে তা

---

[৪৮৬] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিক্হুস সুন্নাহ*, অনুক আকরাম ফারুক, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭, ১ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী খণ্ড: ৩য়, পৃ. ১১৬

পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে।[৪৮৭] তাই জীবিকা অর্জনের কোন পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বশর্তই হল হালাল হারাম সম্পর্কিত ইসলাম প্রদত্ত সকল বিধিনিষেধ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রেখে, তদানুসারে কাজ করা।

**হালাল উপার্জন ও তার ক্ষেত্রসমূহ:**

বান্দাহর যে কোন প্রয়োজনে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করাই তার জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তাঁর উপরই আমি ভরসা করি, তিনি হলেন মহান আরশের মালিক।"[৪৮৮]

আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে উপলক্ষহীন ভাবে পাঠাননি। আমাদের এই দুনিয়াতে আসা এবং বেঁচে থাকা সব তাঁরই মর্জি।

আর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় রুজির ব্যবস্থাকারীও ও কেবল তিনিই। জীবিকার্জনের প্রয়োজন যেমন রয়েছে, তেমনি তা পূরণের জন্য রয়েছে মহান রব্বুল আলামীন। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আমাদের আমলনামায়। সবকিছুর জন্য একদিন আমাদের প্রতিপালকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই অসৎ পথটিকে এড়িয়ে আমাদের সব সময় সৎ পথটিকে বেছে নিতে হবে। অনুরূপ যে কাজটি আমাদের হালাল রুজির জোগান দেয়। সেই কাজটিকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে হবে। হোক সে কঠিন কিংবা সহজ, ছোট কিংবা বড়, উঁচু কিংবা নিচু পর্যায়ের। আর আল্লাহ তা'য়ালার নজরে সেই ব্যক্তি বড় যে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করলো, এবং নিজ ভক্ষণকৃত প্রতিটি দানাকে হারামের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখল।

আদম (রা.) . .  আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে।[৪৮৯]

অতএব, কতইনা উত্তম সেই ব্যক্তি যিনি হালাল হারামের প্রতি সচেতন দৃষ্টিতে তফাৎ রেখে, হারাম কে সম্পূর্ণ পরিহার করে হালালকে আপন করে নিয়েছেন।

**হালাল জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী**

**তাকদিরের উপর বিশ্বাস**

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাউকে বেশী এবং কাউকে কম রিয্ক দান করেন। কাউকে ধনীর হালে দুনিয়ায় পাঠান কাউকে গরীব হালে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আসমান ও জমীনের চাবিকাঠি

---

[৪৮৭] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায়: জাহ্মিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ, অনু: আল্লাহর বাণী: ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয়, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৬০, হাদীস নং-৬৯২৪

[৪৮৮] আল-কুরআন ৯: ১২৯

[৪৮৯] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা. জুন ২০০৬, খ: ৪র্থ, অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল, তার পরোয়া করে না, পৃ.: ১১, হাদীস নং-১৯৩১

তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যার জন্য ইচ্ছা তিনি রিয্ক প্রশস্ত করেন ও (যার জন্য ইচ্ছা) সীমিত করেন। সব বিষয়েই তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী।[৪৯০]

রিযিকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্বয়ং আল্লাহ। তাই জন্মগতভাবে রিযিকের আধিক্যকে তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা মনে করে অথবা রিযিকের ঘাটতিকে আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এখানেই ওয়াজিব হয়ে যায় তকদিরের প্রতি বিশ্বাস। তকদিরে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি জানেন তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, তার প্রতিপালক তাকে কখনই পরিত্যাগ করবে না। আল্লাহর ভালবাসা এবং সন্তুষ্টি শুধু সেই ব্যক্তিই অর্জন করতে পারবে যে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। আর আল্লাহর উপরে ভরসাকারী কখনও হতাশ হতে পারেন না।

**রিযিকের সংকোচন প্রসারণঃ**

রিযকের হ্রাস বৃদ্ধি এমন এক পর্যায়ক্রমিক ঘটনা প্রতিটি মানুষকেই যার মুখোমুখি হতে হয়। পবিত্র কোরআন এ বলা হয়েছে "আল্লাহ রিয্ক সম্প্রসারিত করেন যার জন্য ইচ্ছে করেন, আর যার জন্য চান সীমিত পরিমাণে দেন।[৪৯১]

সম্পদ সংকুচিত হওয়া অনেক সময় বান্দাহর জন্য তার রবের পক্ষ থেকে তার কৃত পাপের শাস্তি স্বরূপ হতে পারে, এবং সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়া অনেক সময় তার রবের পক্ষ থেকে তার কৃত ভালো কাজের বিনিময় তথা উপহার স্বরূপ হতে পারে।

কেননা আল্লাহ তাআলা অনেক সময় আমাদেরকে দুনিয়াবি ভালো কিংবা মন্দে কাজের ফলাফলের কিছু অংশ এই দুনিয়াতেও দিয়ে দেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "তোমার কোন কল্যাণ হলে তা হয় আল্লাহর তরফ থেকে এবং তোমার যে কোন অকল্যাণ হলে তা হয় তোমার নিজের কারণে।[৪৯২]

তাই আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয়গুলো অনেক সময় অন্যায় কাজের কাফ্ফারা হিসেবে আমাদের উপরে এসে বর্তায়।

**তাওবা**

হালাল রিয্ক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পবিত্র নেয়ামত। যা আল্লাহর নাফরমানি দ্বারা কখনই অর্জন সম্ভব নয়। হালাল জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল অন্তরের পবিত্রতা অর্জন। অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখা। বান্দাহর পাপ তার ও তার রবের মাঝে দেয়াল স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ না সে পাপ থেকে পরিশোধিত হয়, ততক্ষণ তার কোনো দোয়া ও আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আবু বকর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন-

"যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪৯৩]

---

[৪৯০] আল-কুরআন ৪২: ১২

[৪৯১] আল-কুরআন ১৩: ২৬

[৪৯২] আল-কুরআন ৪: ৭৯

[৪৯৩] বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, *মিশকাত* ২১/২৭৮৭

অর্থাৎ হারাম উপার্জন করে হারাম খেয়ে কখনই জান্নাত লাভের আশা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।"[৪৯৪]

তাই হালাল উপায়ে জীবিকান্বেষণের পূর্বে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির নিমিত্তে তাওবা করে, নিজের পূর্বকৃত গুনাহ সমূহ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক।

**ধৈর্য ধারণ**

ধৈর্য ধারণ মু'মিন বান্দাহর এক অনন্য গুণ। যা মহান রব্বুল আলামীনের অতি পছন্দনীয় বিষয়। আল্লাহ আমাদের জীবন চলার পথে নানা ভয়, ভীতি ও বিপর্যয় দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এসবের) কোনকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব। ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রেরণ কর।"[৪৯৫]

আল্লাহ আমাদের রিয্ক সংকোচন করে অনেক সময়ে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেন। অর্থ সম্পদের অভাবে (সর্বোপরি জীবিকার অভাবে) আমরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ি। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ নিজ মর্জিতেই ফেলেন। কারণ তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন, যে এমন পরিস্থিতিতে আমরা ধৈর্য ধারণ ও তাঁর শোকর আদায় করি কিনা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের ঘটবে না, তিনিই আমাদের রক্ষক, আর আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা দরকার।"[৪৯৬]

পরম সংকটের মুহূর্তেও আল্লাহর উপরে ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করাই হলো একজন মু'মিন বান্দাহর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য।

**স্বল্পে তুষ্টি**

স্বল্পে তুষ্ট থাকা সুখী জীবনযাপনের পেছনে গোপন রহস্য। যে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলো, সে নিজেকে না পাওয়ার হাহাকার থেকে মুক্ত করে নিল। মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র.) আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রহ.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

"যে লোক ইসলাম কবুল করেছে এবং তার নিকট ন্যূনতম রিয্ক রয়েছে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক দিয়েছেন, সেই সফলকাম হলো।"[৪৯৭]

---

[৪৯৪] আল-কুরআন ২: ২২২

[৪৯৫] আল-কুরআন ২: ১৫৫

[৪৯৬] আল-কুরআন ৯: ৫১

[৪৯৭] ইবনে মাজাহ্ (র.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, অধ্যায়: পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি, অনু: কানা'আত (অল্পে তুষ্টি), প্রাগুক্ত, পৃ:৫৬৯, হাদীস নং-৪১৩৮

মানুষের চাওয়া পাওয়ার কোন দিগন্ত কিংবা সীমারেখা নেই। মানুষ যত বেশি অর্জন করে, তার আরো বেশি অর্জনের চাহিদা ততই বৃদ্ধি পায়। সম্পদ গড়তে গড়তে সম্পদের পাহাড়ও গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধির তাড়না মানুষকে ক্রমশ অধিক তৃষ্ণার্ত করে তোলে এবং শেষমেশ সে কিছুতেই পরিতৃপ্তি পায় না। কিন্তু আমাদের আলী ইবন্ মুহাম্মদ (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

"তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহলে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে।"[৪৯৮]

আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শোকরকারী একজন দিনমজুরও সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক সুখী হতে পারে, সে ব্যক্তি উঁচু দালানের মালিক হয়েও আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট নয় এবং তার শোকরগোজারী নয়। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নিচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকিও না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নি'য়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।"[৪৯৯]

তাই আমাদের উচিত নিজ অবস্থান থেকে উঁচু কারো জীবনযাপনের দিকে তাকিয়ে হতাশার দীর্ঘশ্বাস না ফেলে নিজ অবস্থান থেকে নিচু কারো দিকে তাকিয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নি'য়ামত) বৃদ্ধি করে দেব।"[৫০০]

একজন শোকরকারী অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির জীবনে, আল্লাহর নি'য়ামত তার কৃত ওয়াদা অনুযায়ী সর্বদা ক্রমবর্ধমান।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেছেনঃ "হারাম মাল থেকে ছদকা-খয়রাত করা আর পবিত্র করার উদ্দেশ্য অপবিত্র কাপড় মূত্র দ্বারা ধৌত করা একই সমান। উভয় কার্যেই পবিত্র করতে গিয়ে আরও অপবিত্র করে ফেলা হয়।' মো'আযেব পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (রহ.) বলেছেনঃ ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার ধন ভান্ডার, দো'আ হলো উহার চাবি, আর হালাল খাদ্য সে চাবির দাঁত।' হযরত সাহল্ তাশতারী (রহ.) বলেছেনঃ 'চারটি পন্থা ছাড়া কেউ ঈমানের হাকীকত অবগত হতে পারে না।'

ক) সুন্নত প্রণালীতে যাবতীয় ফরয কার্য সমাধা করা।

খ) পরহেযগারীর নীতি অনুযায়ী হালাল খাদ্য আহার করা।

গ) প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় মন্দ কার্য থেকে বিরত থাকা।

---

[৪৯৮] ইবন্ মাজাহ্, (র.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, খ:৩য়, অধ্যায়: পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি, অনু: আল্লাহ্ ভীতি ও তাকওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৯৭, হাদীস নং-৪২১৭

[৪৯৯] *রিয়াদুস সালেহীন*- ৪৬৮

[৫০০] আল-কুরআন ১৪: ৭

ঘ) মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে উপরিউক্ত নীতিগুলি পালন করে চলা।

বুযুর্গগণ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি ৪০ দিন সন্দেহজনক খাদ্য ভক্ষণ করবে, তার অন্তর কালিমাময় হয়ে যাবে। হযরত ইবনে মুবারক বলেছেন: 'সন্দেহজনক একটি মুদ্রা হস্তগত হওয়ার পর উহার প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াকে আমি লক্ষ মুদ্রা ছদকা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে মনে করি।' হযরত সহাল তাশতারী বলেছেন: 'যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য আহার করে সে ইচ্ছা করুক বা না করুক তার সর্বাঙ্গে পাপে জড়িত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য আহার করে, তার সর্বশরীর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে এবং নেক কাজ করার সুযোগ (তাওফীক) সর্বদা তার সাথী ও সহায় হয়ে থাকে।"[৫০১]

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামে ব্যবসা**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যবসাকে তাঁর বান্দাহর জন্য উপার্জনের একটি অন্যতম হালাল পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এমনকি উপার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল এ ব্যবসা। সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ইসলামে ব্যবসা এবং নৈতিকতা পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত। নৈতিকতা কেবল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেই পরিব্যাপ্ত নয় বরং গোটা জীবনেই এর নিগুঢ় কার্যকারিতা বর্তমান। লেনদেনে উদারতা ও কোমলতা সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ, কোনরূপ দাবি আদায়ের সংকীর্ণতা পরিহার প্রভৃতি ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচারের নৈতিক-নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ। রসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পবিত্রতম উপার্জন কোনটি। তিনি উত্তরে বলেন, "ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক স্বীকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন।"[৫০২]

আল সারকাভী তার হাসিয়াতে বলেন: নবী (সা.) এর বাণী "এবং প্রত্যেক স্বীকৃত ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন" বলে তিনি ব্যবসায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৫০৩]

"ইসলাম কুরআনী ঘোষণা ও রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে ব্যবসা করার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তা করার জন্যে বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরের জন্যেও উৎসাহ দিয়েছে এবং তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের কথা বলেছে। ওপরন্তু ব্যবসায়ের জন্যে যারা বিদেশ সফর করে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোকদের সাথে।

---

[৫০১] ইমাম গাজ্জালী (রহ:), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, প্রকাশনী মীন বুক হাউস ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, পৃ. ২৯৩
[৫০২] ইমাম আহমদ, *মুসনাদ গ্রন্থ*, আল মাইমানিয়্যা প্রকাশনা, খ- ৪, পৃ. ১৪১
[৫০৩] *হাসিয়াতুস সারকাভী আলাল তাহরীর*, ঈসা আল হালবী প্রকাশনী, খ- ২, পৃ- ৩,

বলা হয়েছে:

"কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ সফর করবে এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে।"[৫০৪] (সূরা- মুজাম্মিল: ২০)

"মহান আল্লাহ ব্যবসা তথা বেচাকেনাকে তাঁর বান্দাহদের সুবিধার্থে বৈধ করেছেন। প্রত্যেক মানুষেরই খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ তার জীবন ধারনের জন্যে এ সব জিনিস একেবারেই অপরিহার্য। কোন মানুষের পক্ষে একাকী নিজের জন্যে এ সব প্রয়োজনীয় জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব নয়। কেননা সে এসব জিনিস অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য। এ জন্যে বিনিময়ের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন ব্যবস্থা নেই। সে অন্যের কাছে থাকা যে সব জিনিস তার অপ্রয়োজনীয়, তা তাকে দেবে। এটাই বিনিময় পদ্ধতি এবং এটাই ব্যবসার মূলকথা।"[৫০৫]

ব্যবসা একটি বরকতময় জীবিকার্জনের উপায়। ইসলাম ব্যবসার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের একটি সহজ সুন্দরতম অবলম্বন হল ব্যবসা। হাদীসে বর্ণিস আছে- "তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য কর। কারণ তাতেই নিহিত রয়েছে নয়-দশমাংশ জীবিকা।"[৫০৬]

আলী ইবন্ আইয়্যাশ (রা.). . . জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। যে বেচাকেনা করার সময় এবং পাওনা মিটানোর সময় নম্রতা অবলম্বন করে।"[৫০৭]

রসূল (সা.) আরো বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একজন লোককে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বেচাকেনার সময় এবং পাওনা মিটানোর সময় সহজতা অবলম্বন করত।"[৫০৮]

জীবিকার্জনের শ্রেষ্ঠতম ও মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র মাধ্যম ব্যবসা। ব্যক্তির ব্যবসায়ী কাজে পরিপূর্ণ বরকত তখনই আসবে যখন তিনি ব্যবসায়ী নীতিতে সকল হারাম বর্জন এবং যাবতীয় নীতি নৈতিকতা মেনে চলবেন। রসূল (সা.) উম্মতের ব্যবসায় উন্নতি কামনা করে দোয়া করেছেন এভাবে "হে আল্লাহ আপনি আমার উম্মতের সকাল সমূহে বরকত দান করুন।"[৫০৯]

ব্যবসার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক। যা ক্রেতা-বিক্রেতার লেনদেনের মাঝে স্বচ্ছতা ও সুশৃঙ্খলতা বজায় রাখে। ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থমতে, ব্যবসার মৌলিক উপাদানগুলো হল:

---

[৫০৪] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনুক: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, খয়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, পৃ. ১৯২

[৫০৫] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকগুস সুন্নাহ*, অনুক: আকরাম ফারুক, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী, খণ্ড- ৩য়, পৃ. ১১৭

[৫০৬] গাযালী ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন (*মাকতাবাতুল মুস্তফা আল রাবী ওয়াল হলাবী*), ইমাম হবাকী বলেন: মুরসাল, খ- ২, পৃ. ৬৪

[৫০৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১৪৯৬, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্ব্যবহার। আর যে ব্যক্তি তার পাওনার তাগাদা করে সে যেন অন্যায় বর্জন করে তাগাদা করে-১২৯২, খণ্ডঃ ৪র্থ, পৃ.ঃ ১৮, প্রাগুক্ত

[৫০৮] *জামে তিরমিযি*, সনদ হাসান, আলহালাবী প্রকাশনী, খ- ৩, পৃ. ৬০১

[৫০৯] তিরমিযি, খ- ৩, পৃ. ৫০৮, আল হালাবী সংস্করণ, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ- ২, পৃ. ৫২৯

"ব্যবসা ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সম্মতি দান বা গ্রহণ) দ্বারা সম্পন্ন হয়। ছোট-খাট জিনিসের ক্রয়বিক্রয় এর ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুলের প্রয়োজন হয় না। পণ্য ও মূল্যের সরাসরি লেনদেনই যথেষ্ট। সমাজে প্রচলিত ও সুবিদিত রীতি প্রথাই এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। ইজাব ও কবুলের জন্য কোন নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের বাধ্য বাধকতা নেই। কেননা চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই বিবেচ্য বিষয়, শব্দ নয়। (ব্যবসায় হচ্ছে মানুষের পারস্পারিক লেনদেনের আওতাভুক্ত এবং আন্তরিক সম্মতিই এর ভিত্তি। এই সম্মতি যদি গোপন ও অব্যক্ত থাকে, তবে তা অপর পক্ষের জানা সম্ভব নয়। এ জন্য অন্তরের সম্মতির অভিব্যক্তি ঘটে, এমন শব্দ বা বাক্যকে শরিয়াত সম্মতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার উপরই শরিয়তের বিধি নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছে। ইজাব হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত প্রস্তাব। আর কবুল হলো প্রস্তাবের জবাবে অপর পক্ষ থেকে প্রকাশিত পরবর্তী বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া। প্রস্তাব বা ইজাবকারী ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ হতে পারে। অনুরূপ কবুল কারী ও যে কোন পক্ষ হতে পারে।) যে শব্দ বা বাক্য বিনিময়ভিত্তিক লেনদেন এবং আদান-প্রদানে সম্মতি বুঝায় অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মতিসূচক মনোভাব ব্যক্ত করে কিংবা মালিকানা স্বত্ব প্রদানের অর্থ জ্ঞাপনকারী কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় বা শব্দ উচ্চারিত হয়, তাতেও ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়। যেমনঃ বিক্রেতা কর্তৃক বলা ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম বা সম্মত হলাম বা মূল্য নাও।"[৫১০]

**ব্যবসায়িক নীতিমালা**

ব্যব্সা যতটা তাৎপর্যপূর্ণ পেশা ততটাই  স্পর্শকাতর। এই পেশার বৈধতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে অনেক নীতিমালা তথা বিধিনিষেধ ত্রুটিহীনভাবে মেনে চলতে হয়। ইসলামিক নীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তির জন্য এ পেশার বৈধতা রক্ষা করা দুরূহ। তবে ইসলামিক নীতিজ্ঞান সম্পন্ন একজন পরহেজগার এবং আবীদ ব্যক্তির জন্য এ নীতিমালা সঠিকভাবে মেনে চলা সহজ, নিম্নে ব্যবসায়িক নীতিমালা ও তার নৈতিক সীমারেখা আলোকপাত করা হলঃ

**সততা ও সত্যবাদিতা**

দুনিয়ার জীবনে শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা সততা ও সত্যবাদিতা বিষয়টি ব্যবসায়ী নীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে আছে তা বর্ণনাতীত। ইসলামে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব এতোটাই উর্ধ্বে যে, একে সবার উপরে রাখা হয়। মহান রব্বুল আ'লামিন এর তাৎপর্য তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে বলেছেন- "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[৫১১]

[৫১০] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, অনুকঃ আকরাম ফারুক, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈসায়ী, খণ্ড- ৩, পৃ. ১১৭,

[৫১১] আল-কুরআন ৯: ১১৯

আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এই আয়াতটি দ্বারা মানবজাতিকে সত্য, সুন্দর ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মানব জীবনে সততা ও সত্যবাদিতার মূলত তিনটি দিক প্রতিভাত হয়। আর তা হল অন্তরের সততা, কর্মের সততা ও কথায় সততা, অন্তরের সততায় মু'মিন বান্দাহ ঈমানের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সত্যবাদী হবে। যাতে বান্দাহর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ একে অপরের পরিপন্থী না হয়। তদুপরি আমল যেন দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত না হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন।"[৫১২]

কর্মের সততা ব্যাপারটি যেমন বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে হতে পারে তেমনি বান্দাহ ও মাখলুকের মাঝেও হতে পারে। মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাস্তবায়ন ঘটাবে এবং ধোঁকা দেবে না। আর ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে না। আল্লাহ বলেন-

"আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই হবে ওয়ারিস। অধিকারী হবে ফেরদাউসের যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[৫১৩]

অপর একটি আয়াতে এসেছে,

"আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে সেতো শক্ত রশি আকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে।"[৫১৪]

মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবনে সততা কেবল অন্তর ও কর্মেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কথায় ও তার বাস্তব প্রতিফলন অনস্বীকার্য। কেননা চরিত্রের নৈতিক ও নান্দনিক গুণাবলী সুসংহত করার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিরই বাস্তবতার বিপরীত সংবাদ দেয়া কিংবা কথা ও কাজে অমিল ঘটানোর কোনভাবেই এরূপ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করনা তা কেন বল? তোমরা যা করনা তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।"[৫১৫]

সমগ্র জাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে ব্যবসায়ী নীতিতে সততা ও সত্যবাদিতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নিতান্তই অপরিহার্য। আমাদের জীবনে সকল দিক ও বিভাগে সততা ও সত্যবাদিতার স্বপক্ষে ইসলামের ভাষ্য অতি সুদৃঢ় ও বাস্তব সম্মত।

---

[৫১২] আল-কুরআন ৫: ৭

[৫১৩] আল-কুরআন ২৩: ৮-১১

[৫১৪] আল-কুরআন ৩১: ২২

[৫১৫] আল-কুরআন ৬১: ২-৩

এখানে তারই একটা অকাট্য দলিল তুলে ধরা হল:

- “আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে; যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সাফল্য।”[৫১৬]
- “হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।”[৫১৭]

“বলুন, আল্লাহ সত্য বলছেন। এখন সবাই ইব্রাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”[৫১৮]

“এবং আমরা আপনার কাছে সত্য নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী।”[৫১৯]

“এবং এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং ছিলেন রসূল-নবী।”[৫২০]

আরবরা ব্যবসায় অত্যধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। মহানবী (সা.) নিজেও ব্যবসা করেছেন। এবং ব্যবসার সারকথা বলেছেন। আরবে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। সত্যবাদিতার জন্য মহানবী (সা.) খাদীজা (রা.) এর ব্যবসায় অনেক মুনাফার্জন করেছিলেন। এজন্য মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর খুশি হয়ে খাদীজা (রা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।”[৫২১]

উস্‌মান ইবন্ আবু শায়বা (রা.). . .  আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী **কারিম** (সা.) বলেছেন- “সত্যবাদিতা পূণ্যের পথ দেখায় আর পূণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে করতে সর্বশেষ আল্লাহর কাছে ‘সিদ্দিক’ (সত্যনিষ্ঠ) নামে লিপিবদ্ধ হয়।”[৫২২]

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে।”[৫২৩]

---

[৫১৬] আল-কুরআন ৫: ১১৯

[৫১৭] আল-কুরআন ৩৩: ৭০-৭১

[৫১৮] আল-কুরআন ৩: ৯৫

[৫১৯] আল-কুরআন ১৫: ৬৪

[৫২০] আল-কুরআন ১৯: ৫৪

[৫২১] মুহম্মদ আবু তাহের, *ইসলামের ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, প্রকাশনী: চলক, ৫ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ.: ২৭৪

[৫২২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*ঃ ৫৬৬৪, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ্ তা’আলার বাণী, “হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো” মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে-২৫০১, পৃ.ঃ ৪৪৫, প্রাগুক্ত

[৫২৩] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, অনু: মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ, ই.ফা.বা. সেপ্টেম্বর ২০০৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭, খ: ৩য়, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, অনু: ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর নবী কর্তৃক তাদের নামকরণ, পৃ:৪৯৬, হাদীস নং-১২১২

রিফাআ ইবনে রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সা.) এর সাথে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, লোকেরা কেনাবেচা করছে। তিনি তাদের ডাক দিলেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, রসূলুল্লাহ (সা.) এর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা তাদের ঘাড় উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। মহানবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে মহাপাপীরূপে ওঠানো হবে। তবে যারা সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেছে তারা ব্যতিরেকে।"[৫২৪]

**হীন স্বার্থে ওজনে কম-বেশি দেয়া**

দেয়ার সময় কম আর নেয়ার সময় বেশি এটি ইসলামী নীতিমালার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ ব্যবসায়ী যে সকল বাটখারা ব্যবহার করে থাকেন তা যথার্থ ওজনের চেয়ে কম হয়ে থাকে। প্যাকেটজাত পণ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী কেনার পর অনেক সময় দেখা যায় নির্দিষ্ট অনুপাতের চেয়ে কিছু না কিছু কম থাকে। এটি করা হয় ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে। যেটি একজন ব্যবসায়ীর মাঝে কোনভাবেই থাকতে পারে না। মহান আল্লাহর বাণী-

"যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়।"[৫২৫]

ন্যায্য মাপের নৈতিক ও অতি নান্দনিক দৃশ্যপট পরিলক্ষিত হয় নিচে বর্ণিত হাদীসের এক অনুপম জীবনাদর্শে:

"একদা ফোজাইল (রা.) দেখতে পেলেন তার পুত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা অপরকে মেপে দেওয়ার সময় তার কারুকার্যের মধ্যস্থিত ময়লা ঘষে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বললেন, বেটা! তোমার এই আমল দুই হাজ্ব ও দুই ওমরা অপেক্ষা উত্তম।"[৫২৬]

"পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেয়া কিংবা ওজন করে নেয়ার সময় বেশি নেয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ হারাম।"[৫২৭]

সুতরাং যে কেউ মেপে দেবে তখন কম দেবে না। ব্যক্তি যে কাজটি নিজের জন্য পছন্দ করে না তা অন্যের জন্য কিভাবে পছন্দ করে? মানুষ যখন নিজের জন্য নেয় তখন সে নিশ্চয় কম নিতে রাজি নয়। মূসাদ্দাদ (রা.) ও হুসাইন আল মু'আল্লিম (রা.) . . . আনাস (রা.) রসূল (সা.) বলেছেন, "তুমি তোমার নিজের জন্য যা ভালবাসো তা অন্যের জন্য ভালবাসার আগ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না।"[৫২৮]

---

[৫২৪] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯৭, হাদীস নং-১২১৩।

[৫২৫] আল-কুরআন ৮৩: ১-৩

[৫২৬] ইমাম গাযযালী (রহ:), *ইসলামে হালাল উপার্জন ও ব্যবসা*, (অনু: মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, ইসলাম পাবলিকেশন্স ঢাকা- ১৯৯৮ খ্রি. ), পৃ.: ৪৩

[৫২৭] সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন ইসলাম*, ইফাবা- ঢাকা, জুন, ২০০৬, পৃ.: ৫১৯

[৫২৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১২, ৭ম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ ঈমান, পরিচ্ছেদঃ নিজের জন্য যা পছন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা ঈমানের অঙ্গ-৭, পৃ.ঃ ১৯

শুয়াইব (আ.) যে নীতি বর্ণনা করেছেন তা পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

“হে আমার কওম! আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নেই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায় দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এমন একদিনের অপেক্ষা করছি যেদিন পরিবেষ্টনকারী, আর হে আমার জাতি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ করে বেড়াবে না।”[৫২৯]

ওজন নিষ্ঠা হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

“মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করবে, এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ।”[৫৩০]

পবিত্র হাদীসে ঘোষিত হয়েছে এরূপ, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা ওজনে বা মাপে কম দেয় তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে।[৫৩১]

অপর একটি বর্ণনা এসেছে,

“যে জাতি মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের রিয্ক উঠিয়ে নেয়া হয়।”[৫৩২]

মনে রাখা জরুরী সালাত, সাওম ইত্যাদি নেক আমলে ক্রটি হলে আল্লাহ তা’আলা হয়তো নিজ অনুগ্রহে মার্জনা করবেন। কিন্তু মানুষের অণু পরিমাণ হক নষ্ট করলে এ দায়ভার কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা নিবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

“তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না।”[৫৩৩]

যে সমাজে কম দেয়া এবং বেশি নেয়ার লেনদেন চলে সেটা কোন সভ্য সমাজ নয়। হযরত শুআইব (আ.) এর জাতির লোকদের চরিত্রে এ ক্রটি ছিল। তাই তাদের সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

“মাপ পূর্ণ করো এবং যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। সোজা দাড়িপাল্লায় ওজন কর। মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।”[৫৩৪]

ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এমন কোন নীতির আশ্রয় নেয়া চলবে না। যার ভিতরে অসততার নামমাত্র গন্ধও লুকায়িত থাকে। ইসলামের এই

---

[৫২৯] আল-কুরআন ১১: ৮৪-৮৫
[৫৩০] আল-কুরআন ১৭: ৩৫
[৫৩১] আত, তারহীব- ৭৮৫
[৫৩২] ইমাম মালিক (রহ:), *আল মুয়াত্তা*- ৫৩৭০
[৫৩৩] আল-কুরআন ৫৫: ৯
[৫৩৪] আল-কুরআন ২৬: ১৮১-১৮৩

নান্দনিক বিশেষায়িত নীতি দেশের অভ্যন্তরে যেরূপ অপরিহার্য, তেমনি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নীতিতে এর পরিব্যাপ্তি অনস্বীকার্য। এই মর্মে আল্লাহ বলেন-

"ওজন ও মাপ পূর্ণ করার ন্যায় সহকারে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা এতটুকুই অর্পণ করি, যতটুকু সাধ্য তার রয়েছে।"[৫৩৫]

"পূর্বকালীন বুযুর্গগণের এ অভ্যাস ছিল যে, অপরের নিকট হতে কিছু নেয়ার সময় তারা কিছু কম নিতেন ও অপরকে দেয়ার সময় কিছু বেশি দিতেন এবং বলতেন, এই সামান্য পরিমাণ দ্রব্য আমাদের ও দোযখের মধ্যে আড়াল হবে। কারণ তারা ভয় করতেন যে পুরোপুরি ওজন করা সম্ভব নয়। তাঁরা আরো বলতেন, আসমান যমীনের প্রশস্ততার ন্যায় বিরাট বেহেশত যে ব্যক্তি অতি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করে ফেলে। সে নিতান্ত বোকা। আর যে ব্যক্তি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে ভালকে মন্দে পরিণত করে সে অত্যন্ত মূর্খ।"[৫৩৬]

পরিমাপে সততা অবলম্বন এবং আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিটি বিপনী কেন্দ্রে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় স্থলে পরিমাপ যন্ত্রগুলোর যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ন করা এবং আইনের অধীনে সমাধান সম্ভব না হলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও ওজনে বা মাপে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করা ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব।

**আমানত রক্ষা**

আমানত রক্ষা করা একজন মুমিনের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় আমানতদারি বিদ্যমান থাকা জরুরী। আমানত রক্ষার উপর নির্ভর করে পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতি। আজকের বিশ্বে আমানতের খিয়ানাত, আত্মসাৎ, লুটতরাজ ও অবৈধ উপার্জন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনছে। মানব জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আমানতদার হওয়া ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম নৈতিক মানদণ্ড। মানবজীবনে আমানত রক্ষার যেরূপ আবশ্যকতা রয়েছে তেমনি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অত্যধিক। বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ এ অতি চমকপ্রদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

**আমানত রক্ষায় ইসলামী বিধান**

আমানতের পূর্ণ হেফাজত করা, কোনভাবেই খেয়ানত না করা- যার প্রাপ্য তাকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। এর মাহাত্ম্য তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষকে কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।"[৫৩৭]

---

[৫৩৫] আল-কুরআন ৬: ১৫২

[৫৩৬] ইমাম গাযযালি (রহঃ) (অনুকঃ আব্দুল খালেক), *সৌভাগ্যের পরশমণি বা কিমিয়ায়ে সাআদাতা*, ইফাবা, ঢাকা, জানুয়ারী, ২০০৫, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪

[৫৩৭] আল-কুরআন ৪: ৫৮

অন্যত্র তিনি বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! খেয়ানত করো না, আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খিয়ানাত করো না নিজেদের পারস্পারিক আমানত জেনে শুনে।"[৫৩৮]

তিনি আরো বলেন,

"আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে থাক, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"[৫৩৯]

আমানত সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে হাদীসের দলিলসমূহ উদ্ধৃত হলো:

- "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রক্ষক এবং প্রত্যেকে তার রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৪০]
- "যেকোন শাসক মুসলমানদের আমানত খিয়ানাত করে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য আল্লাহ্ বেহেশত হারাম করবেন।"[৫৪১]

সুলায়মন আবুর রাবী (রহ.). . ."হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুনাফিকদের নিদর্শন তিনটি:

১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।
২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে।
৩. যখন আমানত রাখা হয় তা খিয়ানাত করে।"[৫৪২]

"হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের প্রায়ই খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই, যার অঙ্গীকার নেই, তার দ্বীন নেই।"[৫৪৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময়মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানাত করে, তার খিয়ানাত করো না।"[৫৪৪]

---

[৫৩৮] আল-কুরআন ৮: ২৭
[৫৩৯] আল-কুরআন ২: ২৮৩
[৫৪০] আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আসআশ-সিজিস্তানী (রহ:), *সুনানে আবু দাউদ*- ২৯২৮, ২য় খণ্ড, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪
[৫৪১] ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*, করাচি, কারখানা তিজারাতে কুতুব, ১৯৬১, ২য় খণ্ড, পৃ.: ১০,
[৫৪২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৩২, অধ্যায়ঃ ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ মুনাফিকের আলামত-২৪, খণ্ডঃ ১ম, পৃ.ঃ ২৯, প্রাগুক্ত
[৫৪৩] আলী ইবনে সুলতান মুহম্মদ, *মিরকাতুল সাফাতিহ, (শরহে মিশকাত)*, বৈরুত, দারুল ফিকর, (১ম সংস্করণ- ২০০২) খণ্ড- ১, হাদীস নং: ৩৫, পৃ. ১০৭
[৫৪৪] ইমাম আবু দাউদ (র.), *দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বানিজ্য, অনু: স্বীয় অধিকারের মাল হতে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:৪২৫, হাদীস নং-৩৪৯৭

"সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে উত্থিত হবেন।"[৫৪৫]

**ধোঁকা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ**

"মানুষ মানুষকে ঠকাতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করে থাকে, সেগুলোর অন্যতম হল ধোঁকা ও প্রতারণা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষের মধ্যে আস্থা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। তাই ইসলামে ব্যবসায় ক্রেতাদের ধোঁকা দিয়ে মুনাফা অর্জন করা নিষেধ করেছেন এবং এর সকল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। তা ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কে কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই হোক কোন ক্রমেই জায়েজ নয়। ইসলামের দাবী হলো প্রতিটি বিষয়ে একজন মুসলিম সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে।"[৫৪৬]

"ইসলামে যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে ধোঁকা বা প্রতারণার স্থান সর্বাগ্রে। রসূল (সা.) তাঁর উম্মতদের এ ঘৃণ্য পথ পরিহারে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন-

" যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৫৪৭]

অপর হাদীসটি এরূপ, ইসমাইল (র.) ..ইবন্ উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

"যখন তুমি ক্রয়বিক্রয় করবে, তখন তুমি বলে দিবে যে কোনো প্রতারণা বা ঠকানোর দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার জন্য তিনদিন পর্যন্ত পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকার রয়েছে।"[৫৪৮]

" যেসব লেনদেনে ধোঁকা বা প্রতারণা নিহিত তা রসূল (সা.) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন, পাথরের টুকরা মিশিয়ে বস্তু বেচাকেনা করা।"[৫৪৯]

অন্যত্র এসেছে, আবূ ইসহাক (র.)... হযরত আবু খালীদ হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনাবেচা বাতিল করে দেয়ার অধিকার রাখে। যদি তারা উভয়েই সত্য কথা বলে এবং পরিষ্কার বর্ণনা করে, তাহলে তাদের কেনাবেচায় মঙ্গল হয়। আর যদি তারা উভয়ই দোষগুণ গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেন, তাহলে তাদের কেনাবেচায় মঙ্গল বিনষ্ট করে দেওয়া হয়।"[৫৫০]

---

[৫৪৫] ঈসা আত তিরমিযী (রহ:), *জামে আত তিরমিযী*- ১২০৯

[৫৪৬] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী (রহ:), *ইসলামী হালাল হারামের বিধান*, অনু: মোহাম্মদ আবদুর রহীম, খায়রন প্রকাশনী, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০। পৃ. ৩৫৯,

[৫৪৭] আল কুশাইরী আন নিশাপুরী (রহ:), *সহীহ আল মুসলিম*- ১০১-১০২

[৫৪৮] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা. খঃ ১০ম, অধ্যায়, কুটকৌশল, অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে, পৃঃ ৩১৬, হাদীস নং-৬৪৯৩

[৫৪৯] আবুল গুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহ:), *সহীহ আল মুসলিম*, দারুল হাদীস প্রকাশনী, কায়রো, ১৯৯৪, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৫

[৫৫০] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিঃ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৭, হাদীস নং-১৯৮০

এ বিষয়ে আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (সা.) এর কাছে এসে বলেছিল, সে ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারণার শিকার হয়। একথা শুনে রসূল (সা.) বলেন, “যার সাথে ক্রয়-বিক্রয় কর তাকে বল, কোনরূপ ধোঁকাবাজি করবে না।”[৫৫১]

মক্কী ইবন্ ইবরাহীম (র.).. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে ক্রেতার দরের ওপর দর বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিও না।”[৫৫২]

হযরত ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রা.) কে রিফু (ছেঁড়া বস্ত্রের সংস্কার কার্য) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রিফু কার্য করা উচিত নয়। তবে নিজ ব্যবহারের কাপড় রিফু করতে পারে; বিক্রয়ের জন্য দুরস্ত নয়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়ার জন্য রিফু করে সে পাপী হবে এবং তার পারিশ্রমিক হারাম হবে।”[৫৫৩]

**মিথ্যা শপথ পরিহার**

নিঃসন্দেহে মিথ্যা একটি মারাত্মক গর্হিত অপরাধ। ব্যবসায় মিথ্যা শপথ তো আরো ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনে। কোনো ব্যবসায়ীরই মিথ্যা শপথ করে ক্রেতা সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন ভাবেই উচিত নয়। যে ব্যবসায়ী সৎ, আমানতদার, সর্বোপরি মিথ্যা পরিহার করে, দিন দিন তার ব্যবসায় উন্নতি ও আশাতীত কল্যাণ সাধিত হয়। যারা এরূপ করে না, তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি। মিথ্যা শপথের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইসলাম যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে, তার একটি নমুনা তুলে ধরা হলঃ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, “মিথ্যা কথাবার্তা পরিহার কর।”[৫৫৪]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, “যে সম্পর্কে তোমার ইলম নেই, তার পিছনে লেগে থাকবে না।”[৫৫৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, “যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন তার হিফাযতের জন্য সদা প্রস্তুত একজন পর্যবেক্ষণকারী তার সাথেই রয়েছে।”[৫৫৬]

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে বড় পাপ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করব না। আমরা বলেছিলাম হ্যাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বলেনঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথা সমূহ হেলান দেয়া অবস্থায় বলেছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেনঃ সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি এ কথাটা পুন:পুনঃ বলতে থাকেন। এমনকি আমরা বলেছিলাম, আহ্! তিনি যদি এখন চুপ হয়ে যেতেন।”[৫৫৭]

---

[৫৫১] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, পরিঃ ক্রয়-বিক্রয় প্রতারণা করা দোষনীয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ৪০, হাদীস নং-১৯৮৫
[৫৫২] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, পরিঃ দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যের গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৬, হাদীস নং-২০২৬
[৫৫৩] ইমাম গাযালী (রহঃ), *কিমিআয়ে, সাআদাত*, পৃ. ৭৪
[৫৫৪] আল-কুরআন ২২: ৩০
[৫৫৫] আল-কুরআন ১৭: ৩৬
[৫৫৬] আল-কুরআন ৫০: ১৮
[৫৫৭] ইমাম নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*- ১৫৫১, প্রাগুক্ত (বুখারী- ২৬৫৪, মুসলিমঃ ২৭)

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না; তাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবেন না তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' আমি (আবু যর) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? (এই যখন তাদের অবস্থা তখন) তারা তো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন (তারা হলো):

১. দান করে খোটা প্রদানকারী
২. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী পুরুষ
৩. মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী।"[৫৫৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি "কসম কাটলে অধিক মাল বিক্রিতে সহায়ক হতে পারে কিন্তু তা বরকত দূর করে দেয়।"[৫৫৯]

হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন: "তোমরা কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত হলফ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এতে যদিও বিক্রি বেশি হয়, বরকত ধ্বংস হয়ে যায়।"[৫৬০]

রিফাআত ইবনে রাফি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সা.) এর সাথে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, লোকেরা কেনাবেচা করছে। তিনি তাদের ডাক দিলেন, "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!রসূল (সা.) এর ডাকে সারা দিয়ে তারা তাদের ঘাড় উঠিয়ে তার দিকে তাকালো। তিনি তাদের উদ্দেশ্য বললেন: "ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথে চলে।"[৫৬১]

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "চারটি গুণ যখন তোমার মধ্যে থাকবে, তখন দুনিয়াদারি সব খুঁয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমানত সংরক্ষণ, কথায় সততা, উত্তম চরিত্র ও হালাল খাদ্য।"[৫৬২]

একদা রসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো: "একজন মু'মিন দুর্বল হওয়া কি স্বাভাবিক? তিনি বললেন, হ্যাঁ হতে পারে। আবারো জিজ্ঞাসা করা হল, মু'মিন কি কৃপণ হতে পারে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, একজন মু'মিন কি মিথ্যুক হতে পারে? বললেন, না।"[৫৬৩]

---

[৫৫৮] ইমাম মুসলিম (রহঃ), *সহীহ আল-মুসলিম*, আল-হালাবী প্রকাশনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩
[৫৫৯] আবু দাউদ সুলাইমান, *সুনানে আবু দাউদ*, ৩৩৩৫, অনুচ্ছেদ: ব্যবসায় কসম ও অহেতুক কথা সংমিশ্রণ
[৫৬০] মুসলিম: ১৬০৭
[৫৬১] হাদিসটি ইমাম তিরমিযি তাঁর সুনানে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, আল-হালাবী প্রকাশনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৬
[৫৬২] *মুসনাদে আহমদ*- ৬৬৫২
[৫৬৩] বায়হাকী, শু*আবুল ঈমান*- ৪৮১২

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "এক ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্য সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে, তাকে পণ্যটি এত এত মূল্য দেওয়া হয়েছে। তার কথা ক্রেতা বিশ্বাস করল। অথচ সে মিথ্যুক।"[৫৬৪]

**ইসলামে ভেজাল মিশ্রণ বর্জনীয়**

"যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।[৫৬৫]

বিশ্ব মানবতার কল্যাণে, নির্ভেজাল রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইসলাম সকল প্রকার মন্দ পরিহারে জোর তাগিদ দিয়েছে। ভেজালমুক্ত ও পবিত্র জীবনযাপনকারী দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য নিয়ামক খাদ্য। আর তাতেই যদি মেশানো হয় ভেজাল নামক মারণাস্ত্র। সেখানে সুস্থতা তো দূরের কথা বেঁচে থাকাই দুঃসাধ্য। খাদ্যে ভেজাল মেশানো গর্হিত অপরাধ। ইসলামে যাবতীয় প্রতারণা নিষিদ্ধ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত মানবতার মুক্তির দিশারী রসূলে পাক (সা.) খাদ্য পণ্যের একটি স্তুপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভেজা মনে হল। তিনি বলেন: "হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলেছিল, ইয়া রসূলুল্লাহ! বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বলেন: তাহলে এসব ওপরে রাখনি কেন? লোকে দেখে শুনে কিনে নিতো। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৫৬৬]

অপর এক হাদীস থেকে আমরা পাই। সুলায়মান ইবনুল হারব (রা.) থেকে বর্ণিত "রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি তোমার পণ্যদ্রব্যে কোন দোষ থাকে, তবে তা কখনও গোপন করবে না। কেননা তা গোপন করল ব্যবসায় বরকত আসে না।"[৫৬৭]

বর্তমানে ভেজাল কোথায় নেই? শিশুর গুড়ো দুধ থেকে বৃদ্ধের ইনসুলিন, রূপচর্চার কসমেটিক থেকে শক্তি বর্ধক ভিটামিন, এমনকি বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য সেই পানি এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ পর্যন্ত এখন ভেজালে ভরপুর। মাছ, দুধ, শাক, সবজি ও ফলমূলে ফরমালিন, হলুদে সিসা, মরিচে ইটের গুড়া, সরিষার তেলে কেমিক্যাল, মশার কয়েলে বিপদজনক উপাদান, গরুর গোশতে হরমোন, মুরগীর খাবারে বিষাক্ত উপকরণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি হৃদরোগে আক্রান্তের জন্য বিষাক্ত খাদ্যই দায়ী।

টেলিভিশন, সংবাদ প্রচার মাধ্যম থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক বাগান মালিকের আম গাছ থেকে ঝরে পড়া বিষাক্ত আম খেয়ে তার নিজের সন্তান মারা যায়। একইভাবে বিষাক্ত তরমুজ খেয়ে মানিকগঞ্জে দুটি

---

[৫৬৪] আবু দাঊদ (রহঃ), *সুনানে আবু দাঊদ*- ৩৪৭৪, নাসায়ী- ৪৪৬২

[৫৬৫] আল-কুরআন ৯১: ৯-১০

[৫৬৬] আন-নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*-১৫৮০, ৩য় খণ্ড, মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০, ২০১৫ ঈসায়ী

[৫৬৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১৯৪৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৪ ঈসায়ী, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয় তথ্য গোপন করা-১২৯৫, পৃ.ঃ ২০,

শিশু মারা যায় এবং ছয় শিশুকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০১২ সালে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁয়ে বিষাক্ত লিচু খেয়ে শিশু মারা যায়।

ভেজাল খাদ্য দ্রব্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে ১৯৯২ সালে আমেরিকান এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সির প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, ফরমালিন ফুসফুস ও গলবিল এলাকায় ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

ইসলামে ভেজাল মিশ্রণ ধারণার কোন অবকাশ নেই। যা ইসলামী নৈতিক চেতনাবোধের পরিপন্থী তো বটেই সাধারণ নীতিবোধের মূলেও কুঠারাঘাত হানে।

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধ হিসেবে-

- ভারতে সাজা যাবজ্জীবন।
- চীনে মৃত্যুদণ্ড।
- পাকিস্তানে ২৫ বছরের কারাদণ্ড ।
- যুক্তরাষ্ট্রে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে-

- ➢ সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান। (বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯)
- ➢ সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। (ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯)
- ➢ নতুন প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ তে জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ৫ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

শুধু আইন করে বা শাস্তির ব্যবস্থা করে খাদ্যে ভেজাল রোধ সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন নৈতিকতাবোধ ও পরকালীন জবাবদিহিতার বোধ জাগ্রত করা।

আমাদের দেশে খাদ্যে যে সকল প্রাণঘাতী ভেজাল মিশ্রিত হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা দেখানো হল-

- মাছে ও দুধে ফরমালিন।
- অপরিপক্ব টমেটোতে ইথিলিন হরমোন।
- মাছ তাজা দেখাতে রেড অক্সাইড।
- ফলমূল ও শাকসবজীতে কার্বাইড।
- জিলাপি- চানাচুরে পোড়া মবিল।

- বিস্কুট, আইস্ক্রীম, জুস, সেমাইয়ে টেক্সটাইল ও লেদার রং।
- মুড়িতে ইউরিয়া হাইড্রোজেন।
- পানিতে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, লেড ও ইবোলাইট।
- মসলায় কাউন, কাঠের গুড়া, ঘাসের গুড়া।
- নকল ঘিতে কৃত্রিম রং।
- শিশু খাদ্যে মেলামিন।
- বিস্কুটে বিষাক্ত সাইক্লোমেট।
- চাল এবং শুটকিতে ডিডিটি।
- কাচা কলাতে ইথিলিন হরমোন।
- ফল পাকাতে এসিটাইলিন গ্যাস ও ইথিলিন।

এ পর্যায়ে শরীরের পক্ষে সহনীয় প্রিজারভেটিভস এর মাত্রা উল্লেখ করা হল-

- সোডিয়াম বেনজটের ও সোডিয়াম সরবেট = 200ppm
- সাইট্রিক এসিড = 200 – 350 ppm
- ক্যালসিয়াম প্রপ্রানয়েট 1- 3%

খাদ্য সংরক্ষণে এ চার ধরণের প্রিজারভেটিভ ব্যবহৃত হয়।

সকল মন্দের অপনোদন এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রসারে ইসলামের অবস্থান বরবারই অত্যন্ত সুদৃঢ়। এখানে তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল-

“এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভাল হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।[৫৬৮]

“আল্লাহ তোমাদের যে নি’য়ামত দান করছেন তার কথা মনে রাখো এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছেন তা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ তোমাদের একথা আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ মনের কথা জানেন।”[৫৬৯]

---

[৫৬৮] আল-কুরআন ৩: ১১০

[৫৬৯] আল-কুরআন ৫: ৭

“এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।”[৫৭০]

“এরপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে বিষণ্ন না করে। তাদেরকে ফিরে তো আসতে হবে আমারই দিকে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দিবো তারা কী সব কাজ করে এসেছে। অবশ্যই আল্লাহ অন্তরের গোপন কথাও জানেন।”[৫৭১]

“দেখো, এরা তার কাছ থেকে আত্মগোপন করার জন্য বুক ভাঁজ করেছে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকে তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ জানেন। তিনি তো অন্তরে যা সঙ্গোপন তাও জানেন।”[৫৭২]

হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

“ক্রেতা- বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রাখে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের দোষ- ত্রুটি বলে দেয়, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কে বরকত প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি তারা মিথ্যা বলে এবং বিক্রীত দ্রব্যের দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখে, তাহলে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।”[৫৭৩]

আবু নুআইম (র.) ... আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, সে তাঁর কাছে কিছু উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসলো অতঃপর রসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, খয়বারের সব খেজুরই কি এরকম? লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রসূল আল্লাহর কসম! সকল খেজুর এমন নয়। আমরা এগুলোর এক সা’ অন্যগুলোর দুই সা’ এর পরিবর্তে এবং এগুলোর দুই সা। অন্যগুলোর তিন সা’ এর পরিবর্তে গ্রহণ করে থাকি। তখন রসূল (সা.) বললেন, এরূপ করবে না, বরং প্রথমে মিশ্রিত খেজুরগুলো দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করবে। অতঃপর উক্ত দিরহামের পরিবর্তে উত্তম খেজুরগুলো ক্রয় করবে।”[৫৭৪]

পরকাল বিশ্বাসী একজন সত্যিকার মু’মিন খাদ্যে ভেজাল অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর উপাদান খাবারে মিশিয়ে মানুষকে নির্ঘাত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে না।

---

[৫৭০] আল-কুরআন ২২: ৪১
[৫৭১] আল-কুরআন ৩১: ২৩
[৫৭২] আল-কুরআন ১১: ৫
[৫৭৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১৯৫০, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা, পৃ.ঃ ২৯
[৫৭৪] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা, খ. ৪র্থ ১৯৫০, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে, পৃ-৭৪, হাদীস নং-২০৬১

এখানে মনে পড়ে যায়, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) এর খিলাফাত আমলের ইতিহাসখ্যাত ঘটনা, অন্তরে সুকঠিন ভাবে তাকওয়া ধারণের অবিস্মরণীয় ঘটনাটি প্রজাদের দিনাতিপাতের দৃশ্য অবলোকন করতে আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক ঘর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে বারবার দুধে পানি মেশাতে বলছেন। কিন্তু মেয়েটি বলছে, "খলিফা দুধে পানি মেশাতে বেআইনী ঘোষণা করে ফরমান জারী করেছেন" মা বলল, "খলিফাতো এতো রাতে এসে দেখছেন না।" একথা শুনে মেয়েটি বলল, "খলিফা না দেখতে পারেন, আল্লাহ তো দেখছেন।"

আরেকটি শিক্ষণীয় হৃদয়স্পর্শী ঘটনা হলো- "একদা উমার (রা.) একস্থানে বসে আহার করছিলেন। এক রাখাল এসে সেখানে উপস্থিত হলো। তিনি রাখালকে বললেন, "আমাদের সাথে আহার করো।" রাখাল বলল, "আমি রোযাদার"। উমার (রা.) অবাক হলেন, জনমানবহীন এ স্থানে রোদে পুড়ে, সারাদিন রাখালি করে তারপরও যুবক রোযা রেখেছে! তিনি মনে মনে ভাবলেন, একে একটু পরীক্ষা করে নেই। তিনি রাখালকে বললেন, "তোমার ১টি বকরি আমার কাছে বিক্রী করো। আমি তোমাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করবো। তারপর জবাই করার পর গোশত ভুনা করে আমরা খাবো। তুমিও সন্ধ্যায় খেয়ো।" রাখাল জবাব দিলো "এ বকরিগুলো আমার না, আমার মালিকের।" তিনি বললেন, "তোমার মালিক তো এখানে নেই। মালিককে বলে দেবে বাঘ খেয়ে ফেলেছে"। সঙ্গে সঙ্গে যুবক বলল, "আমার মালিক না হয় এখানে নেই। কিন্তু আল্লাহ তো আছেন।" সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে স্বচ্ছতা জ্ঞান এতটাই প্রবল ছিল যে, প্রকাশ্যে তো দূরের কথা নির্জন নিরালায়ও আল্লাহর ভয়ে ভালকে মন্দ দ্বারা কলুষিত করার পরিণতি সম্পর্কে তাদের হৃদয় সদা জাগ্রত থাকত।

**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ চাকরি**

বিশ্ব জনসমষ্টির একটি বিরাট অঙ্কের মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম চাকরি। নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দেওয়ার নামই চাকরী। ইসলাম উপার্জনের এই ব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। নিজ মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চাকরীর মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ইসলাম স্বীকৃত, যদি না তার সঙ্গে কোন প্রকার অবৈধ অনুষঙ্গের সংশ্লেষণ থাকে। যেভাবে ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে চাকরীর ক্ষেত্রেও ইসলাম পরিপূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠা বজায় রাখার নির্দেশ দান করে।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত হও।"[৫৭৫]

[৫৭৫] আল-কুরআন ৪: ১৩৫

কোন চাকরীর ক্ষেত্রে যোগদান করা মানে সেই কর্মক্ষেত্রের কর্তাগণের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া যে সে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করবে। চাকরীতে নিয়োগকালে নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোন মৌখিক বা লিখিত শর্তারোপ করা হলে তা পালন করা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ওপর অত্যাবশ্যক। কারণ এটা এক প্রকার চুক্তি যার মাধ্যমে সে শর্ত পূরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার কৃত ওয়াদা পূরণ করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"তোমরা পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হলে আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, নিজেদের অঙ্গীকার পাকা- পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করো না, যেহেতু তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর স্বাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।"[৫৭৬]

"ওহে, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা অঙ্গীকারগুলো পূরণ কর।"[৫৭৭]

ঈমান এবং ইসলামকে সামনে রেখে একজন চাকরীজীবী তার দায়িত্ব পালন করলে তাতে আপনাতেই চলে আসে পরিপূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠা। আল্লাহভীতি এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা কোন ব্যক্তিকে তার কাজে কোন প্রকার গাফিলতি করা থেকে বাঁধা দেয় এবং লক্ষ্যে অটল থাকতে সহায়তা করে। সৎকর্মশীলদের প্রতি আল্লাহ স্বয়ং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিনি বলেছেন, "আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করি না।"[৫৭৮]

সততার সহিত কাজ করার পাশাপাশি একজন চাকরীজীবীর চাকরীর উৎস তথা সূত্রপাতও হালাল হতে হবে। চাকরী গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। নতুবা উক্ত চাকরীর মাধ্যমে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ হারাম হিসেবে গণ্য হবে। অবৈধ কোন কর্মক্ষেত্রে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে, পরিপূর্ণ সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করা সত্ত্বেও সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ হালাল জীবিকার্জন করতে পারবে না। রসূল (সা.) বলেছেন,

"পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্য করাও যাবে না।"[৫৭৯]

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির জন্য কোনো দোকানে বিক্রেতার চাকরী গ্রহণ করা বৈধ। কিন্তু সে দোকানে যদি ইসলামে যা হারাম সে জাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয় তবে তার জন্য সেখানে চাকরী হালাল হবে না।

---

[৫৭৬] আল-কুরআন ১৬: ৯১
[৫৭৭] আল-কুরআন ৫: ১
[৫৭৮] আল-কুরআন ৭: ১৭০
[৫৭৯] সুনানে আবু দাউদ- ২৮৬৪

আবার, "মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোন সৈন্যবাহিনীর কোন পদে চাকরী করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে যে প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকারখানা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার কাজে নিযুক্ত, তার কোন চাকরী করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ না।"[৫৮০]

তাই দায়িত্ব পালন যতটা জরুরী, দায়িত্ব হালাল হওয়া ততটাই জরুরী। রসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফাতকালে বিশিষ্ট সাহাবীগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্ব পালন করছেন। যার বিনিময়ে তাদের নির্ধারিত হারে বেতন দেওয়া হত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা.) রসূল (সা.) এর যুগে বেতনের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কাজ করেছেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্বে অবহেলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। অর্পিত দায়িত্ব বিনা ওজরে যথাযথভাবে পালন না করা, কাজে দীর্ঘসূত্রিতা বা অযথা কালক্ষেপণ, নির্ধারিত সময়ে কর্মে অনুপস্থিত থাকা বা বিলম্ব করা, সেবাপ্রার্থীদের সেবা দানে গাফিলতি, হকদারের হক আদায় না করা কিংবা হয়রানি করা প্রভৃতি কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

"শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৮১]

চাকরী ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন চাকরীজীবী ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন না হলে অর্থাৎ তার মাঝে আল্লাহভীতি এবং বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে সে খুব সহজেই অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়তে পারে। ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।"[৫৮২]

সম্পদ আত্মসাৎ দুই প্রকার হতে পারে। চাকরীজীবী যার অধীনে চাকরীরত তার সম্পদ আত্মসাৎ করা বা ভয় ভীতি দেখিয়ে আতঙ্কিত করে সাধারণ জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করা দুটোই অত্যন্ত অনৈতিক কাজ। আবূ বকর ইবন্ আশ শায়বা (র.).... 'আদী ইবনু' উমাইরাহ্ আল কিন্দী (রহ.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, "আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সূচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে।"[৫৮৩]

---

[৫৮০] আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*। অনুক- মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, পৃ.: ২০৪

[৫৮১] ইমাম ইসমাঈল আল বুখারী (রহ), *বুখারী শরীফ*-৬৬৫৬, ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী, দশম খন্ড, অধ্যায় : আহকাম, পৃ.ঃ ৪০৫

[৫৮২] আল-কুরআন ৪: ২৯

[৫৮৩] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ:৫ম, অধ্যায়: প্রশাসন, অনু: কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম, পৃ:৩১০, হাদীস নং-৪৫৯১

ইসলাম অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর বিধি প্রদান করেছে। যেখানে সূচ পরিমাণ সম্পদও অন্যায়ভাবে গোপন করলে তার জন্য তাকে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। তবে নিয়োগকর্তা বা ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা যদি অনুমতি প্রদান করে তবে সেসব সম্পদ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন অফিসের কাগজ, কলম, অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা চাকরীরত ব্যক্তির জন্য হালাল হবে তবে এক্ষেত্রেও তাকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
চাকরীক্ষেত্রে বেতন নেওয়া এবং যার অধীনে চাকরী করা হয় তার কাছ থেকে কোন উপহার গ্রহণ করা দুটি আলাদা বিষয়। চাকরীজীবী কর্মকর্তা কর্মচারীদের এমন কারো কাছ থেকে উপহার নেওয়া বৈধ নয় যার সঙ্গে তার কর্তব্যের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এবং যা দ্বারা তার কর্তব্য পালনে প্রভাবিত হওয়ার সংশয় বিদ্যমান থাকে।
উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র), আবু হুমাই সা'ঈদী (র) বর্ণিত, রসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। যাকাত আদায়ান্তে তিনি ফিরে এসে কিছু সম্পদকে তার প্রাপ্ত উপহার হিসেবে উপস্থাপন করলেন। এতে রসূল (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করেছিলেন।"[৫৮৪]
এ জাতীয় উপহার প্রকৃতপক্ষে উপহার না হয়ে ঘুষে পরিণত হয় এবং তা দুর্নীতির বিস্তার ঘটায় বিধায় ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না। এভাবে সেবাপ্রার্থীদের ফাইল আটকে রেখে অর্থ দাবি করা বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে কারো ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করাও ইসলামের দৃষ্টিতে মহা অন্যায়। এগুলো জুলুম এবং জুলুম সম্পূর্ণ হারাম।
জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারী, ব্যাংক-বীমা, এন.জি.ও ও ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে। এসব চাকরীর ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দর্শন হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে পালন করবে।

একজন চাকরীজীবি তার কাজ বৈধতার সাথে শুরু করে থাকলেও বিভিন্ন কারণে সে চাকরী বৈধতার গন্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। কর্তব্যে অবহেলা অনিয়মানুবর্তিতা ও কার্যে উদাসীনতার দরুন চাকরীজীবীদের উপার্জন অনেক সময় বৈধতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ও কোচিং সেন্টারের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে। যার ফলে যে শিক্ষাটুকু অর্জন করার অধিকার শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত হয় এবং কেবল কোচিং পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই সুবিধা  ভোগ করে। অনেক ডাক্তার হাসপাতালে রোগী না দেখে ক্লিনিকে জমজমাট ব্যবসা শুরু করে দেন। এবং এর ফলে হাসপাতালের রোগীরা যথার্থ সেবা থেকে বঞ্চিত হন। যা কর্তব্যে অবহেলার নামান্তর। নিজস্ব প্রয়োজনে কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ অন্যায় নয়। যদি স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ ও পূর্ণভাবে পালনের পর অতিরিক্ত সময়ে এসব কাজ করেন তবে তা নৈতিক হবে। কিন্তু কর্তব্যকে গৌণ দৃষ্টিতে দেখে এসকল বাড়তি কাজকে মুখ্য বানিয়ে নেওয়া নিঃসন্দেহে অনৈতিক। চাকরীজীবীর দায়িত্বে যে সেবাকর্ম ন্যস্ত রয়েছে তা হতে

[৫৮৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৬৫০৮, অধ্যায়ঃ যাকাত, প্রাগুক্ত

সেবাপ্রাপ্তি সেবার্থীদের হক। আর বান্দাহর হক নষ্ট করা আল্লাহর কাছে ভীষণ অপছন্দনীয়। তারা মৃত্যুর পর আল্লাহর কাছে অসৎ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"যারা অসৎকর্ম নিয়ে হাজির হবে, তাদেরকে অধ:মুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।"[৫৮৫]

ইসলামের বিধান অনুযায়ী পুরুষ এবং মহিলার চাকরীর ক্ষেত্রে তথা স্থান আলাদা হওয়া শ্রেয়। একই প্রতিষ্ঠানে পুরুষ মহিলা বেপর্দা বিচরণের মাধ্যমে কাজ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত। পর্দা নান্দনিকতা প্রকাশের মূল অংশ। কোন পুরুষ চাকরীজীবী যদি এমন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে যেখানে মহিলা কর্মচারীদের উপস্থিতি রয়েছে, তবে তাকে অবশ্যই তার অর্ন্তচক্ষু ও চর্মচক্ষুর উভয়ের পর্দা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৫৮৬]

একজন মু'মিন বান্দাহকে প্রতি ক্ষেত্রেই তার মা'বুদের নির্দেশ পালন করতে হবে। একজন পুরুষ চাকরীজীবী ব্যক্তিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার কর্মক্ষেত্রের কীরূপ দায়িত্ব পালন করতে হবে, এমন কোন পরিবেশে কাজ করা যাবে না যেখানে একজন পুরুষকে অধিক সময় ধরে একজন মহিলার সাথে একাকী নির্জনে থাকতে হয়। আহমাদ ইবন্ মানী (র.).. উমার (রা.) হতে বর্ণিত রসূল (সা.) বলেছেন,

"সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই শয়তান অবস্থান করে।"[৫৮৭]

শয়তান মানুষকে পাপাচারে যেকোন সুযোগে লিপ্ত করতে চাইবে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তার একটি বড় হাতিয়ার। একজন মু'মিন বান্দাহ অবশ্যই শয়তানের প্ররোচণা থেকে বেঁচে থাকবে। বর্তমান জামানার চাকরীর ক্ষেত্রসমূহে এ প্রকার ফিত্নার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। ফিত্না থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা নিতান্তই কঠিন। তা সত্যেও চাকরীজীবী, ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে এসকল ফিত্না থেকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে আখিরাত বর্জন করার মত দুর্ভাগ্য মু'মিন বান্দাহর জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

আচার-আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখা চাকরীজীবী ব্যক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচরণে অসহনশীলতা এবং অশিষ্টতা থাকায় অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকেন। ঠুনকো বিষয়াদি নিয়ে খদ্দেরগণ চাকরীজীবিদের দ্বারা অপদস্থ, অপমানিত হন। যা যে কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য অকাঙ্ক্ষিত। এক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মস্থলেই নৈতিক বিধানাবলির অনুসরণ খুবই জরুরি। একজন ইসলামী নীতিবোধ ও

---

[৫৮৫] আল-কুরআন ২৭: ৯০

[৫৮৬] আল-কুরআন ২৪: ৩০

[৫৮৭] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, খ:৪র্থ, অধ্যায়: ফিতনা, অনু: মুসলিমদের জামায়াত আঁকড়ে থাকা, প্রাগুক্ত, পৃ:৫১৩, হাদীস নং-২১৬৮

শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তি কখনোই তার কর্মচারী অথবা খদ্দেরগণের সাথে খারাপ আচরণ করতে পারে না। বরং সে পরম সহিষ্ণুতার সাথে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। কর্মক্ষেত্রে একজন চাকরীজীবীকে সকলের সাথেই সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। একটি কর্কশ আচরণের পরিবর্তে নরম স্বরে তাকে উত্তর দিতে হবে যা দ্বারা নবী (সা.) এর সুন্নাহও পালিত হয়ে থাকে। এভাবে চাকরী ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৈতিকতা ও নান্দনিক মনোভাব বজায় রেখে চাকরীজীবী তার কর্মক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করতে পারবে এবং পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সে পুরুস্কৃত হবে।

চাকরীজীবীদের অবশ্যই উচিত সন্দেহজনক যেকোন চাকরী পরিহার করা। কারণ উপার্জন সন্দেহাতীতভাবে হালাল হলেই কেবল বান্দাহ নিজেকে পরকালীন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে। মুহাম্মদ ইবন্ আব্দুল্লাহ্ ইবন্ নুমায়র হামদানী... নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি,
"নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়, অনেক লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে, আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন, কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো।"[৫৮৮]
তাই ক্ষুদ্র এ জীবনে প্রত্যেক মু'মিনের উচিত তার জীবনযাপনের সকল উপকরণকে পরিপূর্ণভাবে হারাম এবং এ সংক্রান্ত সকল সম্ভাবনা থেকেও দূরে রাখা।
"মুসলমান সব সময় সন্দেহ বা সংশয়পূর্ণ কাজ থেকে দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করবে। কেননা তা দ্বীন পালন ও আকীদার ক্ষেত্রে দুর্বলতার সৃষ্টি করে। তাই এ কাজে বিরাট পরিমাণ উপার্জন ও প্রচুর ধন লাভ সম্ভবপর হলেও মুসলিম ব্যক্তি এড়িয়ে চলবে। নবী কারিম (সা.) বলেছেন:
যা তোমাকে সংশয়ে ফেলে তা পরিহার কর এবং যা সন্দেহমুক্ত, উন্মুক্ত মনে হয়, তাই গ্রহণ করো।
তিনি আরো বলেছেন, যাতে সংশয় রয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে যাতে কোন রূপ সংশয় নেই তা যতক্ষণ না গ্রহণ করবে, ততক্ষণ মানুষ মুত্তাকীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।"[৫৮৯]
জীবন নির্বাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে কোন না কোন পথ অবশ্যই বাতলে দেন। বান্দাহর এই দুনিয়াতে জন্ম নেওয়া, বসবাস এবং জীবন অতিবাহিত করা সকলই তার রবের মর্জি। হালাল জীবিকার যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে

---

[৫৮৮] ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*-৩৯৪৯, ২য় সংস্করণ ২০০৩, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, খণ্ডঃ ৪র্থ, অনুচ্ছেদঃ হালাল গ্রহণ ও সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করা, পৃ.ঃ ৫২৫
[৫৮৯] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী (রহঃ), *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম, খায়রন প্রকাশনী, ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, পৃ.: ২০৪

রাখার মালিকও একমাত্র তিনি। চাকরী জীবিকা নির্বাহের হালালকৃত পেশাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে ও তার পরিবারের জন্য কল্যাণময় রিযিকের যোগান দিয়ে থাকেন। অন্যান্য পেশার ন্যায় চাকরীও মুসলিম উম্মার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি আর্শীবাদ স্বরূপ। একজন চাকরীজীবী মু'মিন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ সততার সাথে পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও অঢেল সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইসলামে কৃষি কাজ

"আমিতো অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর মাটি বিদীর্ণ করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যাদি, আঙ্গুর, শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান, ফল ফলাদি ও ঘাস।"[৫৯০]

আদিমকাল হতেই কৃষি ব্যবস্থা মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক উৎস হিসেবে চলে আসছে। বাংলাদেশেরও অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। কৃষি একটি দেশের উন্নয়নের মেরুদণ্ড। জীবন ধারণের জন্য পার্থিব সম্পদ আহরণ ও তা প্রতিপালন ও সংরক্ষণের সাধারণ নাম কৃষি।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কৃষি সম্পর্কেও ইসলামে যথাযথ দিক নির্দেশনা রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নীতি ঘোষিত হয়েছে এবং কৃষির উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের মৌলিক নীতির আলোকে কৃষিকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার।

সকল প্রাণীর রিয্কদাতা মহান আল্লাহ তা'আলা খাবার ও আহার্যের উপকরণ সমূহের মাধ্যমে আমাদেরকে বিপুল নি'য়ামত দান করেছেন।

তিনি আমাদের চারপাশের পরিবেশকে জীবন ধারণের জন্য উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তোমরা কি দেখোনা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্তই তোমাদের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।"[৫৯১]

পশুপাখি প্রতিপালনের ব্যাপারে বলেন, "তিনি পক্ষীকুল সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীত নিবারণের উপকরণ ও উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো।"[৫৯২]

---

[৫৯০] আল-কুরআন ৮০: ২৪-৩২
[৫৯১] আল-কুরআন ৩১: ২০
[৫৯২] আল-কুরআন ১৬: ৫

মাছ চাষ নিয়ে তিনি বলেছেন, "তিনি জলরাশিকে অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাজা মাছ আহরণ করতে পারো।"[৫৯৩]

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মাঝে আমাদের জন্য রেখেছেন অফুরন্ত নি'য়ামত। কৃষিকাজের মাধ্যমে আমরা তা নিজেদের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি। আমরা নিজ পরিশ্রমে ও আল্লাহর কুদরতে শক্ত মাটি থেকে ফসল ফলাই। আল্লাহর রহমত ছাড়া যা অসম্ভব। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে উর্বর জমিনে আমরা ফসল ফলাই। আল্লাহ আরো বলেছেন, "বলোতো কে সৃষ্টি করেছেন পানি, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি।"[৫৯৪]

এ থেকে বোঝা যায়, শুধু শারীরিক পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। বীজ থেকে শুরু করে চারা গজানো, ফুলফল ধরানো সবটাই মহান আল্লাহর অনুগ্রহরই অপূর্ব নিদর্শন। কুরআনে এসেছে, "তোমরা যে বীজ বপন কর তা সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তা থেকে উৎপন্ন করো, না আমিই উৎপন্ন করি। ইচ্ছে করলে আমি তা খরকুটা করে দিতে পারি। অতঃপর তোমরা হয়ে যেতে হতভম্ব।"[৫৯৫]

আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামাত রাজি কাজে লাগিয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি আমাদের জীবিকা নির্বাহের নির্দেশ দিয়েছেন। "নামাজ শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় ও তার অনুগ্রহ (রিজিক) তালাশ কর।"[৫৯৬]

নিজ শ্রম, জ্ঞান ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের রিজিক সংগ্রহ করে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের সদ্ব্যবহার ও শুকরিয়া আদায় করতে পারি।

হালাল রিজিক অর্জন প্রত্যেকের জন্য ফরজ। হাদীস শরীফে এসেছে, "হালাল উপার্জন অন্বেষণ ফরজ ইবাদাতের পর আরেকটি ফরজ।"[৫৯৭]

বুখারী শরীফে আরো বলা আছে, "সৎ বিনিময়ে অর্জিত খাদ্যই যে কোন লোকের পবিত্রতম হালাল খাদ্য।"[৫৯৮]

যা থেকে বিচার করলে বলা যায় কৃষিকাজ অর্থাৎ ফসল উৎপাদন, বনায়ন, পশুপালন, মাছচাষ ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজগুলো হালাল উপার্জনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস।

কৃষিকাজ এর গুরুত্ব শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখিরাতেও এর ভূমিকা অপরিসীম।

---

[৫৯৩] আল-কুরআন ১৬: ১৪

[৫৯৪] আল-কুরআন ১৬: ৫

[৫৯৫] আল-কুরআন ৫৬: ৬৩-৬৫

[৫৯৬] আল-কুরআন ৬২: ১০

[৫৯৭] বায়হাকি

[৫৯৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ১৯৪২, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়, পরিচ্ছেদঃ লোকের উপার্জন ও নিজ হাতে কাজ করা-১২৯১, পৃ.ঃ ১৭

কুতায়বা ইবন্ সাঈদ ও আব্দুর রহমান ইবন ............ হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

"কোন মুসলিম যদি কোন বীজ বপন করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, পশু ও পাখি কিছু অংশ খায় তবে তার জন্য এই কাজ সদকায় জারিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।"[৫৯৯]

সদকায়ে জারিয়া হল এমন সওয়াবের উৎস যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরেও কারো আমল নামায় সওয়াব যোগ হতে থাকে। এমনকি কেউ যদি একটা গাছ রোপন করে আর তা যদি কোন মানুষ বা পশুপাখিকে ছায়া বা আশ্রয় দিয়ে থাকে তবে সেটাও ওই গাছ রোপনকারীর জন্য সওয়াবের কারণ হবে। গাছ রোপনের সুফল সম্পর্কে অপর হাদীসে, রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কারও হাতে যদি খেজুর গাছ থাকা অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হয়, তাহলেও সে যেন গাছ রোপন করে দেয়।"[৬০০]

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, কৃষিকাজ, যা কিনা জীবন ধারণের অন্যতম মাধ্যম, একইসাথে তা আখিরাতের জীবনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সওয়াবের উৎস।

ইসলাম চাষাবাদের একটি পদ্ধতিকে হারাম ঘোষণা করেছে যা ইতঃপূর্বে প্রচলিত ছিল। কেননা এ পন্থায় ধোঁকা এবং প্রতারণার অবকাশ ছিল।

"সে পন্থা ছিল এই যে, জমির মালিক চাষকারীর উপরে শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির এক চতুর্থাংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে ও তা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। সমগ্র চাষের সে সেই নির্দিষ্ট জমিটুকুরই ফসল পাবে, তা যতটাই হোক। অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাপে ফসল সে পাবে। আর অবশিষ্ট ফসল থাকবে একা চাষকারীর জন্যে, অথবা তা দুজনের মধ্যে আধাআধি ভাগ করে দেয়া হবে।'[৬০১]

"নবী কারিম (সা.) দেখলেন যে, ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচারের দাবি হচ্ছে এই যে, সর্বমোট ফসলেই তা কম হোক বেশি হোক, উভয় পক্ষকে শরীক হতে হবে। তাদের দুজনের একজনের জন্যে একটা পরিমাণ জমি বা ফসল পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। কেননা অনেক সময় জমির সেই অংশ হয়ত কোন ফসলই দিল না। তাহলে তো একজনই মাত্র যা পাওয়ার পেয়ে যাবে। আর অপর জন প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকবে।"[৬০২]

---

[৫৯৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ২১৬৯, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ বর্গাচাষ, পরিচ্ছেদঃ আহারের জন্য ফসল ফলানো ও ফলবান বৃক্ষ রোপনের ফযীলত-১৪৪৫, পৃ.ঃ ১৬৫, প্রাগুক্ত

[৬০০] *মুসনাদে আহমাদ*- ১২৯০২

[৬০১] আল্লামা ইউসূফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*,অনুক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম,খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ পৃ. ৩৮৩

[৬০২] প্রাগুক্ত

চাষযোগ্য জমি পতিত রাখার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। শায়বান ইবন্ ফাররুখ (র.) হাম্মাম (র.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) কোন আবাদ যোগ্য জমি অনাবাদী রেখে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যার জমি আছে সে যেন তা চাষাবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে চাষ করার জন্য প্রদান করে।"[৬০৩] মুহাম্মদ ইবন্ মুছান্না (র.).. সাঈদ ইবন্ যায়দ (রা.) সূত্রে নবী (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, "কেউ কোন পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই।"[৬০৪]

কাজেই আবাদি জমি ফেলে রাখা যাবে না এবং ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী কেউ অনাবাদী জমি আবাদ করলে সে তার অংশীদারি দাবীদার হয়।

মাছ ও পশু পাখির মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টির উৎস বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে দুটি সুরাও অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা বাকারা ও আনআম। আল্লাহ তা'আলা বিস্তীর্ণ জলরাশিকে মাছ চাষের উপযোগী করে নানান প্রকারের মাছ সৃষ্টি করেছেন।

কৃষি কাজের প্রতি তাগিদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহের সদ্ব্যবহার ও উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ভাষ্যমতে "তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবনধারনের উপকরণ) স্মরণ কর। আর জগতে বিনষ্টকারী ও বিপর্যয়কারী হয়ো না।"[৬০৫]

যুহায়র ইবন্ হারব (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, "নবী করিম (সা.) সম্পদ অপচয়কে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।"[৬০৬]

নবীজী বৃক্ষ নিধন এমনকি অকারণে বৃক্ষের পাতা ছিড়তেও নিষেধ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন্ ইয়াহইয়া (র.)...ইবন্ উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, "পরিপক্ক হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করো না।"[৬০৭] জগতের সব প্রাণীই আল্লাহর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান অভাবনীয়। কৃষি বিপ্লবের সূচনাও তাদেরই হাতে। বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি, যেমন নোরিয়াস, পানির মিল, পানি উত্তোলন যন্ত্র, বাঁধ, জলাধার প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জমিসেচ পদ্ধতির সূচনা মুসলমানরাই করেছিল। সমগ্র বিশ্বে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ এবং তুলনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করে মুসলিমরা। তারা উদ্ভিদবিদ্যার উপরে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন। এছাড়াও মুসলিমরা ইউরোপ সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে বিভিন্ন নতুনধর্মী শস্য যেমন আখ, ধান, যাইট্রাস ফলসমূহ, এপ্রিকট, সাফ্রণ, তুলা,

---

[৬০৩] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, ই.ফা.বা. এপ্রিল ২০০৩, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ:৪র্থ, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, অনু: জমি বর্গা দেয়া, পৃ: ম৪৬৮, হাদীস নং-৩৭৭৭

[৬০৪] আবূ দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, খ:৪র্থ, অধ্যায়: কিতাবুল খারাজ, অনু: অনাবাদী জমি আবাদ করা, প্রাগুক্ত, পৃ:২৪০, হাদীস নং-৩০৬২

[৬০৫] সূরা আল আরাফ: আয়াত- ৭৪

[৬০৬] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, ই.ফা.বা. জানুয়ারী ২০০৭, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ: ৫ম, অধ্যায়: হারানো বস্তু প্রাপ্তি, অনু: বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন করা, প্রাপ্য হক না দেওয়া এবং না-হক কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬৫, হাদীস নং-৪৩৩২

[৬০৭] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, খ:৪র্থ, অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়, অনু: ফল ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পূর্বে কর্তন না করার শর্তে বিক্রি করা নিষেধ, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৫৫, হাদীস নং-৩৭২৬

বাদাম সাবট্রপিকাল ফলসমূহের পরিচিতি ঘটায়। কৃষি স্বার্থে প্রয়োজনীয় শ্রম ও জমির মালিকানা সম্পর্কিত জরুরী আইন কানুনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। বর্গা চাষের অনুমোদনও ইসলামে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি জমি সেচ, চারা রোপন এবং ফসল ফলানোর জন্য জমি অন্যের কাছে হস্তান্তর করে ও বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

ইবন্ নুমায়র (র.).. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ (সা.) খইবারের জমি খাইবার বাসীদের উৎপন্ন শস্য ও ফলের অর্ধেকের শর্তে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।"[৬০৮]

বর্গাচাষের চুক্তি অনুযায়ী জমির মালিক ও বর্গাচাষী উৎপাদিত ফসলের ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে।

জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামী নীতি মালা প্রণীত আছে। অনাবাদী জমি অকারণে ফেলে রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। জমির সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ইসলামে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে জমির সে অনুসারে মালিক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু ও মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ বা চাষাবাদ করতে বাধ্য। জমি লিজ দেওয়া যাবে না। রবী ইবন্ নাফি আবূ তাওবা (রা.) . . . আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।"[৬০৯]

অনাবাদী জমি তিন বছরের উর্ধ্বে ফেলে রাখলে তা বাজেয়াপ্ত করার হুকুমও আছে ইসলামী শরীয়তে। ইসলামে কৃষিকাজের ও চাষাবাদের উপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের সময়ও যেন ক্ষেত খামার নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনামলে সিরিয়ায় যখন সৈন্য দল পাঠান, তখন তিনি তাদের প্রতি এ নির্দেশ দেন, "তোমরা কিছুতেই কোন ফলবান বৃক্ষ কাটবে না।"[৬১০]

হারাম কোন দ্রব্য যেমন গাঁজা, চারস, আফিম বা অনুরূপ কোন মাদক দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে না ও এই কাজে জমি বর্গাও দেয়া যাবে না। এটা জমির মালিক ও উৎপাদনকারীর জন্য পাপের কারণ হবে। উৎপাদিত হারাম পণ্যসমূহ যারা ব্যবহার করবে তাদের পাপ এর অংশও উৎপাদনকারী ও জমির মালিকের উপর বর্তাবে। অংশীদারিমূলক চাষাবাদে কোন পক্ষ যেন যেকোন ধরণের ধোঁকাবাজি, প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকে তা অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে। ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। ভাগ বাটোয়ারা ইসলামের অনুশাসনের আদলে সমাধান করতে হবে। অন্যথায় এর পরিণাম আখিরাতেও ভোগ করতে হবে। আবু মা'মার (রা.). . . আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। 'আয়িশা (রা.) এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা জমির ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেননা নবী (সা.)

---

[৬০৮] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, অধ্যায়: মুসাকাত ও মুযারা'আত, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৮৪, হাদীস নং-৩৮২০

[৬০৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ২১৮৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ বর্গাচাষ, পরিচ্ছদঃ নবী (সা.) এর সাহাবীগণ (র.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরের সহযোগিতা করতেন-১৪৬২, পৃ.ঃ ১৭৭

[৬১০] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, অধ্যায়: অভিযান, অনু: শত্রু অঞ্চল আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তা ধ্বংস করা, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬৬, হাদীস নং-১৫৫৮

বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।"[৬১১]

কাউকে ঠকিয়ে জমির ফসলের প্রাপ্য ভাগ থেকে বঞ্চিত করলে সেই ফসল তার জন্য হারাম। প্রাপককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। এটাই আল্লাহর আইন। আর আল্লাহর আইনই সর্বোৎকৃষ্ট।

সর্বোপরি, কৃষি যে কোনো দেশের উন্নয়নের একটি শক্তিশালী উৎস। সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কৃষি কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে অর্থনীতিতে বিপ্লব সংঘটিত দেশগুলোই উন্নতির স্বর্ণশিখরে। আর কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের বিকাশমান ধারা নিশ্চিত না করা দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে পিছিয়ে আছে। কাজেই একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিখাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই আদম (আ.) থেকে শুরু করে প্রায় সকল নবী রসূলই কৃষিকাজে জড়িত ছিলেন। প্রথম মানব আদম (আ.) সম্পর্কে রসূল (সা.) বলেন, "আমি তোমাদের আদম (আ.) সম্পর্কে বলবো। তিনি কৃষি কাজ করতেন।"[৬১২]

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে বলব। তিনি চাষাবাদ করতেন।"[৬১৩]

স্বয়ং রসূল (সা.) ও কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। আল্লামা সুরুখসি (রহ.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) জারফ নামক স্থানে চাষাবাদ করেছেন।"[৬১৪]

তিনি নিজ হাতে খেজুর গাছ রোপন করেছেন ও পশু চড়িয়েছেন।

তাই নিঃসন্দেহে কৃষিকাজ সমাজ জীবনে প্রধান অর্থনৈতিক উৎস হিসেবে গণ্য। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত নি'য়ামত আমাদের রিজিকের উৎস হিসেবে গ্রহণ এবং এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করতে পারি। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে- "তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"[৬১৫]

তাইতো অবশ্যই আমাদের আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কুরআন মজিদে বান্দাহকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এভাবে, "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের সম্পদ বাড়িয়ে দেব।"[৬১৬]

কাজেই আল্লাহর এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় আমাদের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব।

---

[৬১১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ২২৯, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ যুলম ও কিসাস, পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুলম করে নিয়ে নেয় তার গুনাহ-১৫৩৭, পৃ.ঃ ২৫৩

[৬১২] *মুসতাদরাক হাকেম*, হাদিস: ৪১৬৫

[৬১৩] *মুসতাদরাক হাকেম*, হাদিস নম্বর- ৪১৬৫

[৬১৪] *আল-মাবসুত লিস সুরুখসি*: ২/২৩

[৬১৫] আল-কুরআন ১৭: ২৬-২৭

[৬১৬] আল-কুরআন ১৪: ৭

**সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে শিল্পকর্ম**

আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তি, সম্পদ ও দ্রব্যসামগ্রী মানুষের ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলার নামই শিল্প। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিল্পভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে এর সাথে কায়িক শ্রম, বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা এবং সময়ের সংমিশ্রণেই প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্ম এমন এক চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, সকল যুগের মানুষের জীবিকার্জনের অবলম্বন হয়ে আসছে। অর্থাৎ সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানব সমাজে শিল্পকর্মের অস্তিত্ব বিরাজমান। কিন্তু সভ্যতার শুরুতে তা ক্ষুদ্রায়ত হস্তশিল্পের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে শিল্পোৎপাদনের জন্য মানুষের কল্যাণে নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এভাবে শিল্পের ক্রমবিকাশের ফলে শিল্প আজ জীবিকার্জনের এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

শিল্পকর্ম ইসলামে অনুমোদিত। এমনকি অনেক নবী-রসূলও এ কর্ম সম্পাদন করে গেছেন। কুরআন মাজীদে বহুবধ শিল্পকর্মের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো যে বান্দাহর প্রতি আল্লাহর বড় নি'য়ামত, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

আর আমি তার জন্য লোহাকেও নরম করে দিয়েছিলাম, (এ নির্দেশে যে), "তুমি পরিপূর্ণ বর্ম তৈরি কর এবং যথার্থ পরিমাণে প্রস্তুত কর।" (সূরা সাবাঃ ১০-১১)

অপর আয়াতে অনুরূপ ঘোষণা, 'আর আমরা তাকে বর্ম তৈরী করার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলাম, যেন তা যুদ্ধে তোমাদের প্রতিরক্ষা করতে পারে। তাহলে তোমরা কি শোকর আদায় করবে? (সূরা আম্বিয়াঃ ৮০)

হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

'আর আমরা তার জন্যে তামার ঝর্না প্রবাহিত করেছি এবং এমন জ্বিন তার অধীন করে দিয়েছি যারা তাদের আল্লাহর নির্দেশে তার সম্মুখে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করত, তাকে আমরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলির আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম! তারা তার (সুলায়মানের) জন্য যা সে চাইত, নির্মাণ করত, উঁচু উঁচু প্রাসাদ ইমারত, প্রতিকৃতি, বড় বড় পানি সঞ্চয় পাত্র যেমন লগন ও (ভাবতে হবে) স্বস্থানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ডেগসমূহ। হে দাঊদ বংশধরেরা! শোকর আদায়কারী হিসেবে কাজ কর।'

কুরআনের যুল-কারনাইনের সুউচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

সে বলল, "আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব।' তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" অবশেষে যখন সে দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা ফুঁক দিতে থাক'। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, 'তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর

উপর ঢেলে দেই'। এরপর তারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না। এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না।(সূরা কাহাফ: ৯৫-৯৭)"[৬১৭]

ললিতকলার প্রতি মানুষের একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক নি'য়ামতরাজির ন্যায় শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রতিভাও একটা নি'য়ামত। আল্লাহ সৃষ্ট জগতে রয়েছে জানা অজানা নানান উপাদান। সৃষ্টির সূচনা থেকেই সেগুলো রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করে আসছে। রূপান্তরের এই গুণকেই আমরা বলে থাকি প্রতিভা। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত উপাদান এবং তারই প্রদত্ত মানবিক প্রতিভা। এই দুই নিয়ামতের সংমিশ্রণে গঠিত হয় শিল্পকর্ম। উদাহরণ স্বরূপ, মাটি একটি উপাদান এবং মানুষ তার প্রতিভা দিয়ে মাটির হাড়ি-পাতিল, কলসি, ঢাকনা, বাটি, মাটির চুলো ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র তৈরি করে। যাকে আমরা মৃৎশিল্প বলে থাকি। এভাবে আল্লাহ সৃষ্ট গাছ-গাছড়াকে রূপান্তরিত করে বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈজসপত্র যেমন: শীতলপাটি লেখালেখির কাগজ, মাটির নিচে প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যাদি যেমন লৌহ, তামা, দস্তা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা, হীরক, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, গণ্ডশিলা ইত্যাদির দ্বারা নানান প্রকার নতুন আকৃতির অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করা হয়। এর প্রত্যেকটি এক একটি শিল্পকর্ম এবং উৎপাদনকারীদের জন্য জীবিকার্জনের একটি উপযুক্ত মাধ্যম।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প থেকেই সহায়সম্বলহীন জনসমষ্টির উপার্জনের জোগান ঘটে। আবদুল্লাহ ইবন্ ইউসুফ (রহ.). . . আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কারো জন্য তার রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া মানুষের নিকট তার ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম, চাই সে দিক বা না দিক।"[৬১৮]

ইসলাম কর্মহীনতা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে সমর্থন করে না বরং উপার্জনে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি ইসলাম কোনো কর্মকেই ছোট করে দেখে না যদি তা হালাল হয়। একজন কর্মহীন ব্যক্তি শুধু তার কায়িক শ্রম ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যেকোন শিল্পকর্ম কে বেছে নিয়ে, তদ্দরুণ তার জীবিকা উপার্জন করতে পারবেন। কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, তাঁতি, মুচি, দর্জি, সোনারু, কাঁসারু বাবুর্চি ইত্যাদি পেশাজীবী এক একটি শিল্পকর্মের সাথে জড়িত হয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে একটি উত্তম জীবিকার্জনের মাধ্যম। কিন্তু প্রত্যেক পেশায় যেভাবে উপার্জন হালাল হওয়ার কিছু শর্ত থাকে, শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যেমন: কর্মী যে উপাদানটিকে কেন্দ্র করে কাজ করবে, সেই উপাদানটি অবশ্যই বৈধ এবং পবিত্র হতে হবে। ইসলাম যেসব জিনিস অপবিত্র ঘোষণা করেছে সেসব জিনিস দ্বারা শিল্পকর্ম

[৬১৭] আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খয়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, পৃ.: ১৮৪

[৬১৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৩৮৭, আগস্ট ২০০৬, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ ৩য়, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ যাচনা থেকে বিরত থাকা-৯৩২, পৃ.ঃ ৪৪

করা যাবে না। যেমন তামাক পাতা দিয়ে সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান তৈরির শিল্প কখনই ইসলামে অনুমোদিত নয়। এ ধরণের পেশা দ্বারা উপার্জিত অর্থও কখনই হালাল হবে না।

শিল্পকর্ম হালাল হওয়ার আরেকটি শর্ত হল, তা ছবিমূর্তি মুক্ত হওয়া। অনেক শিল্পকর্ম এমন রয়েছে যেখানে শিল্পকর্মকারকে মূর্তি তৈরি করতে হয় অথবা বিভিন্ন তৈজসপত্রে মানুষ কিংবা প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করতে হয়।

ইসলাম কোন ভাবেই প্রাণীর ছবি আঁকা এবং মূর্তি তৈরি করার অনুমতি দেয়নি। এ সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য এরূপ: "ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রত্যেক ছবি (বা মূর্তি) নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি তুমি করতেই চাও, তাহলে গাছপালা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি বা মূর্তি তৈরি করতে পার।"[৬১৯]

আলী ইবন্ আবদুল্লাহ (রা.). . . "হযরত আইশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমি চত্বরে একটি পরদা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম তাতে চিত্রাংকন করা ছিল। তা দেখে রসূলুল্লাহ (সা.) এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, হে আয়শা! মহাপ্রলয়ের দিন আল্লাহর কাছে সেসব ব্যক্তিই কঠিন সাজাপ্রাপ্ত হবে; যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করে (চিত্রাংকন করে)। আইশা (রা.) বলেছেন: এরপর তা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম এবং তা দ্বারা একটি অথবা দুটি বালিশ তৈরি করেছিলাম।"[৬২০]

অর্থাৎ কোন শিল্প কর্মে কর্মীকে, যদি চিত্রাংকন বা প্রতিকৃতি তৈরি করতে হয়, তবে তা অবশ্যই প্রাণীর হওয়া যাবে না। অন্যথায় তার এ কাজ দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না এবং পরকালে এর জন্য তাকে পেতে হবে কঠোর শাস্তি। এ প্রকারের শিল্পকর্ম অবশ্যই কোন জড় পদার্থের বা গাছপালার হতে হবে। তবেই তা দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে।

কর্মক্ষেত্র অবহেলা এবং অসততা এড়িয়ে চলতে হবে। অন্যান্য পেশার মত শিল্পকর্মেও পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং সততা বজায় রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে তাকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হবে। কিন্তু নিজ পেশায় সততা অবলম্বন করলে বান্দাহ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। নিজ প্রতিভার শতভাগ ঢেলে দিয়ে পরিপূর্ণ চেষ্টা এবং নিষ্ঠা প্রয়োগ করেই একজন রাজমিস্ত্রি গড়ে তুলবে একটি মজবুত ইমারত, একজন কাঠ মিস্ত্রি তৈরি করবে টেকসই আসবাবপত্র, একজন দর্জি তৈরি করবেন ত্রুটিহীন পোশাক, একজন স্বর্ণকার তৈরি করবে নিখাদ গহনা। শিল্পকর্মে

---

[৬১৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-২০৮৪, খণ্ডঃ ৪র্থ, অধ্যায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়,পরিচ্ছেদঃ প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ-১৩৮০, পৃষ্ঠাঃ ৮৭, প্রাগুক্ত

[৬২০] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*- ৫৫৩০, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ পোশাক পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদঃ ছবিযুক্ত কাপড় দ্বারা বসার আসন তৈরি করা-২৪২০, পৃ.ঃ ৩৭৮, প্রাগুক্ত

এভাবে সততা বজায় রাখলে কর্মী তার উপার্জনকে হালাল এবং সন্দেহমুক্ত রাখতে পারবে। বান্দাহর হাত কঠোর পরিশ্রমের সময় যতটা ময়লাযুক্ত হবে, সেটি তার উপার্জনকে ততটাই ময়লামুক্ত করবে।

শিল্পকর্ম এমন কোন কাজকে কেন্দ্র করে হওয়া যাবে না যাতে অশ্লীলতা রয়েছে। অর্থাৎ যা পুরো মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর। যেমন: নায়ক নায়িকাদের চলচিত্রে অভিনয় করাকে শিল্পকর্ম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শিল্পকর্মের শিল্পীরা অনেক সময় অশ্লীলতাকে উপস্থাপন করে থাকে। এমন কোন পেশায়ই হালাল নয় যা নারী দেহকে জনসম্মুখে প্রদর্শিত করে। অতএব যে শিল্পকর্ম দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে তা অবশ্যই সর্বপ্রকার অশ্লীলতা মুক্ত হতে হবে। একই কথা কণ্ঠশিল্পীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাদ্যযন্ত্র নারী পুরুষের প্রণয় সম্পর্কিত অশ্লীলতাপূর্ণ গান, কুফরি এবং শিরক সম্পর্কিত গান ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম। আজকাল অনেক নারী পুরুষের পেশা নাচ-গান নির্ভর। নৃত্যশিল্পী এবং কণ্ঠশিল্পীরা নেচে গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে থাকে। রাস্তাঘাট ও টিভি পর্দায় রুচি বহির্ভূত বিজ্ঞাপন প্রচার অশ্লীলতার আরেকটি অভিনব মাধ্যম। অথচ ইসলামে এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

"প্রকাশ্য বা গোপন কোন প্রকার অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।"[৬২১]

আবু ওমামা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় কর না, তাদের ক্রয় কর না, তাদের গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম।"[৬২২]

ইসলামে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এসকল শিল্পকর্ম হারাম এবং এর দ্বারা উপার্জিত জীবিকাও হারাম। বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের রসূল (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরণের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।"[৬২৩]

সংগীত শিল্পীরা কঠোর অধ্যবসায় পরিশ্রম ও নিবিষ্টতার পর প্রচুর দক্ষতার সাথে নান রকম বাদ্যযন্ত্র চালনা করে। এমনকি মুসলিমদের মধ্যে একদল এ কাজে গভীর ভাবে জড়িত এবং অধিক সংখ্যক মানুষের এটা জানাই নেই যে আল্লাহ বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন। হিশাম ইবনে আম্মার (রা.) ....আব্দুর রহমান ইবন্ গানাম আশ'আরী (র.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।"[৬২৪]

---

[৬২১] আল-কুরআন ৬: ১৫১

[৬২২] আল্লামা খতিব তাবরেযী (র.), *মিশকাতুল মাসাবীহ,* অনু: মাওলানা আহমদ মায়মূন, ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা, খ: ৪র্থ, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরি: বাবুল কাসবি ওয়া তালাবুল হালাল, পৃ:১৮৯, হাদীস নং-২৬৩৭

[৬২৩] বায়হাক্বী, হাদীস ছহীহ, *মিশকাত* হা/৪৫০৩

[৬২৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৫১৮৯, খণ্ডঃ ৯ম অধ্যায়ঃ পানীয় দ্রব্যসমূহ, পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মাদককে ভিন্ন নামে নামকরণ করে হালাল মনে করে-২২২৫, পৃ.ঃ ২১৭, প্রাগুক্ত

অতএব বাদ্যযন্ত্র চালনা করে মানুষের তুষ্টির নিমিত্তে জীবিকা উপার্জনও হালাল হবে না। মূলত যেসকল, শিল্পকর্ম সম্পর্কে ইসলাম সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা পরিহার করে আল্লাহর দেখানো পথে শিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকার্জনই শ্রেয়।

মানবজীবনে শিল্পকর্মে মনোহারী বৈচিত্রের পাশাপাশি কবির ভাষায় জীবিকা নির্বাহের এক অনুপম চিত্র পক্ষীকুল ও পতঙ্গরাজীর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়।

এখানে সেরকমই শিক্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর একটি কবিতা উপস্থাপিত হলো

**কাজের আনন্দ**

**নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।
ছোট পাখি ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।
এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।
পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।
শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই

ছয় পায়ে পিলপিল চলি ।[৬২৫]

আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকুলের কল্যাণার্থে রহমত ও বরকত স্বরূপ মানব জীবনে শিল্পকর্মের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। একজন শিল্পীর উচিত নীতির অধীনে থেকে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পকর্মকে নিজেদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা। ফলশ্রুতিতে বান্দাহ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে অজস্র কল্যাণ লাভ করবে। প্রতিটি পেকারণ কিছু নৈতিক এবং কিছু অনৈতিক দিক রয়েছে। শিল্পকর্মেও তা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে অনৈতিক দিক গুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চললেই কেবল শিল্পকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি একটি পবিত্র ও বরকতময় জীবিকার্জনে সক্ষম হবে। কোন পেশাই ছোট নয় যখন তা হালাল। আল্লাহর কাছে একজন ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং একজন বড় কারখানার মালিক একই মর্যাদার অধিকারী যদি তারা উভয়ই হালাল উপায়ে তাদের জীবিকার্জন করে থাকেন।

সুতরাং মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন মানুষকে যে নান্দনিক বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন অভিরুচি দিয়েছেন, তাতে সৎচিন্তা ও আখিরাত নির্ভর একটি স্বচ্ছ ও পবিত্র জীবিকার লক্ষ্যে শিল্পকর্মটি সম্পাদন করাই ইসলামের দাবি।

---

[৬২৫] নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *কাজের আনন্দ*, আমার বাংলা বই, ২য় শ্রেণি

## সপ্তম অধ্যায়

## মুসলিম ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবন শৈলীতে ইসলামী নান্দনিকতা

চির মোহনীয় সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন সর্বাপেক্ষা নান্দনিক ও কল্যাণময়ী করে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে পূর্ণাঙ্গ জীবনধারায় ইসলামী নন্দনবোধে উজ্জীবিত করে নৈতিকতার মত সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ আয়াতটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে-

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়। তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।"[৬২৬]

আর তাইতো সৃষ্টির সেরা সে মানবকুলের উপরই মহান রব্বুল আ'লামিন খিলাফতের ন্যায় এত পবিত্র গুরুভার অর্পণ করেছেন। আর এ নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট নমুনা হলেন দোজাহানের সর্বাধিনায়ক আহমাদ মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)। মুসলিম ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপই হতে হবে সেই শ্রেষ্ঠ মানবেরই অনুসরণে।

আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের নিদর্শন এই যে, মহান রব নিজ অনুগ্রহে মুসলমানের ঘরে জন্মদান এবং রসূল (সা.) এর উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারই সূত্র ধরে আল্লাহর এ অসীম নিয়ামতের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিটি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন কাঠামো সুসংবদ্ধ হওয়া চাই নৈতিকতা ও নান্দনিকতা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ভাবধারায়। হাদীসে কুদসিতে বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাকে কেবল আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য। তোমার উপর আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত তা তুমি যেন কখনো ভুলে না যাও। যেসব জিনিস আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি, তাতে যেন কখনো এতটা মনোনিবেশ করে না বস, যাতে তোমাকে যার জন্য সৃষ্টি করেছি তার কথা ভুলে যাও।

হে মানুষ আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি। এটাকে তুমি খেলা মনে করো না। আমি তো তোমার রিয্ক, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। অতএব, তুমি হতাশ ভারাক্রান্ত হবে না। হে মানুষ! তুমি আমাকে পেতে চাইবে তবে তুমি আমাকে পাবে। আর যদি তুমি আমাকে পেয়েই যাও, তবে তো

---

[৬২৬] আল-কুরআন ৯৫: ৪-৬

সবকিছুই পেয়ে গেলে, কিছুরই অভাব বা অপূর্ণতা থাকলো না। কিন্তু তুমি যদি আমাকেই হারিয়ে ফেল, তাহলে তুমি হলে সর্বহারা। আমি যেন হই তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"[৬২৭]

বিশ্ব অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বান্দাহকে নিয়ামাতের প্রাচুর্য দানের সাথে সাথে প্রাত্যহিক জীবন শৈলীতে সরল পথও প্রদর্শন করেছেন। আর সিরাতুল মুস্তাকিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নি'য়ামত। এ রহমত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মু'মিন বান্দাহ প্রত্যহ সালাতে প্রতি রাকাতেই আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের নিকট হিদায়াত প্রার্থনা করেন। এইভাবে- "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর।"[৬২৮]

আর এ মর্মবাণী থেকে উপলব্ধী যে, আমাদের দায়িত্ব হল-

- সরল পথে অবিচল থাকার সাধনা।
- অপরকে সরল পথের আহ্বান এবং
- সদা সর্বদা নিজ ও সকলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে হিদায়াত প্রার্থনা করা।

পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোবৃত্তি ইসলামী নৈতিকতা ও নান্দনিকতার অন্যতম উপাদান। এক মু'মিন অপর মু'মিনের দর্পণ স্বরূপ। যেখানে একে অপরকে ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার আদর্শে আলোড়িত করবে এবং বিবেকের কাঠগড়ায় হক বাতিলের পার্থক্য গড়ে দিবে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা করেন-

"তোমাদের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি অবশ্যই থাকবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফলকাম।"[৬২৯]

মুসলমানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হল জীবন পরিচালনায় সর্বাঙ্গীনভাবে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলা। কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একনিষ্ঠ অনুসরণ দ্বারাই ব্যক্তির জীবন শৈলীতে ইসলামী নৈতিকতা ও নান্দনিকতা আনয়ন সম্ভব। আর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, নৈতিক জীবনধারায় নান্দনিকতার উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

আমরা যৌবনে যেমন বাকি জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে সঞ্চয় করে থাকি, তেমনি ক্ষুদ্র এ জীবন শেষে রয়েছে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন। সে জীবনের পাথেয় অর্জন করতে হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কার্যাদি হতে হবে সম্পূর্ণ আখিরাতমুখী অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহরই সন্তোষ বিধানকল্পে।

---

[৬২৭] আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), *হাদীসে কুদ্সী সমগ্র*, অনুকঃ আল মাসরুর, সম্পাদনঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, , প্রকাশনায় তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১২, মুসলিম-২৬২০, আবূ দাউদ-৪০৯০, মাজাহ-৪১৭৪, পৃ.ঃ ২১৬

[৬২৮] আল-কুরআন ১ঃ ৫

[৬২৯] আল-কুরআন ৩ঃ ১০৪

সূরা আশ-শুরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার অংশ থাকলো না।"

উক্ত আয়াতের সারকথা- বান্দাহ যে উদ্দেশ্যে আমল করবে সে অনুযায়ী ফল পাবে। কেননা আল্লাহর মেহেরবানী সবার উপরই সমান। নেক আমলের তারতম্য আখিরাতের ফসল বপনকারী এবং পার্থিব ফসল- বপনকারীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য তৈরি করে। বান্দাহ নেক আমলের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে দুটি মৌলিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে। তাদের একটি-

i) বাহ্যিক জীবনাচরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী অপরটি

ii) অভ্যন্তরীণ জীবনবোধ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি

মুসলিম ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবন শৈলীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজে নান্দনিতার উপস্থিতি অপরিহার্য। কেবল বাহ্যিক পরিপাটি ও নান্দনিক আচরণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, যদি তার অভ্যন্তরে কুৎসিত ক্রিয়া চলতে থাকে। ইসলাম বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতায়ও জোর তাগিদ দিয়েছে। এ দুইয়ের সমন্বয়েই ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ মু'মিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল নৈতিকতার পথ পরিক্রমায় জীবন চরিতে ইসলামী নান্দনিকতার পরিস্ফুটন ঘটানো। আলোচ্য অধ্যায়টিতে আল্লাহর নির্দেশিত অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ কতিপয় দৈনন্দিন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কার্যাদি বিবৃত হয়েছে। যার সাথে ইসলামী নন্দনশৈলীর প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক বিরাজমান।

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত প্রকৃত নান্দনিকতার গূঢ় তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হলো:

## বাহ্যিক জীবনাচরণ

মানব প্রকৃতি স্বভাবতই সৌন্দর্য পিপাসু রূপে সৃজিত। তাই আমাদের বাহ্যিক জীবনের কাজগুলোও হতে হবে আল্লাহ যেভাবে পছন্দ করেন সেরূপ নান্দনিক, আকর্ষণীয় ও মাধুর্যমণ্ডিত।

**গৃহসজ্জার নান্দনিকতা:** নান্দনিক রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে একটি সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন বাসগৃহের মাধ্যমে। আর সেটি হওয়া চাই আল্লাহ নির্দেশিত সীমারেখা মাফিক যা দেখে সকলের অন্তরাত্মা প্রফুল্লতায় ভরে যায়।

**পানাহারের নান্দনিকতা:** পানাহারের আসল নান্দনিকতা সেখানেই যা আল্লাহর নামে শুরু এবং তাঁরই শুকরিয়া জ্ঞাপনে শেষ হয়। সার্বিক নান্দনিক নীতিমালা অনুসরণে যে পানাহার সম্পন্ন হয়, তা দেহ মনকে অনাবিল প্রসন্নতায় ভরে দেয়।

**ঘুমের নান্দনিকতা:** সারাদিনের ক্লান্তি শেষে আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরিমিত ঘুম সুস্থ দেহ ও মস্তিষ্কের অধিকারী করত: একটি জাতিকে সফলতার পথ প্রদর্শন করে। পরিপূর্ণ আমলের সহিত একটি নান্দনিক ঘুম অঢেল সওয়াবসহ স্বপ্নযোগে প্রিয় হাবিব রসূল (সা.) কে দেখার সৌভাগ্য পর্যন্ত এনে দিতে পারে।

**পবিত্রতার নান্দনিকতা:** একটি নির্মল পবিত্র আত্মিক চিন্তা চেতনা ও ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যকার অতি নান্দনিক আত্মিক সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। আর তখন তা হৃদয়মনকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত করে মানবসমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তির ধারা বজায় রাখে।

**পোশাক ও সাজসজ্জার নান্দনিকতা :** পোশাকের নান্দনিক বৈশিষ্ট্যই হলো এই, যা ব্যক্তির ইজ্জত আব্রু রক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে মানবসমাজে সভ্য ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে। পোশাকের ন্যায় শরিয়াত সম্মত সাজসজ্জাও ব্যক্তিকে সকলের নিকট অধিক নন্দিত করে তোলে।

## অভ্যন্তরীণ জীবনবোধ

আল্লাহ তা'আলা ও বান্দাহর সম্পর্ক ঠিক ততটাই নিবিড় যতটা নিবিড়তা গাছ এবং শেকড়ের। বান্দাহ আল্লাহর এ সত্তাকে অনুভব করে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর শৈল্পিক কর্মের মাঝে। অনুভূতির এ গভীরতা বান্দাহকে করে পরম আনুগত্যশীল ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাকে পৌঁছে দেয় অনন্ত সফলতার স্বর্ণশিখরে।

**ঈমানের নান্দনিকতা:** ঈমান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতিদানের সর্বোত্তম মাধ্যম। যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সেই এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার উপর পূর্ণ ঈমান আনার মাধ্যমেই সমগ্র সৃষ্টি যাবতীয় বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপত্তা পায়। ঈমানদারগণ পার্থিব আশা- আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছজ্ঞান করে অনন্ত জান্নাতের পথযাত্রী হতে সদা তৎপর। এমনিভাবে তাঁরা নির্ভেজাল তথা ইসলামী নন্দনবোধ সম্বলিত সুন্দর একটি নতুন পৃথিবী উপহার দিতে পারে।

**তাকওয়ার নান্দনিকতা:** তাকওয়াপূর্ণ অন্তর সকল মন্দ পরিহার করে সত্য ও সুন্দরকে আঁকড়ে ধরে। মুত্তাকীগণ প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মাঝেই ইতিবাচক নান্দনিক মনোভাব বজায় রাখে। ফলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সুসংহত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

**নিয়তের বিশুদ্ধতার নান্দনিকতা:** বিশুদ্ধ নিয়তের প্রকৃত নান্দনিকতা এই যে, ব্যক্তির প্রতিটি কর্মকাণ্ডই হয় সম্পূর্ণ রিয়ামুক্ত। এক্ষেত্রে তার নিয়তের স্বচ্ছতা এতই গভীর হয় যে, প্রত্যাশা না করলেও মহান আল্লাহ তাকে অঢেল প্রতিদান দিয়ে থাকেন। বান্দাহর প্রতিটি নিয়তই যখন একান্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তখনই তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

**সবর বা ধৈর্যের নান্দনিকতা:** সবর নামক বৃক্ষের কাঁটা তিক্ত হলেও তার ফল অতীব সুমিষ্ট। এটি এমন এক নান্দনিক শক্তিশালী ধারালো অস্ত্র যা বান্দাহকে নিশ্চিত ক্ষতি ও ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

**দোয়া ও যিকরের নান্দনিকতা:** দোয়া ও যিকর এমন এক নান্দনিক তারবিহীন প্রক্রিয়া যা আল্লাহর সাথে বান্দাহর নিরবিচ্ছিন্ন আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে। চাষী ভাই যেমন বীজ বপন শেষে ধারণাও করতে পারে না কোন সে অমূল্য রত্ন তার জন্য অপেক্ষমান তেমনি দোয়া ও যিক্‌রকারীকেও মহান আল্লাহ সমাসীন করবেন আশাতীত সুউচ্চ মর্যাদার আসনে।

**শোকরের নান্দনিকতা:** যথাযথ হক আদায় ও স্বীয় আত্মার পরিতুষ্টি অর্জনের অন্যতম সোপান শোকর। মনুষ্যসৃষ্ট জ্ঞানের পরিধি যেখানে কোন একটি বিষয় আবিষ্কার, এমনকি অনুধাবনেও অক্ষম, সেখানে আত্মা, মস্তিষ্ক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অতীব নান্দনিক মূল্যাতীত সৃজনকর্ম সম্পাদনে কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান ঐ রাজাধিরাজই সক্ষম।

**তাওবা ও ইস্তিগফারের নান্দনিকতা:** পুকুরের পানিকে আন্দোলিত করলে যেরূপ ময়লা আবর্জনা সরে গিয়ে তা স্বচ্ছ দেখায়, সেরূপ তাওবার নূরের পরশে বান্দাহর অন্তরও পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা ফিরে পায়। ফলে মানব হৃদয়ে এক পরম স্বর্গীয় নন্দনবোধ ও সুখানুভূতি আস্বাদিত হয়।

## প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামে গৃহসজ্জা

মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের নিয়ামাতসমুহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো একটি নিরাপদ বাসগৃহ, যেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মনুষ্য সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টির পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মানব প্রকৃতি নীতিগত ভাবেই সৌন্দর্য প্রিয়। সে তার বাসগৃহটিকে সুসজ্জিত, আরামদায়ক এবং দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে সদা তৎপর। ইসলাম গৃহসজ্জায়ও সর্বাধিক নান্দনিক দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ করে। এদিক বিচারে গৃহসজ্জার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হল:

### রুচিশীল পরিপাটি বাসগৃহ

পরিপাটি বাসগৃহ সুরুচির পরিচয় বহন করে যার পূর্বশর্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। আমাদের বসতবাড়ি ও আঙ্গিনা এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল, নন্দনময়, মনোরম ও আকর্ষণীয় হওয়া চাই যা দেখে মানুষের আত্মা প্রশান্তিতে ভরে যায়। তাই রসূলুল্লাহ (সা.) এদিকে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা হলেন পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাই তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি মহানুভব। তাই তিনি মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল। তাই তিনি দানশীলতাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা তোমাদের আঙ্গিনাগুলো পরিষ্কার করে রেখো এবং ইয়াহুদীদের মতো সেগুলোকে অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে রেখো না"।[৬৩০]

হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হাদীসের ভাষ্যকার শরফুদ্দীন আত-তীবী (রহ.) [মৃ. ৭৪৩ হি.] বলেন, "যেহেতু এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন পূত-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এ কারণেই তিনি পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। তাই তোমরাও প্রত্যেকটি বস্তু ও স্থানকে সাধ্যমতো পবিত্র ও পরিষ্কার রেখো। এমনকি ঘরের আঙ্গিনাগুলোকে তোমরা পরিষ্কার ও পবিত্র করে রাখবে।"[৬৩১]

---

৬৩০ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযি (রহ:), *সুনানে আত-তিরমিযি*- ২৭৯, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: আন-নাযাফাতু, বৈরুত, দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী, তা. বি.'

৬৩১ ইবনুন হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহ:), *সহীহ মুসলিম*- ৫৭৬৮, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: তাহরীমুন নাযার ফী বাইতি গাইরিহি, বৈরুত: দারু ইবনু কাছীর, তা. বি.

**ইসলামে সুসজ্জিত আবাসস্থল**

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের প্রতিটি সৃষ্টিই অনুপম সৌন্দর্যের নিদর্শন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন- "তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর ও উত্তম রূপেই সৃষ্টি করেছেন।"[৬৩২] তাঁর সেই মহান কর্মের সাথে সাযুজ্য রেখেই আমাদের গৃহগুলো সজ্জিত হওয়া উত্তম। গৃহসজ্জায় অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। ব্যয়বহুল বিলাস-সামগ্রী, প্রাণীর ছবি ও প্রতিকৃতি দ্বারা গৃহ সজ্জিতকরণ ইসলামে অবৈধ। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধিমালা লিপিবদ্ধ হলো:

**ক) বিলাসবহুল প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্মাণ অপচয়ের শামিল**

যে নির্মাণশৈলী গর্ব অহংকারের প্রতীক তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। তবে ঘরবাড়ি প্রয়োজনানুসারে সুসজ্জিত ও পরিপাটি হওয়া অনৈতিক নয়। ব্যয়বহুল অট্টালিকা নির্মাণে নিরুৎসাহিত করে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তোমরা প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (সৌধ হিসেবে বড় বড় ঘর) বানিয়ে নিচ্ছো, যা তোমরা একান্ত অপচয় হিসেবেই করছো। আর এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, (যা দেখে) মনে হয় তোমরা বুঝি এ পৃথিবীতে চিরকাল ধরে থাকবে।"[৬৩৩] রসূলুল্লাহ (সা.) একে কিয়ামাতের একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, "কিয়ামাতের একটি নিদর্শন হলো যখন মেষপালের রাখালেরা অট্টালিকা নিয়ে পরস্পর অহংকার করবে।"[৬৩৪]

অপর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "বান্দাহকে তার প্রত্যেকটি অর্থব্যয়ে পুরস্কৃত করা হবে কিন্তু মাটির কাজে তথা ঘরের নির্মাণ কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তাতে নয়।"[৬৩৫] এখানে কেবল বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের জন্য নির্মিত গৃহের কথা বলা হয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন, যেসব বাড়িঘর বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, সেসব বাড়ি ঘরের ক্ষেত্রেই হাদীসের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ প্রযোজ্য। যেসব বাড়িঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা সবই নির্মাণ করা পাপ নয় বরং এরূপ কিছু কিছু বাড়ি ঘর নির্মাণ করা সওয়াবের কাজ। যেমন, যে বাড়িঘর দ্বারা নির্মাতা ছাড়া অন্যরাও উপকৃত হয় না তা দ্বারা নির্মাতা সওয়াব পাবে না।"[৬৩৬] রসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনাদর্শ থেকে প্রাপ্ত একটি সুন্দরতম ঘটনাবহুল হাদীস উদ্ধৃত হলো- সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, "একবার রসূলুল্লাহ (সা.) জনৈক আনসারী ব্যক্তির সদর দরজার ওপরস্থ একটি সুউচ্চ গম্বুজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি গম্বুজটি দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? সাহাবীগণ তাকে বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। রসূল (সা.) শুনে নীরব রইলেন; তবে এটি তার অন্তরে দাগ কেটেছে। পরে যখন একসময় রসূল (সা.) এর খিদমতে মালিক এসে লোকজনের মধ্যে তাকে সালাম করলো তিনি তাকে উপেক্ষা করে চললেন। এরপর তিনি আরো কয়েকবার এরূপ করলেন। অবশেষে সে বুঝতে পারলো যে, তার প্রতি রসূল

---

[৬৩২] আল-কুরআন ৩২: ৭

[৬৩৩] আল-কুরআন ২৬: ১২৮-১২৯

[৬৩৪] আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*- অধ্যায়: আল ইস্তিযান, পরিচ্ছেদ: মা জা'আ ফিল বিনা, বৈরুত: দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭

[৬৩৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহ:), *সূনানে ইবনে মাজাহ*- ৪১৬৩, অধ্যায়: আয-যুহ্দ, পরিচ্ছেদ: আল বিনা ওয়াল খারাব, বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.

[৬৩৬] ইবনু হাজার আসকালানী, (৭৭৩-৮৫২ হি.) *ফাতগুল বারী*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ- ১৩৭৯ হি, খ. ১১, পৃ. ৯৩

(সা.) ক্ষুব্ধ হয়েছেন ও তাকে উপেক্ষা করে চলছেন। ফলে সে তার সাহাবীগণের নিকট অনুযোগের সুরে বললো, আল্লাহর কসম! আমি রসূল (সা.) কে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, এক সময় রসূল (সা.) বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখতে পেয়েছিলেন। তখন লোকটি ফিরে গিয়ে গম্বুজটি ফেলে দিলেন এবং মাটির সাথে সমান করে দিলেন। এরপর রসূল (সা.) আবার ঐ জায়গা দিয়ে গমন করার সময় গম্বুজটি না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন গম্বুজটি কি করা হলো? তখন সাহাবীগণ বললেন, গম্বুজের মালিক তার প্রতি আপনার উপেক্ষার বিষয়টি আমাদের নিকট অভিযোগ করেছিল। আমরা তাকে আপনার উপেক্ষার কারণ অবহিত করার পর সে নিজেই তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তখন রসূল (সা.) বললেন, প্রত্যেকটি ঘর তার মালিকের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যা প্রয়োজন তা ছাড়া।"[৬৩৭]

**খ) গৃহসজ্জায় ছবি বা প্রতিকৃতি হারাম**

মুসলমানদের ঘরবাড়ি জীবের ছবি বা প্রতিকৃতি দ্বারা সজ্জিতকরণ ইসলামি নীতিসিদ্ধ নয়। এমনকি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ছবিও তার আওতাধীন নয়। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারযাভী তার ইসলামে হালাল হারামের বিধান বইয়ে ছবি হারাম হওয়ার প্রসঙ্গে চারটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপঃ

i) তাওহীদী বিশ্বাসের সংরক্ষণ এবং পৌত্তলিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কার্যাবলী পরিহার।

ii) প্রতিকৃতি বা ছবি নির্মাতা এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে যে, সে বুঝি একটা জিনিসকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছে।

iii) এ কর্মে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় তারা কোন স্থানেই থেমে যায় না।

iv) প্রতিকৃতি বিলাসী জীবন যাপনের পরিচায়ক।

এসব প্রতিকৃতি কারো ঘরে থাকলে সে ঘরে আল্লাহর রহমত প্রবেশ করে না। রসূলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন- "যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"[৬৩৮] একটি হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, একবার তিনি প্রাণীর চিত্র সম্বলিত একটি তাকিয়া (বৃহদাকার বালিশ যাতে আরামের জন্য হেলান দেওয়া হয়) আনলেন বা ক্রয় করলেন। রসূল (সা.) তা দেখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) তার চেহারায় অপছন্দের ভাব দেখতে পেয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তাওবা করছি; আমার কি কোন অপরাধ হয়ে গেলো? রসূল (সা.) জবাব দিলেন তাকিয়ার একি হাল? আমি বললাম, এটা তো আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য কিনেছি। তখন রসূল (সা.) বললেন, কিয়ামাতের দিন এসব চিত্রের অঙ্কনকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে তোমরা যা সৃজন করেছো,

[৬৩৭] আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী (রহঃ), *আবু দাউদ শরীফ*- ৫২৩৯, অনুকঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহঃ) খায়রুন প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকাঃ ১১০০, ১ মে, ১৯৮৪ ঈসায়ী, অধ্যায়ঃ আল আদাব, পরিচ্ছেদঃ মা'জায়া ফিল বিনা, বৈরূত, দারুল কিতাবিল আরবী, তা.বি.আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, পৃ. ১৪৪-৪৬

[৬৩৮] ইসমাইল আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*- ৫৬১৬, অধ্যায়ঃ আল লিবাস, পরিচ্ছেদঃ মান লাম ইয়াদখুল বাইতান ফীহি সূরুতুল, প্রাগুক্ত

তাতে জীবন দাও। অধিকন্তু যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"[৬৩৯] ছবিযুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। হাদীসে এসেছে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, "রসূল (সা.) তাঁর ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না যাতে ক্রুস চিহ্ন থাকতো।"[৬৪০] তবে শর্ত সাপেক্ষে ছবি ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে। যেমন-

- প্রাণীর চিত্র থেকে মাথা কেটে ফেলা হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, চিত্র হলো মাথাই। যদি মাথা কেটে ফেলা হয়, তাহলে এটা চিত্ররূপে ধর্তব্য হবে না।
- প্রাণীর চিত্র যদি সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার না হয়ে যদি তুচ্ছ কাজে ও পদদলিত হয় এরূপস্থানে ব্যবহার করা হয় তাও বৈধ।[৬৪১]
- প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত চিত্র রাখতে বাধা নেই।

সাঈদ ইবনু আবিল হাসান (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার এক চিত্রকর ইবনু আব্বাসকে বললেন, আমি এ ছাড়া কোন কাজ জানি না। তখন তিনি বললেন, যদি তোমার নেহায়াত প্রয়োজন হয়, তা হলে তুমি গাছপালা এবং এমন সকল বস্তুর চিত্র আঁকতে পারো যাদের কোন প্রাণ নেই।"[৬৪২]

**গ) যাবতীয় হিংস্র পশুর চামড়া গালিচা ও ওয়ালমেট হিসেবে ব্যবহারের বিধান**

কোনরূপ গর্ব অহংকার পোষণের জন্য এসব বস্তু সাজ-সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার সমীচীন নয়: মাকরূহ। মুয়াবিয়া ও মিরদাদ ইবনে মা'দীকার (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রসূল (সা.) হিংস্র জন্তু জানোয়ারের চামড়া পরা এবং তার (জীন বাগদীর) উপর আরোহন করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৬৪৩] অন্য রিওয়ায়াত রয়েছে, "রসূল (সা.) হিংস্র জন্তু জানোয়ারের চামড়াকে মেঝের কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৬৪৪]

**ঘ) গৃহ-সজ্জায় স্বর্ণ-রৌপ্য**

স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা ঘরবাড়ি, বৈঠক খানা প্রভৃতি সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হারাম। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি কোন সুসজ্জিত ও অলংকৃত ঘরে প্রবেশ করতে পারি না। অর্থাৎ এটা আমার জন্য শোভনীয় নয়। একই ভাবে ঘরের মেঝে বা দেওয়াল সমূহে স্বর্ণ বা রৌপ্য এর প্রলেপ দেওয়া নাজায়েজ। কেননা এরূপ সাজসজ্জা গর্ব অহংকারের প্রতীক।

**ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাবধানতা**

বসতিবাড়ি নির্মাণের আগে মাটির অবকাঠামো, ধারণক্ষমতা ও পানির প্রবাহ এগুলোর দিকে খেয়াল করা জরুরী। অপরিকল্পিতভাবে খাল-বিল ভরাট করে বাড়িঘর নির্মাণের ফলে যাতে জনজীবনের উপর দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয় সেটি

---

[৬৩৯] হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহ:), *সহীহ মুসলিম*- ৫৬৫৫, অধ্যায়: আল লিবাস, পরিচ্ছেদ: লা তাদখুলুল মালাইকাতু বাইতান----- প্রাগুক্ত
[৬৪০] ইসমাইল আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*- ৫৬০৮, অধ্যায়: আল-লিকাস, পরিচ্ছেদ: নাকযুয সুওয়ার, প্রাগুক্ত
[৬৪১] আবু যাকারিয়া, *শারও সাহীহি মুসলিম*, নাবাবী, বৈরূত: দারু ইহয়তিত তুরাসিল আরবী- ১৩৯২ হি., খ. ১৪, পৃ.: ৮১
[৬৪২] আল কুশায়রী আন-নিশাপুরী (রহ:), *সহীহ আল মুসলিম*- ৫৬৬২, অধ্যায়: আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদ: লা তাদখুলুল মালাইকাতু----, প্রাগুক্ত
[৬৪৩] আবু দাউদ সুলাইমান (রহ:), *আবু দাউদ শরীফ*- ৪১৩৩, অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: জুলুদুন নুমূর ওয়াস সিবা, প্রাগুক্ত
[৬৪৪] ঈসা আত তিরমিযি (রহ:), *জামে আত-তিরমিযি*- ১৭৭১, অধ্যায়: আল লিবাস, পরিচ্ছেদ: শাদ্দুল আসনান বিয যাহাব, প্রাগুক্ত

অবশ্যই আমলে আনতে হবে। এদিকে নির্দেশ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- "জলে-স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের ফসল।"[৬৪৫]

**চ) প্রশস্ত বাড়ি ঘর সৌভাগ্যের নিদর্শন**

বসত বাড়ি প্রশস্ত হওয়া উত্তম। এরূপ ঘর মানুষের অন্তরে উদারতা ও প্রসন্নতা জাগ্রত করে। আসবাবপত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায়। তা না হলে অন্তর সংকুচিত ও অনুদার হয়ে দুঃখ, ক্লেশ, বিমর্ষতা ও অপ্রসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নবী কারিম (সা.) প্রশস্ত বাড়িঘরকে বৈষয়িক সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, চারটি জিনিস কল্যাণের আর তা হল সৎচরিত্রের অধিকারী স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, ভাল প্রতিবেশী এবং উত্তম যানবাহন। নবী কারিম (সা.) প্রায়ই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ মাফ করো, আমার ঘরে আমার জন্য প্রশস্ততা দাও এবং আমায় রিযিকে আমার বরকত দাও। জনৈক লোক জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.) আপনি প্রায়ই এই দোয়া কেন করেন? জবাবে তিনি বলেন, এই দোয়ায় কি কোন একটি জিনিসও বাদ পড়েছে?[৬৪৬]

**ইসলামে ব্যবহার্য আসবাবপত্র**

i) আল্লাহ বান্দাহর কল্যাণে বাসস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও আসবাবপত্রের যোগান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ভোগের উপকরণ হিসেবে ভেড়ার পশম, উটের কেশ ও ছাগলের লোম থেকে তোমাদের (ঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী) অনেক আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী বানানোর ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।"[৬৪৭]

ii) আমাদের জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন ইসলামী আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। তাই শারীয়াহ মাফিক আসবাবপত্র ব্যবহারেও নীতিটি প্রযোজ্য। চাদর, পর্দা, গালিচা, খেলাধুলার সামগ্রী ইত্যাকার আসবাবপত্র ব্যবহারে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। এগুলো ব্যবহারের কতিপয় দিক তুলে ধরা হল।

**স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র**

সুপ্রাচীন কাল থেকে মূল্যবান এ ধাতুটির প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ ছিল। এর দ্বারা তৈরি পাত্র ও বাসন-কোসন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য হারাম। রসূল (সা.) বলেছেন, "যে রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করে, সেতো তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভরে।"[৬৪৮] অন্য হাদীসে রসূল (সা.) বলেন- "তোমরা রৌপ্যের প্লেটে আহার করবে না। কারণ এসব দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্য।"[৬৪৯]

[৬৪৫] আল-কুরআন ৩০: ৪১
[৬৪৬] মুসনাদে আহমদ- ১৬৫৯৯
[৬৪৭] আল-কুরআন ১৬: ৮০
[৬৪৮] ইসমাইল আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*- ৫৩১১, অধ্যায়: আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: আনিয়তুল ফিদ্দাহ, প্রাগুক্ত
[৬৪৯] ইসমাইল আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*- ৫১১০, অধ্যায়: আল আত 'ইমাহ, পরিচ্ছেদ: আল-আকলু ফী ইনায়িন মুফাদ্দাদ, প্রাগুক্ত

**ক. ২-** বাসন কোসনের স্বর্ণ-রৌপ্যের চামচ, কাঁটা চামচ, কাঁটা ছুরি, আতরদানি, সুরমাদানি, ধুপদানি, তেলদানি, পানদানি, আয়না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের শলা যা দ্বারা চোখের সুরমা লাগানো হয় প্রভৃতি ব্যবহারও নাজায়েজ। আধুনিক কালে অনেক বিত্তশালী লোককে স্বর্ণের কলম, কলমদানি, স্বর্ণের সিগ্রেট লাইটার, সিগ্রেট কেস ও হোল্ডার ব্যবহার করতে দেখা যায় যা ইসলামে অবৈধ। ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী বলেন স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘড়ি, কলম, লেখার উপকরণাদি, আয়না ও বিবিধ সৌন্দর্য পরায়ণ দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৬৫০]

**একান্ততা**

বসতবাড়ি আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নিশ্ছিদ্র, নিরাপদ ও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। আমৃত্যু এখানেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। মানুষ আপনস্থলে নিজেকে সর্বপ্রকার সামাজিক বিধি বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে। আর তাইতো আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর প্রতি তার অনুগ্রহ রাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন।"[৬৫১]

**ধাতব বস্তু ও দামী পাথরসমূহ**

স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত যেকোন ধাতব বস্তু (যেমনঃ সীসা, পিতল, লোহা, তামা প্লাটিনাম প্রভৃতি) কিংবা কোন দামী পাথর (যেমনঃ জামরুদ, ইয়াকুত, নীলা ও আকীব পাথর) বা কাচের তৈরি আসবাবপত্রের ব্যবহারে শারীআতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার রসূল (সা.) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর খিদমতে পিতলের পাত্রে কিছু পানি বের করে দিলাম। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন।"[৬৫২] আরেকটি হাদীস হলো- উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতু জাহাশ (রা.) বলেন, "রসূল (সা.) পিতলের পাত্রে ওযু করতেন।"[৬৫৩]

**খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র**

গৃহে অবৈধ খেলাধুলার সামগ্রী এবং বাদ্যযন্ত্র রাখা ও ব্যবহার করা হারাম। ইসলামী শারীআতে কয়েকটি খেলা সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ। যেমনঃ দাবা ও পাশা। রসূল (সা.) বলেন, "যে পাশা খেলে সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করে।"[৬৫৪] অপর হাদীসে বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুয়োরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করে।"[৬৫৫] উল্লেখ্য, জুয়ার ভিত্তিতে যেখানে হার-জিত থাকে সে সকল খেলাও হারাম। তাই এসব খেলার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা ও ঘরে রাখাও হারাম। তবে যেসব খেলাধুলা শারীরিক ব্যায়াম অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা, দ্বীনী বা পার্থিব উপকারিতা এবং মানসিক অবসাদ দূরীকরণে খেলা হয় তা শারীআতে অনুমোদিত।

---

[৬৫০] ড. ওয়াহ্বাহ, যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতু* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি. খ. ৪, পৃ. ২৬৩২

[৬৫১] আল-কুরআন ১৬: ৮০

[৬৫২] ইসমাইল আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল বুখারী*- ১৯৪, অধ্যায়ঃ ওযু, পরিচ্ছেদঃ আল গুসলু ওয়াল ওদু ফিল মিখদাব----, প্রাগুক্ত

[৬৫৩] ইমাম ইবনু হাম্বল (রহঃ), *মুসনাদে আহমদ*- ২৬৭৫৩, হাদীসু যায়নার বিনতু জাহ্শ (রা), বৈরূতঃ আল মুয়্যাসসা সাতুর রিসালাহ্, ১৯৯৯

[৬৫৪] আবু দাউদ সুলাইমান (রহ), *আবু দাউদ শরীফ*- ৪৯৪০, অধ্যায়ঃ আল আদাব, আন-নাহয়ু আনিল লা.বি বিন নারদি, প্রাগুক্ত

[৬৫৫] আল কুশায়রী আন-নিশাপুরী (রহ), *সহীহ মুসলিম*- ৬০৩৩, অধ্যায়ঃ আশা-শি'র, পরিচ্ছেদঃ আত-তাহরীমুল লা'বি বিন নারদিশীর, প্রাগুক্ত

বাদ্যযন্ত্র অশ্লীলতার জন্ম দেয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.) গান বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। হযরত আবু আমির বা আবু মালিক আল আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেন, “আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমি বস্ত্র, মাদক দ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।”[৬৫৬] আবু মালিক আল-আশয়ারী থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক মাদক দ্রব্য সেবন করবে এবং নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখবে। তাদের মাথার উপর বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ এদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন। তাদের মধ্যে থেকে অনেককে বানর ও শুয়োরে রূপান্তরিত করবেন।[৬৫৭] ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘এই উম্মাতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি রয়েছে।’ এমন সময় মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ‘ইয়া রসূলুল্লাহ! সেটি কখন ঘটবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন গায়িকাদের সংখ্যা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাবে এবং মাদকদ্রব্য সেবনের ব্যাপকতা লাভ করবে।’[৬৫৮] আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন, আমার রব আমাকে গান বাজনার যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৫৯] খেলাধুলা ও বাদ্যযন্ত্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হল- “একশ্রেণির লোক আছে, যারা অবান্তর কথাবার্তা খরিদ করে। যাতে করে তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহর পথ থেকে (মানুষদেরকে) দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। তারা একে হাসি-তামাশা বিদ্রুপ হিসেবেই গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।”[৬৬০]

**ইসলামে শিশু খেলনা**

পুতুল ও প্রাণীর ছোট ছোট প্রতিকৃতি খেলনাসামগ্রী হিসেবে ব্যবহার দোষণীয় নয়। উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রসূল (সা.) এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম আমার কিছু সখীও ছিল। তারাও আমার সাথে খেলতো, নবী কারিম (সা.) যখন ঘরে আসতেন, তখন তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যেতো। রসূল (সা.) তাদেরকে আমার কাছে পাঠাতেন, আবার তারা আমার সাথে খেলতো।[৬৬১] উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর ঘরের খোপের মধ্যে একটি পর্দা ছিল। যেখানে তিনি কয়েকটি পুতুল রেখেছিলেন। একবার রসূল (সা.) যুদ্ধ থেকে আসলেন। এ সময় হঠাৎ বাতাসে খোপ থেকে পর্দাটি সরে যায় এবং পুতুলগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে। রসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন আয়িশা এগুলো কি? তিনি জবাব দিলেন এটি আমার পুতুল। রসূল (সা.) পুতুলগুলোর মধ্যে টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি দু’ডানা বিশিষ্ট একটি ঘোড়া দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ আবার আমি কি জিনিস দেখছি? আয়িশা (রা.) বললেন, ঘোড়া, রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে এগুলো কি? আয়িশা

---

[৬৫৬] ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *সহীহ আল বুখারী*- ৫২৬৮, অধ্যায়: আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: মান ইয়াস্তাহিল্লুল খামরা--, প্রাগুক্ত

[৬৫৭] মুহাম্মাদ ইবনে সাজাহ (রহ:), *সুনানে ইবনে মাজাহ*- ৪০২০, অধ্যায়: আল ফিতান, পরিচ্ছেদ: আল উকবাত, প্রাগুক্ত

[৬৫৮] ঈসা আত-তিরমিযি (রহ), *জামে আ-তিরমিযি*- ২২১২, অধ্যায়: আল ফিতান, পরিচ্ছেদ: আলামাতুগুলিলিল, মাসখ ওয়াল খাসফ, প্রাগুক্ত

[৬৫৯] ইমাম ইবনু হাম্বল (রহ:), *আল মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত

[৬৬০] আল-কুরআন ৩১: ৬

[৬৬১] ইসমাইল আল বুখারী (রহ:), *সহীহ আল বুখারী*- ৫৭৭৯, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: আল ইনবিছাত ইলান্নাস, প্রাগুক্ত

(রা.) বললেন, এগুলো দু'টি ডানা। রসূল (সা.) বললেন, ঘোড়াতে কি দুটি ডানা থাকে? আয়িশা (রা.) বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, সুলাইমান (আ.) এর ঘোড়াগুলোতে ডানা ছিল? আয়িশা (রা.) বললেন, এ কথা শুনে রসূল (সা.) এভাবে হাসলেন যে, আমি তার পেষক দন্তগুলো দেখতে পেয়েছি।[৬৬২]

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পানাহার**

আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর অপরিহার্য অঙ্গ পানাহার। যে কেউ জ্ঞান আহরণ, সৎকর্ম সম্পাদন এবং ধর্ম পথে চলার সামর্থ্য লাভের মানসে আহার করবে তার পানাহারও ইবাদত বলে গণ্য হবে। ইবাদত ব্যতীত যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত লাভ অসম্ভব তেমনি পানাহার ব্যতীত মাখলুকের অস্তিত্বই বিলীন হতে বাধ্য। মানবজীবনে পানাহারের গুরুত্ব অবধারিত সত্ত্বেও মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন নির্দিষ্ট স্বাধীনতা দান পূর্বক প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে নির্দেশ দিলেন এভাবে-

"আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহকারে খেতে থাকো। কিন্তু এ গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।"[৬৬৩]

এ মর্মে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন নবী রসূলগণের প্রতিও একই আহ্বান করেন- "হে রসূলগণ তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত।"[৬৬৪]

ইসলামে আহারের আদর্শ হলো মহান আল্লাহ যে উৎস হতে, যে পন্থা ও রীতিতে খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) তার জীবদ্দশায় বাস্তবায়ন করে গেছেন। ইসলামে আহার ইবাদাত সদৃশ হওয়ায় এর কিছু সুনির্দিষ্ট নিদর্শন রয়েছে। তা হলো এরূপ-

i) লোভের তাড়নায় আহার না করা।
ii) হালাল দ্রব্য পরিমিত পরিমাণে আহার করা।
iii) শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আহার করা।

কোন সুস্বাদু ও লোভনীয় খাবার সাধারণ দৃষ্টিতে নান্দনিক হলেও তা যদি হারাম বস্তু দ্বারা তৈরি হয় তা ইসলামে অবশ্যই বর্জনীয়। আবার হালাল বস্তু দ্বারা তৈরি খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেও পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ ও অপব্যয় পরিহারে ইসলাম সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

"খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৬৬৫]

---

[৬৬২] আবু দাউদ সুলাইমান (রহ:), *আবু দাউদ শরীফ*- ৩৯৩৪, অধ্যায়: আল আদাব, পরিচ্ছেদ: আল লায়িব বিল বানাত
[৬৬৩] আল-কুরআন ২: ৩৫
[৬৬৪] আল-কুরআন ২৩: ৫১
[৬৬৫] আল-কুরআন ৭: ৩১

**খাবার গ্রহণ ও শেষে পালনীয়ঃ**

ইসলামে আহার গ্রহণ একদিকে ইবাদাত হিসেবে গণ্য অপরদিকে অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তও বটে। আর সেক্ষেত্রে খাবার ও পানীয় গ্রহণের পূর্বে, গ্রহণকালীন এবং শেষে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত রয়েছে যা প্রত্যেক মুসলমানদের মেনে চলা একান্ত জরুরি। রসূলে কারিম (সা.) বলেছেন- "মুসলমানের প্রত্যেকটি কার্য আখিরাতের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।"[৬৬৬]

খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ধৌত করার মাধ্যমে হাত ও মুখের মলিনতা দূর হয় যা ওযুর তুল্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "যে ব্যক্তি খাওয়ার পূর্বে হাত-মুখ ধৌত করে, সে ব্যক্তি অভাব এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পায়।"[৬৬৭]

রসূলুল্লাহ (সা.) ভাত, রুটি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য দস্তরখানার উপর রেখে খেতেন এবং উম্মাতকেও তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তা দীনতা নম্রতার শিক্ষা এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সহজ প্রণালীতে বসা অর্থাৎ ডান হাঁটু উঠিয়ে বাম পা মাটিতে পেতে বসা। আর কোনকিছুর উপর হেলান বা ঠেস দিয়ে আহার না করাই উত্তম। আবূ নু'আয়ম (রা.). . .  হযরত আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি হেলান দিয়ে আহার করিনা।"[৬৬৮]

ইসলাম পরিমিত খাবার গ্রহণে তাগিদ দিয়েছে। হিশাম ইবন্ আবদুল মালিক হিমসী (র.)... মিক্বদাম বিন মা'দীকারির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশি খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।"[৬৬৯]

ইবাদাতের শক্তি অর্জন মুসলমানের আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাবারের অপচয় রোধ এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সকলেরই কর্তব্য। নামায এবং আহারের সময় একত্রিত হলে প্রথমেই আহার সম্পাদন করে পরে নামায আদায় করতে হবে।

একাকী আহারের চেয়ে কাউকে সাথে নিয়ে আহার করাই শ্রেয়। খাদ্যপাত্রে যত অধিক হাত মিলবে, তত বেশি বরকত হবে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেনঃ "রসূলে আকরাম (সা.) কখনই একাকী আহার করেন নি।"[৬৭০]

আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ দু'জনের

---

[৬৬৬] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) (অনুঃ মাওলানা মাসুম বিল্লাহ),*কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, পৃ. ২৩১

[৬৬৭]

[৬৬৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *বুখারী শরীফ*-৫৩৯৮, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ডঃ ৯ম, পরিচ্ছেদঃ হেলান দিয়ে আহার করা-২১১৭ পৃ.ঃ১১৮

[৬৬৯] ইবনে মাজাহ্ (র.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, অধ্যায়ঃ আহার, অনুঃ কম খাওয়া এবং পেট ভরে না খাওয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ২২৪, হাদীস নং-৩৩৪৯

[৬৭০] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।[৬৭১] খাওয়ার শুরুতে অবশ্যই বলতে হবে 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং খাওয়ার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন খাবার খাবে, তখন সে অবশ্যই আল্লাহর নাম নেবে। প্রথমে আল্লাহর নাম নিতে যদি ভুলে যায় বলবে: 'বিস্‌মিল্লাহির আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' অর্থাৎ খাবার প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে।[৬৭২] ডান হাতে খাবার খাওয়া প্রিয়নবী (সা.) এর সুন্নাত। আলী ইবন্ আব্দুল্লাহ্ (র.)  হযরত উমার ইবনে আবূ সালামা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন: বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করে ডান হাতে খাবার খাও এবং তোমার সামনে থেকে খাও।[৬৭৩] হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো খাদ্যের দোষ ধরেন নি। তাঁর রুচিসম্মত হলে তিনি তা খেতেন। আর রুচি সম্মত না হলে তিনি তা খেতেন না।[৬৭৪] রসূলে মকবুল  (সা.) কখনই কোনো খাদ্যদ্রব্যের দোষ উল্লেখ করেননি। ভাল হলে খাবার গ্রহণ করতেন, অন্যথায় হাত গুটিয়ে নিতেন। বরতনের যে পার্শ্ব নিজের দিকে থাকত সে পার্শ্ব থেকে আহার করতেন: কিন্তু ফল-মূল জাতীয় খাবার হলে পাত্রের সকল অংশ থেকে খেতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একদিন নবী কারিম (সা.) এর সামনে এক পাত্র সারীদ আনা হল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন- তোমরা খাবারের পাশ থেকে খাবে। এর মধ্যস্থল থেকে খাবে না।"[৬৭৫] কেননা খাদ্যের বরকত মাঝখানেই অবতীর্ণ হয়।

খাদ্যদ্রব্যের কোন অংশ হাত থেকে পড়ে গেলে সযত্নে তুলে পরিষ্কার করে খেতে হবে। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূল (সা.) বলেছেন: যখন তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, তখন সে তা অবশ্যই উঠিয়ে নেবে, তাতে লেগে থাকা ময়লা ছাড়িয়ে দিয়ে সে অবশ্যই তা খাবে এবং শয়তানের জন্য তা রেখে দেবে না। আঙ্গুল চেটে না খেয়ে রুমাল দ্বারা হাত মুছবে না। কারণ সে জানে না তার খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।[৬৭৬] হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি দস্তরখান থেকে খাবার তুলে খেয়ে ফেলবে, তার জীবিকার স্বচ্ছলতা বাড়তে থাকবে এবং সন্তান সন্ততিও নির্দোষ এবং নিরাপদ থাকবে।[৬৭৭]

পানীয় দ্রব্য পান করার ক্ষেত্রে পান পাত্র ডান হাতে ধরে বিসমিল্লাহ্ বলে আস্তে আস্তে বসে পান করতে হবে। দাঁড়িয়ে বা শুয়ে পানি পান না করা, অতঃপর তাতে কোনো ক্ষতিকর জীবাণু আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

---

[৬৭১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফঃ* ৫০০০, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ আহার সংক্রান্ত, পরিচ্ছেদঃ একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ঠ- ২১১৫, পৃ.ঃ ১১৬, প্রাগুক্ত

[৬৭২] শায়খ ওলিউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেয়ী (রঃ), অনুক আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব, *মিশকাত শরীফ*, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, অষ্টম খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, হাদীস নং- ৩৯০৩

[৬৭৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৪৯৮৪, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ আহার সংক্রান্ত, পরিচ্ছেদঃ আহারের পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা ও ডার হাত দিয়ে আহার করা-২১০৭, পৃ.ঃ ১০৮, প্রাগুক্ত

[৬৭৪] খতীব তাবরেয়ী (রঃ), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৯১০

[৬৭৫] (*আবু দাঊদ*- ৩৭৭২, *তিরমিযী*- ১৮০৫, *ইবনে মাজাহ*- ৩২৭৭) ইমাম নববী, প্রাগুক্ত হাদীস নং- ৭৪৫

[৬৭৬] (মুসলিম- ২০৩৩, ১৩৫), ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালেহীন* হাদীস নং- ৭৫ প্রাগুক্ত

[৬৭৭] ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

ইসলামের হুকুম হলো পানি তিন শ্বাসে পান করা। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত- রসূলুল্লাহ (সা.) পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিয়েছেন।[৬৭৮] পান শেষে এ দো'আ পাঠ করতে হবে যে-

الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا

"যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি স্বীয় অনুগ্রহে এ পানীয়কে মিষ্ট ও সুস্বাদু করেছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে এটাকে লবণাক্ত ও বিস্বাদ করেননি।"[৬৭৯]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত- নবী কারিম (সা.) কোন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (রা.), হযরত আনাস (রা.) কে বলেন, খানা খাওয়া? তিনি বলেন এটা অধিক খারাপ বা অধিকতর নিকৃষ্ট।[৬৮০] তবে জমজমের পানি পান করার ক্ষেত্রে বিষয়টি স্বতন্ত্র। আবূ নু'আয়ম ইবন্ আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, "নবী (সা.) দন্ডায়মান অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন।[৬৮১]
হালাল বস্তু ভক্ষণ শেষে অন্তর থেকে আল্লাহর শোকর গুজার এবং সন্দেহযুক্ত খাবার সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। খাওয়া শেষে ভালভাবে হাত মুছা, দাঁত খিলাল করা এবং পাত্রে লেগে থাকা অংশ সুন্দরভাবে চেটে খাওয়া ছিল নবী (সা.) এর অভ্যাস। আলী ইবন্ আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন তার আঙ্গুল চেটে না খেয়ে মুছে না ফেলে।[৬৮২] হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি ভোজন পাত্র মুছে বা চেটে খায়, উহা তার জন্য এ দো'আ করে: হে প্রতিপালক! এ ব্যক্তি আমাকে শয়তানের লেহন থেকে পবিত্র রেখেছে। আপনি একে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। ভোজনপাত্র ধৌত করা পানি পান করলে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়।[৬৮৩] খাবার গ্রহণ শেষে পাঠ করতে হবে- الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين

**সহভোজী, সহপাঠী এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃবর্গের সাথে একত্রে আহারের নিয়ম ও ফযীলত**

ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামাত। ইসলামে আহারের ক্ষেত্রে সকলে একত্রিত হলে সভামধ্যে যিনি বয়সে, জ্ঞানে, খোদাভীরুতা বা অন্য কোন কারণে শ্রেষ্ঠ, তিনি

---

[৬৭৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), বুখারী শরীফ- ৫২২৯, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ পানীয় দ্রব্যসমূহ, পরিচ্ছেদঃ দুই কিংবা তিন শ্বাসে পানি পান করা- ২২৪৫, পৃ.ঃ ২৩২, প্রাগুক্ত

[৬৭৯] ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত

[৬৮০] (*মুসলিম*- ২০২৪, *তিরমিযী*- ১৮৭৯, *আবু দাউদ*- ৩৭১৭, *ইবনে মাজাহ*- ৩৪২৩, ৩৪২৪, *আহমদ*- ১১৭৭৫. ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৬৪৯, ১২৮১৯, ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৫৬৯১, *দারেমী*- ২১২৭), ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৭২

[৬৮১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*- ৫২১৫, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ পানীয় দ্রব্যসমূহ, পরিচ্ছেদঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা-২২৩৫, পৃ.ঃ ২২৬,প্রাগুক্ত

[৬৮২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৪৯৮৪, খণ্ডঃ ৯ম, অধ্যায়ঃ আহার সংক্রান্ত, পরিচ্ছেদঃ রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া-২১৫৬, পৃ.ঃ ১৪৩, প্রাগুক্ত

[৬৮৩] ইমাম গাজ্জালী (রহ:), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

খাবার শুরু না করা পর্যন্ত অন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে খানার দস্তরখানায় একত্রিত হতাম তখন রসূল (সা.) যতক্ষণ পর্যন্ত শুরু না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খানায় হাত দেয়া থেকে বিরত থাকতাম। একবার আমরা সবাই রসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে খাবার খেতে বসেছি। এমন সময় একটি বালিকা খাদ্যের ওপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছিল যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলছে। সে খাবারে হাত রাখতে যাচ্ছিল, এমন সময় রসূল (সা.) তার হাত ধরলেন। এরপর এক বেদুঈন এসেছিল সেও যেন খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) তারও হাত ধরে ফেলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: নিঃসন্দেহে যে খাদ্যের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান তা (নিজের জন্য) হালাল করে নেয়। শয়তান এ বালিকাটিকে নিয়ে এসে এর দ্বারা নিজের জন্য খাদ্যকে হালাল করতে চেয়েছিল। আমি তার হাত ধরে ফেলেছিলাম। এরপর শয়তান এ বেদুঈনকে নিয়ে আসে। এর সাহায্যে তার নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে চেয়েছিল। আমি তারও হাত ধরে ফেলেছিলাম। যে সত্তার (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এ দুজনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। এরপর তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করে (বিসমিল্লাহ পড়ে) খাবার খেয়েছিলেন'।[৬৮৪]

- ভোজনকালে অনর্থক ও অলীক গল্প না করে ধর্মপরায়ণ ও ওলী দরবেশগণের কাহিনী, পুরাবৃত্ত ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, শরীয়তসম্মত সুন্দর সুন্দর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ভোজনসভায় নিজে অধিক গ্রহণ না করা এবং সমবন্টনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে।
- খাবারের উত্তম ও উপাদেয় অংশ নিজে একটু কম খেয়ে একান্ত সঙ্গীকে কিংবা সাধারণ দরিদ্র লোককে বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা ইসলামী মানবীয় গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) দরিদ্রদেরকে দাওয়াত করে এনে তাদের সম্মুখে খোরমা স্থাপনাপূর্বক বলতেন:" যে ব্যক্তি বেশি খেতে পারবে এক একটি আঁটির জন্য তাকে একটি দিরহাম প্রদান করা হবে। খাবার গ্রহণের পর গণনা করে যার আঁটির সংখ্যা বেশি পেতেন তাকে আঁটি প্রতি একটি করে দিরহাম পুরস্কার দিতেন।"[৬৮৫]

ইসলামী শিষ্টাচার অনুযায়ী সহপাঠী ও বন্ধু বান্ধবকে দাওয়াত করে খাবার খাওয়ানো অধিক দান খয়রাত অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে রসূল (সা.) ইরশাদ করেন- নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে মানুষের কোন হিসাব হবে না। ক) রোযা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাত্রে যা আহার করবে, খ) রমজানে ইফতারের সময় যা আহার করবে, গ) বন্ধু-বান্ধবের সাথে যা আহার করবে। হযরত হাসান বছরী (রহ.) বলেছেন: মানুষ নিজে যে খাবার খায় এবং

[৬৮৪] (*বুখারী*- ৩২৮০, *মুসলিম*- ২০১৭, *তিরমিযী*- ১৮১২, ২৮৫৭, *আবু দাউদ*- ৩৭৩১, ৩৭৩৩, *ইবনে মাজাহ*- ৩৪১০, *আহমদ*- ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, মালেক- ১৭২৭), ইমাম নববী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৩২

[৬৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

পিতা মাতাকে যা খাওয়ায় এর হিসাব হবে কিন্তু যে খাবার ধর্মীয় বন্ধুবর্গকে খাওয়ানো হয়, এর হিসাব হবে না।[৬৮৬] মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ কিংবা সমাজের দুর্বল-অসহায় লোকদের মুখে যে ব্যক্তি আহার তুলে দিবে তার ব্যাপারে মহান রব্বুল আ'লামিন দুনিয়া ও আখিরাতে সীমাহীন মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) বলেছেন: ধর্মীয় ভ্রাতাগণের সম্মুখে এক সা পরিমাণ খাবার স্থাপন করা একটি ক্রীতদাস আযাদ করে দেওয়া অপেক্ষা আমার নিকট বেশি প্রিয়। তাছাড়া হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাও নাই। মানুষ বলবে- হে বিশ্বপালক! তুমি কেমন করে ক্ষুধার্ত হয়েছিলে? তুমি নিজে তো সমগ্র বিশ্বের অধিপতি এবং পালনকর্তা, তুমি তো কখনই খাবারের মুখাপেক্ষী নও। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জবাব আসবে- তোমার ভাইয়েরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। তুমি যদি তাদেরকে খাবার প্রদান করতে, তবে সে খাবার আমাকেই প্রদান করা হত। অন্যত্র হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইদেরকে পেট ভর্তি করে পানাহারে পরিতৃপ্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। প্রতি খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। তিনি আরও বলেছেন- তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যিনি ক্ষুধার্তকে খাবার দান করেন।[৬৮৭]

### বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালীন খাবারের নিয়ম

বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে গেলে যে খাবার দাবারের আয়োজন হয়ে থাকে এক্ষেত্রে মেহমানকে কিছু বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। খাবারের সময় স্বেচ্ছায় অনাহূত কোন বন্ধু সকাশে গমন না করে বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করাই উত্তম।

তবে যার বন্ধুত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং যার মনোভাব জানা আছে, তার ঘরে অনাহূত অবস্থায় স্বপ্রণোদিত হয়ে খাওয়ার মানসে গমন করা যেতে পারে। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত উমার ফারূক (রা.) ক্ষুধার্ত হলে কোন কোন সময় হযরত আবু আইয়ুব আনছারী ও হযরত আবুল হাশিম ইবনে তাইহানের ঘরে গিয়ে খাবার চেয়ে খেতেন।[৬৮৮] এরূপ চেয়ে খাওয়াতে গৃহকর্তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করা হয়। ধর্মীয় বন্ধনই যে স্থলে বন্ধুত্বের সূত্র সেরূপ ক্ষেত্রে বন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তার খাবার থেকে খাবার ভক্ষণ করা জায়েয আছে। কয়েকজন দরবেশ হযরত সুফিয়ান সাওরীর ঘরে গমনপূর্বক তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর ঘরে প্রস্তুত খাবার ভক্ষণ করেছিলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রা.) ঘরে ফেরার পর যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন আনন্দচিত্তে

---

[৬৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
[৬৮৭] ইমাম গাজ্জালী (রহ:), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
[৬৮৮] প্রাগুক্ত

বলেছে: তোমরা আমাকে প্রাচীনযুগের বুযুর্গদের ব্যবহারই স্মরণ করালে। পূর্ব যুগের বুযুর্গগণও ইত্যাকারের আচরণ করতেন।[৬৮৯]

- ঘরে যে খাবার থাকবে তাই মেহমানের সামনে উপস্থিত করতে হবে অতিরিক্ত কিছুর দরকার নেই। ঋণ করে আপ্যায়ন নিষ্প্রয়োজন। একদা এক সাহাবী হযরত আলী কাররাসাল্লাহু ওয়াজদাহুকে দাওয়াত করেন। তিনি দাওয়াতকারীকে বললেন: তুমি তিনটি শর্ত পালন করতে পারলে আমি তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারি। ক) আমার জন্য বাজার থেকে কিছু ক্রয় করে আনতে পারবে না। খ) ঘরের যাবতীয় বস্তু যা যে স্থানে রক্ষিত আছে আমার সম্মানার্থে তার কিছু সরাবে না। গ) আহার্য দ্রব্য থেকে পোষ্যবর্গের পূর্ণ অংশ রাখবে।[৬৯০]
- আবেগের বশবর্তী হয়েই হোক কিংবা অবচেতন মনেই হোক দাওয়াত খেতে গিয়ে মেযবানের পক্ষে যা কষ্টসাধ্য তা আবদার না করে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ। হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) কোন সময়ে বাগদাদ নগরে জনৈক যা'ফরান ব্যবসায়ীর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ইমাম সাহেবের খাবারের নিমিত্ত যে বস্তুর দরকার যা'ফরান ব্যবসায়ী প্রত্যহ সে দ্রব্যগুলির এক তালিকা তৈরি করে স্বীয় বাবুর্চির হাতে প্রদান করতেন। একদিন ইমাম শাফেঈ সাহেব উক্ত তালিকায় স্বহস্তে একটি নূতন বস্তুর নাম সংযোগ করে দিলেন। যা'ফরান ব্যবসায়ী সে তালিকাটি স্বীয় বাঁদীর হাতে দেখে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়পূর্বক উক্ত বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।[৬৯১]
- মেহমানের খেদমত করাতে যদি গৃহকর্তৃ আনন্দ পান, তবে মেহমানকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তিনি কোন দ্রব্য খেতে ভালবাসেন। মেহমানকে তার অভিরুচি অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো দ্বারা সন্তুষ্ট করার মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভ্রাতার মনের আশা পূরণ করতে যত্নবান হন, তার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিখিত হয়। অসংখ্য গুনাহ তার আমলনামা থেকে ক্ষমা করা হয়। হাজার হাজার প্রকারে তার মর্তবা উন্নত করা হয়। এবং ফিরদাউস, আদ্ন এবং খুল্দ নামক তিনটি বেহেশত থেকে তার জন্য অংশ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়।[৬৯২]

**আমন্ত্রিত অতিথিকে খাবার প্রদানের মাহাত্ম্য**

পূর্বোক্ত বিষয়গুলো শুধু সে সব অতিথিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা অনিমন্ত্রিত এবং স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হয়। তবে যাদেরকে দাওয়াত করা হয় তাদের আহার প্রদানের বিষয়টি স্বতন্ত্র। ইসলামে মেহমানদারীর ফযিলত অনেক

---

[৬৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
[৬৯০] প্রাগুক্ত
[৬৯১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
[৬৯২] প্রাগুক্ত

বেশি। হযরত রসূলে মকবুল  (সা.) এর জনৈক ক্রীতদাস হযরত আবু রাফে (রহ.) বলেছেন: একদা রসূলে পাক (সা.) আমাকে বললেন: অমুক ইয়াহুদীর নিকট থেকে আমার জন্য আটা কর্জ করে আনলে আমি তা রজব মাসে পরিশোধ করব। কারণ একজন মেহমান এসেছে। আমি ইয়াহুদীর নিকট রসূলের প্রস্তাব জানালে সে বিনা বন্ধকে ধার দিতে অস্বীকার করল। আবু রাফে (রহ.) বললেন আমি রাসূলের দরবারে ইয়াহুদীর উক্তি বর্ণনা করলে রসূল (সা.) বললেন: আমি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে আমীন বলে খ্যাত। বিনা বন্ধকে কর্জ প্রদান করলেও আমি তার ঋণ পরিশোধ করতাম। যাও, ঐ বর্মটি বন্ধক রেখে ইয়াহুদীর নিকট থেকে আটা ধার করে আন। হযরত আবু রাফে বললেন- আমি তাই করলাম।[৬৯৩]

**দাওয়াত প্রদান ও দাওয়াত কবুল**

মুত্তাকী বা ধর্মপরায়ণ লোকদের দাওয়াত করে সমাদর করা ইসলামী রীতিসিদ্ধ আচরণ। পবিত্র আহার গ্রহণে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ কারণে সমাজের দুর্বৃত্ত কিংবা অসাধু ব্যক্তিকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। ইসলাম ফকীর মিসকীন, দীন-দুঃখী ব্যক্তিকে খাওয়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। হযরত রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে বিবাহ সংক্রান্ত যিয়াফতে শুধু আমীর বা ধনী ব্যক্তিবর্গকে খাবার খাওয়ানো হয়, আর গরীব মিসকীনদের বঞ্চিত রাখা হয়, তা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যিয়াফত। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন: তোমরা দাওয়াত কার্যেও গুনাহর ভাগী হয়ে থাকো। কেননা, এমন লোককে দাওয়াত করে থাকো যারা কখনো আসবে না। আবার যারা দাওয়াতে যোগদানের জন্য আগ্রহশীল তাদেরকে পরিত্যাগ কর।[৬৯৪]

একে অপরকে দাওয়াত করলে সেটি কবুল  করা ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত কর্তব্য। দাওয়াত কবুলের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। তা নিম্নরূপ:

- দাওয়াতী ব্যক্তি প্রদানকারী ধনী না দরিদ্র দাওয়াত প্রদানকারীর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা চলবে না। কেননা ইসলাম দাওয়াত কবুলের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। একদা হযরত আলী (রা.) এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.) ঘোড়ায় চড়ে একদল গরিব লোকের নিকট দিয়ে পথ চলছিলেন। যখন এরা শুকনো রুটির টুকরা চিবাচ্ছিল, ইমাম সাহেবকে দেখামাত্র তারা অতিশয় সম্মানের সাথে তাঁকে অনুরোধ করল, হে রসূলে ফরযন্দ! আপনিও আমাদের সাথে খাবারে লিপ্ত হউন। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব থেকে নেমে তাদের সাথে একত্রে আহারে বসলেন এবং বললেন, অহঙ্কারী লোকদের আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না। আহার শেষে তিনি ঐ দরিদ্র লোকদেরকে পরবর্তী দিন তাঁর বাড়িতে আহারের জন্য দাওয়াত করে নিজ গন্তব্য পথে চলে

[৬৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
[৬৯৪] প্রাগুক্ত

গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাদের জন্য নানা জাতীয় সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করা হলো। তিনি তাদের সাথে এক দস্তরখানায় বসে মহানন্দে পানাহার করলেন।[৬৯৫]

- মেহমান মেযবানের দাওয়াত কবুল করলে মেযবান সেটিকে সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করবে। দাওয়াতী ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ এ দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, দাওয়াত প্রদানকারী ইসলাম বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছে কিনা। মেহমান যদি বুঝতে পারে, উক্ত অনুষ্ঠানে কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারের সংমিশ্রণ ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রভাবে দাওয়াত পরিত্যাগ করতে হবে। আবার যে অনুষ্ঠানে রেশমী ফরাশ পাতানো আছে কিংবা রোপ্য নির্মিত ধূপদানী, বাদ্য-যন্ত্র সহকারে রাগ-রাগিনী, অশ্লীল বাক্যালাপ, নারী পুরুষের অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয় এ জাতীয় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
- দাওয়াতকারীর মাঝে যদি গর্ব অহংকার কিংবা দাওয়াতীকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা না জন্মায় তবে দূরের রাস্তা হলেও যতদূর যাওয়ার সামর্থ্য রাখে খুশি মনে সে দাওয়াত কবুল করতে হবে।
- কেবল উদরপূর্তি ও লোভের তাড়নায় দাওয়াত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কেননা তা সুন্নত পরিপন্থি কাজ। রসূল (সা.) এর সুন্নত পালনের মানসে দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ ও রসূলের নিকট পাপী। আলোচ্য হাদীসের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে কোন কোন আলেমের অভিমত দাওয়াত গ্রহণ ওয়াজিব।[৬৯৬] দাওয়াতকারী মুসলমান ভাইয়ের সম্মান এবং তাকে সন্তুষ্টার্থে দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে- মুসলমান ভ্রাতার মন সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা হয়।[৬৯৭] দাওয়াত গ্রহণে অজস্র সওয়াব নিহিত। কাজেই তা রক্ষা করা মু'মীন ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব।

উপস্থিত মেহমানের সমীপে খাবার পরিবেশনকালীন কিছু বিষয়ের ওপর খেয়াল রাখতে হবে। তা হলোঃ

- মেহমানকে আহারের প্রতীক্ষায় বসিয়ে না রেখে মাজলিসে নিজ নিজ আসন গ্রহণের সাথে সাথে খাবার পরিবেশন করলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে ভোজনসভায় দাওয়াতপ্রাপ্ত দীন-দুঃখীর উপস্থিত হতে দেরী হলে এবং তার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে তার জন্য খানিকটা অপেক্ষা করা উত্তম। হযরত হাতেম আছেম (রহ.) বলেছেনঃ কোন কাজে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। কিন্তু নিম্নোক্ত ছয়টি কর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করা আবশ্যক। ১) দাওয়াতী মেহমানের সম্মুখে খাবার সামগ্রী

---

[৬৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০
[৬৯৬] প্রাগুক্ত
[৬৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

আনয়ন করা, ২) মৃতকে দাফন করা, ৩) বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ দেওয়া, ৪) ঋণ পরিশোধ করা, ৫) পাপকার্য থেকে তাওবা করা এবং ৬) ওলীমার নিমন্ত্রণ প্রদানে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত।[৬৯৮]

- খাদ্য তালিকায় টাটকা ফলমূল ও সবজি জাতীয় খাবার উপস্থিত রাখতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- দস্তরখানায় টাটকা সব্জি তরকারি আনয়ন করা হলে তথায় ফেরেশতা আগমন করেন।[৬৯৯] উত্তম খাবার প্রথমেই উপস্থিত করতে হবে, যেন মেহমানগণ ইচ্ছামত আহার করে তৃপ্ত হতে পারেন। অন্যদিকে পরিবার পরিজনের জন্যও প্রয়োজনীয় অংশ রাখতে হবে যাতে উভয়পক্ষেই ভারসাম্য বজায় থাকে। কারণ অনেক সময় দাওয়াতে আসা লোকজন অনৈতিকভাবে গৃহকর্তৃর অগোচরে খাবার দাবার বেঁধে নিয়ে যায়। ফলে বাড়ির শিশু-বৃদ্ধসহ প্রায় সকলকেই বঞ্চিত হতে হয়। তবে গৃহকর্তৃর সাক্ষাতে ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এরূপ করা যেতে পারে।
- খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হলে মেহমান মেযবানের কাছ থেকে ভদ্রভাবে বিদায় নেবে। সম্ভব হলে মেযবান মেহমানকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসবে। এটি ছিল নবী কারিম (সা.) এর নীতি আদর্শ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ঘুম

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের অপার অনুগ্রহরাজির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে ঘুম। যেখানে তার অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরিসীম মহিমা প্রতিভাত হয়। সময়ের আবর্তনকে তিনি দিন ও রাত্রি এই দুই অংশে বিভক্ত করে দিনকে কর্মচাঞ্চল্য ও রাতকে বিশ্রামের জন্য নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে করেছেন আরামপ্রদ আর দিনকে করেছেন আবার জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়।"[৭০০]

নিদ্রারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর আত্মাকে তার দেহ থেকে পৃথক করে নেন এবং নিদ্রা শেষে পুনরায় তাকে তার দেহে ফেরত পাঠান। তাই ঘুম হচ্ছে আমাদের জন্য সাময়িক মৃত্যু স্বরূপ। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে আবার জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[৭০১]

---

[৬৯৮] প্রাগুক্ত
[৬৯৯] প্রাগুক্ত
[৭০০] আল-কুরআন ২৫: ৪৭
[৭০১] আল-কুরআন ২: ৫৬

আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্যে ঘুম কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ তিনি নিজেই আমাদের অনুধাবন করাতে চেয়েছেন। শরীরকে সুস্থ, সুন্দর ও প্রাণবন্ত রাখতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ঘুম সকলের জন্য অপরিহার্য। ঘুমের এই অপরিহার্যতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা আল্লাহর এই নিয়ামাতের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারবো এবং আমাদের অন্তরাত্মা তার কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবে।

ইসলামি শারীয়াতে ঘুমের জন্য কোন নির্দিষ্ট আয়তন নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি সাধারণত মানুষ গড়ে ৫-৮ ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি এর চেয়ে কম ঘুমিয়ে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম থাকতে পারে তবে সে কম ঘুমাতে পারে। আর কারো ঘুমের ঘাটতি পূরণের জন্য যদি অধিক ঘুমের প্রয়োজন হয় তবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সে কিছু বেশি ঘুমিয়ে নিতে পারে। বয়স, কাল পাত্রভেদেও ঘুমের তারতম্য ঘটে থাকে। ঘুমের প্রধান সময় রাত হলেও ইসলামে দিনের ঘুমকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে উত্তম সময় হচ্ছে রাতের প্রথম অংশের এবং দিনের মাঝামাঝি কিছু সময়ের ঘুম। আব্দুল্লাহ্ ইবন্ ইউসুফ (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত উমার (রা.) একদিন মাসজিদে লোকেদের রাতের প্রথম অংশে সালাত আদায় করতে দেখে বলেছেন, “তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক, তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় করো।”[৭০২]

এর দ্বারা উমার (রা.) রাতের প্রথম অংশে ঘুমানোর এবং রাতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ইঙ্গিত করেছেন। রসূল (সা.) নিজেও সব সময় রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, “রসূল (সা.) রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থাকতেন।”[৭০৩]

রাত জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে যেভাবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকি। একইভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাতে পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে দেহকে তারই ইবাদাতের জন্য পুনরুজ্জীবিত করে তোলার মাধ্যমেও আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো।

“তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল রাত ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের (দ্বারা) তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করা। মনোযোগী লোকদের জন্য অবশ্যই এতে আছে অনেক নিদর্শন।[৭০৪]

---

[৭০২] ইমাম বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ*, খ: ৩য়, অধ্যায়ঃ তারাবীহর সালাত, পরিচ্ছেদঃ কিয়ামে রমযান এর (রমযানে তারাবীহর সালাতের) ফযীলত, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯১, হাদীস নং-১২৫২

[৬৮৮] *সুনানে ইবনে মাজাহ*; ১৩৬৫, অনুচ্ছেদ- সালাত আদায় করা ও তার নিয়মকানুন

[৭০৪] আল-কুরআন ৩০: ২৩

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য রাতকে ঘুম এবং দিনকে তাঁর অনুগ্রহ তালাশের জন্য নির্ধারিত করেছেন, সেহেতু দিনের বেলায় সৎ উপায়ে তার নিয়ামাত সংগ্রহ করায় আমরা যেভাবে সওয়াব অর্জন করে থাকি, তেমনই রাতের বেলা আমাদের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুমানোর মাধ্যমেও সওয়াব অর্জন করে থাকি। কারণ আমাদের দেহের সক্ষমতা প্রবলভাবে পরিমিত ঘুমের উপর নির্ভরশীল। আর রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার ওপর তোমার দেহেরও হক আছে।"[৭০৫]

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ-সাফাইরেনি (রা.) বলেন, ঘুমকে অত্যাধিক পরিমাণে প্রতিরোধ করা বা অধিক সময় জেগে থাকা ঠিক নয়। ঘুমকে প্রতিরোধ করা এবং এড়িয়ে যাওয়া বিভিন্ন সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন, মন খারাপ, মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিতে ব্যাঘাত ঘটা, ক্লান্তি যা সঠিকভাবে বুঝতে ও কাজ করতে বাঁধা দেয় এবং এটি অনেক সময় মারাত্মক সমস্যার কারণ হতে পারে।

সৃষ্টি ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে এবং যারা ভারসাম্যের নীতির অনুসরণ করে তারা সমস্ত মঙ্গল অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল আদাব আল কতাওবাতের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, "তন্দ্রা বোধশক্তিকে দূর করে দেয়। কিন্তু ঘুম তাকে বাড়ায়। ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহদের ওপর প্রেরিত আশীর্বাদ গুলোর মধ্য থেকে একটি যা তিনি তাঁর কিতাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[৭০৬]

ঘুমকে রসূল (সা.) অনেক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তন্দ্রা এলে তা দূর করতে সালাত আদায়ের পরিবর্তে ঘুমিয়ে নিতে বলেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন্ ইউসুফ (রা.)... আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন,

"সালাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হয়ে পড়লে সে যেন ঘুমের আমেজ চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ যে তন্দ্রাচ্ছন্ন সালাত আদায় করে সে জানে না যে, সে কি ইস্তেগফার করছে না নিজেকে গালি দিচ্ছে।"[৭০৭]

রসূল (সা.) ইশার সালাতের আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং ইশার সালাতের পর অযথা কথা বলা অর্থাৎ, যে সকল কথাবার্তায় কোন ফায়দা নেই বা যে আলাপ আলোচনা করার ফলে রাত বা সকালের ইবাদতে কোন ব্যাঘাত ঘটতে পারে, এরূপ আলাপ আলোচনাকে তিনি অপছন্দ করতেন। আবূ বারযা (রা.) বলেছেন,

"ইশার সালাত একটু বিলম্বে আদায় করা তিনি রসূল (সা.) পছন্দ করতেন। আর ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপছন্দ করতেন।"[৭০৮]

---

[৭০৫] *সহিহ মুসলিম*: ২৬২০, অনুচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়াম

[৭০৬] *জায়া আল আলবাবের শারহ মানজুমাত আল- আদাব*,(২/৩৬৯)

[৭০৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-২১২, খণ্ডঃ ১ম, পরিচ্ছেদঃ ঘুমের পরে ওযু করা, পৃ.ঃ ১২৮, প্রাগুক্ত

[৭০৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৫৪১, অনুচ্ছেদঃ ইশার সালাতের ফযীলত, পৃষ্টাঃ ২৪, প্রাগুক্ত

ইসলাম প্রতিটি কার্য সম্পাদনে সুন্দরতম বিধানমালা বেঁধে দিয়েছেন। আমরা রসূল (সা.) এর জীবনাচরণকে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। ঘুমের ক্ষেত্রেও রসূল (সা.) তাঁর গোটা জীবনব্যাপী কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন যথারীতি পরিপূর্ণ করতেন। যা বান্দাহর জন্য অবশ্য পালনীয়।

রসূল (সা.) ঘুমানোর পূর্বে সব সময় ওযু করে নিতেন এবং অন্যান্যদের তাই নির্দেশ দিতেন। হযরত উমর ইবনে হুরাইস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, "পবিত্র অবস্থায় শয়নকারী সিয়ামরত রাত্রি জাগরণ কারীর ন্যায়।"[৭০৯]

হযরত মুজাহিদ (রা.) বলেন, "আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওযু বিহীন শয়ন করবে না। যে অবস্থায় রূহ সমূহের মৃত্যু হবে সে অবস্থায়ই উত্থান হবে।"[৭১০]

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, রূহসমূহ ঘুমন্ত অবস্থায় উর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করে, যে রূহ ওযু অবস্থায় থাকে তা আরশের সামনে সিজদারত হয়।"[৭১১]

হযরত বারাআ ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন: তুমি যখন শোয়ার বিছানায় যাবার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। এরপর ডানকাতে শুয়ে বলবে اللهم اسلمت وجهي إليك , وفوضت أمري إليك , والجئت ظهري إليك , رغبة ورهبة إليك , لاملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت. , "হে আল্লাহ্! আমার জীবন আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলামু আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে।আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ্! আমি ইমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।" পূর্বের মতই বললেন। তাতে অতিরিক্ত রয়েছে "একথাগুলোকেই তোমার শেষকথা হিসেবে বলবে।"[৭১২]

মূসা ইবন্ ইসমাঈল (র.)... সাহাবী মু'আয ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তারপর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।"[৭১৩]

ওযুসহ ঘুমানোর এ সকল উপকারিতার পাশাপাশি আমরা শয়তান থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। শয়তান আমাদেরকে পেরেশান করতে পারে না।

---

[৭০৯] *ফয়যুল কাদীর*- ৬/২৯৩

[৭১০] বাইহাকী ফী শুআবিল ঈমান ৫/১৭৬, ফাতহুল বারী- ১১/১১০

[৭১১] *বাইহাকী ফী শুয়াবিল ঈমান*- ৫/১৭৬

[৭১২] ইমাম বুখারী (র.) *বুখারী শরীফ*, খঃ ১ম, অধ্যায়ঃ উযূ, পরিচ্ছেদ : উযূসহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত, প্রাগুক্ত, পৃ.: ১৪২, হাদীস নং-১৭৩

[৭১৩] আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, খঃ৫ম, অধ্যায়ঃ নিদ্রা সম্পর্কে, অনুঃ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৬৬, হাদীস নং-৪৯৫৮

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।"[৭১৪]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আত্মাকে দেহ থেকে রাত্রি বেলায় আলাদা করে নেন যা আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর কাছেই থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে যা কামাই কর তা তিনি জানেন। এরপর দিনে তোমাদেরকে তিনি, আবার জীবিত করেন, যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।"[৭১৫]

সুতরাং ওযু করে ঘুমানোর ফলে আমাদের আত্মাসমূহ পবিত্র অবস্থায় উর্ধ্বাকাশে গমন করে। ফলে দিনের বেলায় আমরা যেভাবে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করি, আল্লাহকে সিজদা করি, সেভাবেই ঘুমিয়ে থাকলেও আমাদের আত্মা পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর আরশের সামনে সিজদারত হয়।

উপুড় হয়ে ঘুমানো মাকরূহ। কেননা এটি এমন শয়ন, যাকে আল্লাহ তা'আলা খুব অপছন্দ করেন। মুহাম্মদ ইবন্ মুছান্না (র.)... ইয়াঈশ ইবনে ত্বিখফাহ গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, "আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নাড়িয়ে বলল। "এ ধরণের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।" তিনি বলেন, "আমি তাকিয়ে দেখলাম তিনি রসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন।"[৭১৬]

ঘুমানোর সময় হাদীসে বর্ণিত আযকার ও দোয়া থেকে সাধ্যানুযায়ী পড়ার চেষ্টা করতে হবে। যিকির তথা আল্লাহর নাম নেয়া ব্যতীত ঘুমানো মাকরূহ।

---

[৭১৪] ইমাম বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, খ: ৫ম, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরি: ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০১, হাদীস নং-৩০৫০

[৭১৫] সূরা- আন'য়াম: ৬০

[৭১৬] আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, খ:৫ম, অধ্যায়: নিদ্রা সম্পর্কে, পরি: উঁপুর হয়ে শোয়া সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:৫৬৬, হাদীস নং-

৪৯৫৬

কুতায়বা ইবন্ সাঈদ (র.)... আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে আল্লাহর যিকির করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন করে তাতে আল্লাহর যিকির করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার ক্ষতি হবে।"[৭১৭]

ঘুমানোর পূর্বে রসূল (সা.) আয়াতুল কুরসি এবং সূরা ইখলাস, ফালাক্ব এবং নাস নিয়মিত পাঠ করতেন।

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে রমযানের ফিতরা সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। কোন এক আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাবার সংগ্রহ (চুরি) করতে লাগল। (........) এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে আছে আগন্তুক তাঁকে বলল: তুমি যখন বিছানায় যাবে তো আয়াতুল কুরসী পড়বে, কেননা এর মাধ্যমে সর্বক্ষণ তোমার সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন হিফাজাতকারী থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেষতে পারবে না।

রসূল (সা.) বললেন, "তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে বড় মিথ্যাবাদী। সে হচ্ছে শয়তান।"[৭১৮]

কুতায়বা ইবন্ সাঈদ (র.)... আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, "নবী কারিম (সা.) যখন প্রতি রাত্রিতে নিজ বিছানায় যেতেন দুই হাতের কবজি পর্যন্ত একত্রিত করতেন। অতঃপর তার মাঝে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তেন। অতঃপর দুই হাত যথা সম্ভব সমস্ত শরীরে মলে দিতেন। মাথা, চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ পরপর তিনবার করতেন।"[৭১৯]

মূসা ইবন্ ইসমাঈল (র.)... হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) যখন রাত্রির শয্যা গ্রহণ করতেন, হাত গালের নিচে রাখতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। আবার যখন জাগতেন তখন বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি মরার পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন।"[৭২০]

বিছানা অথবা ঘুমানোর স্থানকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা বৈজ্ঞানিকভাবেই অত্যাবশ্যক হিসেবে প্রমাণিত। কারণ বিছানায় পড়ে থাকা পূর্বদিনের জীবাণুসমূহ আমাদের দেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং সেগুলো আমাদের দেহের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে।আমাদের রসূল (সা.) ঘুমানোর স্থানকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন এবং আমাদেরকেও এটা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

---

[৭১৭] আবু দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: আদব, অনু: কেউ কোন স্থানে বসার পর, সেখান থেকে উঠা পর্যন্ত যদি আল্লাহর যিকর না করে এর নিন্দা সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৯২,হাদীস নং-৪৭৮০

[৭১৮] *রিয়াদুস সলেহীন*। হাদিস নং: ১০২১

[৭১৯]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৪৬৫২, পঞ্চম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, ই.ফা.বা, খণ্ড ঃ ৮ম, অধ্যায়: ফাযায়িলুল কুরআন, অনুচ্ছেদ ঃ মু'আবিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)- এর ফযীলত, পৃ.ঃ ৩৫৫

[৭২০] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৮৭৫, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড: ৯ম, অধ্যায়: দু'আ, পরিচ্ছেদঃ ডানে গালের নীচের হাত রেখে ঘুমানো-২৬২১, পৃ. : ৫৫৭

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি তার বিছানা ত্যাগ করলো, আবার ঘুমাতে ফিরে এলো সে যেন তার চাদর বা লুঙ্গির আঁচল দিয়ে তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয়। আর সে যেন বিসমিল্লাহ পড়ে (আল্লাহর নাম নেয়); কেননা সে জানে না যে, তার চলে যাবার পর এতে কী পতিত হয়েছে।'

তারপর সে যখন শোয়, তখন যেন এ দো'আটি বলে,

"হে আমার রব! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ রেখেছি (শুয়েছি) এবং আপনারই নাম নিয়ে আমি তা উঠাবো। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন, তাহলে আপনি তার হিফাযত করুন যেভাবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাহগণকে হিফাযত করে থাকেন।"[৭২১] কাবীসা (রহ.)..... হুযায়ফা ইবন্ ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) যখন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করতে যেতেন, তখন তিনি এ দু'আ পড়তেন। "হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মারা যাচ্ছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হবো।"[৭২২]

বারাআ ইবনু আযিব (রহ.) হতে বর্ণিত,"রসূলুল্লাহ (সা.) যখন নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিতে যেতেন এবং বলতেন হে আল্লাহ! আমি আমার সত্ত্বাকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আর আমার বিষয় ন্যস্ত করলাম আপনার দিকে এবং আমার চেহারা আপনারই দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আপনার রহমতের আশায়। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে এ দু'আ গুলো পড়বে, আর এ রাতেই তার মৃত্যু হবে সে স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপরই মরবে।"[৭২৩]

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবেন। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালিকানায়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আপনি তার হিফাযত করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।"[৭২৪]

উসমান ইবনে আবু শায়বা (র.)... হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম (সা.) রাত্রে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা মুখ মোবারক পরিষ্কার করতেন।[৭২৫]

কিয়াম উল লাইল যা রাতের শেষ অংশ সালাতুল লাইল বা রাতের সালাতের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। সালাতুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সালাত আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্ককে গভীর এবং মজবুত করার সবচেয়ে উত্তর সুযোগ। রাতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করলে আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর জন্য রাতের দ্বিতীয় ভাগ রাতের

---

[৭২১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৫৮৭৩, খণ্ডঃ ৯ম, পরিচ্ছেদঃ ঘুমাবার সময় কী দু'আ পড়বে, পৃষ্ঠাঃ ৫৫৬, প্রাগুক্ত

[৭২২]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৮৭৩, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড; ৯ম, অধ্যায়ঃ দু'আ, পরিচ্ছেদঃ ঘুমাবার সময় কি দু'আ পড়বে-২৬২০, পৃ.: ৫৫৬,

[৭২৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৮৭৬, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড : ৯ম, অধ্যায়ঃ দু'আ, পরিচ্ছেদ : ডান পাশের উপর ঘুমানো-২৬২১, পৃ.:৫৫৭,

[৭২৪] *মুসলিম*: ৪/২০৮৩, হাদীস নংঃ ২৭১২, *আহমাদ*: ২/৭৯, হাদীস নংঃ ৫৫০২

[৭২৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-২৪৪, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড :১ম, অধ্যায় : উযূ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : মিসওয়াক করা- ১৭১, পৃ.-১৪১

প্রথম ভাগ অপেক্ষা উত্তম এবং রাতের তৃতীয় ভাগ রাতের দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা উত্তম। প্রতি রাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিয়াম বা শেষ প্রহরে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন আর বান্দাহর ফরিয়াদ শোনেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসআলা..... আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, "মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৭২৬]

এর দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি রাতের প্রথম দুই অংশ ঘুমানোর পরে তৃতীয়াংশে জেগে থেকে সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করার জন্য ইসলাম আমাদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। যাতে করে বান্দাহ তার মা'বুদের দিদার এবং অফুরন্ত রহমত লাভে ধন্য হয়।

ঘুমের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রসূল (সা.) পাঁচটি কাজ করতে বলেছেন।

১. 'আওযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' বলে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।
২. বাম দিকে তিন বার থু-থু ফেলবে।
৩. এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।
৪. যে কাতে শোয়া ছিল সে কাত থেকে ঘুরে শোবে অর্থাৎ, পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে।
৫. নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে।

আবু ক্বাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে খারাপ লাগে তাহলে সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন সে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চায়। কেননা, তা হলে এটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

"আবু সালামাহ (রা.) বলেন, "আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি যা আমার কাছে পাহাড়ের চেয়ে ভারী মনে হয়, তখন এ হাদীস শোনার ফলে আমি তার কোন পরোয়াই করি না।"[৭২৭]

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো হয়)। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা (স্বপ্ন) ব্যক্ত করে।" অন্য বর্ণনায় আছে যে, "সে যেন তার

[৭২৬] আল্লামা নাসিরউদ্দীন আলবানী (র.), *হাদীসে কুদসী সমগ্র*, অনুবাদকঃ আল মাসরুর, সম্পাদনাঃ শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল মাদানী, প্রকাশনায়ঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১২, বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, পৃষ্ঠাঃ ৮৮

[৭২৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৬৫১৫, ই.ফা.বা. ২০০৭-ঈসায়ী, খন্ড-১০ম, অধ্যায়:স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, পৃ.-৩৩৩

প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”[৭২৮]

রসূল (সা.) ঘুম থেকে জেগে রাতের সালাতের পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন।

হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) যখন রাতে সালাতের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে পরিষ্কার করে নিতেন।[৭২৯]

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘মুসলমান অবশ্যই সর্বদা ফজরের নামাযের পূর্বে জাগ্রত হবে যেন নামায সময় মত জামাতের সাথে ঠিকভাবে আদায় করতে পারে। এ ব্যাপারে চেষ্টা করা এবং এতে সহায়তাকারী উপকরণাদি গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিব।’

এক ব্যক্তি ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল তার সম্পর্কে রসূল (সা.) কে প্রশ্ন করা হল। রসূল (সা.) বললেন, ঐ ব্যক্তির কর্ণদ্বয়ে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছেন।”[৭৩০]

কাবীসা (র.) ... হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, ঘুম থেকে ওঠার পর রসূল (সা.) নিম্নোক্ত দু'আসমূহ পাঠ করতেন-

“হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারূপ) (ভাবতে হবে) মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট সকলের পুনরুত্থান।”[৭৩১]

সাদাকা ইবন্ মামল (র.) ... উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন,“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হাক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই; আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র-মহান। সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন হাক্ব ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোন উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোন শক্তি কারো নেই। হে রব! আমাকে ক্ষমা করুন।”[৭৩২]

---

[৭২৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) *বুখারী শরীফ*-৬৫১৪, খন্ড-১০ম, অধ্যায়: স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান, অনুচ্ছেদ ঃ (রসূলুল্লাহ (সা) এর বাণী) ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়-২৯৩১, পৃ. : ৩৩২

[৭২৯] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) *বুখারী শরীফ* ৮৪৫, সপ্তম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭, ই.ফা.বা., খন্ড: ২য়, অধ্যায়: জুমু'আ, অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা-৫৬৩পৃ.: ১৭২

[৭৩০] *নাসায়ী:* ১৬০৮

[৭৩১]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৮৭৩, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড; ৯ম, অধ্যায় : দু'আ, পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমাবার সময় কি দু'আ পড়বে-২৬২০, পৃ.: ৫৫৬৭

[৭৩২]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১০৮৭, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড; ২য়, অধ্যায়: তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তার ফযীলত-৭৩৫, পৃ : ৩১২

ঘুমানোর জন্য ইসলাম যেভাবে কিছু উত্তম সময় নির্দেশ করে দেয় ঠিক সেভাবেই কিছু মাকরূহ সময়ের কথাও ইসলামে বলা হয়েছে। রসূল (সা.) সূর্যাস্তের ঠিক পরপর ঘুমানো অপছন্দ করতেন। ফজরের পর কখনোও ঘুমাতেন না।

রসূল (সা.) ফজরের সালাত আদায় করার পর স্বস্থানে বসে আল্লাহর যিকর করতেন, যতক্ষণ না পুরোপুরি সকাল হয়ে যেতো এবং এরপর তিনি দিনের অন্যান্য কাজ শুরু করতেন। কেননা রাতের বেলায় বিশ্রাম নিয়ে সকালে আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ভোরের সময়টাকে তিনি কখনও ঘুমের জন্য ব্যয় করতেন না। তবে দিনের মাঝামাঝি সময়ে স্বল্প সময়ের জন্য রসূল (সা.) ঘুমিয়ে নিতেন এবং মুসলিম সমাজও তাই যুগ যুগ ধরে এ ঘুমের চর্চা করে আসছে।

আল ফুদাইল ইবন ‘ইয়াদ রাহিমাল্লাহু বলেছেন, দুটি অভ্যাস হৃদয়কে শক্ত করে দেয়; অত্যধিক খাওয়া এবং অত্যধিক ঘুম।

ইবনে আল কাইয়্যিম (রহীমাল্লাহু) এর মতে,

‘পাঁচটি বিষয় হৃদয়কে কলুষিত করে দেয়। সেগুলি হল, মানুষের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা করা, অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আসক্ত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে পেট ভরে খাওয়া এবং ঘুমানো। এই পাঁচটি হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকৃতকারী।’

তিনি তাঁর ঘুমের উক্তিটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “পঞ্চম বিকৃতি হচ্ছে, খুব বেশি ঘুম। কারণ এটি হৃদয়কে মৃত করে দেয়, শরীরকে ভারাক্রান্ত করে দেয়, সময় নষ্ট করে এবং আলস্য ও ঔদাসীনতাকে প্রবনতাকে বাড়িয়ে দেয়। কিছু কিছু ঘুম একেবারেই মাকরূহ আবার কিছু কিছু ঘুম ক্ষতিকর হয়ে থাকে যা শরীরের কোন উপকারেই আসে না।”[৭৩৩]

একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও প্রশান্তির ঘুম আমাদের দেহকে পুনরায় সজীব করে তোলে এবং প্রফুল্লতার সাথে একটি নতুন দিনের আবির্ভাব ঘটায়। রাতের  আঁধার শেষে দিনের সূর্যকিরণ যেমন আমাদের দেহ মনে নতুন আলো এবং প্রাণের সঞ্চার করে ঠিক সেভাবেই সারাদিনের ক্লান্তি পরিশ্রান্তির আধার কাটিয়ে ঘুম আমাদেরকে এক প্রাণবন্ত নতুন দিন উপহার দেয়। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালনের জন্য প্রতিটি জিনিসের রেখাচিত্র কতটা শৃঙ্খলার সাথে এঁকে দিয়েছেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ: পবিত্রতা অর্জন

আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।”[৭৩৪]

---

[৭৩৩] *মাদরাজ আল-মালিকীন*, ১/৪৩৫

[৭৩৪] আল-কুরআন ২: ২২২

পবিত্র জীবনযাপন প্রত্যেক মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষার বিষয়ে ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। কাজেই বান্দাহর প্রতিটি চিন্তা চেতনা ও কর্মকাণ্ড হওয়া চাই পবিত্র ও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত এবং সেই সাথে বাহ্যিক অঙ্গ ও পরিধেয় বস্ত্র হবে অবশ্যই পাক পবিত্র। আমরা ভালভাবে খেয়াল করলেই দেখতে পাব যে, পবিত্রতার বিষয়টি ইসলামে শুধু শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ এর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি আরও বহুদূর বিস্তৃত। পবিত্রতার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রসূল (সা.) বলেছেন, "নামায বেহেশতের চাবি, আর নামাযের চাবি হল পবিত্রতা।"[৭৩৫] পবিত্রতার বিষয়টি ইসলামে ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে পরিগণিত। যেমনঃ রসূল (সা.) বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"[৭৩৬]

মন থেকে আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর কল্পনা দূর করে দেয়াই ঈমানের অর্ধাংশ। যতদিন (গাইরুল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তা থেকে অন্তর পবিত্র না হবে ততদিন কিছুতেই আল্লাহ স্মরণযোগ্য হবে না। তাছাড়া হিংসা, অহমিকা, রিয়া, লোভলালসা, শত্রুতা, আত্মগরীমা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিগুলো হৃদয় থেকে দূর করতঃ তদস্থলে বিনয়, নম্রতা, আন্তরিকতা, স্বল্পে তুষ্টি, হৃদ্যতা, অনুতাপ, ধৈর্য, পাপভীতি, রহমতের আশা, খোদাপ্রেম, প্রভৃতি সুপ্রবৃত্তিগুলি দ্বারা অন্তর অলংকৃত করার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন এবং পরনিন্দা, মিথ্যা, হারাম ভক্ষণ, পরের অনিষ্ট সাধন, পরস্ত্রী দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় গর্হিত কর্ম থেকে পঞ্চইন্দ্রিয়কে পবিত্র রাখাকেই মূলত ঈমানের অর্ধাংশ হিসেবে ধরা হয়।

কিন্তু ইবাদাত কবুল  হওয়ার জন্য বাহ্য অঙ্গ ও পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়াও বাঞ্ছনীয়। লক্ষণীয় যে, আজকের দিনে সিংহভাগ মুসলিমই বাহ্যিক পবিত্রতার দিকে গুরুত্ব দিলেও আত্মিক পবিত্রতার বিষয়টি আমলে নেয় না।

অভিধানে শব্দের অর্থ হল পবিত্রতা। শারীয়তের পরিভাষায়, طهارة [পবিত্রতা] দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. طهارة حكمي (যে সকল কারণে ওযু বা ফরয গোসলের প্রয়োজন হয়, সেগুলো থেকে পবিত্রতা অর্জন)। একে طهارة حكمي বা বিধানগত পবিত্রতা বলে।

২. طهارة حقيقي বা নাপাকী থেকে পবিত্রতা।

৩. طهارة حكمي  অর্জিত হয় ওযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে।

طهارة حقيقيঅর্জিত হয় বিশুদ্ধ পানি, পবিত্র মাটি, পাথর প্রভৃতি দ্বারা নাপাক দূর করার মাধমে।[৭৩৭]

সাধারণত যে পানিতে কোন নাপাকীয় মিশ্রণ থাকে না এবং তাতে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমনঃ নদী, ঝরনা, হাওড়, খাল-বিল, সমুদ্র ও বরফগলা পানি ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

---

[৭৩৫] আল্লামা খতিব তাবরেযী (র.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ:১ম, অধ্যায়: কিতাবুল তাহারাত, পৃ:২৫০, হাদীস নং-২৭৩

[৭৩৬] আল্লামা খতিব তাবরেযী (র.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ:২৩৮, হাদীস নং-২৬১

[৭৩৭] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ:) অনুক: অছিউর রহমান, *সহজ ফিকহুল আল মুয়াসসার*, আল-কাউছার প্রকাশনী, মিরপুর- ১২, ব্লক- ৩, ৩০ অক্টোবর, ২০০২ খ্রি., ১৪নং পৃ.

**পানির প্রকারভেদ ও তার হুকুমঃ**

যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয় না এই হিসেবে পানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

**প্রথম প্রকারঃ** যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্য জিনিসকে পবিত্র করতে সক্ষম। যা ব্যবহার করা মাকরূহ নয়।

**দ্বিতীয় প্রকারঃ** যে পানি নিজে পবিত্র, অন্যকে পবিত্র করতে পারে এবং যার ব্যবহার মাকরূহ। এটা ঐ পানি, যা থেকে বিড়াল, মুরগি, হিংস্র প্রাণী অথবা সাপ পান করেছে। এই পানি দ্বারা ওযু ও গোসল মাকরূহে তানযীহ, যখন সাধারণ পানি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সাধারণ পানি যখন বিদ্যমান থাকে না। তখন (পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে) তার ব্যবহার মাকরূহ নয়।

**তৃতীয় প্রকারঃ** যে পানি নিজে পবিত্র কিন্তু অন্য জিনিসকে পবিত্র করার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এটা ঐ পানি যা থেকে গাধা বা খচ্চর পান করেছে। এ পানি কোন সন্দেহ ছাড়াই নিজে পবিত্র। কিন্তু এর দ্বারা ওযু শুদ্ধ হবে কিনা, এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। এ পানি ছাড়া যদি সাধারণত পানি না পাওয়া যায়, তবে তা দ্বারা ওযু বৈধ। অবশ্য এ প্রকার পানি দ্বারা ওযু করলেও সাথে তায়াম্মুম করতে হবে।

**চতুর্থ প্রকারঃ** যে পানি নিজে পবিত্র কিন্তু অন্য কোন জিনিসকে পবিত্র করতে পারে না। এটা হল ব্যবহৃত পানি। ব্যবহৃত পানি হল যে পানি ওযু কিংবা গোসলে নাপাকী দূরীকরণার্থে অথবা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ ওযু থাকা সত্ত্বেও সওয়াবের আশায় (নতুন) ওযু করা। সুতরাং ওযুকারী শীতলতা লাভ কিংবা কাউকে শিক্ষা দেওয়া হয়, ওযু ব্যবহৃত পানি নয়। তবে মুহদিস (নামাযের জন্য যার ওযু বা গোসল করা জরুরী) পানি সংকটে এ জাতীয় পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়েজ।

**পঞ্চম প্রকারঃ** নাপাক পানিঃ এটা হল স্বল্প ও স্থির পানি যাতে নাপাক পড়েছে। তাই নাপাকের প্রভাব পানিতে প্রকাশ পাক বা না পাক। যখন নাপাকের প্রভাব পানিতে প্রকাশ পাবে তখন তা নাপাক হয়ে যাবে। পানি স্বল্প হোক বা বেশি। স্থির হোক বা প্রবহমান। যদি পানি বড় একটি হাউজের মধ্যে হয় যার একদিকে নাড়া দিলে অন্যদিক না নড়ে, তাই বেশি পানি হিসেবে ধর্তব্য।

বেশি পানির পরিমাণ এভাবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে, কোন হাউজের দৈর্ঘ্য দশ হাত এবং তার গভীরতা এতটুকু যে, তা থেকে হাত দ্বারা পানি তোলা হলে তলার মাটি উঠে আসেনা। আর স্বল্প পানি হল, যে পানি ঐ পরিমাণ অপেক্ষা কম।

নাপাক পানির হুকুম হল, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় না বরং অন্য কোন জিনিসের সাথে মিশ্রিত হলে তাও নাপাক হয়ে যায়।[৭৩৮]

পানির প্রকারভেদ নিয়ে এত বিস্তারিত হুকুমসহ নির্দেশনার পিছনেও গূঢ় চিন্তার উপাদান রয়েছে। ইসলাম মক্কার জাহেলী যুগে আগমন করেছিল। মক্কা ছিল প্রস্তরাকীর্ণ মরুভূমি যেখানে সাধারণ পানির সংকট ছিল কেননা জমজম কূপের সম্মানার্থে তার পানি অধিবাসীরা অপবিত্রতা দূরীকরণে ব্যবহার করত না।

বেশিরভাগ অধিবাসী পবিত্রতা অর্জনেও সচেতন ছিলেন। তাই ইসলামী শারীআতে পানি ও পবিত্রতা সম্পর্কিত মাসয়ালাগুলো বরাবরই খুবই গুরুত্বের সাথে সামনে এসেছে। এবং এরই প্রেক্ষিতে ইসলামকে মুসলমানদের জন্য সহজ করার লক্ষ্যে পানির প্রকারভেদসহ বিস্তারিত হুকুম ও নির্দেশনা এসেছে। যাতে কোন পরিস্থিতিতেই পবিত্রতা অর্জন কঠিন না হয়।

**বিভিন্ন ধরণের পানির বিধানঃ**

যদি পানির সাথে সাবান, আটা, জাফরান, গোলাপজল, চন্দন, মুলতানি মাটি, দুধ, ফলফলাদি গাছের পাতা মিশ্রিত হয় তবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্ভব, যদি এসব বস্তুর প্রাধান্য পানিতে না থাকে। অর্থাৎ, বস্তুর উপস্থিতি যেন পানির তিনটি গুণের (বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ) একটি গুণকে নষ্ট করে না দেয়।

উচ্ছিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রে সকল মানুষের উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র (যদি মুখে নাপাকি না থাকে)। অনুরূপভাবে গোশত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর উচ্ছিষ্টও পবিত্র। হিংস্র প্রাণী, ইঁদুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র কিন্তু তা দ্বারা ওযু মাকরূহ। অর্থাৎ সাধারণ পানি পাওয়া গেলে তা দ্বারা ওযু করা যাবে না। গাধা, খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহাতীতভাবে পবিত্র কিন্তু এর দ্বারা ওযু করে তায়াম্মুমও করতে হবে। শুকর, কুকুর ও অন্যান্য হিংস্র পানির উচ্ছিষ্ট নাপাক।

কূপের পানির ক্ষেত্রে (এক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বাসাবাড়ির হাউজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে) যদি কূপে এক ফোটা মদ, রক্ত বা শুকর (জীবিত বা মৃত) পতিত হয় তবে কূপের সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যায়। তাই সমস্ত পানি সেচে ফেলতে হবে। মানুষ পড়ে গিয়ে জীবিত উঠে আসলে পানি নাপাক হবে না। গাধা, খচ্চর বাজ, চিল এসবের ক্ষেত্রে গায়ে যদি নাপাকী না থাকে তবে পানি পবিত্র থাকবে।

যে সকল প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত নয় এবং পানিতে জন্ম নেওয়া কোন প্রাণী যদি কূপের মধ্যে মারা যায় তবুও পানি নাপাক হবে না। মানুষ, কুকুর বা গরু-ছাগল জাতীয় প্রাণী কূপে পড়ে মারা গেলে সমস্ত পানি সেচে ফেলতে হবে। সকল প্রাণীর মাসয়ালার ক্ষেত্রে যদি কূপ প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত পানি সেচে ফেলা সম্ভব না হয় তবে দুইশত বালতি পানি সেচলেই হবে। বিড়াল বা মুরগির ন্যায় প্রাণী পড়ে মারা গেলে চল্লিশ বালতি এবং চড়ুই বা ইঁদুরের ন্যায় প্রাণী পড়ে মারা গেলে বিশ বালতি পানি সেচে ফেললেই হবে।

[৭৩৮] সাইয়্যেদ আবুল হাসান নাদভী, *সহজ আল ফিকহুল আল মুয়াসসার*, পৃ.: ১৮, প্রাগুক্ত

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত হওয়ায় বান্দাহর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যসচেতন বিধান জারি করে তা পালন আবশ্যকীয় করেছেন। যেমন, মলমূত্র ত্যাগের ন্যায় প্রাকৃতিক বিষয়টিতেও ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলি বেধে দিয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের পিতৃতুল্য। তোমাদেরকে আমি দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাদের কেউ শৌচাগারে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসবে না। আর কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও বসবে না এবং ডান হাতে শৌচ করবে না।' তিনি ঢিলা ব্যবহারে নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করতেন।[৭৩৯]

**শৌচালয়ের আদবঃ**

লোকচক্ষুর আড়ালে, নরম ও নিম্নভূমি নির্বাচন করা (এখন টয়লেট আছে আগে ছিল না তাই এই বিধান)

শৌচালয়ে প্রবেশের পূর্বে বলা হয়,

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে পানাহ চাচ্ছি।[৭৪০]

বাহির হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়েও দু'আ পড়তে হবে।

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের জন্য কষ্টদায়ক পদার্থ বের করে ফেললেন এবং যা হিতকর তা দেহে রেখে দিলেন।

শৌচালয় ব্যবহারে কিছু বিষয় মেনে চলা আবশ্যক যেমন, পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা, মাথা ঢেকে রাখা, কোন জলাশয় বা গর্তে, রাস্তার ছায়ায় ও ফলবৃক্ষের নিচে পেশাব নিষিদ্ধ।

কোন গুরুতর ওজর ছাড়া কথা বলা যাবে না, একই সাথে দুইব্যক্তি ঢোকা নিষেধ।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, দুব্যক্তি একই সঙ্গে পেশাব পায়খানার জন্য বের হবে না এবং আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলবে না কারণ এরূপ কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।[৭৪১]

ওজর ছাড়া দাড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ এবং এ অবস্থায় সালাম দেওয়া-নেওয়া বর্জনীয়।

হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) পেশাব করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তি তাকে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন না। আবু দাঊদ (রহ.) বলেন, ইবনু উমার ও অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত, নবী (সা.) তায়াম্মুম করলেন। অতঃপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।[৭৪২]

---

[৭৩৯] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ-আস-আস সিজিস্তানী (রহঃ), *সুনানে আবু দাঊদ*, ই.ফা.বা. খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ ওযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ শৌচাগারে কী বলতে হয়-১০৪, পৃষ্ঠাঃ ৯৯,

[৭৪০] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৪৪, সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

[৭৪১] ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), *সুনানে আবু দাঊদ*- ১৫, ই.ফা.বা. পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদ: ৭

[৭৪২] ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), *সুনানে আবু দাঊদ*, ই.ফা.বা.- ১৬, অধ্যায়: পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদ: ৪, হাদীস নং: ০৮

**ইস্তিঞ্জার নিয়মাবলি:**

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুবায় কিছু লোক রয়েছে যারা ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ ভালভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।'[৭৪৩]

ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করা বলতে পেশাব পায়খানা থেকে দৃঢ়ভাবে পবিত্রতা অর্জন করাকে বোঝায়।

পেশাব পায়খানার পর ভালভাবে পরিচ্ছন্ন হওয়া সুস্থ, পবিত্র জীবন এবং ইবাদাত করা ও তা কবুল হওয়ার জন্য খুবই জরুরী। শৌচকার্য সম্পন্ন করাকে ইস্তেঞ্জা বলে। তবে ইস্তেঞ্জার পূর্বে পেশাব পায়খানার স্থান ভালভাবে পরিষ্কার করা জরুরি। যেমন: নাপাকী যদি পেশাব পায়খানার রাস্তার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তবে তিনটি ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করার পরও তা পানি দ্বারা ধৌত করা ফরয। ঢিলা কুলুখের ব্যবস্থাটির তাৎপর্য এই, মক্কায় পানির সংকট ছিল এবং পূর্বে বর্তমানের মতো সাবান সোডা ছিল না। ব্যাপক হারে তাই পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার বিষয়টি চিন্তা করেই ঢিলা কুলুখ দ্বারা ইস্তেঞ্জার বিধান চালু হয়েছিল। আর যদি নাপাকী পেশাব পায়খানার রাস্তার বাইরে না যায় তবে ঢিলা কুলুখে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে। ঢিলা কুলুখের ব্যবহার ও সংখ্যা হাদীসেও এসেছে। যেমন:

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাক্কী... আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাকে অনুসরণ করলাম এবং তিনি এদিক ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম, তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও আমি তা দিয়ে ইস্তেঞ্জা করব (বর্ণনাকারী বলেন) বা এ ধরণের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য হাড় বা গোবর আনবে না। তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।'[৭৪৪]

আবদান (রা.) আবু ইদরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরাইরা (রা.) কে বলতে শুনেছেন, নবী (সা.) বলেন, যে ওযু করে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।"[৭৪৫]

ইস্তিঞ্জার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো প্রথমে তিনটি বিজোড় সংখ্যক মাটির ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। মাটির ঢিলা জীবাণু নষ্ট করে এবং সাবানের পরিবর্তে তা ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে টিস্যু ঢিলার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর প্রথমে হাত ধৌত করে তারপর পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে হবে। ইস্তিঞ্জা পানিতেও সীমাবদ্ধ রাখা যায়েজ।

---

[৭৪৩] আল-কুরআন ৯: ১০৮

[৭৪৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৫৭, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ ওযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ পাথর দিয়ে ইসতিন্জা-১১৫, পৃষ্ঠাঃ ১০৪, প্রাগুক্ত

[৭৪৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৬২, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ ওযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ ওযুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা-১২০, পৃষ্ঠাঃ ১০৭, প্রাগুক্ত

যেমন: আবূ কুরায়ব (র.)... আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, কুফাবাসীর সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। "তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন।"[৭৪৬]

আবূ কুরায়ব (র.)... আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, এসব লোক পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত। তাই তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।"[৭৪৭]

পেশাব-পায়খানা থেকে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা ইবাদাতে বিভ্রাট এবং কবরের আযাবের কারণ।

ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সা.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন, এ দুজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বড় গুনাহের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর (অপর কবরের দিকে ইশারা করে) বললেন, এ ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে সেটি দু'টুকরো করে একটি এ কবরে ও অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন এবং বললেন আশা করা যায়, ডাল দুটি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে।"[৭৪৮]

মুসনাদে ইমাম আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত, "একদা রসূল (সা.) তাদের (সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিয়ে ফযরের সালাত আদায় করেন। তিনি তাতে সূরা আর-রুম তেলাওয়াত করতে গিয়ে আমাকে জট লাগিয়ে দেন (বিভ্রাট বা বিভ্রম ঘটে)। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আমাদের সাথে সালাত আদায় করে, যারা উত্তমরূপে ওযু করে না (আর এ কারণে আমার এমনটি হয়ে থাকে)। অতএব যারা আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে আসবে তারা যেন সঠিক ও সুন্দরভাবে ওযু সম্পন্ন করে।"[৭৪৯]

নাজাসাত তথা অপবিত্রতা ২ ধরণের।

১. নাজাসাতে হুকমিয়া বা বিধানগত নাপাকী। আর তা হলো বায়ু নির্গত হওয়া বা গোসল ওয়াজিব হওয়া। যেসব নাপাকীর কারণে গোসল ওয়াজিব হয় তাকে বড় নাপাকী বলে। এ অবস্থায় নামাজ জায়েজ নয়, তিলাওয়াত জায়েজ নয়। আর বায়ু নির্গত হওয়া ছোট নাপাকী। এ অবস্থায় ওযু ওয়াজিব হয়। পবিত্রতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত নামায যায়েজ না। তবে এ অবস্থায় না ছুঁয়ে কোরআনের তিলাওয়াত করা যায়।
২. নাজাসাতে হাকিকাত বা প্রকৃত নাপাকী। যেমন: মলমূত্র, যা থেকে আত্মরক্ষা ও পবিত্রতা অর্জন করা ফরয। নাজাসাতে হাকিকাত ২ প্রকার।

---

[৭৪৬] ইমাম তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, খ:৫ম, অধ্যায়: কুরআন তাফসীর, অনু: সূরা তওবা, প্রাগুক্ত, পৃ:৪০০, হাদীস নং-৩১০০
[৭৪৭] ইবনে মাজাহ (র.), *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, খ:১ম, অধ্যায়: পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনু: ইস্তিঞ্জার করা, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬৭, হাদীস নং-৩৫৭
[৭৪৮] আবু দাউদ (রহ:), *সুনানে আবু দাউদ*- ২০ অধ্যায়- পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদ-১১ , ই.ফা.বা.
[৭৪৯] আল্লামা খতিব তাবরেযী (র.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ:২৫১, হাদীস নং-২৭৪

ক) নাজাসাতে গালিজা বা মারাত্মক নাপাকী। যা নিঃসন্দেহে নাপাক। যেমন: প্রবহমান রক্ত, মদ, মৃত প্রাণীর গোশত ও চামড়া, পেশাব, কুকুরের মল ও লালা, কবুতর, হাঁসের বিষ্ঠা, যেসকল জিনিস মানুষের শরীর থেকে বের হওয়ার কারণে ওযু ভঙ্গ হয় এসবের পরিমাণের ব্যাপারে এক দিরহামের বেশি হলে তা ধৌত করা বা পবিত্র করা ফরয। এটা নিয়ে নামায পড়া যায়েজ নয়।

খ) নাজাসাতে খফিফা বা হালকা নাপাকী অর্থাৎ যেসব জিনিসের নাপাক হওয়ার বিষয়টি সুদৃঢ় নয় এমন দলিল প্রমাণের উপস্থিতির কারণে যা তার পবিত্র হওয়া প্রকাশ করে। যথা: ঘোড়ার পেশাব ভক্ষণ করা যায় এমন প্রাণীর পেশাব এবং ভক্ষণ করা হয় না এমন পাখির বিষ্ঠা। এই নাপাকী অল্প পরিমাণ হলে মাফ বেশি পরিমাণ হলো কাপড় ও শরীরের এক চতুর্থাংশ। আর নাপাকীয় চিহ্ন দেখা না গেলে নাপাকী ধরা হবে না।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তোমাদের কারও ওযু নষ্ট হলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না।"[৭৫০]

আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী ওযুর ফরয ৪টি।

পূর্ণ চেহারা একবার ধৌত করা, কপাল থেকে থুতনি এবং ডান কান থেকে বাম কান অবধি দুই হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা, মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ করা, দু'পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

মুহাদীস যদি সকল অঙ্গ ধৌত করার জন্য পর্যাপ্ত পানি ব্যবহারে অক্ষম হয় তবে তার উপর ওযু ওয়াজিব নয়। দাড়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে, নখে যদি এমন জিনিস যেমন, মোম, আঠা বা নেলপালিশ থাকে তবে তা দূর করে তার তলদেশ পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব। আংটি, দুল, নথ এসব অলংকার ওযুর সময় নেড়েচেড়ে চামড়ায় পানি পৌছানো অপরিহার্য। আবদুল খায়ের বর্ণনা করেছেন, আলী (রা.) সালাত আদায়ের পর আমাদের নিকট এসে পানি চাইলেন। আমরা বললাম সালাত আদায় শেষে পানি দিয়ে কী করবেন? মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে (ওযু) শিক্ষা দেওয়া। কাজেই একপাত্র পানি ও একটি তশতরী আনা হল। তিনি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন, ও নাকে পানি দিলেন। তিনি এক অঞ্জলী পানি দিয়ে কুলি করলেন। ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার মুখ-মণ্ডল ধুলেন এবং তিনবার ডানহাত এবং তিনবার বাম হাত ধুলেন। তারপরে পাত্রে হাত ডুবিয়ে একবার মাথা মাসেহ করলেন। তারপর তিনবার করে ডান ও বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন যে ব্যক্তি রসূল (সা.) এর নিয়ম জানতে আগ্রহী (সে জেনে রাখুক)।"[৭৫১]

সুতরাং ওযুর সুন্নাহসমূহ এরূপ-

নিয়ত করা, ওযুর দোয়া পড়া।

[৭৫০] আল-কুরআন ৫: ৬

[৭৫১] আবু দাউদ (রহ:), *সুনানে আবু দাউদ*- ১১১, পবিত্রতা অর্জন, অনু- ৫০   ই.ফা.বা.

মিসওয়াক করা, এ ব্যাপারে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন এবং ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।"[৭৫২]

ওযুর সুন্নত নিম্নরুপ

দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোওয়া, গড়গড়াসহ তিনবার কুলি করা, তিনবার নাকে পানি দেওয়া, পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা, ঘাড় মাসেহ করা, আঙুলসমূহ খিলাল করা, দু'পা তিনবার টাখনুসহ ধোয়া।

ওযু ভঙ্গের কারণ-

পেশাব, পায়খানা বা বায়ু নির্গত হলে, শরীর থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়লে, মুখভর্তি বমি হলে, মুখ থেকে থুথুর সমান বা বেশি রক্ত বের হলে, ঘুমিয়ে গেলে, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি রুকু সিজদাহ বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি দেয়, তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু অট্টহাসি দিলে ওযু ভঙ্গ হবে না।

ইহকালে নামায কবুল হওয়া ছাড়াও পূর্ণাঙ্গভাবে ওযুকারীর জন্য আখিরাতে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। যেমনঃ বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্য এরূপ-

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রসূল (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, "আমার উম্মাতকে কিয়ামতের দিন, গুররাম মুহাজ্জালীন বা উজ্জ্বল কপাল ও শুভ্র অংশের (কপাল চাঁদা) অধিকারী বলে আহ্বান করা হবে। ওযু করার সময় যেসব অংশ ধোয়া হয় সেখান থেকেই এর নিদর্শন ফুটে বের হবে। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি নিজের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার ক্ষমতা রাখে তার তা করা সমীচীন অর্থাৎ যথারীতি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ ওযু করা।[৭৫৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, আমার হাবীব রসূল (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি মু'মিনের সৌন্দর্য সে পর্যন্ত পৌঁছাবে যে পর্যন্ত তার ওযুর পানি পৌঁছাবে।"[৭৫৪]

মুহাম্মদ ইবন্ মা'মার রিবই আল কায়সী (র.)... হযরত উসমান ইবন্ আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ওযু করে এবং অধিক উত্তম ও সুন্দর করে ওযু করে তার দেহ থেকে সব পাপ বের হয়ে যাবে। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়।"[৭৫৫]

সুওয়ায়দ ইবন্ সাঈদ এবং আবুত তাহির (র.)... হযরত আবু হুরাইরা (রা.) রসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, যখন মুসলিম বা মু'মিন ওযু করে এবং তার মুখ-মণ্ডল ধুয়ে ফেলে পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার চেহারা থেকে সব পাপ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে সে তার আঁখি যুগলের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করেছিল। এরপর

---

[৭৫২] আবু দাঊদ (রহঃ), *সুনানে আবু দাঊদ*- ৫৭ অনুচ্ছেদ- ৩০, অধ্যায়- পবিত্রতা অর্জন, ই.ফা.বা.

[৭৫৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-১৩৮, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ ওযু অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ ওযুর ফযীলত এবং ওযুর প্রভাবে যাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ উজ্জ্বল হবে-৯৮, পৃষ্ঠাঃ ৯৬, প্রাগুক্ত

[৭৫৪] আল্লামা খতিব তাবরেযী (র.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ:২৫০, হাদীস নং-২৭০

[৭৫৫] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, ই.ফা.বা. মে ২০০৭, আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর ঢাকা ১২০৭, খ:২য়, অধ্যায়: তাহারাত, অনু: উযুর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া, পৃ:৪৭, হাদীস নং-৪৬৯

যখন সে তার হাত দুটি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার হাত দুটি থেকে সব পাপ বের হয়ে যায় যা তার হাত দুটি করেছিল।[৭৫৬]

এরপর যখন সে তার পা দুটি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে পাপ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার পা দুটি এগিয়ে গিয়েছিল এমনকি সে পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়।"[৭৫৭]

মু'মিন যখন হাদাসে কবিরা (বড় নাপাকী) তথা বীর্যপাত বা সহবাসের কারণে হায়েজ, নিফাসের কারণে গোসল ফরয হয়। আর জীবিতদের উপর মৃতের গোসল করানো ফরজ।

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ফাতিমাহু বিন্‌তু আবু হুবাইশ (রা.), রসূল (সা.) এর নিকট এসে বলেন, আমি একজন রক্তপ্রদর রোগী, কখনো পবিত্র হইনা। আমি কি সালাত ত্যাগ করব? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ওটা একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েজ নয়। যখন হায়েজ হবে তখন সালাত ছেড়ে দিবে। হায়েযের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে আবার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) সালাত আদায় করবে।"[৭৫৮]

উম্মু সালমা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল (সা.) এর যুগে নিফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলের দাগ দূর করার জন্য তাতে ওয়ার্স (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম।"[৭৫৯]

**গোসলের ফরযঃ**

কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা।

আবদুল্লাহ ইবন্ ইউসুফ (রহ.). . . 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) যখন জান বাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দুটো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের ওযুর মত ওযু করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি পৌঁছিয়ে দিতেন"[৭৬০]

আর গোসলের সুন্নত, বিসমিল্লাহ বলা, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছে এই নিয়ত করা, ওযুর ন্যায় দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া, শরীরের নাপাকী ধোয়া, ওযু করা, সমস্ত শরীরের তিনবার পানি ঢালা। প্রথমে মাথায় তারপর ডান কাঁধে, তারপর বাম কাঁধে, শরীর ধোয়া।

---

[৭৫৬] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৬, হাদীস নং-৪৬৮

[৭৫৭] ইমাম মুসলিম (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, পৃ:৪৬, হাদীস নং-৪৬৮

[৭৫৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৩১৯, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ হায়য অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ একই মাসে তিন হায়য হলে সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য-২২৬, পৃষ্ঠাঃ ১৮০, প্রাগুক্ত

[৭৫৯] প্রাগুক্ত- ৩১১, অনু: ১২২ (হাসান সহীহ)

[৭৬০] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-২৪৬, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ গোসল অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ গোসলের পূর্বে ওযু করা-১৭৪, পৃষ্ঠাঃ ১৪৬, প্রাগুক্ত

মূসা ইবন্ ইসমা'ঈল (রহ.).... মায়মূনা বিনত হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার হাত ধুলেন। সুলায়মান (রা.) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কি না তা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে গিয়ে তাঁর দু'পা ধুলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।"[৭৬১]

তায়াম্মুমের রুকণ দুটি-

সম্পূর্ণ মুখ মাসেহ করা এবং দু'হাত কনুইসহ মাসেহ করা। আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, তোমার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, জমিতে হাত মেরে তা দ্বারা মুখ-মণ্ডল এবং উভয়হাত মাসেহ করবে। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।"[৭৬২]

মাটি, ঢেলা, ইট, সুরকির দেয়াল ইত্যাদির দ্বারা তায়াম্মুম যায়েজ।

ইবন উমার (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল (সা.) পায়খানা থেকে ফেরার পথে নাসক কূপের নিকট এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। লোকটি তাকে সালাম দিল। কিন্তু রসূল (সা.) জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়াল পর্যন্ত এসে দেয়ালে হাত রাখলেন। অতঃপর মুখ-মণ্ডল ও ডান হাত মাসাহ করে লোকটির সালামের জবাব দিলেন।"[৭৬৩]

কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে এভাবে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেওনা) ফরয গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রসাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্ত সম্ভব না হয়, তবে পাক পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল।"[৭৬৪]

সুতরাং তায়াম্মুম এর ওজর হলো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পবিত্র পানি না থাকা, পবিত্র পানি যদি তায়াম্মুমকারীর চেয়ে ১ মাইল দূরে থাকে, রোগাক্রান্ত হলে, পানি ব্যবহারে মৃত্যুর দৃঢ় আশঙ্কা থাকলে, ঈদের বা জানাযার নামায

[৭৬১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-২৬৩, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ গোসল অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা-১৮৩, পৃষ্ঠাঃ ১৫১, প্রাগুক্ত

[৭৬২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*-৩৩৪, খণ্ডঃ ১ম, অধ্যায়ঃ তায়াম্মুম অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ মুখমণ্ডলে এবং হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা-২৩৭, পৃষ্ঠাঃ ১৮৯, প্রাগুক্ত

[৭৬৩] *সুনানে আবু দাঊদ*- ৩৩১, অনু- ১২৫ (পবিত্রতা অর্জন, ই.ফা.বা.)

[৭৬৪] আল-কুরআন ৪: ৪৩

ছুটে যাবে এরূপ প্রবল ধারণা হলে, কূপের পানি তোলার উপকরণ না থাকলে এবং পানির স্থানে যদি শত্রুর হামলা বা হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকে।

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইসলামে পোশাক ও সাজসজ্জা**

পোশাক মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশের অন্যতম নিদর্শন। যা মানবদেহকে কেবল আবৃতই করে না বরং এতে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি ও রুচিশীল অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলামী শরী'য়াহহ নির্দেশিত পোশাক মানুষকে সুসজ্জিত করার সাথে সাথে আরো আকর্ষণীয় ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলে। এই জাতীয় পোশাক পরিধানের মাধ্যমে অশ্লীলতা ভুলে বান্দাহ নিজেকে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত রেখে তার নৈকট্য লাভে ধন্য হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে- "হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত্ত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।"[৭৬৫] প্রাচীন বিশ্বকে পেছনে ফেলে কালিক পরিক্রমায় আমরা যে নতুন বিশ্বে উপনীত হয়েছি তাতে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে সভ্য পোশাকের কদর যেমন বাড়ছে, অনুরূপভাবে পোশাক পরিচ্ছদেও দিনদিন অনেকেই পাশ্চত্য দর্শনে ঝুঁকে পড়ছে। অথচ ইসলামী পোশাকই কেবল ব্যক্তির নান্দনিকতা ও আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে, যা তাকে আরো বেশি নৈতিক ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

**পোশাক নির্বাচন:**

চাল-চলনে সৌন্দর্যবোধ ও স্মার্টনেস ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ নয়। অবশ্য অন্তরকে অহংকার মুক্ত রেখে আল্লাহর নিয়ামাতের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সক্ষমতা অনুযায়ী ভালো পোশাক পরিধান ইসলাম সমর্থন করে। হযরত মু'আস ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা হিসেবে উন্নতমানের পোশাক পরিধান পরিহার করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সকল সৃষ্টির সামনে তাকে আহ্বান করবেন। অবশেষে তাকে ঈমানের পোশাক থেকে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পোশাক পরিধান করার ইচ্ছা, তা পরিধান করার স্বাধীনতা প্রদান করা হবে।[৭৬৬] নারী পুরুষের নির্ধারিত পোশাক স্বচ্ছ কাপড়ের হবেনা, যাতে বাহির থেকে ভিতর দৃশ্যমান হয়। আবার তা এতটা আটসাটও হওয়া চলবে না যাতে শরীরের গড়ন বুঝা যায়। অন্যদিকে পোশাক অতি চাকচিক্যময় হবেনা যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে থাকে। "হযরত আলকামা ইবনে আবু আরকামা তার মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একখানা খুব

---

[৭৬৫] আল-কুরআন ৭: ২৬

[৭৬৬] আবু যাকারিয়া ইয়াহহিয়া বিন শারফ আন নববী (রহ), *রিয়াদুস সালেহীন* ৮০৩, আনু. ফজলুর রহমান, মীনা বুক হাউজ, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, জানুয়ারী ২০১৫ (ঈসায়ী); ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৯, (সহীহ আত-তিরমিযী, তাহক্বীক আলবানী-২০১৭, ২৪৮১) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়িশা (রা.)্র কাছে গেলেন, হযরত আয়িশা (রা.) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।"[৭৬৭] পেশাগত প্রয়োজনে ইউনিফর্ম নিষিদ্ধ নয়। যেমন: পুলিশ ও সৈনিক ইত্যাদি নির্ধারিত পোশাক। নিজেকে আলেম হিসেবে জাহির করতে বিশেষ ধরণের পোশাক পরিধান ইসলাম সমর্থিত নয়। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন।"[৭৬৮] পোশাক নতুন হওয়া জরুরি নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হয়। কাপড় সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ময়লা পোশাক পরিহার বাঞ্ছনীয়। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদিন রসূল (সা.) আমাদের কাছে বেড়াতে এলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুলগুলো ছিল এলো-মেলো এবং বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি কি এমন কোন জিনিসই পায়নি যা দিয়ে সে মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনে ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি কি এমন কিছু পায়নি, যা দিয়ে সে নিজেরে কাপড় ধুয়ে নিতে পারে।"[৭৬৯] ইসলাম রঙের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম বেধে দেয়নি। তবে সাদা পোশাকের প্রতি তাগিদ দিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেছেন: "তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করবে। কারণ এটাই তোমাদের উত্তম পোশাক। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদের কাফন দেবে।"[৭৭০] কাপড় পরিধান শুরু করতে হবে ডান দিক থেকে এবং খুলতে হবে বাম দিক থেকে। সহজে পরা ও খুলে রাখা যায় এমন পোশাক উত্তম। দেহ ও মনকে সুস্থ ও নির্মল রাখতে আবহাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী আরামদায়ক পোশাক নির্বাচন করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। তারপর পোশাক ঝুলিয়ে বা ভাজ করে রাখতে হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "রসূল (সা.) যখনই জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন।"[৭৭১] মুসলমানরা যখন নতুন পোশাক কিনবে, তখন এই পোশাক কেনার তাওফিক দেয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। পরিধানের সময়ও দু'আ পড়তে হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: "রসূল (সা.) যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করেছেন, তখন এর নাম নিয়েছেন। যেমন: পাগড়ী, জামা বা চাদর। এরপর বলেছেন: "হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছেন।আমি আপনার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রত্যাশী এবং সে কল্যাণেরও প্রত্যাশী যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কাপড়ের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এবং সে

---

[৭৬৭] আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযি (রহ); *মিশকাত শরীফ*-৪০৬২, মীনা বুক হাউজ ৩৬/৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, এপ্রিল ২০১০ (ঈসায়ী), খণ্ড-৮ম, পৃ: ৬৪৮

[৭৬৮] আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযি (রহ); *মিশকাত শরীফ*-৪০৩৪, পৃ. ৬১৪, প্রাগুক্ত। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ)

[৭৬৯] আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযি (রহ), *মিশকাত শরীফ*-৪০৩৮, পৃ. ৬৪৫, (আহমদ নাসাঈ) প্রাগুক্ত

[৭৭০] আন নববী (রহ), *রিয়াদুস সালেহীন*-৭৮০, পৃ. ৪০০, (তাহক্বীক্ব আলবানী-৩৬২, ৩৮৭৮, তিরমিযী-৯৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ, প্রাগুক্ত

[৭৭১] আব্দুল্লাহ খতীব তাবরেযি (রহ), *মিশকাত শরীফ*-৪০১৯, পৃ. ৬৪৩, প্রাগুক্ত

অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় কামনা করছি, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।"[৭৭২] কঠিন সামাজিক ব্যাধিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিম মহিলাদের মধ্যে অমুসলিম কাফির মহিলাদের অনুকরণ প্রবণতা। অনেক মুসলিম মহিলা অমুসলিমদের মত সংক্ষিপ্ত ও পাতলা পোশাক পরিধান করেন এবং তাদের মত ফ্যাশন ও সৌন্দর্য প্রদর্শনে লিপ্ত হন। অথচ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'[৭৭৩] একারণে মুসলিম মহিলাদের জন্য অমুসলিম মহিলাদের মত পোশাক বা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হারাম। অনুরূপভাবে মুসলিম নামধারী হয়েও যে সকল মহিলা আল্লাহর বিধান অমান্য করেন তাদের অনুকরণও হারাম। ছোট মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ তাদেরকে ছোট থেকে অমুসলিমদের বা ইসলাম অমান্যকারীদের অনুসরণ করতে ও তাদের মত পোশাক পরতে অভ্যস্ত করলে তারা বড় হয়ে এর বিপরীত অন্য সব পোশাক ঘৃণা করবে। ফলে সুদূর প্রসারী সামাজিক অবক্ষয় ও সমস্যা সৃষ্টি হবে।

পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য হারাম। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রা.), ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সা.) ঐ সব পুরুষকে লানত করেছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐ সব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।"[৭৭৪] অপর হাদীসে রসূল (সা.) বলেন, মু'আয ইবন ফাযালা (রা.), ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সা.) পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন।"[৭৭৫] পুরুষদের জন্য রেশমি, বুটিদার রেশমি, কারুকার্যখচিত রেশমি অথবা চার আঙ্গুলের বেশি রেশমি পাড়ের কাপড় নিষিদ্ধ। তবে স্বাস্থ্যগত বা চিকিৎসাগত কারণে রেশমের কাপড় পড়ার অনুমতি রয়েছে। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা রেশমি পোশাক পরিধান করো না। কারণ দুনিয়াতে যে ব্যক্তি তা পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।"[৭৭৬] "অপর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কে তাদের শরীরে চুলকানী থাকার কারণে রেশমি পোশাক পরিধান অনুমতি দিয়েছেন।"[৭৭৭] পুরুষের সতর হলো নাভি হতে হাটু পর্যন্ত। পুরুষের লুঙ্গি বা পায়জামার পরিধি টাখনুর উপরে রাখতে হবে, তবে পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। এর নিচে কোন প্রকারেই নামানো যাবে না । আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) বলেছেন : আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকার বশে ইযার ঝুলিয়ে পরে।"[৭৭৮]

---

[৭৭২] আন-নববী (রহ), *রিয়াদুস সালেহীন*-৮১৪, প্রাগুক্ত। সহীহ আবু দাউদ : (তাহক্বীক আলবানী-৩৩৯৩, ৪০২০, তিরমিযী-১৭৬৯), পৃ : ৪১২

[৭৭৩] খতীব মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রহ), *বুখারী শরীফ*-৪০৩৫, পৃ : ৬৪৪ (আহমদ ও আবু দাউদ) প্রাগুক্ত

[৭৭৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৪৬৫, পঞ্চম সংস্করণ : জুন ২০০৬, ই.ফা.বা, খণ্ড: নবম, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ : পুরুষদের নারীর বেশ ধারণ করা ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা, ২৩৯০, পৃ. ৩৫৭

৭৭৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৪৬৫, পঞ্চম সংস্করণ : জুন ২০০৬, ই.ফা.বা.[৭৭৫] খণ্ড: নবম, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ : পুরুষদের নারীর বেশ ধারণ করা ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা, ২৩৯০, পৃ. ৩৫৭

[৭৭৬]. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শলীফ*-৫৪১৬, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড, নবম, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ : পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা, রেশমী চাদর বিছানো বৈধ-২৩৫৪, পৃ. ৩৩৪

[৭৭৭] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৪২১, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড : নবম, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ : চর্মরোগের কারণে পুরুষের জন্য রেশমী কাপড়ের অনুমতি-২৩৫৮, পৃ : ৩৩৬

[৭৭৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৩৭২, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড : নবম, পরিচ্ছেদ : টাখনুর নীচে যা থাকবে তা জাহান্নামে যাবে, খন্ড-২৩৩৩, পৃ.: ৩১৩

মহিলাদের সতর হল দুই হাতের কবজি, মুখ-মণ্ডল ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত। তবে এই ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তাও ঢেকে রাখতে হবে।

**নারীর মর্যাদাই পোশাক:**

মহান রব্বুল আ'লামিনের সমগ্র সৃষ্টির মাঝে নারী অতি মোহনীয় ও সুন্দরতম সৃষ্টি। নারীর এই সৌন্দর্যকে যেন তারা অবলীলায় অপাত্রে বিলিয়ে না দেয় সে ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে বারবারই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে সেটি সংরক্ষণের বিষয়ে তাদেরকে জোর তাগিদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইসলামি পর্দা প্রথা অনুযায়ী নারীর দেহ আবৃত রাখবে। "পর্দা প্রথা প্রগতির অন্তরায় হতে পারে না। বরং এটি মানুষকে পশুত্ব থেকে রক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।"[৭৭৯] তাকওয়ার পোশাক পরিধানে ইসলাম যে সীমারেখা বেঁধে দিয়েছে তা অবশ্য পালনীয়। এতে একদিকে যেমন নারীর মর্যাদা ও সৌন্দর্যের হিফাযত হয় অপরদিকে এটি তাকে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল হতে শেখায়, ফলে তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় বিরাট প্রতিদান। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী; যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৮০] এক শ্রেণীর লোক নারীর চেহারাকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত মনে করেনা। অথচ এই মুখ-মণ্ডলই পর্দার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৫৯নং আয়াতে বলেছেন- "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৭৮১] এই মর্মে ইমাম সূয়ূতী (রহ.) বলেন, "এটি সকল নারীর জন্য হিজাবের আয়াত। এতে মাথা ও চেহারা ঢাকা ওয়াজিব করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের স্ত্রীদের আদেশ করেছেন, তারা যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় উপর দিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে রাখে। এবং শুধু এক চোখ খোলা রাখে।"[৭৮২] আবার প্রখ্যাত ফকীহ তাবেয়ী উবাদা আসলামী (রহ.) দেখিয়েছেন, কিভাবে নারীগণ এই আয়াতের উপর আমল

[৭৭৯] হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী চিশতী (রহ:), *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার গুকুম ও নারীর মর্যাদা*, সংশোধিত, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১০ইং, সোলেমানিয়া বুক হাউস- ঢাকা

[৭৮০] আল-কুরআন ২৪: ৩১

[৭৮১] আল-কুরআন ৩৩: ৫৯

[৭৮২] *তাফসীর ইবন কাসীর*:৩/৮২৪

করেন। তিনি তার চাদর দিয়ে এমনভাবে মুখ-মণ্ডল আবৃত করলেন যে, নাক ও বাম চোখ আবৃত হয়ে গেল। শুধু ডান চোখ খোলা থাকল। তদ্রুপ মাথার উপর থেকে কপাল ও চোখের ভ্রুও আবৃত হল।"[৭৮৩]

প্রকাশ থাকে যে, সাহাবায়ে কেরাম হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পর চেহারায় পর্দা করতেন। যা মা আয়িশা (রা.) এর উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। "মা হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, "আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আমার নিকটে এসে আমাকে হিজাবের হুকুম নাযিল হওয়ার আগে দেখেছিলেন। সে তখন ইনশাআল্লাহ বলল- আমি তার ইনশাআল্লাহ বলার শব্দে জেগে উঠি। তখন আমি ওড়না দিয়ে আমার মুখ ঢেকে ফেলি।"[৭৮৪]

মানুষের সৌন্দর্য প্রকাশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সাজসজ্জা। ব্যক্তি নিজেকে সাজিয়ে পরিপাটি রাখবে এটি যেন তার চিরায়ত অভ্যাস। ইসলাম সম্মত সাজসজ্জা তাকে আরও বেশি নান্দনিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলে। তবে আল্লাহ প্রদত্ত (অমূল্য সম্পদ) তার এই সৌন্দর্য যে কারো সামনে প্রদর্শন ইসলাম অনুমোদিত নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টত ঘোষিত হয়েছে- "জাহিলিয়াতের যুগে তোমরা যে ধরণের সাজসজ্জা করে বেড়াতে এখন তা করো না।"[৭৮৫] পবিত্র কুরআনের পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা বিষয়ক অন্যতম সূরা আন-নূর এ আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এইভাবে তাদের সাজসজ্জা (জিনাত) যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, এটুকু ছাড়া যা আপনা আপনিই বের হয়ে যাবে।"[৭৮৬] (জিনাত) শব্দের অর্থ সাজসজ্জা। এর আরেকটি অর্থ প্রসাধন করা। অর্থাৎ চোখ ধাঁধানো, পোশাক, গহনা পরা এবং হাত, পা, মুখে প্রসাধনী মাখা।

জিনাত দুই ধরণের। যথা:

ক) সৃষ্টিগত, যা আল্লাহ প্রদত্ত।

খ) কৃত্রিম, যা প্রসাধনী সামগ্রী দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

যে সাজসজ্জা মনে ব্যাধির জন্ম দেয় না, তা দোষণীয় নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে সামান্যতম মন্দ বাসনার উদ্রেক হয় তা জাহিলিয়াতের শামিল এবং ইসলামী শারীআত বহির্ভূত।

**তাবাররুজ:** তাবাররুজ অর্থ গোপন জিনিস প্রকাশ করা। অর্থাৎ যে জিনিস গোপন করা জরুরী তা গোপন না করে প্রকাশ করাকে তাবাররুজ বলে। পরে মেয়েদের লজ্জা শরম ত্যাগ করে বেঢং হয়ে বের হওয়া ও সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়ানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে সূরা নুরের ৬০ নং আয়াতেও সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে "তাবাররুজ" শব্দটি এসেছে।

---

৭৮৩ কাশশাফ ৩/২৭৪, *তাফসীরে কুরতুবী* ১৪/২৪৩-২৪৪

৭৮৪

৭৮৫ আল-কুরআন ৩৩: ৩৩

৭৮৬ আল-কুরআন ২৪: ৩১

মহান আল্লাহ বলেন- "জাহিলিয়াতের যুগের মত তোমরা তাবাররুজ (সাজসজ্জা করে ঢং দেখানো) করো না। অর্থাৎ চলাফেরার সময় বেপর্দা, বেপরোয়া হয়ে ঘুরাফেরা করো না। দেহ সজ্জা করে বেড়িয়োনা। এটা সম্পূর্ণ হারাম, নাযায়েজ ও কবীরা গুনাহ।"[৭৮৭] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- "অধিক বয়সী মেয়েরা যাদের বিয়ের আশা নেই, তারা যদি নিজেদের সৌন্দর্য দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া (গায়ের) অতিরিক্ত কাপড় খুলে থাকে তাতে দোষের কিছু নেই। তবে এ কাজ না করাই ভাল।"[৭৮৮] এ আয়াত থেকে বোঝা যায় বেগানা পুরুষের সম্মুখে মেয়েদের সৌন্দর্য প্রকাশ কোন অবস্থায় যায়েজ নয়।

**সাজসজ্জা ও প্রসাধনী ব্যবহারে ইসলামের দিক নির্দেশনা:**

মহিলারা সুবাসিত হয়ে বাইরে যাবে না: মুসলিম মহিলাদের পোশাকে বা শরীরে সুগন্ধি বা আতর মেখে বাইরে বেড়ানো নিষিদ্ধ। মুসাদ্দাদ (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন: "যদি কোন মহিলা সুগন্ধি মেখে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, যেন মানুষেরা তার সুগন্ধ অনুভব করে তাহলে সেই মহিলা ব্যভিচারিণী বলে গণ্য হবে।"[৭৮৯] নুফায়লি (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "যে মহিলা লোবান ইত্যাদি দিয়ে খুশবু ব্যবহার করবে, সে যেন আমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায়ের জন্য হাজির না হয়।"[৭৯০]

**পরচুলা লাগানো:**

আল্লাহ তা'আলা নারীর সৌন্দর্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে দিয়েছেন তার মাথার চুল কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্যের উপর কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসে পরচুলা লাগিয়ে থাকে এবং অমুসলিমের ন্যায় চুল কেটে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে রসূল (সা.) এই ধরণের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন- আদম (আ.), আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মহিলা পরচুলা লাগায় আর যে অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়, নবী (সা.) তাদের উপর লানত করছেন।[৭৯১]

**আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন**

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দেওয়া এ (নিয়ামাত) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থি। আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী চেহারায় সৌন্দর্য বাড়াতে ভ্রু সরু করে থাকে যা হারাম।

---

[৭৮৭] আল-কুরআন ৩৩: ৩৩

[৭৮৮] আল-কুরআন ২৪: ৬০

[৭৮৯] আবূ দাউদ সুলায়মান (র.), *আবূ দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনু: বাইরে যাওয়ার সময় মহিলাদের খুশবু লাগানো, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬১, হাদীস নং-৪১২৫

[৭৯০] আবূ দাউদ সুলায়মান (র.), *আবূ দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: চিরুনি করা, অনু: বাইরে যাওয়ার সময় মহিলাদের খুশবু লাগানো, প্রাগুক্ত, পৃ:১৬২, হাদীস নং-৪১২৭

[৭৯১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৫১১, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড:নবম, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ : পরচুলা লাগানো-২৪১২,পৃ.:৩৭২

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, "যার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল: আমি অবশ্যই তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব, তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব।"[৭৯২] এই মর্মে একটি হাদীস রয়েছে, ইসহাক ইবনে ইবরাহিম (রহ.) আলকামা (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে যেসব নারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে, যেসব নারী ভ্রু উপড়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে যা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। তাদের উপর আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) লানত করেছেন। উম্মে ইয়াকূব বলল, এ কেমন কথা? আব্দুল্লাহ বললেন, আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে আল্লাহর রসূল লানত করেছেন এবং আল্লাহর কিতাবেও।"[৭৯৩]

**মাথায় চিরুনি করা:**
মাথার চুল আচড়িয়ে পরিপাটি রাখাও সৌন্দর্য রক্ষার একটি উপায়। রসূল (সা.) এর দেখানো মতো চুল আচড়ানো হলে আমাদের আমল নামায় সওয়াব লেখা হবে। আবুল ওয়ালীদ (রহ.) ... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াতে ও ওযু করতে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন।"[৭৯৪]

**খোপা বাঁধা:**
মাথার চুল পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা বা বেণী করা ইসলামে নিষেধ নেই। অথবা মাথার পিছনে খোপা বাঁধাও নিষেধ নেই। তবে যে খোপা মাথার উপর বাঁধা হয় যা দেখতে বেশ উঁচু উটের পিঠের মতো মনে হয় তা নাযায়েজ। হাদীসে এসেছে- যুহায়র ইবনে হারব (র:) .... আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, জাহান্নামবাসী দু'ধরণের লোক এমন আছে যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পেটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্র, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথায় (চুলের) অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না।"[৭৯৫]

**নাক-কান ফোঁড়ানো:**
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য অনেক ফিকাহবীদের মতে, মেয়েদের কান ফোঁড়ানো যায়েজ। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রসূল (সা.) এর জামানায় মেয়েরা কানে দুল পরতেন। হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র:) .... ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) একবার ঈদের দিনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন, না এর আগে তিনি কোন সালাত আদায় করেন না এর পরে। তারপরে তিনি মহিলাদের কাছে আসেন,

---

[৭৯২] আল-কুরআন ৪: ১১৮-১১৯
[৭৯৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৬১৪, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড : নবম, পরিচ্ছেদ : ২৪১৩ ভ্রু উপড়ে ফেলা-
[৭৯৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*- ৫৫০২, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড: নবম, পরিচ্ছেদ:২৪০৬, চিরনি দ্বারা মাথা আঁচড়ানো, পৃ: ৩৬৯
[৭৯৫] ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ), *মুসলিম শরীফ*-৫৩৯৭, ই.ফা.বা. অনু ও সংকলন প্রকাশনা : ১০০, ৪র্থ সংস্করণ জুন ২০১০, খন্ড: ৫, পৃ. ১৫৫

তখন তার সাথে ছিল বিলাল (রা.), তিনি মহিলাদের সাদকা করার নির্দেশ দেন। তারা নিজেদের কানের দুল ছুড়ে ফেলতে লাগল।"[৭৯৬]

**নারী ও পুরুষের সোনার আংটি ব্যবহার:**

ইসলামে নারী ও পুরুষের সোনার আংটি পরিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয়। এটির ব্যবহার নারীদের পক্ষে ইসলাম সিদ্ধ। তবে পুরুষদের জন্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে- মুহম্মদ ইব্নে বাশশার (রহ.)....আবূ হুরাইরা (রহ.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৭৯৭]

**রূপার আংটি ব্যবহার:**

রসূল (সা.) রূপার আংটি পরতেন তা হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইউসুফ ইব্ন মূসা (র:)... ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সা.) স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করেন। আংটির মোহর হাতের তালুর ভিতরের দিকে ফিরিয়ে রাখেন। তাতে তিনি .......... খোদাই করেছিলেন। লোকেরাও অনুরূপ আংটি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি ব্যবহার করছে, তখন তিনি তা ছুড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি আর কখনও এটা ব্যবহার করব না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি ব্যবহার আরম্ভ করেন। ইব্ন উমার (রা.) বলেন, নবী (সা.) এর পরে আবু বকর (রা.), তারপর উমার (রা.) ও তারপর উসমান (রা.) তা ব্যবহার করেছেন।"[৭৯৮]

**পুরুষের খুশবু লাগানো:**

মূসা (র:)...আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যে সব সুগন্ধি পেতাম তার মধ্যে সবচাইতে উত্তম সুগন্ধিটি নবী (সা.) কে তার ইহ্‌রাম অবস্থায় লাগিয়ে দিতাম।"[৭৯৯] এ বর্ণনা হতে বোঝা যায় পুরুষের খুশবু লাগানো মুস্তাহাব।

**চোখে সুরমা:**

নবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতায় লোম গজায়।"[৮০০]

---

[৭৯৬] . ইমাম মুহাম্দ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৯৮, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড: ১ম, অধ্যায় : ইলম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ : আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া-৭৪, পৃ. ৭৩

[৭৯৭] . ইমাম মুহাম্দ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৪৪৫ , ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড : নবম , পরিচ্ছেদ : স্বর্ণের আংটি-২৩৭৪, পৃ : ৩৪৭

[৭৯৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৪৪৭, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড: নবম, পরিচ্ছেদ: রূপার আংটি-২৩৭৫, পৃ. : ৩৪৮

[৭৯৯] ইমাম মুহাম্দ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৫৫০৪, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খণ্ড: নবম, পরিচ্ছেদ: খোশবু লাগানো মুস্তাহাব : ২৪০৮, পৃ. : ৩৭০

[৮০০] ইমাম আবু আবদির রহমান আহমাদ শু'আয়ব আন-নাসাঈ (র), *সুনানু নাসাঈ শরীফ*-৫১১৩, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত অধ্যায় : সাজসজ্জা, পরিচ্ছেদ : সুরমা লাগানো

**নূপুর পরা :**

অন্যের নিকট নিজেকে সাজিয়ে তোলার লক্ষে নারীরা শব্দ সৃষ্টিকারী এক প্রকারের যে গহনা (নূপুর) পায়ে পরিধান করে থাকে সে ব্যাপারে ইসলামে বিধি নিষেধ রয়েছে। কেননা নবী (সা.) বলেন, "ঘন্টা (নূপুর) শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।"[৮০১]

**মেহেদি লাগানো:**

মেহেদি পরে মেয়েদের হাত রাঙানোর বিষয়টি সমাজ সংস্কৃতির নন্দনশৈলীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈদ, বিবাহ এবং অনুষ্ঠানাদিতে মেয়েদের মধ্যে একে অপরকে মেহেদী পরিয়ে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। এমনকি তারুণ্য ধরে রাখতে মেহেদি ও কাতামের ব্যবহার অতীব ফলপ্রসূ। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী, সাদা চুল দাড়ি কলপ দিয়ে কালো না করে মেহেদী লাগিয়ে যে চমৎকার আভা ফুটে ওঠে সেটি তাকে আরো বেশি ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা দান করে। সুলায়মান আবদুর রহমান (র)... নবী (স) এর খাদেম আনাস (রা) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, "নবী (স) মাদিনায় আসলেন,তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ছিলেন সব চাইতে বয়স্ক। তিনি মেহেদী ও কতম একত্র করে(এক প্রকার কালো ঘাস) লাগিয়ে ছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল(ও দাঁড়ি) টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল।"[৮০২]

**স্বামীর মন সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা:**

স্বামীর মন খুশি করার জন্য স্ত্রীর সাজসজ্জা শুধু যায়েজই নয়, উত্তমও বটে। দেহ সজ্জার জন্য রং ব্যবহার, সুগন্ধী, প্রসাধনী, সুরমা, মেহেদী, মালাসহ সকল প্রকার সাজসজ্জা ও রূপ চর্চা করা যায়েজ। শারীআত অনুমোদিত পন্থায় স্বামী যে ধরণের পরিচ্ছদ, রূপচর্চা, আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা ও চালচলন পছন্দ করে নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বিরক্ত ও অপছন্দ করেন এমন আচরণ ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। রসূল (সা.) বলেন, আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে বলতাম তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম।"[৮০৩]

**ব্যাখ্যা:** কোন মানুষকে সিজদার বিধান ইসলামে নেই। এটা বড় ধরণের শিরক। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর উপর স্বামীর যে মর্যাদা দিয়েছেন উক্ত হাদীসে রসূল (সা.) কেবল সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত এই বিষয়টি নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন অবকাশ নেই। একমাত্র মায়ের পায়ের নিচে যে সন্তানের বেহেশত এ কথা সকলের জানা।

**স্ত্রীর মন খুশি করার জন্য স্বামীর সাজসজ্জা:**

স্ত্রী যেমন স্বামীর মনতুষ্টির জন্য সাজসজ্জা করে, তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর মন খুশির জন্য সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। ইব্নে আব্বাস বলেন, আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজগোজ করে আমিও তার জন্য সাজগোজ করি, ইমাম কুরতুবি

[৮০১] আবূ দাউদ সুলায়মান (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, অধ্যায়: আংটির বিবরণ, অনু: পায়ে মল পড়া সম্পর্কে, প্রাগুক্ত, পৃ:১৮৩, হাদীস নং-৪১৮৩

[৮০২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৩৬৩৬, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড: ষষ্ঠ, অধ্যায়: আম্বিয়া কিরাম (আ), পরিচ্ছেদ : নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের মদিনায় হিযরত ২১৫৪, পৃ : ৪৪৪

[৮০৩] আন নববী (র), *রিয়াদুস সালেহীন*-২৮৫, খন্ড : ১ম, পৃ : ১৮৫, প্রাগুক্ত। তিরমিযী-১১৫৯

বলেন, আলেমগণ বলেছেন, পুরুষদের সাজসজ্জার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। এটা নির্ভর করে পরিবেশ পরিস্থিতির উপর। কোন ধরণের সাজসজ্জা বর্তমানে চলে, কোনটি অচল, কোন পোশাক এখন চালু, কোনটা বয়স্কদের জন্য, কোনটা যুবকদের জন্য মানানসই এগুলো বিষয়ে স্ত্রীর অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে। মূল কথা স্ত্রীর ভালো লাগা ও আনন্দ দেয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যাতে সে অন্য পুরুষদের সাথে আকৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তবে এ সাজগোজ শরীয়ত সমর্থিত হতে হবে।

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ঈমান**

মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নির্ণায়ক হল ঈমান। প্রতিটি সৃষ্টিই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিয়ত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুমের অধীন প্রত্যেক বান্দাহর জন্য স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশিত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন অবধারিত। ঈমানী বলই বান্দাহর জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য তথা মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়নে অস্বীকার করে তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন প্রস্তুত রেখেছেন অনন্তকালের মর্মন্তদ শাস্তি। এ মর্মে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর, যে গ্রন্থ তিনি তাঁর রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান আন। আর যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।"[৮০৪]

এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ঈমানকে কঠিনভাবে অন্তরে ধারণ যা আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন ও বান্দাহর মধ্যকার এমন এক সেতুবন্ধন যার বিনিময় হবে অনন্তকালের জান্নাত।

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।"[৮০৫]

ঈমান হল কোন কিছুকে নির্ভুল সত্য মনে করে আল্লাহর দেখানো সরল পথকে চিরন্তন সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। সেই সাথে ফিরিশতাগণের উপর, অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ, আখিরাত এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীরের ওপর সন্দেহাতীতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের সারকথা হলো কালিমায়ে তাইয়্যেবা।

[৮০৪] আল-কুরআন ৪: ১৩৬
[৮০৫] আল-কুরআন ৬: ৮২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর উপমা এঁকেছেন এভাবে-

“কালিমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ যেমন কোন ভাল জাতের গাছ, এর শিকড় মাটির নিচে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে। এর শাখা-প্রশাখাগুলো শূন্যলোকে বিস্তৃত আল্লাহর হুকুমে তা অনবরত ফলের পর ফল দান করছে।”[৮০৬]

**ঈমানের রুকনসমূহ:**

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের ৬টি রুকন সম্পর্কে জানা যায়। যেমন:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি। তাঁর রসূলের প্রতি এবং সে গ্রন্থের প্রতি যা আল্লাহ তার রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন ও সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।”[৮০৭]

আয়াতে কারিমার মর্মার্থে ঈমানের ছয়টি মূলভিত্তি প্রতিভাত হয়। সেগুলো হল-

- আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান।
- ফিরিশতাগণের ওপর ঈমান।
- অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান।
- রসূলগণের ওপর ঈমান।
- আখিরাতের ওপর ঈমান।
- আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীরের ওপর ঈমান।

**ঈমানে মুজমাল**

**১। আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান:**

আল্লাহ বিরোধী সকল শক্তি ও সত্ত্বার আধিপত্য ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আনুগত্য ও আইন মনে প্রাণে মেনে নেয়াই ‘ঈমান বিল্লাহ’ বা তাওহীদের একমাত্র মৌলিক ভিত্তি।

“আল্লাহকে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ তাঁকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তিনিই সমুদয় সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, প্রভু, বিশ্বজাহানের সর্বশক্তিমান মালিক ও পরিচালক, মানুষের একমাত্র ইলাহ, বাদশাহ্, প্রতিপালক, শাসক ও আইনদাতা, সকল প্রকার স্তবস্তুতি, বন্দেগী, দাসত্ব আনুগত্য একমাত্র তারই জন্য।

---

[৮০৬] আল-কুরআন ১৪: ২৪-২৫

[৮০৭] আল-কুরআন ৪: ১৩৬

তিনি আদি, অনন্ত, এক ও একক। তিনি সর্বজ্ঞ। এমনি অসংখ্য গুণে তিনি গুণান্বিত। এসব গুণেরও তিনি একমাত্র অধিকারী। এসব গুণে তাঁর নেই কোন শরীক, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী।"[৮০৮]

আর এ থেকে জানা গেল যে, নবী-রসূলগণের তাওহীদ তিন ভাগে বিভক্ত। আর তা হলো তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত। এ তিন প্রকার তাওহীদেরই মূল প্রতিপাদ্য বা উপজীব্য বিষয় হল মহান সেই বিশ্ব অধিপতির প্রণীত ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি এই ঈমান, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং কর্মের প্রতিফলনই ঈমানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

**২ । ফিরিশতাগণের উপর ঈমান:**

**পরিচয়:** 'ফিরিশতা' শব্দটি ফারসি। এর আরবী প্রতিশব্দ মালাইকা, এর অর্থ বার্তা বা বাণী বাহক। আর ফিরিশতাগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের সেই নিদর্শন যাদের সূক্ষ্ম নূরানী দেহ রয়েছে যারা আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি, চেহারা ও সম্মানিত কারো বেশ ধারণ করতে সক্ষম। এবং স্ব স্ব স্থানে দিবানিশি তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে রত।

**ফিরিশতাগণ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্ট ও পরিচালিত:**

আল্লাহর সৃজনকর্ম ব্যবস্থাপনায় ও বিষয়সমূহ পরিচালনায় ফিরিশতাদের কোন প্রভাব নেই। বরং তারা আল্লাহর একদল সৈন্য, যারা আল্লাহর নির্দেশে কাজ করে। আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে সকল নির্দেশ। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। অনুরূপভাবে ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ইবাদত পালন করা জায়িজ নেই। বরং ফিরিশতাদের স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টির স্রষ্টার জন্যই ইবাদতকে একনিষ্ঠ করে নেওয়া ওয়াজিব, স্বীয় প্রভুত্বে ও ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে যার কোন শরীক নেই। এবং স্বীয় নামসমূহ ও গুণাবলীতে যার কোন সাদৃশ্য নেই। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারটি বর্ণনা করে বলেন-

"ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে রব হিসেবে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় না। তোমাদেরকে মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরের নির্দেশ দেবে?"[৮০৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। আর তারা তো সম্মানিত বান্দাহ। আর তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, আমিই ইলাহ, তিনি ব্যতীত, তাকে আমরা প্রতিফল দেব জাহান্নাম, এভাবেই আমরা যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"[৮১০]

এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফিরিশতাগণ হলেন মহান রব্বুল আলামিনের অধীনস্থ বান্দাহ, স্বীয় রব ও স্রষ্টার মাধ্যম ছাড়া যাদের কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

---

[৮০৮] আব্বাস আলী খান, *ঈমানের দাবী*, প্রকাশনী: বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, মে, ২০০৫, পৃ.- ১১

[৮০৯] আল-কুরআন ৩: ৮৩

[৮১০] আল-কুরআন ২১: ২৬-২৯

**৩। অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান:**

**অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের হুকুম ও দলীল:**

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ বিশ্ব মানবতার মুক্তির নিমিত্তে যেসকল মহাগ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার প্রত্যেকটির উপর বিশ্বাস স্থাপন সকলের উপর ফরয। এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেছেন-

"তোমরা বল! আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[৮১১]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পূণ্য নেই, কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ, শেষ দিবস, ফিরিশতাগণ, সকল গ্রন্থ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে।"[৮১২]

**গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের পদ্ধতি**

গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের অনেকগুলো দিক রয়েছে। সেগুলো হল:

১. এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ গ্রন্থগুলোর প্রতিটিই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

   "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইনজিল। ইতঃপূর্বে মানবজাতির হিদায়েতের জন্য। আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"[৮১৩]

২. এ ব্যাপারে ঈমান আনয়ন করা যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহের একটি অন্যটিকে সত্য প্রতিপন্ন করে।

   "আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ইতঃপূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপণকারীরূপে।"[৮১৪]

৩. এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ কুরআন কারিম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

---

[৮১১] আল-কুরআন ২: ১৩৬
[৮১২] আল-কুরআন ২: ১৭৭
[৮১৩] আল-কুরআন ৩: ২-৪
[৮১৪] আল-কুরআন ৫: ৪৮

"হে গ্রন্থধারীগণ! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তোমরা গ্রন্থের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক কিছু প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট গ্রন্থ তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন। এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৮১৫]

৪. এসকল গ্রন্থের প্রতিটিই একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছে এবং যাবতীয় কল্যাণ, হিদায়েত, আলো ও জ্যোতি নিয়ে এসেছে। এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করা।

"তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইনজিল। ইতঃপূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য।"[৮১৬]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

"নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, এতে ছিল হিদায়াত ও আলো।"[৮১৭]

তিনি আরো বলেন,

"আর আমরা তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো।"[৮১৮]

কুরআনে আরো এসেছে,

"রমাদান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং সত্য পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।"[৮১৯]

৫. কুরআনকে নাযিলের দিক থেকে সর্বশেষ গ্রন্থ এবং অন্য গ্রন্থসমূহের উপর সাক্ষী হিসেবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেছেন,

"তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপকরূপে।"[৮২০]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

---

[৮১৫] আল-কুরআন ৫: ১৫-১৬
[৮১৬] আল-কুরআন ৩: ৩-৪
[৮১৭] আল-কুরআন ৫: ৪৪
[৮১৮] আল-কুরআন ৫: ৪৬
[৮১৯] আল-কুরআন ২: ১৮৫
[৮২০] আল-কুরআন ৫: ৪৮

"তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। যা তার পূর্বের গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল। ইতঃপূর্বে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।"[৮২১]

**৪। নবী-রসূলগণের ওপর ঈমান**

**নবী-রসূলগণের ওপর ঈমান আনয়নের হুকুম ও দলীল**

নবী রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের জন্য শিরোধার্য। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"বলুন, রসূল ঈমান এনেছেন তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং মু'মিনগণও। তাঁদের সকলে আল্লাহ তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।"[৮২২]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে (ঈমানে) পার্থক্য সূচিত করতে চায় এবং বলে, আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর তারা এর মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়। এরাই প্রকৃত কাফির।"[৮২৩]

**নবী-রসূলগণের উপর ঈমান আনয়নের পদ্ধতি**

এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নবী রসূল প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন:

"আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।'[৮২৪]

নবী রসূলগণ ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত-এ ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করা। "এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভাইদের কতককে, আর আমরা তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। এটি আল্লাহর হিদায়েত, স্বীয় বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন।'[৮২৫]

[৮২১] আল-কুরআন ৩: ২-৪
[৮২২] আল-কুরআন ২: ২৮৫
[৮২৩] আল-কুরআন ৪: ১৫০-৫১
[৮২৪] আল-কুরআন ১৬: ৩৬
[৮২৫] আল-কুরআন ৬: ৮৭-৮৮

এ বিশ্বাস রাখা যে, সকল নবী রসূলের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন- "আমরা আপনার পূর্বে যে রসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর প্রতি এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক্ব ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[৮২৬]

এ বিশ্বাস রাখা যে, তাদেরকে যে রিসালাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা এর সমস্তই সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন- "যেন তিনি জানেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রিসালাত (বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন এবং রসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর আয়ত্তাধীন। আর তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।"[৮২৭]

এ বিশ্বাস রাখাও ওয়াজিব যে, রসূলগণ সৃষ্ট মানব ছিলেন। রুবুবিয়্যাহ তথা প্রভুত্বের কোন বৈশিষ্ট্য তাঁদের ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন- "তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলত, আমরা কেবল তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।"[৮২৮]

**"বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ মাত্র একজন,** সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"[৮২৯]

রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যে বিশ্বাস রাখাও আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বাণীতে বলেছেন, "এ রসূলগণ এরূপ যে, তাঁদের একের ওপর অন্যকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যাঁদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।"[৮৩০]

এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাঁরা সমস্ত মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাঁদের প্রত্যেককে আমরা সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৮৩১]

তারা যা নিয়ে এসেছে সে ব্যাপারে তাদের সবাইকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল।"[৮৩২]

এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রসূল। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমাকে নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, আমাকে ব্যাপকার্থবোধক পূর্ণ বাক্যসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আমাকে (শত্রুদের মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

---

[৮২৬] আল-কুরআন ২১: ২৫
[৮২৭] আল-কুরআন ৭২: ২৮
[৮২৮] আল-কুরআন১৪: ১১
[৮২৯] আল-কুরআন ১৮: ১১০
[৮৩০] আল-কুরআন ২: ২৫৩
[৮৩১] আল-কুরআন ৬: ৮৬
[৮৩২] আল-কুরআন ৭: ১৫৮

হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য যমীনকে পবিত্র ও মাসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা নবীদের ধারার পরিসমাপ্তি করা হয়েছে।"[৮৩৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।"[৮৩৪]

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমার এবং আমার পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উদাহরণ হলো এমন লোকের মত যে একটি ঘর বানিয়ে তাকে সুন্দর পরিপাটি করেছে। এর এক কোণে এক ইট পরিমাণ স্থান ব্যতীত। ফলে মানুষ এ ঘরের পাশে ঘুরাফিরা করতে শুরু করল এবং এ ব্যাপারে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগল, কেন এ ইটটি রাখা হলো না? তিনি বললেন, আমিই সে ইট, আর আমিই শেষ নবী।"[৮৩৫]

রসূল (সা.) কে মুহাব্বাত, তার মুহাব্বাতকে নিজের এর সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর প্রাধান্য দেওয়া। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে যাকে সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তিনি নবীকুলের শিরোমণি হযরত মোহাম্মদ (সা.)। পরিবার, পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ব্যক্তির নিজের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) এর মুহাব্বাতকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে। এমনকি সঞ্চিত অর্থবৈভব থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য সামগ্রী এসব কিছুর।

কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী এরূপ:

"হে নবী, বলে দাও, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়ার ভয়ে তোমরা তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর। এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে তোমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা তোমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিকদের কখনো সত্য পথের সন্ধান দেন না।"[৮৩৬]

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউই মু'মিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে আমি তার পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ থেকে বেশি প্রিয় না হব।"[৮৩৭]

**৫। আখিরাতের উপর ঈমান:**

আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে নিশ্চিতভাবে তা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পুনরায় নতুন এক জগতে সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন। আখিরাত বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকালের জীবনকে বোঝায়। কবর, হাশর, হিসাব,

---

[৮৩৩] আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (রহঃ), *সহীহ আল মুসলিম*- ৫২৩

[৮৩৪] আল-কুরআন ৩৩: ৪০

[৮৩৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৩২৮৩, ই.ফা.বা.চতুর্থ সংস্করণ-২০০৬ ইং, ষষ্ঠ খন্ড, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, পরিচ্ছেদ : খাতামুন নাবিয়্যিন, পৃ : ১৮৭

[৮৩৬] মূল-মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম অনুক: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও ড. আবুবকর মুহম্মাদ যাকারিয়া, *উসূলুল ঈমান*, সবুজপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, ২০১৬ ঈসায়ী, পৃ. ২২২

[৮৩৭] ঈসমাইল আল বুখারী (রহঃ), *সহীহ আল-বুখারী*: ১৩, ১ম খণ্ড, ইফাবা- ২০০৬ ঈসায়ী

পুলসিরাত এবং জান্নাত জাহান্নাম সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। "পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আখিরাতের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে।

১. মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত।

২. কিয়ামত থেকে অনন্তকাল অবধি। যেখানে কোনো মৃত্যু নেই। নেই কোন ধ্বংস, লয় বা শেষ।"[৮৩৮]

**মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্তঃ**

**কবরের নিয়ামাত ও আযাবের উপর ঈমান আনয়নঃ**

কবরের **নিয়ামাত** ও আযাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"যখন মু'মিনকে কবরে বসানো হবে তখন নিয়ে আসা হবে তারপর সে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আর অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল।"[৮৩৯]

আর এটিই হল আল্লাহর বাণী- "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"[৮৪০]

**মুনকার-নাকীরের উপর ঈমানঃ**

কুরআনে বর্ণিত কবরের ফিরিশতাদ্বয়ের নাম, তাঁদের গুণাগুণ, কবরে তাঁদের প্রশ্ন, তার ধরণ। প্রকৃত বিষয়ের উপর ঈমান আনা ফরজ।

রসূল (সা.) বলেছেন, "যখন মৃত ব্যক্তিকে অথবা বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন কবরস্থ করা হবে তখন তার কাছে দুইজন গাঢ় নীল ফেরেশতা আসে তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার অপরজনকে নাকীর।"[৮৪১]

**হাশরের উপর ঈমানঃ**

হাশর মানে একত্রীকরণ। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন সকল মানুষকে একদিন একত্র করবেন তাদের বিচারের জন্য। তিনি বলেছেন-

"আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব আর তাদের কাউকে ছাড়ব না।"[৮৪২]

সুতরাং হাশর সত্য। এর উপর ঈমান আনয়ন ফরজ।

---

[৮৩৮] *সিরাতুন নবী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩

[৮৩৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১২৮৫, ই.ফা.বা.-২০০৬, ২য় খণ্ড, অধ্যায় : জানাজা পরিচ্ছেদ : কবরের আযাব প্রসঙ্গে, পৃ : ৪২০

[৮৪০] আল-কুরআন ১৪: ২৭

[৮৪১] ঈসা আত তিরমিযী (রহঃ), *জামে তিরমিযী*- ১০৭১

[৮৪২] আল-কুরআন ১৮: ৪৭

**হাউজে কাওসার এর উপর ঈমান:**

"হাউজ হল এমন এক বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে হাশরের মাঠে দান করেছেন। যেখানে তিনি এবং তাঁর উম্মাত অবতরণ করবে।"[৮৪৩]

অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা হাউজে কাওসার এর সত্যতা প্রমাণিত। রসূল (সা.) বলেছেন- "আমার হাউজ এক মাসের রাস্তা, তার কোণসমূহ একই সমান, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা। তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়েও বেশি উত্তম। তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকার মতো বেশি। যে তা থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।"[৮৪৪]

**মীযানের উপর ঈমান:**

মীযান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র। এর সাহায্যে আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে মানুষের আমল ওজন করবেন। এর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আল্লাহ বারী ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে এর বর্ণনা দিয়েছেন- "আর কিয়ামাতের দিন আমরা ন্যায়বিচারের মীযান সমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।"[৮৪৫]

**আমলনামার উপর ঈমান:**

দুজন ফেরেশতা সার্বক্ষণিক মানুষের সকল ভালো ও মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করেন। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেককে তার আমলনামা হাতে দেওয়া হবে।

রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে সকল সৃষ্টির সমান থেকে বিশেষভাবে ডাকবেন। তারপর তার নিরানব্বইটি দপ্তর খুলবেন। প্রত্যেক দপ্তর যতদূর চোখ যায় ততদূর লম্বা, তারপর তাকে বলবেন, 'তুমি কি এর কিছু অস্বীকার কর? আমার সংরক্ষণকারী লেখকবৃন্দ কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে?' তখন সে বলবে, না, হে প্রভু! তখন তিনি বলবেন: তোমার কি কোন ওজর আপত্তি অথবা নেককাজ আছে? তখন লোকটি হতবুদ্ধি হয়ে বলবে, না হে প্রভু! তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার একটি নেককাজ আছে। আজ তোমার উপর কোন অত্যাচার করা হবে না। তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করবেন যাতে লেখা আছে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব মা'বুদ নেই। আর মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসূল।" তারপর বলেন, "তারপর সে সমস্ত দপ্তরগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে, অপর পাল্লায় রাখা হবে সে কার্ডটি। তিনি বলেন, তাতে দপ্তরগুলো উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে, মহিয়ান দয়াময় আল্লাহর নামের সাথে কোন কিছুই ভারী হতে পারে না।"[৮৪৬]

---

[৮৪৩] *উসূলুল ঈমান*, পৃ.: ২৮৮, প্রাগুক্ত

[৮৪৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৬১৩০, ই.ফা.বা.-২০০৬ ঈসায়ী, অধ্যায়-হাউয, দশম খন্ড, পৃ : ১০৮

[৮৪৫] আল-কুরআন ২১: ৪৭

[৮৪৬] *মুসনাদে আহমদ*- ২/২১৩, *জামে আত তিরমিযী*- ২৬৩৯

**পুলসিরাত এর উপর ঈমানঃ**

শরীআতের পরিভাষায় সিরাত বলতে বোঝায়, এমন এক পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর প্রলম্বিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই পার হতে হবে। যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।"[৮৪৭]

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"...তারপর পুল নিয়ে আসা হবে এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে" আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল, 'পুল' কি? তিনি বললেন, "তা পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যার উপর লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাকা কাঁটা থাকবে। যা নাজদের সা'দান গাছের কাঁটার মতো। মু'মিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুণে ঝলসে যাবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হিঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে।"[৮৪৮]

**জান্নাত জাহান্নামের উপর ঈমান**

জান্নাত ও জাহান্নাম হল চূড়ান্ত প্রতিদানের আবাসস্থল। মু'মিন মুসলিমদের চিরস্থায়ী আবাসভূমি চিরশান্তির জান্নাত এবং পথভ্রষ্টদের অনন্তকালীন আবাসস্থল অভিশপ্ত জাহান্নাম। এ দুইয়ের উপর ঈমান আনয়ন ওয়াজিব। কুরআন ও হাদীসে অজস্রবার জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তাঁরা এবং তাঁদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। সেখানে তাঁদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম। হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।"[৮৪৯]

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাঁদের জন্য আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে

[৮৪৭] উসূলুল ঈমান- ২৯৬, প্রাগুক্ত

[৮৪৮] ইমাম মুহাম্‌দ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৬৯৩২, ই.ফা.বা.-২০০৬ ঈসায়ী ,দশম খন্ড, অধ্যায় : জাহনিয়াদের মতের খন্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গে, পৃ : ৫৭০

[৮৪৯] আল-কুরআন ৩৬: ৫৫-৫৯

অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"[৮৫০]

রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।"[৮৫১]

"আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তারপর তাদের মাঝে একজন আহ্বানকারী দাঁড়িয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! কোন মৃত্যু নেই, আর হে জাহান্নামবাসী! কোন মৃত্যু নেই, যে যেখানে আছে সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"[৮৫২]

**৬। তাকদীরের উপর ঈমান:**

মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন ইরশাদ করেন,

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। তিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।"[৮৫৩]

তাকদীরে বিশ্বাসের ভিত্তিসমূহের বর্ণনা ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন-

"একজন মু'মিন বান্দাহকে যেখানে আরো অনেক বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হয় তার সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপরও ঈমান আনতে হয় এবং হৃদয় মনকে নিশ্চিত করতে হয় যে, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর কার্যকর রয়েছে। তাঁর শক্তি সব কিছুকে আয়ত্ত করে রেখেছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং তিনি ভাল করেই জানেন তাঁর কি করা উচিত।"[৮৫৪]

তাকদীরের উপর ঈমান আনা ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের জ্ঞান যে সর্বব্যাপী এ সম্পর্কে তিনি বলেন- "বস্তুত: যেকোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কোরআনের যেকোন অংশ থেকেই পাঠ করা কিংবা যেকোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদিগার থেকে গোপন থাকে না একটি কণাও, যা যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু আছে, না বড় যা এই প্রকৃষ্ট কিতাবে নেই।"[৮৫৫]

মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের তাকদীরও লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে এর উপর নির্ভর করে আমল বন্ধ করে দিলে চলবে না। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

---

[৮৫০] আল-কুরআন ৪৭: ১৫

[৮৫১] ইমাম মুহাম্মদ বন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৩০০৭, ই.ফা.বা.-২০০৬ ঈসায়ী, পঞ্চম খন্ড, অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা, পৃ : ৩৯৪

[৮৫২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৬১০১, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড : দশম, অধ্যায় : কোমল হওয়া, অনুচ্ছেদ : সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে-২৭৩১, পৃ : ৯১

[৮৫৩] আল-কুরআন ৮৭: ২-৩

[৮৫৪] ইমাম গাযযালী (রহ:), *ইসলামী আকীদা*, অনুক: মুহাম্মদ মূসা, প্রকাশনা- খোশরোজ কিতাব মহল, ২৫/বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ২০০৯ ঈসায়ী, পৃ.: ১২৫

[৮৫৫] আল-কুরআন ১০: ৬১

হযরত আলী (রা.) বলেন, "আমরা একটি লাশের সাথে বাকী আলগারকাদে ছিলাম। রসূল (সা.) আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বসে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ছড়ি দিয়ে মাটি খুড়তে লাগলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির ঠিকানা বেহেশত অথবা দোযখ নির্ধারিত হয়ে আছে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কেন সেই লেখার ভরসা করব না এবং কাজকর্ম ছেড়ে দেব না? তিনি বললেন, তোমরা কাজ করতে থাক। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যবানদের কাজই করে। আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য সে হতভাগ্যদের কাজই করে থাকে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

"পরন্তু যে লোক (আল্লাহর পথে) ধন মাল ব্যয় করল (তাঁর নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল, তাকে আমি সহজ পথে চলার সহজতা দেব। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করল, (আল্লাহর প্রতি) বিমুখ হল এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল, তার জন্য আমি দুষ্কর পথের সহজতা দান করব।"[৮৫৬] (সূরা- লাইল: ৫-১০)

**সপ্তম পরিচ্ছেদ : তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি**

"আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এগুলোর (কতাওবানী পশুর) গোশত এবং রক্ত বরং তাঁর কাছে পৌছায় তোমাদের তাকওয়া- মনের একাগ্রতা।"[৮৫৭]

একজন মুমিনের জীবনাচরণে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাকওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় মন্দ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার নামই তাকওয়া। তাকওয়ার সহজাত বোধই মানুষকে অন্যায়, অশ্লীল, খারাপ ও অনিষ্টকর কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত রাখে। আর এ তাকওয়াই সমাজে মানবতাবোধ, নীতিবোধ ও মূল্যবোধ নামে পরিচিত। উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, সাদা-কালো নির্বিশেষে যে কোন মুসলিম নারী-পুরুষ তাকওয়া অবলম্বন করে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক তথা সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করেন। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে মুত্তাকী নামে পরিগণিত। মানুষের জীবনে সাফল্য অর্জনে তাকওয়ার প্রভাব, অপরিমেয় ও অনস্বীকার্য। বিশেষ করে সকল মুসলিমের সমাজ জীবনে তাকওয়ার সুদূর প্রসারী প্রভাব অপরিহার্য। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে তাকওয়া তথা সুস্থ মন-মানসিকতা, মননশীলতা ও আল্লাহ ভীতির কোন বিকল্প নেই। যার চরিত্র তাকওয়ার বলে যত বেশি বলীয়ান নিশ্চিতভাবেই সে দুনিয়া ও আখিরাতে

[৮৫৬] উসূলুল ইমান, পৃ.: ১৪৮-৪৯, প্রাগুক্ত
[৮৫৭] আল-কুরআন ২২: ৩৭

ততবেশি সফলকাম। একজন মুমিনের জন্য এটি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁর জীবনে তাকওয়ার পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলে সে আল্লাহর সান্নিধ্য ও অধিকতর মর্যাদা লাভে সক্ষম।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর বান্দাহদের মহাসুসংবাদ দিয়ে বলেন- "আর তোমাদের প্রভুর ক্ষমার প্রতি এবং জান্নাতের প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাও, যার পরিধি হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।" মুত্তাকী হচ্ছে তাঁরা যাঁরা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় (মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ) ব্যয় করে, যাঁরা নিজেদের রাগ ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মুত্তাকী তারাও) যাঁরা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে (সাথে সাথে) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? আর তাঁরা জেনে- শুনে নিজেদের (ভুল) কৃতকর্ম সমূহ বারংবার করতে থাকে না।"[৮৫৮]

**তাকওয়া পরিচিতি**

ইসলামের মৌলিক পরিভাষা গুলোর মধ্যে 'তাকওয়া' অন্যতম।

আভিধানিকভাবে তাকওয়া শব্দের অর্থ- "ভয়, সতর্কতা ও জবাবদিহিতা।"[৮৫৯]

'তাকওয়া' মানে আল্লাহর বিষয়ে সতর্ক হওয়া।[৮৬০]

এই অর্থে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।"[৮৬১]

নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লূত (আ.) এবং শুআইব (আ.) নিজ নিজ জাতিকে বলেছিলেন, "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না?"[৮৬২]

তাঁরা এও বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।"[৮৬৩]

আবার, ভালভাবে বেঁচে থাকা, পরহেয করা, রক্ষা করা, দূরে থাকা, সচেতনতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বিরত থাকা ও সাবধান থাকা এসবই তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন, তাকে বলা হয় মুত্তাকী। আল্লামা যামাখ্শারী (জন্ম-মৃত্যু) বলেন শাব্দিকভাবে 'মুত্তাকী' কর্তাবাচক বিশেষ্য, যা আরবদের কথা 'ওয়াক্বাহ ফাত্তাক্বা'- 'সে তাকে বাঁচিয়েছে, ফলে সে বেঁচে গেছে' থেকে এসেছে।

[৮৫৮] আল-কুরআন ৩: ১৩৩-১৩৫

[৮৫৯]

[৮৬০] ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মুজাম আল ওয়াসীত*, দেওবন্দ, কুতুবখানা গুসায়নিয়াহ, তা.বি. পৃ. ১০৫২

[৮৬১] আল-কুরআন ২২: ১

[৮৬২] আল-কুরআন ২৬: ১০৬, ১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৭৭

[৮৬৩] আল-কুরআন ২৬: ১০৬, ১২৪, ১৪২, ১৬১, ১৭৭

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

"তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।"[৮৬৪]

"যে ঘোড়া কাদা ও ধুলাবালি থেকে নিজ ক্ষুর বাঁচিয়ে রাখে তাকে 'ফারায ওয়াক্বি' বলা হয়। কারণ কষ্টদায়ক সামান্য কিছুর স্পর্শ থেকেও সে তার ক্ষুরকে রক্ষা করে।"[৮৬৫]

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়- তাকওয়া অর্থ হল- "আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে দূরে থেকে ইসলাম নির্ধারিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অথবা, যে কাজ করার কারণে মানুষকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, তা থেকে নিজেকে রক্ষা তাকওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজেকে রক্ষা তাকওয়া। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত করুণা, ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ হারানোর ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত থাকার নাম তাকওয়া।"[৮৬৬]

মুত্তাকীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহ.) বলেন,

"শরীআতের পরিভাষায় মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে এমন সব কিছু থেকে রক্ষা করেন, বাঁচিয়ে রাখেন, যা তাকে পরকালে ক্ষতির সম্মুখীন করবে।"[৮৬৭]

আবু মুহাম্মাদ আল হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল বগবী (রহ.) [মৃ. ৫১০ হি.] বলেন,

মুত্তাকী ঐ ব্যক্তি, যিনি শিরক, কবীরাহ গুনাহ ও সকল প্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। মুত্তাকী শব্দটি আল ইত্তিকাউ থেকে নির্গত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দুবস্তুর মাঝখানের অন্তরাল- দেয়াল। যেমন, এক হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কিরামের উক্তি, "যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) কে আমাদের ও শত্রুদের মাঝখানে অন্তরাল করে রাখতাম। সুতরাং মুত্তাকী আল্লাহর আদেশ পালন এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার ফলে তার এবং আল্লাহর শাস্তির মাঝখানে অন্তরায় তৈরি করে বলেই তাকে মুত্তাকী বলা হয়।[৮৬৮]

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখ্শারী (রহ.) বলেন, "ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় মুত্তাকী হল ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্ত্বাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়, সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।[৮৬৯]

---

[৮৬৪] আল-কুরআন ২: ২৪

[৮৬৫] আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইব্ন উমার আল যামাখশারী, *আল-কাশ্শাফ 'আন হাক্বায়িক্বি আন তানযীল ওয়া উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওয়ূহি আল তাবীল* মিশর, মাকতাবা মিশর, তা.বি. খণ্ড-১, পৃ. ৩৭

[৮৬৬] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা, ই.ফা.বা, ১৯৯২ ঈসায়ী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১০৭

[৮৬৭] কাযী নাসীরুউদ্দীন আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৮৬৮] আবু মুহাম্মদ আল গুসাইন ইবন মাসউদ আল-বগভী [মৃ. ৫১০ হি.] *মা'আলিমুত তানবীল ওয়া উয়ূনি আল আক্বা-বীল ফী ওয়ূহি আল তাবীল*, মিশর, মাকতাবা, মিশর তা. বি. খণ্ড- ১, পৃ. ৩৭

[৮৬৯] আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইবন উমার আল জামাখশারী, আল-কাশশাফ, *আল হাক্বাযিকি আল তানযীল ওয়া উয়ুনি আল আক্বাবীল ফী*, *ওয়ূহি আল তাবীল*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ৩৭

**পবিত্র কুরআনে তাকওয়া:**

পবিত্র কুরআনের ১৫ জায়গায় তাকওয়া শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।"[৮৭০]

'আল- মুত্তাকুন' শব্দটি মোট ৬ বার এবং 'আল-মুত্তাক্বীন' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে মোট ৪৩ জায়গায়।[৮৭১]

এছাড়া 'আলবিকায়াতু' ও 'আল-ইত্তিকাউ' শব্দ মূল থেকে গঠিত বিশেষ্য- বিশেষণ বা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার রয়েছে প্রায় ২০০ জায়গায়। পবিত্র কুরআনের বর্ণিত করণীয় বা বর্জনীয় প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ের বর্ণনার সাথে তাকওয়া শব্দটির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাকওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের সাথে মিল রেখে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এর কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হল-

তাকওয়া অর্থ ঈমান। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কুরআন মাজীদ মুত্তাকীদের তথা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক।"[৮৭২]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

"আর তিনি তাদের জন্য তাকওয়ার বাণী তথা তাওহীদের বাণী অর্থাৎ ঈমান অবধারিত করে দিলেন।"[৮৭৩]

আরো বলা হয়েছে,

"তারাতো ঐ ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার তথা ঈমানের জন্য নির্বাচন করেছেন।"[৮৭৪]

"ফিরআউন সম্প্রদায়, তারা কি তাকওয়া অবলম্বন তথা ঈমান গ্রহণ করবে না?"[৮৭৫]

তাকওয়া অর্থ তাওবা, অনুশোচনা, যেমন- আর যদি গ্রামের অধিবাসীরা ঈমান অর্থ গ্রহণ করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ তাওবা করে তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।[৮৭৬]

তাকওয়ার অর্থ আনুগত্য। যেমন- "তোমরা ভীত হও যে, আমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই আনুগত্য কর।"[৮৭৭]

"অএতব, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া আর কারও আনুগত্য করছ?"[৮৭৮]

"আর তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর অবাধ্য হয়ো না।"[৮৭৯]

---

[৮৭০] আল কুরআন ২:১৯৭, ২৩৭, ৫:২৮, ৭: ২৬, ৯: ১০৮, ২০:১৩২, ৩৭ ৪৮:২৬, ৪৯: ৩, ৫৮:৯, ৭৪, ৫৬, ৯৬:১২; মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-*মুজাম আল মুফাহরাস লি আল আলফায় আল কুরআন আল কারীম*, বৈরুত,, দার আল মারিফাহ্, ১ম মুদ্রণ ১৪২৩ হি. ২০০২, পৃ. ৩৭৯

[৮৭১] মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল-মুজাম আল মুফাহরাস লি আল আলফায় আল কুরআন আল কারীম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৫-৮৪৬

[৮৭২] আল কুরআন, সূরা বাক্বারাহ:২, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা:) সহ অন্যান্য অনেক সাহাবা (রা:) বলেন, তারা ঈমানদার ব্যক্তিগণ। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জাবীর আল তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) *জামিউল বায়ান আন তাবীলির আয়িল কুরআন*, বৈরুত দার আল যিকর, তা.বি খণ্ড-১, পৃ. ১৪৭

[৮৭৩] আল-কুরআন ৪৮: ২৬

[৮৭৪] আল-কুরআন ৪৯: ৩

[৮৭৫] আল-কুরআন ২৬: ১১

[৮৭৬] আল-কুরআন ৭: ৯৬

[৮৭৭] আল-কুরআন ১৬: ২

[৮৭৮] আল-কুরআন ১৬: ২৬

[৮৭৯] আল-কুরআন ৪০: ৫২

তাকওয়া অর্থ নিষ্ঠা- আন্তরিকতা বা একাগ্রতা। যেমন- "আর নিশ্চয় এটি মনের তাকওয়া অর্থাৎ, মনের একাগ্রতা।"[৮৮০]

তাকওয়া হচ্ছে মূল্যবোধ, মানসিক শুদ্ধতা ও দৃঢ়তা। এটি যে কোন ধরণের পদস্খলন থেকে মানুষকে রক্ষা, সকল মন্দ, অশ্লীল কথা, কাজ ও পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে রাখে। জনমানব শূন্য নির্জন স্থানে বা দুর্নীতি করার অসংখ্য সহজ পথ উন্মুক্ত থাকার পরও যে শক্তি মানুষকে নিজের ও দেশের ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখে তা-ই তাকওয়া। "যাদের মনে তাকওয়া রয়েছে, তাদের ওপর শয়তান তথা দুষ্ট চক্রের আক্রমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেকবোধ শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।"[৮৮১]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদের ভালো মন্দ পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন।"[৮৮২]

অর্থাৎ, তাকওয়ার ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি প্রখর হয় এবং সুষ্ঠু বিচার- বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয় তাই সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়- অন্যায় ও ভাল- মন্দ চিনতে এবং তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তার হাতে তাকওয়ার আলোকবর্তিকা থাকার ফলে জীবন পথের মন্দ দিকসমূহ সে স্পষ্টত দেখতে পায়। বিবেচনা শক্তির প্রখরতা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তার মধ্যে এমনভাবে কাজ করে যে, তার কাছে তখন ইহ- পারলৌকিক যে কোন বিষয়ের কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা স্পষ্টত ধরা পড়ে। ফলে সে কোন সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ইতস্তত, দুর্বলতা ও হীনমন্যতা ছাড়াই দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, " তোমরা আল্লাহকে ভয় কর- তাকওয়া অর্জন কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ প্রতিদান তোমাদেরকে দিবেন এবং তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে।"[৮৮৩]

অর্থাৎ তাকওয়া জীবনকে এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে, যা সকল প্রকার ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, প্ররোচনা- প্রতারণা, প্রলোভন-পদস্খলন থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখে। অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর সমুদ্রে কম্পাস বা দিক-দর্শন যন্ত্র যেমন সমুদ্রাভিযাত্রীকে সঠিক দিক- নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সমস্যা সংকুল জীবন পথে তাকওয়াও তেমনি মানুষকে নির্ভুল পথের সন্ধান দেয়।

অন্তরে তাকওয়া ধারণকারী মহাসম্মানে ভূষিত সেই মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্টত প্রতিভাত হয়েছে।

---

[৮৮০] আল-কুরআন ২২: ৩২
[৮৮১] আল-কুরআন ৭: ২০১-২০২
[৮৮২] আল-কুরআন ৮: ২৯
[৮৮৩] আল-কুরআন ৫৭: ২৮

আর তা হল এরূপ-

"এই সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এই কিতাব কেবল তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক," যারা গায়েবের ওপর ঈমান আনে, যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে আমারই নির্দেশিত পথে ব্যয় করে। যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে- ঈমান আনে তোমার আগে (নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।[৮৮৪]

এখানে তাকওয়ার মর্মার্থ সৎকাজ সম্পাদন। কেননা, "পবিত্র কুরআন সৎকর্মশীলগণের জন্য পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ।"[৮৮৫]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

"শুধুমাত্র পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ হচ্ছে, যে ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবী-রসূলগণের ওপর, আর তারই ভালবাসার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মূসাফির, পথিক, ভিক্ষুক ও সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করবে, আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, আর যারা তাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে এবং অভাবে রোগে- শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী। আর তারাই সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই তাকওয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকী।"[৮৮৬]

"তারাই হল সত্যাশ্রয়ী" অংশের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, "আয়াতে বর্ণিত ও অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডসমূহ যখন তারা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে তখনই তারা মুত্তাকীরূপে পরিগণিত হবে।"[৮৮৭]

"তারাই তো সে সব লোক যারা সত্য প্রমাণিত করেছে, আর তারাই হল মুত্তাকী।" আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবু হাইয়্যান (রহ.) বলেছেন, সত্যবাদিতা দিয়ে এখানে কথা-বার্তায় সত্যবাদিতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি কোন বিষয়ে সংবাদ দেয় তখন তা হয় এমন সত্য সংবাদ যার মধ্যে কোন মিথ্যা মিশ্রিত হয় না।"[৮৮৮]

বস্তুত "যারা সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে তারাই তো মুত্তাকী।"[৮৮৯]

---

[৮৮৪] আল-কুরআন ২: ৩-৪
[৮৮৫] আল-কুরআন ৩১: ৩
[৮৮৬] আল-কুরআন ২: ১৭৭
[৮৮৭] শায়খ আবদুর রহমান ইবন হাসান, *ফাতহুল মাজীদ*, রিয়াদ, আল বিয়াআহ্ আল-আম্মাহ, ১৯৮৩, পৃ. ৩৩৩
[৮৮৮] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ ওরফে আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (৬৫৪-৭৫৪ হি.), *তাফসীর আল-বাহুরুল মহীত*, কায়রো, *দারুল কিতাব আল-ইসলামী*, ৩য় মুদ্রণ, ১৪১৩ হি./ ১৯৯২ ঈসায়ী, খণ্ড-২, পৃ. ৮
[৮৮৯] আল-কুরআন ৩৯: ৩৩

সুতরাং, জেনে বুঝে সে কোন অন্যায়তো করেই না বরং সঙ্গদোষ বা পরিবেশ- পরিস্থিতির শিকার হয়ে কোন অনৈতিক বা পাপের কাজে প্রবৃত্ত হলে অথবা যে কোন ধরণের ভুল করলে মনে পড়ার সাথে সাথে নিজেকে সুধরে ফেলে।"[৮৯০] কোন কুসংস্কার বা গর্হিত কাজ যারা করে না তারাই মুত্তাকী।"[৮৯১]

কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রহ.) বলেন, "কল্যাণের অধিকারী সে ব্যক্তি, যে সকল হারাম ও শাহওয়াত-লালসা থেকে বেঁচে থাকে।"[৮৯২]

যুদ্ধ চলাকালীন কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণের সাথে তাওকয়ার সংযোগ ঘটলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

"আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না।"[৮৯৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বান্দাহর জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এগুলো তখনই কল্যাণ বয়ে আনে যখন তারা এগুলো জীবনের বাঁকে বাঁকে মেনে চলে ও বাস্তবায়ন করে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে করতে থাক।"[৮৯৪]

এ আয়াতের তুক্বাতিহী যথাযথ ভয় হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা, কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, 'হাক্কা তুক্বাতিহি' এর অর্থ হল, আল্লাহর সকল অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের কাজে কোন ব্যক্তির ভৎর্সনা বা নিন্দা তাকে কুণ্ঠিত করে না। সে ন্যায় নীতি অবলম্বন করে সকল কাজ সমাধা করে, হোক সে কাজ তার নিজের অথবা তার সন্তানের অথবা তার পিতার বিরুদ্ধ।[৮৯৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী নাসিরউদ্দীন বায়যাবী (রহ.) বলেন, "এখানে স্পষ্টত বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ রয়েছে যে, এটি পূর্ণাঙ্গ মানবীয় গুণাবলী সম্বলিত একটি আয়াত। এখানে বর্ণিত সমুদয় বিষয় এর শাখা- প্রশাখাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। এক. মানুষের আকীদা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার বিবরণ, দুই. সুন্দর আচার আচরণ এবং তিন. ব্যক্তি মানসের কুদৃষ্টি কালচার। প্রথমটির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে আল্লাহর বাণী মান আমানা থেকে 'ওয়ান্নাবিয়্যীন' পর্যন্ত

---

[৮৯০] আল-কুরআন ৭: ২০১
[৮৯১] আল-কুরআন ২: ১৮৯
[৮৯২] কাযী নাসিরউদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন ওমর ইবন মুহাম্মদ আল-বায়যাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
[৮৯৩] আল-কুরআন ৩: ১২০
[৮৯৪] আল-কুরআন ৩: ১২০
[৮৯৫] মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ ওরফে আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী (৬৫৪-৭৫৪ হি.), *তাফসীর আল কহরুল মুহীত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭

অংশে এবং তৃতীয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে 'ওয়া আকামাস সালাতা' থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ দিয়ে। এ কারণেই আয়াতে বর্ণিত সমুদয় গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে তার সুদৃঢ় ঈমান ও ই'তিকাদের ভিত্তিতে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাকে মুত্তাকী বলা হয়েছে তার সুন্দর ব্যবহার ও যথাযথ লেনদেনের ভিত্তিতে।"

আর এ জন্যই মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ আয়াতের ওপর আমল করল সে অবশ্যই তার ঈমান পরিপূর্ণ করল।[৮৯৬]

তাকওয়ার দাবি ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে অধিক সওয়াবের/পূণ্যের আশায় আল্লাহর ইবাদাত ও কল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হওয়া।

"তারা (আহলে কিতাবগণ) সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে সেজদায় রত থাকে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়। অকল্যাণ থেকে বারণ এবং সৎ কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল।

তারা যে সব সৎকাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বিষয়ে অবগত।"[৮৯৭]

উপর্যুক্ত আয়াতের তাৎপর্যের আলোকে প্রত্যেক মু'মিন যত বেশি ভালো কাজ করবে তার মধ্যে তত বেশি তাকওয়া বদ্ধমূল হবে।

মুত্তাকী অনুসন্ধিৎসু উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিবর্তন পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করে নাড়া দেয়, ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রাখে। ফলে সে বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

চন্দ্র- সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র তথা সৌরজগত এবং পৃথিবীর জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, রাত দিনের পরিবর্তন ইত্যাদি মুত্তাকীদের কাছে গবেষণার উপাদান হয় এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এ থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়ও তাদের সাথে সম্পর্কিত, যারা তাওকয়ার অধিকারী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সে সব লোকের জন্য যারা ভয় করে।"[৮৯৮]

---

[৮৯৬] কাযী নাসিরউদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মুহাম্মদ আল-বায়যাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
[৮৯৭] আল-কুরআন ৩: ১১৩-১১৫
[৮৯৮] আল-কুরআন ১০: ৬

বৃষ্টির পানি দিয়ে জমিতে উৎপন্ন ফল-ফসল ও উদ্ভিদের কথা চিন্তা করে এর উৎকর্ষ সাধন ও উৎপাদন বাড়ানোর ওপরও মুত্তাকী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন:

"তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?[৮৯৯]

বদান্যতা প্রদর্শন হচ্ছে তাকওয়া পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ স্বামী) যদি ক্ষমা করে, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পারিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহই সে সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।"[৯০০]

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।"[৯০১]

ইসলামের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সকল শ্রেণির মানুষের সাথে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং লেনদেনে ইসলামে কোন বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "ইসলামে কোন সংকীর্ণতা বা প্রতিবন্ধকতা নেই।"[৯০২]

মুত্তাকীগণ জাতি-ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে থাকেন। ফলে আল্লাহ তাঁদের ভালবাসেন।[৯০৩]

তবে সম্পর্ক রক্ষা ও লেনদেনের আড়ালে যেন মুসলিমদের কৃষ্টি কালচার, ধর্মীয় বিশ্বাস হারিয়ে না যায় এবং অমুসলিমদের কোন চক্রান্তে না পড়ে সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে চলার জন্য পবিত্র কুরআনে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার করে বলা হয়েছে:

"যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।"[৯০৪]

অন্য অর্থে তাকওয়া হলো, "এমন সহায়সম্বল অবলম্বন যা থাকার ফলে অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না।"

---

[৮৯৯] আল-কুরআন ১০: ৩১
[৯০০] আল-কুরআন ২: ২৩৭
[৯০১] আল-কুরআন ২: ২৪১
[৯০২] আল-কুরআন ২২: ৭৮
[৯০৩] আল-কুরআন ৩: ৭৬
[৯০৪] আল-কুরআন ৩: ২৮

“আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করতে থাকো।”[৯০৫]

তাকওয়ার মূল অর্থ যখন যাবতীয় মন্দ থেকে বিরত থাকা, সে অথে তাফসীরে জালালাইনের মতে, এর ৩টি দিক পরিলক্ষিত হয়। যথা:

১. সাধারণের তাকওয়া। তা হলো কুফর থেকে বেঁচে থাকা।
২. খাস লোকদের তাকওয়া। আর তা হচ্ছে আল্লাহর সকল নির্দেশসমূহ পালন করা এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা।
৩. বিশেষ ব্যক্তিদের তাকওয়া। আর তা হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এমন সবকিছু থেকে বিরত থাকা।[৯০৬]

মানুষের মাঝে পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক দুটি শক্তি বিরাজমান। যেমন- হক্ব- বাতিল, আলো- আঁধার, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়- অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্য থেকে হক্বের পথকে বেছে নিয়ে সেটা যতই কষ্টকর হোক না কেন এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই মুত্তাকীদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

তাকওয়া বান্দাহর সর্বোত্তম গুণাবলীর এমন এক শাশ্বত সঞ্জীবনী শক্তি যা তাকে যাবতীয় বাতিল পরিহারপূর্বক হক্বের উপর অবিচল থাকার দৃঢ়তা প্রদান করে।

**অষ্টম পরিচ্ছেদ : নিয়তের বিশুদ্ধতা**

আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড একমাত্র সেই মহান অধিপতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিমিত্তে সম্পাদিত হওয়াই ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশপালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয় মনের লক্ষ আরোপ ও উদ্যোগকে নিয়ত বলে। ফতহুর রব্বানীর গ্রন্থাকার বলেন, “নিয়ত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর আদেশ পালনার্থে কোন কাজের দিকে মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অভিপ্রায় প্রয়োগ”।[৯০৭]

ইখলাস এমন এক তেজোদীপ্ত ও সুকঠিন আত্মস্পৃহা যা আল্লাহর অপরিমেয় পরিতুষ্টি অর্জনের পথ সুদৃঢ় করে। বান্দাহ বিশুদ্ধ নিয়তে যা কিছু করে থাকে তার সবটুকুই ইবাদাত হিসেবে গণ্য। ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে নিয়তের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়।

[৯০৫] জালালুদ্দীন আল-সুয়ূতী, *তাফসীর জালালাইন*, সিঙ্গাপুর: এরাদা নশর, ওয়া ইশা'আতে ইসলামিয়্যাহ, তা:বি, পৃ. ২৯
[৯০৬] জালালুদ্দীন আল সুয়ূতী, *তাফসীর জালালাইন* সিঙ্গাপুর: এরাদা নশর ওয়া ইশা'আত ইসলামিয়্যাহ তা. বি. পৃ:৪, টীকা নং-২০
[৯০৭] *ফতওুর রব্বানী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭

এই মর্মে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এরূপঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-
"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশনা দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এটিই সঠিক দ্বীন।[৯০৮]

বান্দাহর পূর্ণাঙ্গ জীবনই একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। প্রতিটি কাজ আমরা মনে করি, কী উদ্দেশ্যে করি, আমাদের পাপ-পূণ্য তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই কতাওবানী ঈদের কথাই ধরা যাক, আমি কি মানুষকে দেখানোর জন্য গরু কিনছি, নাকি অনেক বেশি গোশত খেতে কিনছি, তা আমার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতি কষ্টের আমল মুহূর্তে বিফলে যেতে পারে, শুধু নিয়তের বিশুদ্ধতার অভাবে।
নিয়তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এটি আমলের পরিচয় বহন করে। বিষয়টি অনেকটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নম্বর এর মতো। ৭নং প্রশ্নের মত ভালো করে লেখা হোক না কেন সেখানে যদি প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর ৫ লিখা হয় তাহলে ফলাফল ০ (শূন্য)। কারণ ঐ উত্তরটি ৭নং এর জন্য সঠিক হলেও ৫নং এর জন্য ভুল। আবার উত্তর লেখার সময় কোন ক্রমিক নং না দিলেও ০ (শূন্য) পেতে হবে। রাত আটটার সময় জায়নামাজে দাঁড়িয়ে কোন ওয়াক্তের নামায সুন্নাত না নফল ব্যক্তির কিছুই জানা নেই। মনে মনে সে ধরে নেয় যে নামাজই হোক, একটা কিছু তো হবে। আসলে কিছুই হবে না, ফলাফল শূন্য।
দুই বন্ধু যাচ্ছে দেশের বিখ্যাত এক পীরের মাজারে। একজন মনে মনে ভাবছে, ওখানে গিয়ে মাজার সিজদা করলেই সকল পাপ ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে। আরেকজন ভাবছে যাক মনোবাসনা পূরণের পাশাপাশি একটা ঐতিহাসিক স্থানও দেখা হবে! ওখানে গিয়ে উভয়ই নিয়ত অনুযায়ী কাজ করেছে, ওখানে ঘুরে দেখেছে, দুই বন্ধু খুব পোজ দিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করেছে। তাদের মধ্যে দ্বিতীয়জনের শিরকের পাপ কিছুটা কম হলেও, প্রথমজন একেবারে বড় রকমের শিরক করে ফেলেছে। শিরক ইসলামে সবচেয়ে বড় পাপ, এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, যার পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এখানে এদের এ পরিণতির কারণ হলো স্রষ্টা ছেড়ে সৃষ্টির আনুগত্য তথা নিয়তের ভুল।

বিশুদ্ধ নিয়তের অভাব ও তার পরিণতি তুলে ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও শিক্ষামূলক এ হাদীসটি উদ্ধৃত হলো, "হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রসূল (সা.) বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে হাজির করবেন। একজন আলেম, একজন দানশীল ও একজন শহীদ। আলেমকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি দুনিয়াতে কি করেছ? সে উত্তর দিবে হে আল্লাহ আমি মানুষকে ইসলামি জ্ঞান শিখিয়েছি। কেন শিখিয়েছ? উত্তর দিবে, হে

[৯০৮] আল-কুরআন ৯৮: ৫

আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টির  জন্য শিখিয়েছি। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ। সেই সাথে ফেরেশতারাও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ ফেরশতারা জানে আল্লাহ সর্বদাই সঠিক। আল্লাহ বলবেন তুমি এজন্য জ্ঞান দান করেছ যেন মানুষ তোমাকে বলে লোকটি কত বড় জ্ঞানী, তোমাকে সম্মান করে, তোমাকে এটা-ওটা উপহার দেয়, এগুলো সবই তুমি পেয়েছ। এরপর আল্লাহ দানশীলকে হাজির করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, কেন দান করেছিলে? সে আল্লাহকে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ কারণে দান করেছ যেন মানুষ তোমাকে দানশীল বলে, তোমাকে যেন মনে  রাখে, তুমি যেন বিখ্যাত হতে পারো। এরপর ডাকবেন শহীদকে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন জীবন দিয়েছ? সে বলবে, আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য জীবন দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি জীবন দিয়েছিলে, কারণ লোকে তোমাকে যেন বীর  বলে, ওরা যেন তোমার মূর্তি বানিয়ে রাখে। এটুকু বলার পরে  রসূল (সা.) সামনে বসা সাহাবী মু'আয (রা.) এর ঘাড়ে হাত দিয়ে ঝাকি দিলেন। যাতে সাহাবী তার দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনে। কারণ তিনি এখন যেটা বলবেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন, হে মু'আয এরাই হচ্ছে প্রথম তিন ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রজ্জলিত করবেন।[৯০৯]

বিষয়টা কতখানি ভয়াবহ সেটা আন্দাজ করা দুস্কর। হতে পারে একজন আলেমের কথায় হাজারো লোক ইসলামের পথে এসেছে, আবার হতে পারে হাজারো লোক দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেই আলেমের দেওয়া জ্ঞানের উসিলায়। হতে পারে একজন দানশীল ব্যক্তির দানে বানানো হাসপাতালে প্রতিবছর শত শত লোক আরোগ্য হচ্ছে, অথবা তার দানের টাকায় বানানো মসজিদে ইবাদাত করে হাজারো লোক দোযখ থেকে রক্ষা পেয়েছে। একজন শহীদের জীবনের বিনিময়ে শত মানুষের কল্যাণ হয়েছে। এত কিছুর পরও এরাই প্রথম জাহান্নামী। এর কারণ, তাদের অন্তরে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য (নিয়ত) ছিল।

এখানে জিজ্ঞাসা থাকে, স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এত ভাল কাজ করার পরও তারা কেন আল্লাহর আযাবে পতিত হল! হ্যাঁ ঐ ব্যক্তিত্রয়ের প্রতিটি কাজ যদি লোক দেখানো বা বাহবার উদ্দেশ্যে না হয়ে বিশুদ্ধ নিয়ত হত তাহলে আল্লাহর ক্রোধের পরিবর্তে বিরাট সন্তুষ্টি সম্ভব হত।

যে কোন কাজে বিশেষত ইবাদাতে একাধিক নিয়তের সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে যখন একটিমাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোন কাজ সম্পন্ন হয় তখন তা খালেস নিয়তের অন্তর্গত। কে কী মনে করলো সেদিকে মনোনিবেশ না করে, লোকচক্ষু বা লোকলজ্জাকে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ সর্বক্ষণ আমাকে দেখছেন সে বিশ্বাস অন্তরে রেখে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করতে হবে।

---

[৯০৯] ইমাম নববী (র.)

খাঁটি নিয়ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ চাবিকাঠি। এর উল্টোটি ঘটলে দুনিয়া ও আখিরাতের পরিণতি হবে ভয়াবহ। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনা:

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন:

মহান আল্লাহ পাক তোমাদের শরীর ও আকৃতির প্রতি দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তরসমূহের প্রতি দেখেন।[৯১০]

ইখলাস মনের এমন একটি সূক্ষ্ম অবস্থা যা চিনতে পারা অত্যন্ত কঠিন। আর ইখলাসের উপর সম্পূর্ণ অটল থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটিতে সফল হওয়া আরোও কঠিন। দুই বা ততোধিক সংকল্পের প্রভাবে কোন কাজ সংগঠিত হলে তাতে ইখলাস থাকে না বলে আল্লাহ তা'আলার সমীপে তা গ্রহণযোগ্যও নয়।

"একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, আমি সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে প্রত্যেক পাঞ্জেগানা নামাজ জামা'আতের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলাম। একদিন আমি একটু বিলম্বে আসার কারণে প্রথম সারিতে স্থান না পেয়ে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছি। আমি অনুভব করলাম, আজ আমার পেছনের সারিতে দাঁড়ানোর লোক দেখতে পেল বলে আমার মনে লজ্জার উদ্ভব হয়েছে। কেননা তারা বলাবলি করবে দরবেশ আজ দেরী করে এসেছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এতদিন জামাতের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার জন্য আমার আগ্রহ ও আনন্দ শুধু এই জন্য ছিল যে, মানুষ আমাকে প্রতিদিন প্রথম সারিতে দেখে আমার প্রশংসা করবে। অতএব রিয়া বা লোক দেখানো মনোভাব আমার হৃদয়ে লুকায়িত ছিল বলে আমার এ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ইবাদতই বিনষ্ট হয়েছে। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমি আমার ত্রিশ বৎসরের নামাযেরই কাযা আদায় করেছি।[৯১১]

**বিশুদ্ধ নিয়তের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য:**

নবী কারিম (সা.) এর শিক্ষা হল প্রতিটি কাজের জন্য নিয়ত জরুরি, কেননা প্রত্যেক খাঁটি নিয়তের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।

হুমায়দী (রহ.) আলকামা ইবন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: আমি রসূলুল্লাহ (সা.) ক ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক কাজই নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।

একনিষ্ঠ নিয়তের অধিকারী বান্দাহর প্রতি সুসংবাদ এরূপ- নবী কারিম (সা.) বলেছেন, "কেউ একনিষ্ঠ মনে শাহাদাতের প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। যদিও সে স্বীয় বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[৯১২]

---

[৯১০] মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহহিয়া আন-নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলিহীন*, হাদীস নং-৭ (১ম খণ্ড), অনুক: মাওলানা ফজলুর রহমান, মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। বুখারী-৫১৪৪, ৬৬০৬ মুসলিম- ২০৬৪। জানুয়ারি, ২০১৫, ঈসায়ী

[৯১১] ইমাম গায্যালী (রহঃ), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, অনুক: মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, মিনা বুক হাউস, ৪৫/ বাংলা বাজার-১১০০, মার্চ, ২০১৭ ঈসায়ী

[৯১২] *রিয়াদুস সালেহীন*, হাদিস-১৩২২, [মুসলিম-১৯০৯], ৩য় খণ্ড, জিহাদ অধ্যায়, পৃ. ৫৮৩

অনেক ধৈর্য পরীক্ষার পর যে সাওয়াব অর্জিত হয়, একমাত্র বিশুদ্ধ নিয়তের গুণে বান্দাহর পক্ষে সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন সম্ভব। বিশুদ্ধ নিয়তের আবশ্যকতা তুলে ধরে আরো কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ দলীল উপস্থাপিত হলোঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শক্তিধর মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সৎ কাজ ও অসৎ কাজ দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে তা করেনি, তাকে আল্লাহ একটি পূর্ণ নেকীর সওয়াব প্রদান করেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর এ কাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়ে বেশি গুণ সওয়াব প্রদান করেন। আর যদি কোন গুনাহর কাজের ইচ্ছা করে, তা না করে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে একটি পূর্ণ সওয়াব লিখে দেন। আর যদি ইচ্ছা করার পর সে গুনাহর কাজটি করে তাহলে আল্লাহ তার একটি মাত্র গুনাহ লিখেন।"[৯১৩]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) এর বর্ণনা রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একদল সৈন্য যখন কা'বা শরীফ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমতল ভূমিতে পৌঁছবে, তখন তাদের পূর্বের ও পরের সকল লোকসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেয়া হবে। হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি আরজ করেছিলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! কিভাবে পূর্বের এবং পরের সকল লোককে ধসিয়ে দেয়া হবে। অথচ অনেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছে তারা তাদের দলভুক্ত নয়। মহানবী (সা.) বলেন, তাদের পূর্বের এবং পরের সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।"[৯১৪]

হযরত আবু বাক্‌রা নুফাই ইবনে হারিস সাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ দু'জন মুসলিম যখন তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। আমি বলেছিলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! এ হত্যাকারী সম্পর্কে তো বুঝেছিলাম, নিহত ব্যক্তির (জাহান্নামী হওয়ার) কারণ কি? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি ও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল।[৯১৫]

হযরত আবু মূসা আল আশ্‌আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের জন্য সংগ্রাম করে, আরেক ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে- এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে? এরপর রসূলুল্লাহ (সা.), "যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কালিমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, সে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।[৯১৬]

---

[৯১৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৬০৪৭, ই.ফা.বা.- ২০০৬ ঈসায়ী, অধ্যায় : কোমল হওয়া, দশম খন্ড, পৃ : ৬৮

[৯১৪] ইমাম নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*, হাদীস নং-২, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, বুখারী-২১৮৮ মুসলিম-২৮৮৪

[৯১৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-২৯, ই.ফা.বা. ২০০৬ ঈসায়ী, অধ্যায় : ঈমান প্রথম খন্ড, পৃ : ২৭

[৯১৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১২৫, ই.ফা.বা. ২০০৬ ঈসায়ী, অধ্যায়-ইলম, প্রথম খন্ড, পৃ : ৮৭

হযরত আবূ ইয়াযীদ মা'আন ইবনে আখ্নাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা সবাই সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ (রা.) কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদাকা করার জন্য বের করে মাসজিদে কোন এক লোকের কাছে তা রেখে দিয়েছিলেন। আমি গিয়ে তা নিয়ে এলাম। এতে আমার পিতা বললেন, মহান আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করিনি। আমি তখন বিষয়টা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিচারের জন্য উত্থাপন করলে তিনি ইরশাদ করেন: হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়ত করেছ তা তোমার। আর হে মা'আন! তুমি যা নিয়েছ তাও তোমার।[৯১৭]

কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভালভাবে ওযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে মাসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাকে আসতে উদ্বুদ্ধ করেনি। সে মাসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে একেকটি মর্যাদা বাড়তে থাকে এবং তার একেকটি করে পাপসমূহ সাফ হতে থাকে। এরপর সে যখন মাসজিদে প্রবেশ করে তখন থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের মজলিশে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তোমাদের সকলের জন্য দো'আ করে বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তার তাওবা কবুল করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সে কষ্ট না দেয় এবং ওযুর সাথে থাকে।[৯১৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: অতীতকালে তিনজন লোক কোথাও চলার পথে রাত যাপনের জন্য তাদেরকে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। তারা সেখানে প্রবেশ করার পর পাহাড়ের চূড়া থেকে একখানা পাথর খসে পড়ে তাদের গুহার মুখে আটকে গেল। এরপর তারা বলল- "তোমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে তোমাদের খাঁটি নেক আমলকে ওসীলা করে দো'আ করলে, পাথরের এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পার।" তাদের একজন বলল: হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা ছিলেন খুবই বৃদ্ধ। আর আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার- পরিজনের আগেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন জ্বালানী কাঠের সন্ধানে আমাকে বহুদূর যেতে হল এবং যথা সময়ে ঘরে ফিরে আসতে পারিনি, এমনকি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের রাতে খাবার জন্য দুধ দোহন করে এনে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে আছেন।

এরপর আমি তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের আগে পরিবার-পরিজনকে দুধ খাওয়াতেও আমি অপছন্দ করলাম। অতএব আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অপরদিকে আমার সন্তানগুলো পায়ের কাছে ক্ষুধার তাড়নায় গড়াগড়ি করছিল। এমতাবস্থায় সকাল হয়ে যায়। এরপর তাঁরা জেগে উঠে দুধ পান করেন। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি আপনারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে এ পাথরের কারণে আমরা যে মুসীবতে পড়েছি তা থেকে আমাদের নাজাত দিন। এতে পাথরখানা কিছুটা সরে যায় বটে, কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তাদের বের হওয়া সম্ভব হল না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল: হে মহান আল্লাহ! আমার

[৯১৭] আন-নববী, *রিয়াদুস সলেহীন*, হাদীস-৫, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত
[৯১৮] আন-নববী, *রিয়াদুস সলেহীন*, হাদীস নং-১০, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত,বুখারী-৬৪৫, ৬৪৬, মুসলিম-৬৫৫০

এক চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসতাম।অন্যদিকে বর্ণনায় রয়েছে, পুরুষ নারীকে যত বেশি ভালবাসতে পারে আমি তাকে তত বেশি ভালবাসতাম। এরপর আমি তার সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি এক দুর্ভিক্ষের বছর সে আমার কাছে এল। সে আমার কাছে নিজেকে নিরালায় অর্পণ করবে শর্তে আমি তাকে ১২০টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ছিলাম। এতে সে সম্মতি প্রকাশ করে। আমি যখন তাকে নিরালায় পেলাম, অন্য এক রেওয়াতে রয়েছে: যখন আমি তার দু পায়ের মাঝখানে বসেছিলাম, তখন সে বলল, ‘আল্লাহকে ভয় কর এবং অনধিকারে আমার কুমারীত্ব নষ্ট কর না। তখনই আমি তার কাছ থেকে ফিরে গিয়েছিলাম। অথচ মানুষের মধ্যে সে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। হে মহান আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে আমাদের এ বিপদ দূর করে দিন। এতে পাথরখানা আরও কিছুটা সরে যায়। কিন্তু তাতেও তারা পাথরটা সরাতে সমর্থ হল না।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল: ‘হে মহান আল্লাহ!আমি কয়েকজন শ্রমিক রেখেছিলাম। তাদের সবাইকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন তার পারিশ্রমিক রেখে চলে যায়। আমি তার পারিশ্রমিক ব্যবসায় খাটিয়েছিলাম। তাতে ধনসম্পদ অনেক বেড়ে যায়। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর বান্দাহ! আমার পারিশ্রমিক দিয়ে দিন। তখন আমি বলেছিলাম উট, গরু, ছাগল, চাকর- বাকর যা কিছু দেখছ এ সকল তোমার পারিশ্রমিক। সে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না।’ আমি বলেছিলাম “আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। এরপর সে সবকিছু নিয়ে চলে যায় এবং কিছুই রেখে যায়নি। হে আল্লাহ! আমি যদি আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজটি করে থাকি। তাহলে আমাদের এ বিপদ থেকে নাজাত দিন। এরপর পাথরখানা সরে যায়। এরপর তারা সকলেই বের হয়ে চলে যায়।[৯১৯]

**নবম পরিচ্ছেদ : সবর**

মানব জীবনের সর্বোত্তম গুণাবলীর ভেতর ধৈর্য বা সবর সর্বাপেক্ষা মহত্তম গুণ। যে যত বেশি এই অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের অধিকারী সে দুনিয়া ও আখিরাতে তত বেশি সাফল্য লাভে অগ্রগামী। সবর এমন এক স্বতঃসিদ্ধ ও সুতীক্ষ্ণ মনোবৃত্তির ফল যা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে করেছে আরো বেশি মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত।

সাধারণত সবর বলতে বুঝায় সুখ- দুঃখ উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁর প্রণীত জীবন ব্যবস্থার উপর অবিচল থাকা। মূলত ভোগের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তির লোভ, কুপ্রবৃত্তির দংশন এবং বিপদ আপদ ও মহা আনন্দে আত্মহারা না হয়ে দ্বীনের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় চিত্ত থাকাই সবরের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

---

[৯১৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*- ২০৭৪, ই.ফা.বা. -২০০৬ ঈসায়ী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় পরিচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করা পরে সে রাযী হলে, পৃ. ৮০

"ঈমানের শাখা- প্রশাখাগুলোর মধ্যে সবর অবলম্বন কাজটিই নিতান্তই কঠিন এবং একান্ত দুঃসাধ্য। কাজের যে অংশ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও দুঃসাধ্য তাকেই মানুষ মূল কাজ বলে গণ্য করে থাকে। এ কারণেও তুমি যদি সবরকে ঈমানের মূল বস্তু এবং সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য বলে স্থির করে নাও তাহলে সে হিসেবে সবরকে পূর্ণ ঈমান বলা যায়। এ কারণে "সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন রাসূলে আকরাম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! ঈমান কী পদার্থ? জবাবে রসূল (সা.) বলেছিলেন, সবর, কেননা, ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলোর মধ্যে সবর সর্বাপেক্ষা কঠিন"। কোন কাজকে তার কঠিনতম অংশের নাম দ্বারা প্রকাশের প্রথা প্রচলিত আছে। এ কারণে হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.) বলেছেন, আরাফার হাজ্জ্ব এর অর্থ হল হাজ্জ্ব ক্রিয়া সমাপনকালে করণীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরাফা নামক অবস্থান এবং তদাবস্থায় করণীয় কাজগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। আরাফার কাজগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা যথাযথভাবে পালিত না হলে হাজ্জ্ব ক্রিয়া সম্পন্ন হবে না। এটা ব্যতীত হজ্জের অপরাপর অংশসমূহের মধ্যে কোনটি সুচারুরূপে নির্বাহিত না হলেও হাজ্জ্ব ক্রিয়া নষ্ট হয় না।"[৯২০]

এই জন্যই বলা হয় সবর এমন একটি সঞ্জীবনী শক্তি, যার প্রভাবে মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নাকে অবদমন করে অন্তরে সদ্ভাব ও আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার অর্থ সম্পদ ও সুখ-শান্তির প্রাচুর্যের মায়ায় আমাদের ধৈর্যধারণে বিচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা থাকে, বিধায় কেবলই ভোগের তাড়নায় বিলাসবহুল এসব ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। কেননা দুনিয়ায় এসব সম্পদের সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

সম্পদ লাভের পর বিষয়টি এভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রাপ্ত সম্পদ আমাকে ঋণস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। অচিরেই তা তার প্রকৃত মালিককে তথা আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ সবরকারীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মর্মে রহমত স্বরূপ এটি কেবল তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকেই দিয়ে থাকেন।

"হযরত দাউদ নবীর (আ.) উপর অহী আসল যে, "হে দাউদ! তুমি আমার স্বভাবের অনুকরণ কর। আমার স্বভাব সমূহের মধ্যে একটি স্বভাব হল, "আমি ছাবুর" অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল।[৯২১]

হযরত ঈসা নবী (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ করে বলেছিলেন, হে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ, যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের অকৃতকার্যতার উপর সবর করতে পারবে না সে পর্যন্ত তোমরা কোন উদ্দেশ্যেই সফলকাম হতে পারবে না।[৯২২]

সবরের মৌলিক দিক তিনটি-

- আল্লাহর আদেশের উপর সবর।

---

[৯২০] ইমাম গাযযালী (রহঃ), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, মিনা বুক হাউস, ৪৫/ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, মার্চ- ২০১৭, (ঈসায়ী) , খণ্ড, পরিত্রান, পৃ. ৭৪৩-৭৪৪

[৯২১] ইমাম গাযযালী (রহঃ), *কিমিয়ায়ে সা'আদাতা*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৯

[৯২২] ইমাম গাযযালী (রহঃ), *কিমিয়ায়ে সা'আদাতা*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৯

- আল্লাহর নিষেধের উপর সবর।
- বিপদ-আপদে সবর করা।

এখানে সবর সংশ্লিষ্ট কতিপয় কুরআনের আয়াত ও হাদীস দেয়া হলোঃ

হে (মানুষ) তোমরা যারা ঈমান এনেছ, (পরম) ধৈর্য ও (খালিস) নামাযের মাধ্যমে তোমরা (আমার কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[৯২৩]

আমি অবশ্যই (ঈমানের দাবিতে) তোমাদের পরীক্ষা করব, কখনো ভয়-ভীতি, (কখনো) ক্ষুধা অনাহার, (কখনো) তোমাদের জান মাল ও ফসলাদির ক্ষতিসাধন করে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে, যারা ধৈর্যের সাথে এর মোকাবেলা করে তুমি ( সে) ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দান কর।[৯২৪]

অতএব (হে নবী), এরা যা কিছুই বলে তুমি তার উপর ধৈর্যধারণ কর। তুমি (বরং) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। সূর্যোদয়ের আগে ও তা অস্ত যাওয়ার আগে রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রান্তেও। তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর, সম্ভবত ( কেয়ামতের দিন) তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে।[৯২৫]

আর এ (বিষয়) টি শুধু তাদের (ভাগ্যেই লেখা) থাকে। যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এ (সকল) লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী।[৯২৬]

অতঃপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে এবং একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দিবে।[৯২৭]

যতক্ষণ তুমি তাদের কাছে বের হয়ে না আস, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত, তাহলে এটা তাদের জন্য খুবই উত্তম হত। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [৯২৮]

অবশ্যই তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পার এ অবস্থায় (শত্রুবাহিনী) যদি তোমাদের উপর দ্রুতগতিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের মালিক (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবে।[৯২৯]

(তাদের অবস্থা হচ্ছে) তোমাদের কোন কল্যাণ হলে (তার কারণে) তাদের খারাপ লাগে আবার তোমাদের কোন অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে। (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈয্যধারণ করতে পার এবং নিজেরা

---

[৯২৩] আল-কুরআন ২: ১৫৩
[৯২৪] আল-কুরআন ২: ১৫৫
[৯২৫] আল-কুরআন ২০: ১৩০
[৯২৬] আল-কুরআন ৪১: ৩৫
[৯২৭] আল-কুরআন ৯০: ১৭
[৯২৮] আল-কুরআন ৪৯: ৫
[৯২৯] আল-কুরআন ৩: ১২৫

সাবধান হয়ে চলতে পার তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।[৯৩০]

যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং (ভাল কাজ) করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের ( সে সব) কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিবেন।[৯৩১]

(নেককার মানুষ হচ্ছে তারা) যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং (সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের উপরই নির্ভর করেছে।[৯৩২]

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি একথা জেনে নেব, কে তোমাদের মাঝে (সত্যিকারভাবে) আল্লাহর পথে মুজাহিদ। আর কে তোমাদের মধ্যে (জিহাদের ময়দানে) ধৈর্যধারণকারী।

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা তাদের (দ্বীনের পথে) ধৈর্যধারণের জন্য দু'বার পুরস্কৃত হবে। তারা তাদের ভাল (আমল) দ্বারা মন্দ (আমল) দূর করে।

"(হে নবী) তুমি ধৈর্যধারণ কর। (ঠিক) যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল আমার (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) সাহসী নবীরা।"

হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর (ধৈর্যের এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর।] (শত্রুর মোকাবেলায়) সুদৃঢ় থেকো। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"[৯৩৩]

ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকেই আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।"[৯৩৪]

যারা এই দুনিয়ায় কোন কল্যাণকর কাজ করবে তাদের জন্য (পরকালেও) মহাকল্যাণ (থাকবে)। আল্লাহ তা'আলার জমিন অনেক প্রশস্ত (উপরন্তু) ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।[৯৩৫]

তোমার উপর কোন বিপদ মসিবত এসে পড়লে তার উপর ধৈর্যধারণ কর। (বিপদে ধৈর্যধারণ করার) এ কাজটি নিঃসন্দেহে বড় সাহসিকতা পূর্ণ কাজ।[৯৩৬]

(হে ঈমানদারগণ) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।

তোমরা ধৈর্যধারণ করো। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৯৩৭]

---

[৯৩০] আল-কুরআন ৩: ১২০
[৯৩১] আল-কুরআন ১৬: ৯৬
[৯৩২] আল-কুরআন ২৯: ৫৯
[৯৩৩] আল-কুরআন ৩: ২০০
[৯৩৪] আল-কুরআন ৩: ১৪৬
[৯৩৫] আল-কুরআন ৩৯: ১০
[৯৩৬] আল-কুরআন ৩১: ১৭
[৯৩৭] আল-কুরআন ৮: ৪৬

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যখন সে একটি কবরের পাশে উপবেশন করে কাঁদছে। তিনি বলেন, "মহান আল্লাহকে ভয় করো, এবং সবর অবলম্বন করো। সে বলল আপনি আমাকে কিছু না বলে নিজের কাজ করুন। কারণ আপনি আমার মত বালা-মুসিবতে পতিত হননি। সে মহিলা তাঁকে চিনতে পারেনি। এর পর লোকেরা বলল, ইনি হচ্ছেন নবী কারিম (সা.)। এরপর মহিলাটি নবী কারিম (সা.) এর ঘরের দরজায় এসে তাঁর সামনে এল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখেনি। সুতরাং, সে বলল, "আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।" তিনি বলেন, "সবর অবলম্বন তো প্রথম আঘাতের সময়ই হয়ে থাকে।[৯৩৮]

হযরত আবূ ইয়াহইয়া উসাইদ ইবনে হুদাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! আপনি কি আমাকে কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না, যেমন অমুককে কর্মচারী নির্বাচিত করেছেন? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "তোমরা অনতিবিলম্বে আমার পরে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সাথে হাউসে কাউসারে, সাক্ষাৎ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সবর অবলম্বন করবে।"[৯৩৯]

হযরত আবূ সাইদ সাদ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক প্রদান করেন। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ত জিনিস আর কাউকে দান করা হয়নি।"[৯৪০]

রসূলুল্লাহ (সা.) এর আযাদকৃত প্রিয় গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র উসামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) এর কন্যা সংবাদ পাঠালেন যে, আমার ছেলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত। অতএব, আপনি আমাদের কাছে আসুন। রসূলুল্লাহ (সা.) সংবাদ বাহকের কাছে তাকে সালাম দিয়ে বলেন, আল্লাহ যা নিয়ে যান তা তারই। আর যা কিছু দান করেন তাও তারই। তার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। কাজেই তোমরা ধৈর্যধারণ করে মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা কর।[৯৪১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ বলেন, আমার মু'মিন দাসের জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই। যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই আর এ সময় সে সওয়াবের আশায় সবর অবলম্বন করে।[৯৪২]

---

[৯৩৮] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১১৭৯, অধ্যায় : জানাযা, পরিচ্ছেদ : কবরের কাছে কোন মহিলাকে ববলা, সবর কর-৭৯০, খন্ড : ২য়, পৃ : ৩৬২, সপ্তম সংস্করণ, জানয়ারি ২০০৭, ই.ফা.বা.

[৯৩৯] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-৩৫২১, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম (আ), পরিচ্ছেদ : আনসারদের সম্পর্কে নবী (সা) এর উক্তি তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে....২১১৮, খন্ড : ষষ্ঠ, পৃ : ৩৪৮, ৪র্থ সংস্করণ মার্চ ২০০৬, ই.ফা.বা.

[৯৪০] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১৩৮৪, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : যাচনা থেকে বিরত থাকা-৯৩২, খন্ড : ৩য়, পৃ : ৪৪ ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত

[৯৪১] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*-১২০৯, অধ্যায় যাকাত, অনুচ্ছেদ : ৮১৫, খন্ড : ২য়, পৃ : ৩৭৭, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত

[৯৪২]ইমাম নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*, হাদীস নংঃ ৩২, ১ম খণ্ড, পৃ.: ৫৬, প্রাগুক্ত, বুখারী- ১২৮৩, ১২৫২, মুসলিম- ৯২৬

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি তাকে বলেন, এটা ছিল আল্লাহর একটা শাস্তি, মহান আল্লাহযাকে চান, তার উপর একে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি এটা মু'মিনদের জন্য রহমতে পরিণত করে দিয়েছেন। যে কোন মু'মিন দাস প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে যদি সে তার অঞ্চলে ধৈর্য সহকারে সওয়াবের নিয়তে এ কথা জেনে বুঝে অবস্থান করে আল্লাহ তার জন্য যা সুনির্ধারণ করে রেখেছেন তাতেই সে ভুগবে। তাহলে সে শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবে।[৯৪৩]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ পাক বলেছেন: আমি যখন আমার দাসকে তার দুটি প্রিয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেই)। এরপর সে তাতে সবর অবলম্বন করে, তখন আমি তাকে তার দু'টি বস্তুর পরিবর্তে জান্নাত প্রদান করি, অর্থাৎ দুটি চোখের বিনিময়ে।[৯৪৪]

হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের একজন জান্নাতী মহিলা দেখিয়ে দেব না? আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই! তিনি বলেন, এ কালো মহিলাটি রসূল (সা.) এর কাছে এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার দেহ থেকে বস্ত্র খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আবেদন করুন। তিনি বলেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে তুমি সবর অবলম্বন করতে পারো। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে আর তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আবেদন করে দেই, সে বলল আমি সবর অবলম্বন করব, কিন্তু আমার দেহ থেকে যে বস্ত্র খুলে যায় সেজন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করুন যেন আমি বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য আবেদন করেন।[৯৪৫]

হযরত আবু আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন, রসূল (সা.) কে অবলোকন করতে পারছি। তিনি নবী (আ.) গণের মধ্য হতে কোন এক নবীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর কওম তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। আর তিনি তার চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন, হে মহান আল্লাহ। আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন। কারণ তারা জানে না।[৯৪৬]

হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মুসলিম দাসের যেকোন ক্লান্তি, নিত্যব্যাধি, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন এমনকি কোন কাটা ফুটলেও এর কারণে মহান আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।"[৯৪৭]

---

[৯৪৩] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা. অধ্যায় : চিকিৎসা, পরিচ্ছেদ : প্লেগ রোগে ধৈর্যধারণকারীর সাওয়াব-২৩০২, খ : নবম, পৃ : ২৮৪, হাদীস নং-৫৩২৩

[৯৪৪] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা. অধ্যায় : রোগীদের বর্ণনা, পরিচ্ছেদ : যে ব্যাক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত- ২২৫৬, খ : ৯ম, পৃ : ২৪৪, হাদীস নং-৫২৫১

[৯৪৫] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায় : রোগীদের বর্ণনা-, ই.ফা.বা.- ২০০৬ ঈসায়ী, খ. ৯ম পৃ : ২৪৩, হাদীস নং-৫২৪৯

[৯৪৬] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায়. আম্বিয়া কিরাম, খ. ষষ্ঠ, ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী, পৃ : ১৫৫, হাদীস নং-৩২৩১

[৯৪৭] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায় : রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়, নবম খন্ড, ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী, পৃ : ২৪১, হাদীস নং-৫২৩৯

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী কারিম (সা.) কে বলল, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বলেন, রাগ করবে না। সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। আর নবী কারিম (সা.) (প্রতিবারই) বলেন, রাগ করবে না।[৯৪৮]

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কুস্তিতে অপরকে আছাড় দেয় সে শক্তিশালী নয় বরং শক্তিশালী হচ্ছে সে, রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম।"[৯৪৯]

হযরত আবু ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আউফা (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রসূল (সা.) দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য সূর্য হেলে যাবার অপেক্ষায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি দাড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রুদের সাথে সংঘর্ষে রত হওয়া কামনা করবে না। আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করবে। তাহলে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তখন সবর অবলম্বন করবে। অর্থাৎ, স্থির থাকবে। জেনে রাখবে, জান্নাত রয়েছে তরবারীর ছায়াতলে। এরপর নবী কারিম (সা.) বললেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী ও দুশমন বাহিনী পরস্তকারী আল্লাহ! তাদের পরাস্ত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।[৯৫০]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো কোন কষ্টের কারণে সে অবশ্যই মৃত্যু কামনা করবে না। যদি কেউ এরূপ করতেই চায়, তাহলে বলবে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, যে পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।[৯৫১]

**দশম পরিচ্ছেদ : দোয়া বা যিকর**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"[৯৫২]

দোয়া বা যিকর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এমন এক সুতীক্ষ্ণ প্রক্রিয়া, যার দ্বারা বান্দাহর ইহজাগতিক ও পারলৌকিক প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, এমনকি তা ভাগ্য পরিবর্তনেও সক্ষম। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের সন্তোষজনক যে কোন বিষয় নিয়ে অন্তরের গভীরে চিন্তা, মৌখিক প্রকাশ এবং সেটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এ সবই যিকর বা আল্লাহর স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। মূলত, শোয়া, বসা, কিংবা দাড়ানো সকল অবস্থায় যিকর বা আল্লাহর স্মরণে রত থাকা যায়।

---

[৯৪৮] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, অধ্যায় : আচার-ব্যবহার, খ. নবম, ই.ফা.বা.-২০৬৬ ঈসায়ী, পৃ : ৪৫৪, হাদীস নং-৫৬৮৬

[৯৪৯] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী,, অধ্যায় : আচার-ব্যবহার, খ. নবম অধ্যায় পৃ : ৪৫৩ হাদীস নং-৫৬৮৪

[৯৫০]ইমাম নববী (রহ:), *রিয়াদুস সলেহীন*- ৫৩, পৃ.- ৬৫, বুখারী-২৮১৯, ২৮৩৩, মুসলিম- ১৭৪১, ১৭৪২

[৯৫১] ইমাম বুখারী (র), বুখারী (রহ), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা-২০০৬ ঈসায়ী, অধ্যায় : রোগীদের বর্ণনা, খ. নবম, পৃ : ২৫৫, হাদীস নং-২৬৯

[৯৫২] আল-কুরআন ১৩২: ২৮

যেমন: পবিত্র কুরআনে এসেছে-

“যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।”[৯৫৩]

আর আল্লাহর এ স্মরণ হতে পারে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল, সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, দ্বীনি কোন মজলিসে বসার মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর সৃষ্ট নি'য়ামত রাজি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে।

ইমাম নববী (র) বলেন: “যিকর কেবল তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে প্রত্যেক আমলকারীই যিকরকারী হিসেবে বিবেচিত।”

সাধারণত, বান্দাহ বিপদ-আপদ বা দুঃখ- কষ্টে পতিত হলে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তার হৃদয় হতে উৎসারিত হয় পরম আকুতিপূর্ণ আল্লাহর স্মরণ। আর সহজাত এ প্রবণতা থেকেই বান্দাহ এক উচ্চতর সত্তার কাছে নিজের হীনতার কথা ব্যক্ত করে তার অপার রহমত প্রার্থনা করে।

পঞ্চাশ দশকের খ্যাতিমান রাষ্ট্রনীতিবিদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের (১৯৫৩-১৯৬১) দৃষ্টিতেও বিশ্ব সমস্যা সমাধানে দু'আ বা যিকর নিশ্চিতভাবেই ফলপ্রসূ হতে পারে। তিনি এক বাণীতে বলেন-

“বিশ্ব শান্তির স্বপ্ন কেবল তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন আমরা আধ্যাত্মিকতার প্রতি ঈমান পোষণকারী সব লোকেরা এই সৎ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব, আমাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে শান্তির কাজে নিয়োজিত করব এবং আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান দু'আ বা প্রার্থনাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেব।”[৯৫৪]

যিকর মানব জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, যেটি মানবদেহের হৃদযন্ত্রের সাথে তুলনীয়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হলে বেঁচে থাকা যেরূপ অসম্ভব, যিকরবিহীন অন্তরও তেমনি বেঁচে থেকেও মৃত।

হাদীস শরীফে এসেছে- আবূ মূসা (রা.) বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, নবী কারিম (সা.) বলেছেন, “যে তার প্রতিপালকের যিক্র করে, আর যে যিকর করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি।”[৯৫৫] (বুখারী ও মুসলিম)

---

[৯৫৩] আল-কুরআন ৩: ১৯১

[৯৫৪] হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *দর্শন বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোক দো'আ*, প্রকাশক: নাকিব পাবলিকেশন্স, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১৩,

[৯৫৫] শায়খ্ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ খতীব তাব্‌রেযী (র), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, অনু: আলহাজ্ব মাওলানা শামছুল হক সাহেব, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ৩৬, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০১, খ. ৫ম, হাদীস নং-২১৪৯

যিকরের ভাষা যাই হোক না কেন, যখন সেটি কেবল বাকযন্ত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র অন্তর জুড়ে যখন একমাত্র আল্লাহর স্মরণই স্থান পাবে, তখনই তা কেবল যিকরের পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। এটি তাদের দ্বারাই সম্ভব যাদের তাকওয়াপূর্ণ অন্তর আল্লাহর প্রেমে সিক্ত।

মানব জীবনে মূলত যিকরের চারটি অবস্থা বিরাজমান। তা হলো-

প্রথমত, যে যিকর কেবল মুখে উচ্চারিত হয়, অন্তর তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকে এরূপ যিকরের প্রভাব সামান্য হলেও নিষ্ফল নয়। কেননা এতে অন্তত জিহ্বাটিতো সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকল।যিকররত জিহ্বা নিরর্থক কথা বলা কিংবা নিষ্কর্ম রেখে দেওয়া জিহ্বা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম।

দ্বিতীয়ত, এরূপ যিকর মন থেকে হলেও ততটা স্থায়ী নয়। এ ধরণের যিকরের ক্ষেত্রে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা আল্লাহর স্মরণ সম্ভব হয়। কিন্তু তাতে চেষ্টা বা সাধনার ঘাটতি হলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

তৃতীয়ত, এরূপ যিকর দ্বারা বান্দাহ নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে বহুলাংশে সক্ষম। ফলে, অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। এমতাবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম ব্যতীত মন অন্যদিকে ধাবিত হয় না।

এবং চতুর্থত, এ প্রকারের যিকর দ্বারা বান্দাহ সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে তার স্রষ্টার নিকট সমর্পিত করে দেয়। পার্থিব কোন মোহই তাকে আল্লাহর যিকর বা স্মরণ থেকে বিমুখ রাখতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই বান্দাহর সমগ্র অন্তর জুড়ে স্থান পায়। আর এটিই অন্তরের উন্নততর অবস্থা।

আল্লাহ তা'আলার শানে যিকর সকল ইবাদাতের মূল লক্ষ। করণীয় বা বর্জনীয় সম্পর্কে বান্দাহ যখন পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে, তখনই যিকর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

যিকর মহা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রকৃত যিকরের পরশ অন্তরাত্মাকে যাবতীয় গুনাহ অসদাচারণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে আত্মিক উন্নতির শীর্ষে আরোহন ও দীদারে ইলাহি লাভের পথ প্রদর্শন করে।

নিম্নে ইসলামের আলোকে যিকরের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কিত দলীলসমূহ উদ্ধৃত হলো-

মহান আল্লাহর বাণী-

"হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাকো, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৯৫৬]

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো এবং সকাল ও সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[৯৫৭]

---

[৯৫৬] আল-কুরআন ৮: ৪৫

[৯৫৭] আল-কুরআন ৩৩: ৪১-৪২

“অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।”[৯৫৮]

“আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল- সন্ধ্যায় অনুনয়- বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”[৯৫৯]

“অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় করো, আমার সাথে কুফরী করো না।”[৯৬০]

“অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।”[৯৬১]

“আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের পক্ষ থেকে নূরের উপর রয়েছেন, (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?) অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।”[৯৬২]

“আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তারা যা আমল করতো তা শোভিত করে দেয়া হয়েছে।”[৯৬৩]

“আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।”[৯৬৪]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, “যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌঁছবে তার ফল খাবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন, “যিকরের মাজলিস।”[৯৬৫]

হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, “যে কোন মানব দল আল্লাহর যিকর করতে বসে, নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে নেয়। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ ইয়াদ করেন তাদেরকে আপন পার্শ্বচরদের কাছে।”[৯৬৬]

---

[৯৫৮] আল-কুরআন ৪: ১০৩
[৯৫৯] আল-কুরআন ৭: ২০৫
[৯৬০]আল-কুরআন ২: ১৫২
[৯৬১] আল-কুরআন ৬২: ১০
[৯৬২] আল-কুরআন ৩৯: ২২
[৯৬৩] আল-কুরআন ১০: ১২
[৯৬৪] আল-কুরআন ৩৩: ৩৫
[৯৬৫] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম , প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৫৭
[৯৬৬] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৪৭

হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার কাছে একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার রয়েছে। আর আমি বেশিও দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণই রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে যাই। আর যে আমার এক হাত কাছে আসে, আমি তার দশ হাত কাছে যাই। যে আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে দৌড়ে যাই এবং আমার কাছে পাহাড়সম গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে।"[৯৬৭]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, একদিন রসূল (সা.) বললেন, আমি কি তোমাদের বলব না যে, তোমাদের কার্য সমূহের মধ্যে কোনটি উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক পবিত্রও তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অধিক কার্যকর, সর্বোপরি তোমাদের পক্ষে সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং একথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের গর্দান কাটবে, আর তারা তোমাদের গর্দান কাটবে।

তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ। (মালিক, আহমাদ তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)।[৯৬৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাহর কাছে থাকি, যখন সে আমার যিকর করে এবং আমার তরে তার ওষ্ঠ নড়ে।"[৯৬৯]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদিন আমীর মুয়াবিয়া (রা.) মসজিদের এক বৃত্তাকার মাজলিশে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বললেন, "আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা আল্লাহর যিকর করছি। তিনি বললেন, খোদার শপথ করে বলুন, আপনারা এখানে এছাড়াও অন্য কোন কাজে বসেননাই তো? তারা বলল, খোদার শপথ করে বলছি আমরা এখানে অন্য কোন কাজে বসেননি। অতঃপর তিনি বললেন, জেনে রাখুন, আমি আপনাদের প্রতি অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। রসূল (সা.) এর কাছে আমার মত মর্যাদাবান কোন সাহাবী আমার ন্যায় এত কম হাদীস বর্ণনা করেননি। একদিন রসূল (সা.) ঘর থেকে বের হয়ে তার সাহাবীদের এক মাজলিসে পৌছলেন এবং বললেন, আপনারা এখানে কি কাজে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকর করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে ইসলামের প্রতি হিদায়াত করেছেন এবং আমাদের প্রতি ইহসান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তখন রসূল (সা.) বললেন, আপনারা এখানে এছাড়া অন্য কোন কাজে বসে নেই। তখন রসূল (সা.) বললেন, শুনুন, আপনাদের প্রতি অবিশ্বাসবশত আমি আপনাদেরকে শপথ করাইনি বরং

---

৯৬৭ খতীব তাব্‌রেযী (রহঃ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম , প্রাগুক্ত হাদীস নং-২১৫১
৯৬৮ খতীব তাব্‌রেযী (রহঃ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৫৫
৯৬৯ খতীব তাব্‌রেযী (রহঃ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত হাদীস নং-২১৭০

ব্যাপার হল এখন হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, আপনাদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করছেন।[৯৭০]

হযরত সওবান (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল- "আর যারা সোনা রূপা সঞ্চয় করে- (শেষ পর্যন্ত) আমরা রসূল (সা.) এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। তখন তার কোন সাহাবী বললেন, এটা সোনা রূপা সম্পর্কে নাযিল হল, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তা সঞ্চয় করতাম। তখন রসূল (সা.) বললেন, "তোমাদের কারও শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহর যিকরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার ঈমানের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে।[৯৭১]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার দরিদ্র মুহাজিররা রসূল (সা.) এর কাছে এসে বললেন, ধনবানরা তো সব মর্তবাসমূহ দখল করে নিয়েছেন এবং চিরন্তন নি'য়ামত সমূহ তাদের ভাগে পড়লো। (কারণ) আমরা যে সব সালাত কায়েম করি তারাও তেমনি সালাত কায়েম করে, আমরা যে সব রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে কিন্তু ধন-সম্পদের দিক দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রসর। ফলে তারা হাজ্ব করে, ওমরা করে, আবার জিহাদ করে এবং সাদ্‌কাও করে। উত্তরে রসূল (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তু বলে দেব (যার ওপর আমল করে) তোমরা নিজেদের পরবর্তীদের থেকেও এগিয়ে যাবে, আর তোমাদের মত সে আমলসমূহ না করা পর্যন্ত কেউ তোমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হবে না? তাঁরা বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার তাস্‌বীহ, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর পাঠ কর। বর্ণনকারী আবু সালেহ সাহাবী (র) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তাঁকে সে কালিমাসমূহ পাঠ করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বলেন, এ কালিমাগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এসব হচ্ছে: "সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওলাইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লহু আকবার" এবং এ প্রত্যেকটি কালিমাই হবে ৩৩ বার।[৯৭২]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেন,আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে আমি বান্দাহর সে ধারণার নিকটেই আছি। অর্থাৎ সে ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। এবং বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গেই থাকি। বান্দাহ যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে নিজে নিজে স্মরণ করি। আর সে যদি কোন জনসমষ্টি নিয়ে স্মরণ করে তবে আমিও বিশেষ দল নিয়ে স্মরণ করি যা তাদের জনসমষ্টি থেকে উত্তম। বান্দাহ যখন এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, তখন আমি একহাত

[৯৭০] খতীব তাবরেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৬৪
[৯৭১] খতীব তাবরেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৬৩
[৯৭২] মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া বিন শারফ আন্-নববী (রহ:), *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু- মাওলানা ফজলুর রহমান, প্রকাশক- মীনা বুক হাউস, নিচতলা ও ২য় তলা বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল: জানুয়ারি, ২০১৫,খ. ৩য়, হাদীস নং-১৪১৯, পৃ.:২১৯,

নিকটবর্তী হই। আর একহাত অগ্রসর হলে আমি দুহাত অগ্রসর হই। সে যদি ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয়,তখন আমি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসি।”[৯৭৩]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, “একবার রসূল (সা.) মক্কার পথে সফরে এক পাহাড়ের কাছে পৌঁছলেন, যার নাম হল জুমদান। তখন বললেন, চল, চল এটা জুমদান। আগে চলে গেল মুফাররিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, মুফাররিদ কারা ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনি বলেন, যে পুরুষ বা নারী আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করে তারা।”[৯৭৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রহ.) বলেন, “একদিন এক বেদুঈন রসূল (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে?রসূল (সা.) বললেন তার পক্ষেই খুশি যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল নেক হয়েছে। রসূল (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রসূল (সা.) বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে, আর তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির থাকবে।”[৯৭৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, “শয়তান আদম সন্তানের দিলের উপর জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্বরণ করে সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয়, তার দিলে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে।”[৯৭৬]

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, “কোন বান্দাহ এমন কোন আমল করতে পারে না যা তাকে আল্লাহর যিকর অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক রক্ষা করতে পারে।”[৯৭৭]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, কোন দল কোন মাজলিসে বসল, অথচ আল্লাহর স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দুরূদ পাঠাল না, নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হল। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাদের শাস্তিও দিতে পারেন আর যদি ইচ্ছা করেন, মাফও করে দিতে পারেন।[৯৭৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, যে কোন দল আল্লাহর স্মরণ না করে কোন মাজলিস হতে উঠল, তার নিশ্চয় মরা গাধা খেয়ে উঠল। সে মাজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে।[৯৭৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হল আল্লাহর যিকর। আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় তরবারির মালিকও নহে এমন কি যদি ভেঙ্গেও যায়।[৯৮০]

---

[৯৭৩] আল্লামা নাসিরউদ্দীন আলবানী (র),*হাদীসে কুদসী সমগ্র*, অনু: আল-মাসরুর। সম্পাদনা: অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, প্রকাশনায়: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১২, বুখারী:৭৪০৫,৭৫০৫,মুসলিম :২৬৭৫,মাজাহ:৩৮২২,তিরমিযি:২৩৮৮,

[৯৭৪] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১১৮

[৯৭৫] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৫ম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৫৬

[৯৭৬] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৬৭

[৯৭৭] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত , হাদীস নং-২১৬৯

[৯৭৮] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৬০

[৯৭৯] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ* ২১৫৯, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৫৯

[৯৮০] খতীব তাব্‌রেযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ* , ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৭১

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর স্মরণকারীদের তালাশ করে। যখন তারা কোন দলকে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখতে পান তখন একে অন্যকে বলেন, আসো! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রসূল (সা.) বলেন, অতঃপর তারা তাদের ডানা দিয়ে ঘিরে নেয় এ নিকটতম আসমান পর্যন্ত। রসূল (সা.) বলেন, তখন তাদেরকে প্রভু পরওয়ারদেগার জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত আছেন। আমার বান্দাহরা কী বলছে? রসূল (সা.) বলেন, তখন তারা বলেন, তারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখছে? রসূল (সা.) বলেন, তখন, ফেরেশতাগণ বলেন, কসম তোমার, তারা কখনও তোমাকে দেখেনি। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন যদি তারা আমাকে দেখতো কেমন হতো? রসূল (সা.) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে খোদা! যদি তারা তোমাকে দেখত তবে তারা তোমার আরও বেশি ইবাদাত করত এবং আরও বেশি মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কী চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার কাছে বেহেশত চায়। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও দেখেনি। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হতো যদি তারা দেখত? রসূল (সা.) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা দেখত নিশ্চয় তারা তার প্রচণ্ডলোভ করত, তার প্রার্থনা জানাত অধিক এবং তার আগ্রহ বেশি প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? তোমার কসম, তারা কখনও তা দেখেনি। রসূল (সা.) বলেন, তারা কখনও তা দেখেনি। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কেমন হতো যদি তার দোযখ দেখত? রসূল (সা.) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা দোযখ দেখতো, তবে তা হতে বেশি দূরে যেত এবং তা হতে বেশি ভয় করত। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তারা কি তা দেখেছে? রসূল (সা.) বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও তা দেখেনি। রসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কেমন হতো যদি তারা দোযখ দেখত? রসূল (সা.) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর করেন, যদি তার দোযখ দেখত, তবে তা হতে বেশি দূরে যেত এবং তা হতে বেশিভয় করত। রসূল (সা.) বলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রসূল (সা.) বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে ওঠেন, তাদের ওমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো শুধু তার কোন কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তার এমন সভাসদ যাদের কোন সদস্যই হতভাগ্য হয় না।[৯৮১]

[৯৮১] আল্লামা নাসিরউদ্দীন আলবানী (র),*হাদীসে কুদসী সমগ্র*, অনু: আল-মাসরুর। সম্পাদনা: অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজাম্মেল পৃ.:৯০ হক,বুখারী:৬৪০৮,মুসলিম:৪৮/০৮,প্রাগুক্ত

**একাদশ পরিচ্ছেদ : শোকর**

শোকর আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের পছন্দনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সৌভাগ্যবান বান্দাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বাবস্থায় সে মনে প্রাণে তার মহান রবের অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। আর শুকরিয়া জানাতে গিয়ে প্রাপ্ত নিয়ামাতের প্রকৃত দাতা সম্পর্কে বান্দাহর পূর্ণ জ্ঞান রাখা আবশ্যক। কেননা সঠিক জ্ঞানের অভাবে ব্যক্তির চিন্তাধারা শিরকের পথে ধাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং, শোকর সম্পর্কে জ্ঞান রাখা বান্দাহর জন্য অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

*"এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে।" (৬৭:২৩)*

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি যেকোন সম্পদ দ্বারা কারো উপকার সাধন করলে সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তরে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, উক্ত নিয়ামাত বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাকে দান করেছেন। কিন্তু সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ঐ ব্যক্তিকেই প্রকৃত নিয়ামাত দাতা হিসেবে ধরে নেয়, তবে তা হবে নিতান্ত বোকামি। তার এ ধারণা শুকরিয়া আদায়ের মর্যাদা হারায়। রাত্রি শেষে সূর্যের আলোয় প্রকৃতি যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন মু'মিন বান্দাহর অন্তরে এ বোধ জাগ্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, ঐ আলোর উৎস সূর্যেরও আসল মালিক আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন। কাজেই শুকরিয়া লাভের একমাত্র পূর্ণ দাবিদার ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

হযরত মূসা নবী (আ.) আল্লাহর দরবারে আরজ করেছিলেন: *"হে আল্লাহ; হযরত আদম (আ.)-কে আপনি স্বীয় কুদরতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে নানাবিধ নি'য়ামত প্রদান করেছেন। তিনি উক্ত নি'য়ামত সমুহের বিনিময়ে আপনার প্রতি কিরূপ শোকর করেছেন? জবাব আসল: আদম স্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত নি'য়ামতই সে আমার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এরূপ বুঝতে পারাই তার প্রকৃত শোকর।"* [৯৮২]

ব্যক্তি কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ফলে তার অন্তরে তিন ধরণের আনন্দের উদ্ভব ঘটে।

প্রথমত, নি'য়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ ভেবে আনন্দিত হয়ে থাকে যে, এ নিয়ামতের জন্য সে একান্ত মুখাপেক্ষী ও অভাবগ্রস্থ ছিল এবং সেটি পেয়ে তার যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে বলেই সে আনন্দিত। মূলত, তার এ আনন্দ শোকরের উদ্দেশ্যে নয়। কেননা এটা প্রকৃত নি'য়ামত দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, এটা মনে করেও সে খুশী হতে পারে যে, নি'য়ামত দাতা সন্তুষ্ট হয়ে তা তাকে দান করেছেন, এমনকি ভবিষ্যতে সে আরো কিছু পাওয়ার আশাও রাখে। প্রাপ্তির এ আনন্দ কৃতজ্ঞতার অন্তর্গত হলেও সেটি প্রকৃত কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ  নয়।

---

[৯৮২] ইমাম গাজ্জালী (রহ:), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ইমাম গাজ্জালী (রহ:), অনু: মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, প্রকাশনী- মীনা বুক হাউস, বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, দোকান নং- ২০৮ (২য় তলা), ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ৭ম মুদ্রণ: মার্চ- ২০১৭ইং, পৃ. ৭৫৫

তৃতীয়ত, প্রাপ্ত নি'য়ামতকে আল্লাহ পাক প্রদত্ত এবং তারই সান্নিধ্য লাভের উপায় ভেবে আনন্দিত হলেই এ স্তরের আনন্দ প্রকৃত শোকর বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, বান্দাহর পক্ষে কোনভাবেই এটি সমীচীন নয় দ্বিতীয় স্তরের নিচে থাকা। কেননা প্রথম স্তরতো শোকরের পর্যায়ভুক্তই নয়।

মূলত, তিনটি উপায়ে শোকর আদায় করা সম্ভব।

ক) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মারফত শোকর

খ) মৌখিক শোকর এবং

গ) আত্মিক শোকর

**ক) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মারফত শোকরের পরিচয়**

দেহ ভাণ্ডারের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আল্লাহ তাআলার একেকটি অমূল্য দান এবং বিরাট নি'য়ামত। মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তা স্ব-স্ব উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রাখাই সত্যিকার শোকর হিসেবে পরিগণিত হবে।

**খ) মৌখিক শোকরের পরিচয়ঃ**

একমাত্র যার মেহেরবানিতেই মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ সম্ভব, সেই মহিমাময় আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের দানের বিষয়টি আমলে নিয়ে সর্বান্তঃকরণে আলহামদুলিল্লাহ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েই মৌখিক শোকরের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে থাকে।

**গ) আত্মিক শোকরঃ**

অন্তরের শোকর এরূপ, কাউকে ভাল থাকতে দেখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে নিজের যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। এমনকি ব্যক্তি নিজের জন্য আল্লাহর কাছে যেরূপ কল্যাণ কামনা করে থাকে, অপরের জন্যও তদ্রুপ মঙ্গল কামনা করাই প্রকৃত শোকরের পরিচায়ক।

আল্লাহর নি'য়ামতরাজি মানব জীবনে যেহেতু প্রতিটি হৃদস্পন্দনের ন্যায় সদা বহমান, তাইতো সেই মহান রবের প্রতি শোকর গুজারি করতঃ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়টি কতটা উর্ধ্বে তা বান্দাহকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণের একটি সুন্দরতম উদাহরণ প্রখ্যাত মনীষী উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ) এর জীবদ্দশায় পরিলক্ষিত হয়।

উরওয়া বিন যুবাইর (রঃ) এর এক পুত্র নিহত। কোন এক ঘা বা ক্ষতস্থলে পচন ধরলে তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়। তবুও তিনি মহান প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্বক বলেছিলেন আল্লাহ আমার ৪টি সন্তানের মধ্যে ১টি নিয়েছেন এবং বাকী রেখেছেন ৩টি, আমার ৪টি হাত পায়ের মধ্যে ১টি নিয়েছেন এবং বাকী রেখেছেন ৩টি। আল্লাহর

কসম। তিনি নিয়েছেন কমই। রেখেছেন অনেক। দু-একটি বিপদ দিলে ঘাবড়াবার কি আছে? সারা জীবনই তো তিনি আমাকে আরাম-আয়েশে রেখেছেন।[৯৮৩]

মহান আল্লাহর বাণী-

"তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর, এবং কখনও আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[৯৮৪]

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরবে না। (আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট (হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে, আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করব, আর যে ব্যক্তি আখিরাতে পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাকে সে (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করব। এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞদের (যথার্থ) প্রতিফল দান করব।"[৯৮৫]

"(তোমরাই বল) আল্লাহ তাআলা কি (খামাখা) তোমাদের শাস্তি দেবেন- যদি তোমরা (তার প্রতি) কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং তার ওপর ঈমান আন; (বস্তুত) আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন (সর্বোচ্চ) পুরস্কারদাতা ও সম্যক ওয়াকীফহাল।"[৯৮৬]

আমি তোমাদের (এই) জমিনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি (এজন্য) আমি তাতে তোমাদের জন্য সব ধরণের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।" কিন্তু তোমরা (আমার এ নিয়ামাতের) খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।"[৯৮৭]

অতঃপর (পথভ্রষ্ট করার জন্য) আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছনে দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে, ফলে তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না।"[৯৮৮]

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা কিছু পবিত্র ও হালাল রিযক দিয়েছেন, তোমরা তা আহার কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই গোলামী কর, তাহলে (এজন্য) আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"[৯৮৯]

"নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন এক উম্মত (এর সমমর্যাদাবান, তিনি ছিলেন) আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ (বান্দাহ), তিনি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, (তিনি ছিলেন) আল্লাহ তা'আলার নিয়ামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (নবুয়াতের জন্য) বাছাই করেছেন এবং তিনি তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন।"[৯৯০]

"আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে। আর যে অকৃতজ্ঞ হবে তবে সে জানুক যে, নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত অধিক দাতা।"[৯৯১]

---

[৯৮৩] (*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৪/৪৩০-৪৩১)
[৯৮৪] আল-কুরআন ২: ১৫২
[৯৮৫] আল-কুরআন ৩: ১৪৫
[৯৮৬] আল-কুরআন ৪: ১৪৭
[৯৮৭] আল-কুরআন ৭: ১০
[৯৮৮] আল-কুরআন ৭: ১৭
[৯৮৯] আল-কুরআন ১৬: ১১৪
[৯৯০] আল-কুরআন ১৬: ১২০-১২১
[৯৯১] আল-কুরআন ২৭: ৪

"হে মু'মিণগণ! তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা শোকর করো, এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।"[৯৯২]

আর তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, "যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।[৯৯৩]

"সে তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দাহ।[৯৯৪]

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বায়ু পাঠান (বৃষ্টির) সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে রহমত আস্বাদন করাতে এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করে, আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারো।[৯৯৫]

তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় পাত্র এবং স্থির হাড়ি নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার বান্দাহদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।[৯৯৬]

"আর তোমরা যা চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামাত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।"[৯৯৭]

নবী কারিম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পানাহার করে শোকর করে তার মর্যাদা ধৈর্যশীল রোজাদারের ন্যায়।[৯৯৮]

নবী কারিম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ অবশ্যই পছন্দ করেন ঐ বান্দাহকে যে খাদ্য গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পান করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে।"[৯৯৯]

আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন বান্দাহর পুত্রের ইন্তিকাল হয় মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দাহর পুত্রের জান কবয করে নিলে? ফেরেশতারা উত্তর দেন হ্যা। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলেন, এতে আমার বান্দাহ কী বলল? ফেরেশতারা জবাব দেন, আপনার তারিফ করল, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজীউন" পড়ে। একথা শুনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করো এবং এর নাম দাও "বাইতুল হাম্‌দ।"[১০০০]

---

[৯৯২] আল-কুরআন ২: ১৭২

[৯৯৩] আল-কুরআন ১৪: ৭

[৯৯৪] আল-কুরআন ১৭: ৩

[৯৯৫] আল-কুরআন ৩০: ৪৬

[৯৯৬] আল-কুরআন ৩৪: ১৩

[৯৯৭] আল-কুরআন ১৪: ৩৪

[৯৯৮] ইমাম বুখারি (র), *সহীহ আল-বুখারী*, ই.ফা.বা. প্রাগুক্ত, খন্ড:৯ম, অধ্যায়: আহার সংক্রান্ত, পরিচ্ছেদ: কৃতজ্ঞ আহারকারী। পৃ.:১৪৪,

[৯৯৯] ইমাম আন-নববী (রহ:), *রিয়াদুস সলেহীন*, তৃতীয় খণ্ড, মীনা বুক হাউস, ৪৫/বাংলাবাজার ঢাকা, ১১০০, প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ২০১৫, (ঈসায়ী), মুসলিম- ২৭৩৪ পৃ.: ৬০৫, হাদীস নং: ১৩৯৭

[১০০০] ইমাম আন-নববী (রহ:), *রিয়াদুস সলেহীন*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত। সহীহ আল-জামে- ৭৯৫, সহীহ হাদীস সিরিজ- ১৪০৮, পৃ.: ৬০৫, হাদীস নং: ১৩৯৬

নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।"[১০০১]

হযরত আবু ইয়াহ্ইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সকল কাজই কল্যাণময় ও আনন্দজনক। কিছু হলে সে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে, তাতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আবার তার দুঃখজনক কিছু হলে সে মহান আল্লাহর ওপর ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর।"[১০০২]

**দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : তাওবা ও ইস্তিগফার**

গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ ও দুনিয়া এবং আখিরাতে নিশ্চিত সাফল্যের একমাত্র পথের দিশারী হলো খাঁটি তাওবা। মু'মিনদের প্রতি সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ,তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো" ।[১০০৩]

এ আয়াতের মর্মবাণী থেকে একথা উপলব্ধি হয় যে, পাপ পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ব্যক্তির পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাওবা। তাওবা বান্দাহর অন্তরের গভীরে উত্থিত অনুতাপ ও অনুশোচনার এমন এক চূড়ান্ত রূপ যা পথভ্রষ্টকে কেবল পবিত্রই করে না বরং আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং রূহানী সেতু বন্ধন গড়ে তোলে।

মূলত তাওবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, রহমানের নিকট কৃত অপরাধ স্বীকারপূর্বক কায়মনোবাক্যে স্বীয় আত্মার পরিশুদ্ধির নিমিত্ত এমনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা যেন উক্ত ভ্রষ্টতায় ভবিষ্যতে আর কখনোই লিপ্ত হবে না।

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শয়তান মানুষকে জঘন্যতম কুমন্ত্রণা এবং প্ররোচনা দ্বারা বিপথগামী করে আসছে। ফলে সর্বদা মানুষের পক্ষে শয়তানকে পরাজিত করে নিষ্পাপ জীবন- যাপন কঠিন। এমতাবস্থায় যে কোন ধরণের পাপ সংঘটিত হওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা করে ভ্রষ্টতা পরিহারপূর্বক আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্বের পথে ফিরে আসা বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য।

মানব জীবনের তাওবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা এই যে, আগুনে না পুড়ালে লোহার মরিচা যেমন দূর হয় না, তেমনি তাওবার প্রখর ও দীপ্ত অনল ব্যতিত অন্তরের মরিচা দূরীভূত করা যায় না। তাওবার প্রভাব পাপীর কঠিন হৃদয়ে তীব্র অনুশোচনার আগুন জ্বালিয়ে তার অন্তর-আত্মাকে প্রচ্ছন্ন ও নরম করে দেয়। আত্মা (হৃদয়) মূলত পরিষ্কার আয়নার ন্যায় মসৃণ ও স্বচ্ছ পদার্থ। মানুষ যদি সেই স্বচ্ছ আত্মাকে পাপরূপ মরিচা থেকে নির্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন

---

[১০০১] ইমাম তিরমিযি (র.), *তিরমিযি শরীফ*, অধ্যায়ঃ সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা, অনুঃ তোমার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৮৬, হাদীস নং-১৯৬০

[১০০২] আন নববী (রহঃ), *রিয়াদুস সলেহীন*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.: ৫০, হাদীস নংঃ ২৭, মুসলিম- ২৯৯, আহমদ- ১৮৪৫৫

[১০০৩] আল-কুরআন ২৪: ৩১, রুকু-৪

অবস্থায় রেখে আখিরাত পার হয়ে যেতে পারে, তবে সেই স্বচ্ছ আয়নায় মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিবিম্ব অতি সহজেই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু এই আত্মা পুনঃপুনঃ পাপে নিমজ্জিত হয়, তৎক্ষণাৎ মলিনতায় হৃদয় ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার ইবাদাত করলে প্রত্যেকটি ইবাদাতের ফলে একেকটি নূর উদিত হয়ে অন্তরের কালিমাকে ক্রমশ দূরীভূত করতে থাকে। এ দ্বন্দ্বের মাঝখানে অকস্মাৎ তাওবা এসে পাপের মরিচা দূর করে ফেললে আত্মা তার স্বাভাবিকতা ফিরে পায়।

পাপকার্য স্বভাবতই মানুষের নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ও লোভনীয় সামগ্রী। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপের কারণে সত্যিকারের লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যথার্থ তাওবা করে, তখন তার দৃষ্টিতে ঐ পাপের গ্লানি বিষ মিশ্রিত মধুতুল্য। যে কেউ একবার বিষ মিশ্রিত মধুপান করে মহা যন্ত্রণা ও কষ্টে পতিত হয়েছে, পুনরায় ঐ বস্তু পান তো দূরের কথা, অন্তরে ভাবনার উদয় হওয়া মাত্রই সে শিউরে উঠবে। তাওবাকারীর নিকট পাপের অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ। যে ব্যক্তি পাপের দরুণ আত্মার ক্ষতি টের পেয়ে আখিরাতে ধ্বংসের আশঙ্কায় পাপ থেকে তাওবা করেছে, পুনরায় পাপ কাজের প্রতি তার লোভের সঞ্চার হলেও পাপের কঠিন পরিণতির কথা ভেবে স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দুই অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাওবা ওয়াজিব।

প্রথমত, এরূপ যখনই কেউ শরী'য়াহ মোতাবেক বালেগের সীমায় উপনীত হয়, সে যদি কাফির হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তাঁর মহিমাময় কার্যাবলী, তাঁর নির্ধারিত ধর্ম বিধান এবং আখিরাতের হিসাব নিকাশের প্রতি অবিশ্বাসী হয় তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া মাত্রই উক্ত অবিশ্বাস থেকে তাওবা করে নেয়া তার প্রতি ওয়াজিব বা অবশ্যকর্তব্য।

দ্বিতীয়ত, আর যদি সে ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং তার ইসলাম কেবল পিতা-মাতার দেখাদেখি অনুসরণ হয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের কালিমাগুলো শুধু তাদের নিকট থেকে শুনে বিনা অর্থ গ্রহণে কেবল মুখে আওড়ায়। অথচ অন্তর উক্ত কালিমার মর্মার্থ থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পক্ষে উক্ত অজ্ঞতা ও অমনোযোগিতা থেকে তাওবা করে কালিমার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা ওয়াজিব। যাতে করে সে ঈমানের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয় এবং ঈমানী নূরের পরশে তার অন্তঃকরণ আলোকদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

**তাওবার গুরুত্বঃ**

আল্লাহর নিকট ঐ সকল বান্দাহ সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যাদের দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথেই প্রকৃত তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

তাওবার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিন্তু যারা তাওবা করেছে, আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তা'আলা এমন সব লোকদের (পিছনের) গুনাহ সমূহ তাদের নেক আমল দ্বারা বদলে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর যারা তাওবা করে এবং নেক কাজ করে আল্লাহর প্রতি তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা।"[১০০৪]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাওবাকারীদের কতটা ভালবাসেন এবং ক্ষমা করতে পছন্দ করেন।পাপে লিপ্ত হয়ে বান্দাহ জাহান্নামে পতিত হক; আল্লাহ তা কোনভাবেই চান না। কেননা তিনি যে রহমানুর রহীম।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তারা কি আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[১০০৫]

আলোচ্য আয়াতের মূল কথা এই যে, পাপ করার পর বান্দাহ তাওবা করলে তিনি পাপ মোচন করবেন এবং সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। তিনি চান বান্দাহ প্রকৃত তাওবার মাধ্যমে জান্নাতের অমিয় সুধা পান করুক।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো একান্ত খাঁটি তাওবা, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের মালিক (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং বিনিময়ে (পরকালে) তিনি তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা।[১০০৬]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তার বান্দাহকে একনিষ্ঠভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সহীহ নিয়তে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন।

অন্যত্র এসেছে, "আল্লাহর কাছে তাদের তাওবা সত্যিকারের তাওবা, যারা অজ্ঞতাবশত খারাপ কাজ করে এবং সাথে সাথে তাওবা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল  করেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"[১০০৭] এ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে বান্দাহকে তাওবা করতে বলেন। আর আল্লাহ এরূপ মু'মিন বান্দাহর তাওবাই কবুল  করে থাকেন।

আল্লাহর সন্তোষজনক ইবাদাত সমূহের মধ্যে তাওবা অন্যতম। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে আয়াতত্রয়ের ভাষ্য: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী করুণাময়।[১০০৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন: জেনে রাখুন আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ক্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।[১০০৯]

তাওবার বরকতে আল্লাহর নিয়ামতের প্রাচুর্য যেমন- গুনাহ মাফ, বৃষ্টি বষণ, সন্তান ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য এবং জান্নাত লাভ সম্ভব হয়। ইরশাদ হচ্ছে "অতঃপর নূহ (আঃ) বলেছেন: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা

---

[১০০৪] আল-কুরআন ২৫: ৭০-৭১
[১০০৫] আল-কুরআন ৫: ৭৪
[১০০৬] আল-কুরআন ৬৬: ৮
[১০০৭] আল-কুরআন ৪: ১৭
[১০০৮] আল-কুরআন ২: ১৯৯
[১০০৯] আল-কুরআন ৪৭: ১৯

প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করবেন, ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।[১০১০]

পূর্বের নবী-রসূলদের আল্লাহ- তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আকুতি এরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: "হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা- মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।[১০১১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম ও হাওয়া (আঃ) এর তাওবা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন: তারা উভয়ে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।[১০১২]

অনিচ্ছায় সংঘটিত কিবতী হত্যার ঘটনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আ'লামিনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হযরত মূসা (আঃ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন।[১০১৩]

আর নবী করিম (সা.) তাওবার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তার উম্মতদের অনুপ্রাণিত করেছেন "হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, খোদার কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।"[১০১৪]

হযরত আগার মুযানী (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, হে মানবমন্ডলী! আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আর আমিও দিনে একশত বার তার কাছে তাওবা করি।[১০১৫]

রসূল (সা.) ছিলেন সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত এবং সম্পূর্ণ বেগুনাহ। তারপরও তিনি দৈনিক ৭০ থেকে ১০০ বার তাওবা করতেন। যাতে এ থেকে বান্দাহ শিক্ষা নিয়ে তাদের গুনাহ সমূহকে মাফ করিয়ে নিতে পারে।

মহান আল্লাহ তাওবা কবুলের জন্য সদা প্রস্তুত। "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক গড়গড় করার অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের আগ পর্যন্ত বান্দাহর তাওবা কবুল করেন।[১০১৬]

---

[১০১০] আল-কুরআন ৭১: ১০-১২

[১০১১] আল-কুরআন ৭১: ২৮

[১০১২] আল-কুরআন ৭: ২৩

[১০১৩] আল-কুরআন ২৮: ১৬

[১০১৪] শায়খ ওলি উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তাব্‌রেযী (র), *মিশকাত শরীফ*, অনু: আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামছুন প্রকাশকাল- এপ্রিল ২০১০ইং, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং-(২২, ০৮),

[১০১৫] খতিব তাবরেযী (রহ:) *মিশকাত শরীফ*, হাদীস নং- ২২০৯ (মুসলিম) পৃ.: ৩৯৪ প্রাগুক্ত

[১০১৬] মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন শারফ আন-নববী (রহ), *রিয়াদুস সালেহীন* হাদীস নং-১৮, অনু. মাওলানা ফজলুর রহমান, প্রকাশক- মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০ প্রকাশকাল-২০১৫, ১ম খণ্ড, তিরমিযী-৩৫০৭, ইবনে মাজাহ-৪২৫৩

উক্ত হাদীসে রসূল (সা.) উম্মতদেরকে তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর ক্ষমা প্রার্থনার উত্তম সময় হল ফরজ নামাজ শেষে ও শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আর চোখের পানি ফেলে যে তাওবা করা হয় তা আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয়।

এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণিত তাওবা ও ইস্তিগফার সংশ্লিষ্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি তুলে ধরা হল- "আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর।"[১০১৭]

"অতঃপর অবশ্যই তোমার মালিক (তাদের ওপর দয়া করেছেন) যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহের কাজ করলো, অতঃপর (অন্যায় বুঝতে পেরে) তাওবা করলো এবং (সে অনুযায়ী) নিজেদেরকে সংশোধনও করে নিলো (হে নবী) তোমার মালিক অবশ্যই এরপর তাদের জন্যে (হবেন) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১০১৮]

গুনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বিপুল প্রভাব- প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, (একদিন) তার দিকেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।[১০১৯]

এরপরও আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১০২০]

আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতঃপর হিদায়াতের পথে থাকলো।[১০২১]

তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে (তার কথা আলাদা), আশা করা যায় সে মুক্তি প্রাপ্তদের শামিল হবে।[১০২২]

অবশ্য যে সব ব্যক্তি এ (অন্যায়ের) পর তাওবা করে এবং (নিজেদের) শুধরে নেয়, (তাদের কথা আলাদা) আল্লাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[১০২৩]

আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত ও তাঁর রসুলও। এখন যদি তোমরা তাওবা করে নাও তবে তা, তোমাদের জন্যও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও তবে জেনে রেখো তোমরা আল্লাহকে শক্তি সামর্থহীন করতে পারবে না। আর হে নবী! অস্বীকারকারীদের কঠিন আযাবের সুখবর দিয়ে দাও।[১০২৪]

---

[১০১৭] আল-কুরআন ১১: ৩
[১০১৮] আল-কুরআন ১৬: ১১
[১০১৯] আল-কুরআন ২৩: ৩
[১০২০] আল-কুরআন ৯: ২৭
[১০২১] আল-কুরআন ২০: ৮২
[১০২২] আল-কুরআন ২৮: ৬৭
[১০২৩] আল-কুরআন ২৪: ৫
[১০২৪] আল-কুরআন ৯: ৩

“আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছিলো। তাকে গর্ভধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমনকি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছেঃ “হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে যে সব নি'য়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ করো। আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমাকে সুখ দাও। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত মুসলিম বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত।”[১০২৫]

তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়।আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১০২৬]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর তাওবাহর কারণে সেই লোকের চেয়ে অধিক খুশি হন, যে লোক মরুভূমিতে তাঁর উট হারিয়ে পরে তা ফিরে পায়।”[১০২৭]

হযরত আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেছেন, “মহান আল্লাহ রাতে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের গুনাহগার তাওবা করে। এমনকি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে।”[১০২৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আগে অর্থাৎ কিয়ামতের আগে (তার গুনাহ থেকে) তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।”[১০২৯]

হযরত আবূ নুজাইদ ইমরান ইবনে হোসাইন আল খুসাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। জোহাইন গোত্রের এক মহিলা যিনার কারণে গর্ভবতী হয়ে রসূল (সা.) এর দরবারে এসে বলল, “ইয়া রসূলুল্লাহ! “আমি শাস্তিযোগ্য অন্যায় করেছি, আমাকে এর জন্য শাস্তি প্রদান করুন।” রসূল (সা.) তার অভিভাবককে ডেকে এনে বলে দেন, “এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, যখন সে সন্তান প্রসব করবে তখন আমার কাছে নিয়ে আসবে।” এ লোকটি তাই করেছিল। রসূল (সা.) তাকে শাস্তির আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল এবং নির্দেশানুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। এরপর রসূল (সা.) তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত উমার (রা.) বলেন,

---

[১০২৫] আল-কুরআন ৪৬: ১৫

[১০২৬] আল-কুরআন ৭৩: ২০

[১০২৭] ইমাম বুখারি (র), *সহীহ বুখারী*, ই.ফা.বা,প্রাগুক্ত, খঃ ৯ম, অধ্যায়ঃদু'আ,পরিচ্ছেদঃতাওবা করা-২৬১৭, পৃ.:৫৫৪, হাদীস নং-৬৩০৯

[১০২৮] আন্ নববী (রহঃ) *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু. মাওলানা ফজলুর রহমান, প্রকাশক-মীনা বুক হাউস, আবু জাফর, ৪৫, বাংলা বাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল- জানুয়ারি ২০১৫, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬, মুসলিম-২৭৫৯, আহমদ-১৯০৩৫, ১৯১২২

[১০২৯] আন্ নববী (রহঃ) *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭, মুসলিম-২৭০৩, আহমদ-৭৬৫৪, ৮৮৮৫

ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি যিনাকারিণীর জানাযার নামাজ পড়েছেন? রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “সে এমন তাওবা করেছে যে, তা ৭০ জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের (মুক্তির) জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এ মহিলা তার নিজের প্রাণকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কোরবানী করে দেয় তার এরূপ তাওবা অপেক্ষা ভাল কোন কাজ তুমি পেয়েছ কি?[১০৩০]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ পাক এমন দু ব্যক্তির প্রতি হাসবেন, যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। একজন আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে শহীদ হবে। এরপর আল্লাহ পাক হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে (যুদ্ধে শরীক হয়ে) শহীদ হয়ে যাবে।[১০৩১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, “শয়তান বলল, প্রভু হে! তোমার ইজ্জতের কসম- আমি তোমার বান্দাহদেরকে গোমরাহ করতে থাকব, যে পর্যন্ত তাদের প্রাণ দেহে থাকে। তখন প্রভু পরওয়ারদেগার আযযা ও জাল্লা বললেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং উচ্চ মর্যাদার কসম- আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকব যে পর্যন্ত তারা আমার কাছে মাফ চাইতে থাকবে।[১০৩২]

হযরত আব হুরাইরা (র) বলেন, রসূল (সা.) বলেন, তার শপথ যার হাতে আমার জান রয়েছে, যদি তোমরা গুনাহ করতে, আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহ তা’আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিতেন।[১০৩৩] হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, কোন বান্দাহ অপরাধ করল এবং বলল হে প্রভু! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাকে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করলেন তত দিন সে অপরাধ না করে রইল। আবার অপরাধ করল এবং বলল হে প্রভু! আমি আবার অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাকে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাহকে ক্ষমা করলাম। সে যা ইচ্ছা করুক।[১০৩৪]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, বানী ইসরাঈলের মধ্যে দু ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন বড় আবিদ ছিল, আর অপরজন বলত আমি গুনাহগার। আবিদ তাকে বলত বিরত থাক যাতে তুমি লিপ্ত

---

[১০৩০] আন্ নববী (রহঃ) রিয়াদুস সালেহীন, ২২, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, মুসলিম- ১৬৯৬, তিরমিযী-১৪৩৫

[১০৩১] ইমাম বুখারী (র), *বুখারী শরীফ*, ই.ফা.বা- ২০০৬ ঈসায়ী, পঞ্চম খন্ড, অধ্যায় : জিহাদ, ১৩৪, হাদীস নং-২৬৩০

[১০৩২] খতীব তাব্রেযী (রহঃ) *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২২৭

[১০৩৩] খতীব তাব্রেযী (রহঃ) *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২১২

[১০৩৪] খতীব তাব্রেযী (রহঃ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত,বুখারী ও মুসলিম, হাদীস নং-২২১৭

আছ তা থেকে, আর সে বলত আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। অবশেষে একদিন সে তাকে এমন একটি অপরাধে লিপ্ত পেল যাকে সে কড়া গুরুতর মনে করল এবং বলল বিরত থাক। সে বলল, আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর দারোগা করা হয়েছে? তখন সে বলল, খোদার কসম, তোমাকে আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না এবং বেহেশতে দাখিল করবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবজ করল এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে একত্র হল। তখন তিনি গুনাহগারকে বললেন, আমার রহমতের দ্বারা তুমি বেহেশতে দাখিল হও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দাহর প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পার? সে বলল, না প্রভু! আল্লাহ বললেন, একে দোযখের দিকে নিয়ে যাও।"[১০৩৫] রসূল (সা.) বলেছেন, "তুমি যদি এত অধিক পরিমাণে পাপ কাজ কর যে, তা স্তুপীকৃত হয়ে আসমানের সমান উঁচু হয়, অতঃপর অনুতাপের সাথে তাওবা কর, তথাপি তোমার তাওবা কবুল  হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে না।"[১০৩৬]

একদিন জনৈক হাব্‌শী লোক রসূলে আকরাম (সা.) এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি বহু পাপ করেছি আমার তাওবা কি কবুল  হবে? জবাবে রসূল (সা.) বললেন, "হ্যাঁ কবুল  হবে। লোকটি এ উত্তর শুনেই ফিরে যাচ্ছিলো। কিছুদূর গমনের পর পুনরায় ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল: 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি পাপ কাজ করার সময় আল্লাহ তা'আলা কি আমাকে দেখেছিলেন' রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, "হ্যা দেখেছিলেন"। এটা শুনে হাব্‌শী লোকটি এক বিকট চিৎকার করে ভূতলশায়ী হলো এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল।[১০৩৭]

রসূলে আকরাম (সা.) আর একদিন বলেছেন: "কোন কোন বান্দাহ এমন আছে যে, পাপ কাজের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" তা শুনে ছাহাবাগণ সবিনয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! এ কেমন করে সম্ভব হবে? রসূল (সা.) বললেন: "যে ব্যক্তি পাপ কাজ করার পরে তদ্দরুন বিশেষ অনুতপ্ত হয়ে পড়বে। বেহেশতে পৌঁছা পর্যন্ত সে অনুতাপ ও লজ্জা তার দৃষ্টি পথের সম্মুখে উপস্থিত থাকবে।"[১০৩৮]

রসূল (সা.) বলেছেন: " যে ব্যক্তি (পাপ কাজ অনুষ্ঠানের পরে) তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলা অপরাধমূলক কাজ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণকে তার পাপ কাজের কথা ভুলিয়ে দেন এবং  যে হাত- পায়ের সাহায্যে সে ব্যক্তি উক্ত পাপ কাজগুলো করেছে, সে হাত- পাকে উক্ত পাপগুলোর কথা ভুলিয়ে  দেন এবং যে স্থানে উক্ত পাপ কাজগুলো

---

[১০৩৫] খতীব তাব্‌রেযী (রহঃ), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৩০

[১০৩৬] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ), *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, অনু. মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, প্রকাশনী- মীনা বুক হাউস, বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, দোকান নং- ২০৮ (২য় তলা), ৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ৭ম মুদ্রণ: মার্চ- ২০১৭ইং , পরিত্রাণ খণ্ড,

[১০৩৭] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত

[১০৩৮] ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত

অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে স্থানটিকেও পাপ কাজগুলো ভুলিয়ে দেন, যেন সে ব্যক্তি মহাবিচারক আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিচারার্থে উপস্থিত হলে তার পাপানুষ্ঠানের কোন প্রকার সাক্ষী না পাওয়া যায়।"[১০৩৯]

রসূলে মাকবুল (সা.) আরও একদিন বলেছেন: "পাপ কাজ না করে এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠানের পরে তাওবা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত পাপীর মধ্যে উত্তম।" তিনি আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তা থেকে তাওবা করে, সে ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেন সে পাপ কাজ করে নাই।" রসূল (সা.) আরও বলেছেন: "পাপ কাজ থেকে তাওবা করে পুনরায় কখনও সে পাপের নিকটবর্তী না হওয়াকেই প্রকৃত তাওবা বলে।"[১০৪০]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে বান্দাহকে অপরাধমূলক কাজের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বলে আল্লাহ তা'আলা বুঝতে পারেন- সে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।[১০৪১]

হযরত রসূলে কারিম (সা.) আরও বলেছে, "সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে মানুষের আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। ইতোমধ্যে কেউ তাওবা করে থাকলে তা কবুল হয়, যারা নিজের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের পাপ মার্জিত হয়ে যায়। কিন্তু যারা স্বীয় আত্মাকে হিংসায় পরিপূর্ণ রাখে, তাদেরকে ক্ষমা না করে গুনাহগার অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হয়।"[১০৪২]

**সাক্ষাৎকার**

ইসলামের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবিদ্যীয় রূপরেখা সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাদের নিজস্ব বক্তব্য প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ে ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতা সংজ্ঞায়নে অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বাকীর অভিমত-

"নৈতিকতা হলো ব্যক্তির ওহীজ্ঞান সমন্বিত আকল বা বিবেকলব্ধ নীতিবোধ যা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে আর প্রতিটি কাজের সুষ্ঠু সমাধানই হল নান্দনিকতা। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুম-আহকাম পালন এবং ধর্মীয় বিধানাবলী পরম বিনয় ও নিষ্ঠার সহিত সর্বোত্তমরূপে আদায় করাই হলো নান্দনিকতা।"[১০৪৩]

সিরাজউদ্দিন আহ্মাদের অভিমত-

**নৈতিকতা:** ইসলাম নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম নিদর্শন। যার প্রণয়নকর্তা স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন। এ নীতিবোধ নবী-রসূলগণের মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে। ফলে মানুষ নীতি-নৈতিকতা, হক-বাতিল, সুন্দর-

[১০৩৯] ইমাম গাজ্জালী (রহ:) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত
[১০৪০] ইমাম গাজ্জালী (রহ:) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত
[১০৪১] ইমাম গাজ্জালী (রহ:) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত
[১০৪২] ইমাম গাজ্জালী (রহ:) *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, পরিত্রাণ খণ্ড, প্রাগুক্ত
[১০৪৩] অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *সাক্ষাতকার*, পহেলা জানুয়ারি, ২০১৭

অসুন্দর, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞান লাভ করে। আর এ জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হল পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য আসমানী কিতাব।

**নান্দনিকতা:**

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানব জীবনকে নান্দনিক করে তুলতে নীতিবোধের অকাট্য দলিলরূপে আল-কুরআন ও সুন্নাত এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। নবীকুলের শিরোমণি মুহাম্মাদ মোস্তফা (স) এর মুখনি:সৃত বাণী ও তার উপর নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, আয়াত ও পরিপূর্ণ সূরা পাঠের মধ্য দিয়ে মানবহৃদয়ে এক পরম স্বর্গীয় নন্দনবোধ উৎসারিত হয়। উত্তম কথা ও কাজ জাদুময় নান্দনিকতার পরিচায়ক। এর সর্বোৎকৃষ্ট নজির রসূল (সা:) এর বিদায় হজ্বের দিকনির্দেশনামূলক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ।”[১০৪৪]

ড. মুফতি মুহাম্মাদ কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহী এর মতে, “ইসলামে নৈতিকতা বলতে বুঝায় মানুষের চরিত্রগত আর্দশিক দিকগুলোকে সুসম্পন্ন করা। ইসলামী নন্দনবোধ বা নান্দনিকতা হলো কুরআন-সুন্নাহ লব্ধ জ্ঞান আহরণ ও তার সফল বাস্তবায়ন।”[১০৪৫]

ড. মু. ফজলুর রহমান বলেন, “ইসলামে নৈতিকতার প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই যে সকল নীতিনৈতিকতা আল-কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাই ইসলামী নৈতিকতা।”[১০৪৬]

**উপসংহার**

নৈতিকতা ও নান্দনিকতা ইসলামের এমন এক প্রচ্ছন্ন উপাদান, যা উপলব্ধি করতে হলে ইসলামের নিগুঢ় তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদঘাটন আবশ্যক। হৃদয় গহীনে গ্রথিত এ সত্য এমনই পরশ পাথর সদৃশ যার সংস্পর্শে এসে মানবজীবনে পরম স্বর্গীয় সুখ আস্বাদন সম্ভব। ইসলামী জীবনদর্শনের প্রতিটি দিক ও কোণে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার বিষয়টি অতি সুক্ষ্ম অথচ সার্বিকভাবে বিরাজমান। 'ইসলামের দৃষ্টিতে নন্দনবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণা পত্রটিতে ইসলামী জীবনবোধ সংশ্লিষ্ট নীতি নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সমন্বয়ে কীভাবে মানবজীবন পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করবে, তারই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রারম্ভে নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ উক্ত বিষয়ে ইসলামী নীতি আদর্শ ও প্রসিদ্ধ মনীষীদের সুচিন্তিত মতামত অনুসৃত হয়েছে। একই সাথে ইসলামী নৈতিকতা ও সৌন্দর্যবোধের চিরন্তন সম্পর্কের মাধুর্যকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে বস্তু জগতে এমন সব নিয়ামকের অবতারণা হয়েছে যেখানে দেখা যায় বিবেকবোধ সম্পন্ন না হয়েও হুকুমের অধীনে নৈতিক নান্দনিক প্রক্রিয়ায় তারা স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনে সদা নিয়োজিত। বস্তুত গবেষণা প্রবন্ধটির প্রথমেই ইসলামসিদ্ধ নান্দনিক নৈতিক মূল্যবোধের মৌলিক ধারণা স্থান পেয়েছে।

---

[১০৪৪] অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন আহমাদ, প্রিন্সিপাল, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা, *সাক্ষাৎকার*, ৭ জানুয়ারী, ২০১৭

[১০৪৫] অধ্যক্ষ, ঢাকা নেসারিয়া কামিল মাদরাসা, *সাক্ষাৎকার*, ৯ জানুয়ারী, ২০১৭

[১০৪৬] ড. ম. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫/০১/২০১৭

মুসলিম কৃষ্টি সভ্যতার এক অনিন্দসুন্দর নিদর্শন মুসলিম স্থাপত্য ও ক্যালিগ্রাফি নৈতিকতা ও নান্দনিকতার স্বরুপ চিত্রায়ণ করে। মরুবাসী যাযাবর আরব সমাজ বিজিত অঞ্চলের উন্নত সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধর্মীয় নীতির আলোকে মুসলিম স্থাপত্যকে পরিশীলিত ও স্বতন্ত্র রুপ দিয়েছেন। আবহাওয়া-জলবায়ুগত তারতম্য, উপকরণের সহজলভ্যতা, সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবে মুসলিম স্থাপত্য নির্মাণ কৌশলে স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হলেও ধর্মীয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিচারে সকল মুসলিম স্থাপত্যশৈলী একইসূত্রে গাঁথা। আধ্যাত্মিকতার নিবিড় ছোঁয়ায় মুসলিম স্থাপত্য শিল্পীদের অনবদ্য সৃজনকর্ম মুসলমানদের জীবনধারায় এক পবিত্র (নান্দনিক) চেতনাবোধ জাগ্রত করে।

ইসলামের সকল সৌন্দর্যভাবনা আল্লাহ তা'আলার একত্ব, সত্তাগত সৌন্দর্য থেকে উৎসারিত, আর এজন্যই কবি সাহিত্যিকগণ এটিকে সাহিত্য ও সংগীতের মূল উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের সুন্দর, সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ কবিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অশ্লীল, অসুন্দর ও সত্যের অপলাপ ঘটে এমন কবিতাকে দারুণ ভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষা হলো সত্য ও সুন্দরের প্রতিনিধিত্বকারী এমন এক সঞ্জীবনী শক্তি যা হৃদস্পন্দনের ন্যায় মানবজীবনকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত অথচ গতিশীল করে সমগ্র জীবনধারায় পরিপূর্ণতা এনে দেয়। নৈতিক নান্দনিক শিক্ষার যথার্থ প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা চারাগাছ থেকে মহীরুহে পরিণত হলেই কেবল এর ধরন্ত ফলের অমৃতরস আস্বাদনে ধন্য হবে সমগ্র জাতি। গবেষণাকর্মটিতে সর্বশ্রেষ্ঠ দুইটি নিয়ামক নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সমাবেশ ঘটিয়ে তথাকথিত শিক্ষার রূপ পরিশীলিত করার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে নানামুখী ধারায় শিক্ষাকে কিভাবে স্বার্থক করে তোলা যায়, তারই একটি সাধারণ ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

গতানুগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধান করলে আমরা এমন এক চিকিৎসা শৈলীর অস্তিত্ব খুঁজে পাই, যাতে বান্দাহর রোগ মুক্তির আশু সমাধান নিহিত। যেখানে সাধারণ চিকিৎসা রোগীর পক্ষে বেদনাদায়ক ও ব্যয়সাপেক্ষ সেখানে ইসলামসিদ্ধ চিরায়ত এ চিকিৎসা পদ্ধতি অধিক সহনীয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন এক অনন্য উপকারী ও নান্দনিক ব্যবস্থাপনা। আল্লাহ ও রসূলের শেখানো চিরকল্যাণময় এ চিকিৎসা ধারায় রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের চমৎকার উপায়সমূহ এই লেখনীতে চিত্রিত হয়েছে। আবার রোগ ব্যাধি যে নিছক দুঃখ কষ্টেরই কারণ নয়, উপরন্তু তা পরম আশীর্বাদ-সেটিসহ নৈতিকতার মানদন্ডে দুনিয়ার সবচেয়ে মহান পেশা চিকিৎসা/ডাক্তারি সেবার সত্যিকার নান্দনিক মর্যাদা কোথায় তাও আলোচিত হয়েছে।

গবেষণাপত্রটিতে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নৈতিকতার পথ-পরিক্রমায় ইসলামী নন্দনবোধকে জাগ্রত করণের অপরিহার্যতা যে কতটা উর্ধ্বে এবং কিভাবে মানবজীবনকে নৈতিক তথা পরিশুদ্ধ করে তোলে তারই একটি সাধারণ ধারণা দেয়া হয়েছে। হালাল-হারামের তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক নৈতিকতার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাঝেই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির প্রকৃত বীজ নিহিত। আল্লাহর নির্দেশক্রমে পেশা ছোট-বড় যাই হোক না কেন, এর সকল ক্ষেত্রে নৈতিকতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই কেবল অনন্ত অসীমের যাত্রায় সাফল্য লাভ সম্ভব, তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে গবেষণাকর্মটিতে।

পার্থিব কার্যাদির আবহের বাইরে দৃষ্টিপাত করলে বান্দাহ আল্লাহ তুষ্টির এমন এক নান্দনিক পথনির্দেশ অবলোকন করবে, যাতে দোজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কল্যাণ নিহিত। এ নির্দেশমালায় কিছু সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে যা দৃশ্যমান না হলেও আত্মার সাথে এতটাই নিগূঢ় ভাবে জড়িত যে, বিচার দিবসে তা আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এ কথা

দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, স্রষ্টার আনুগত্যের মাঝে ইসলামী নন্দনবোধ ও নৈতিকতার নির্যাস লুকায়িত এবং এ আনুগত্য পোষনের একমাত্র সোপান হলো আল্লাহ মনোনিত বিধিবিধানগুলোকে সর্বোত্তমভাবে আদায় করা। তাই নিবন্ধটিতে একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপ বিশেষত গৃহসজ্জা, পানাহার, ঘুম, পবিত্রতা, পোশাক ও সাজসজ্জা, ঈমান, তাকওয়া, নিয়তের বিশুদ্ধতা, সবর, যিকর,শুক্র, তাওবা ও ইস্তিগফার প্রভৃতি কাজ ইসলামী নীতিমালার আলোকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ এবং তা পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতঃ ইহজাগতিক জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল, স্বার্থকমন্ডিত এবং সর্বোপরি পারলৌকিক মুক্তির পথকে কিভাবে সুদৃঢ় করা সম্ভব তারই প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

মুসলিম কৃষ্টি, সভ্যতা ও জীবন পদ্ধতির নন্দনমূল্য বিশ্লেষণ ও ইসলামী নৈতিকতার আলোকে নন্দনচর্চায় ইসলামের দিকনির্দেশনা উপস্থাপন প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী নৈতিক নান্দনিক দর্শন, স্থাপত্য, সাহিত্য-সঙ্গীত, চিকিৎসার স্বরুপ অনুধাবন এবং জীবনাচরণ পদ্ধতি সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম শিল্পশৈলীর তুল্যাতুল্য বিচার প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের পরিধিভুক্ত। প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের প্রধানতঃ ইসলামী সভ্যতার আলোকে কালিক পরিক্রমায় মুসলিম সভ্যতার সমৃদ্ধশিল্প ভান্ডারের অন্তর্নিহিত নান্দনিক প্রবণতাসমূহ অনুধাবন ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে অত্র অভিসন্দর্ভে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামসিদ্ধ নান্দনিক অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে নন্দনত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো নৈতিকতার মোড়কে উন্মোচিত হবে।

দুনিয়ার জীবন মুমিনের জন্য কারাগার সদৃশ সত্ত্বেও এটিই সেই অবারিত সম্ভাবনাময় উর্বরভূমি যেখানে পরম সহিষ্ণুতার সিঁড়ি বেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্বাশত কল্যাণ প্রাপ্তিই মুমিনের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। ইহজগতে আগমনের ভেতর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের যাত্রা শুরু হয় সেই অনন্ত অসীমের পথে, যার শুরু আছে ঠিকই শেষ বলতে তার কিছুই নেই। আখিরাতের অন্তহীন চিরস্বপ্নময় যে নবজীবন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে; তার পাথেয় হিসেবে শস্যভূমি তুল্য এ ধরিত্রী থেকেই প্রকৃত সাফল্য লাভের (জান্নাত) আশায় প্রত্যাশিত শস্যাদি ফলিয়ে নিতে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন শৈলীতে ইসলামী নৈতিকতা ও নান্দনিকতার অনুশীলন একান্তই অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা এই গবেষণাকর্ম দ্বারা আমাকে ও এর পাঠকগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। (সুম্মা-আমীন)

## গ্রন্থপঞ্জী

আরবী/উর্দু/বাংলা

আল-কুরআনুল কারীম


| | | |
|---|---|---|
| আবু আবদির রাহমান আহমাদ শু'আইব আন-নাসাঈ (র.) ইমাম | : | *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, (অনু: মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৮ (ঈসায়ী)। |
| আবু আব্দুল্লাহ- মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (আল ইমাম) | : | *আল আদাবুল মুফরাদ*, অনু: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ৬ষ্ঠ মুদ্রণঃ নভেম্বর, ২০১৮। |
| আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌নে ঈসা আত্-তিরমিযী | : | *আল জামে আত-তিরমিযী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯২। |
| আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশআস্ আসসিজিস্তানী (আল ইমাম) | : | *আবূ দাউদ শরীফ* (অনু: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অন্যান্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, আগষ্ট ২০০৬। |
| আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআক্বিরী | : | *সিরাতুন নবী*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৫ জুলাই, ২০১৭। |
| আবূ সালমান আব্দুল হামিদ মাদানী | : | *সুখের সন্ধান*, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০৩। |
| আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাযযালী (রহঃ) ইমাম | : | *ইসলামী আকীদা*, (অনুঃ মুহাম্মদ মূসা), খোশরোজ কিতাব মহল, ২৫/ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০৯ (ঈসায়ী)। |
| আবু হামেদ মুহাম্মদ আল গাযযালী (রহঃ) ইমাম | : | *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, (অনুঃ মাওলানা মাসুম বিল্লাহ্) মীনা বুক হাউজ, ঢাকা, মার্চ ২০১৭। |

| | | |
|---|---|---|
| আবুল কাশিম জারুল্লাহ মাহমুদ ইব্ন উমার আল জামাখশারী | : | *আল কাশ্‌শাফ আন হাক্বায়িক্বি আন তানযীল ওয়া উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওয়ূহি আল তাবীল মিশর*, মাকতাবা মিশর, তা. বি.। |
| আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাছীর | : | *তাফসীর ইবন্ কাছীর*, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, গুলশান, ঢাকা-২০০৮। |
| আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন | : | *আরব স্থাপত্য*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা-১০০০, ৩য় সংস্করণ, জুন, ১৯৯৩। |
| আবুল হাশিম | : | *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী: ১৯৮২। |
| আব্দুল মুকিত চৌধুরী | : | *শেষ সালাম*, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। |
| আব্দুল মান্নান তালিব | : | *ইসলামী সাহিত্য, মূল্যবোধ ও উপাদান*, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা। |
| আব্দুস শহীদ নাসিম | : | *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, নভেম্বর ১৯৯৭ ঈসায়ী। |
| আব্দুস শহীদ নাসিম | : | *ইসলামী অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা*, কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, ঢাকা, ২৭ আগষ্ট ২০১০। |
| আব্দুল হামিদ ফাইযী | : | *হারাম রুযী ও রোজগার*, ৪ জুন ২০০৫ ঈসায়ী। |
| আশরাফ আলী থানবী চিশতী (র) মাওলানা | : | *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম ও নারীর মর্যাদা*। অনু:পীরে কামেল আলহাজ্ব মাওলানা শামসুল হক সাহেব। সোলেম্যানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, আগষ্ট ২০১০। |
| আশ-শামী আত-তাবারানী | : | *আল মু'জামুল কাবীর*, মাকতাবায়ে, ইবনে তাইময়া, কায়রো, ১৯৮৩ ঈসায়ী। |

| | | |
|---|---|---|
| আলী আহমাদ (ডক্টর) | : | *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-১০০০, জুন ২০১৫ ঈসায়ী। |
| আলী ইবনে আবী তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু), (হযরত) | : | *নাহজুল বালাগা*, নুরুস সাকালায়েন জনকল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশঃ ২০০৩ |
| আবুল হুসায়ন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী (আল ইমাম) | : | *মুসলিম শরীফ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ*, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, তৃতীয় সংস্করণ মে, ২০০২। |
| আব্দুল মান্নান সৈয়দ | : | *বাংলা সাহিত্য মুসলমান*, ১৯৯৮। |
| আব্দুল হামিদ ফাইযী | : | *হারাম রুযী ও রোযগার*, ৪ জুন ২০০৫ (ঈসায়ী) |
| আব্বাস আলী খান | : | *ঈমানের দাবী*, প্রকাশনী : বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, মে- ২০০৫। |
| আব্দুস শহীদ নাসিম | : | *বাংলাদেশ ইসলামি শিক্ষানীতির রূপরেখা*, ইসলাম হাউজ, ২০০৯ ঈসায়ী। |
| আব্দুস শহীদ নাসিম | : | *ইসলামী জীবনধারা*, সউদী আরব, রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হি.। |
| আসাদ বিন হাফিজ (সম্পাদক) | : | *নির্বাচিত ইসলামী গান*, প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ১ম প্রকাশ- নভেম্বর ১৯৯৬। |
| ইউরি বোরেভ | : | *নন্দনতত্ত্ব: একটি পাঠ্যগ্রন্থ*, অনুঃ শামসুদ্দীন চৌধুরী, বর্ণায়ন প্রকাশন ২০১২। |
| ইউসুফ আল কারযাভী (আল্লামা) | : | *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনু-মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১ মে, ১৯৮৪ ঈসায়ী। |
| ইউসুফ ইসলাহী (আল্লামা) | : | *আদাবে যিন্দেগী*, অনুবাদ- মুহাম্মাদ আবুল বাশার আকন্দ ও কে এম আ: খালেক, দারুস সালাম বাংলাদেশ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, এপ্রিল ২০১০ ঈসায়ী। |

| | | |
|---|---|---|
| ইব্‌ন মাজাহ্‌ আল কাযবীনী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ | : | *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬। |
| ইব্‌ন মাজাহ, আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন্‌ ইয়াজীদ আল কাযবীনী (আল ইমাম) | : | *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, অক্টোবর ২০০০। |
| ইব্‌ন হাম্বল আশ শায়বানী (রহঃ) | : | *আল মুসনাদ* (মুসনাদে আহমদ), বৈরুত, ২০০৮ (ঈসায়ী) |
| ইবনে আবু বকর আল জামিউস সাগীর ফী আহাদীরিল বাশীরিন নাযির আস সুয়ূতী | : | *দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ*, বৈরুত, ২০০৪ ঈসায়ী। |
| ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী (রহঃ) | : | *আল মুসনাদ* (মুসনাদে আহমদ) বৈরুত, ২০০৮ খ্রি. |
| ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যা (রহঃ) | : | *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ*, সু' আসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪। |
| ইবরাহীম মাদকূর (ড.) | : | *আল-মুজাম আল ওয়াসীত*, দেওবন্দ, কুতুবখানা হুসায়নিয়াহু- তাঃ বি। |
| ইয়ার খাঁন নঈমী (আল্লামা মুফতী) | : | *ইসলামী জিন্দেগী*, নিশান প্রকাশনী, চট্টগ্রাম- ১৯৯৬ইং। |
| উইলিয়াম হান্টার | : | *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুঃ আবদুল মওদূদ, আহমাদ পাবলিশিং হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, জুন ২০০৮। |
| উপদেষ্টা পরিষদ | : | *আল-মাওসু "আতুল ফিকহিয়্যাহ, ইসলামী ফিকহ্‌ বিশ্বকোষ*-৩, ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন-১, বাংলাদেশ ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, নভেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী। |
| এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী (ডক্টর) | : | *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। |
| এস. এম জাকির হুসাইন | : | *সৌন্দর্যতত্ত্ব*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২ ক, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৬। |
| এ. জেড. এম শামসুল আলম | : | *মাদরাসা শিক্ষা*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম, মে ২০০০। |

| | | |
|---|---|---|
| এ. জেড. এম শামসুল আলম | : | *মুসলিম সংগীত চর্চার সোনালী ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০১২। |
| এম. আব্দুল হামিদ (ডক্টর) | : | *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, অনন্যা প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ৩য় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০। |
| কাজী দীন মুহাম্মদ | : | *জীবন সৌন্দর্য*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৮৯। |
| কাজী নজরুল ইসলাম | : | *নজরুলের শিশু-কিশোর সাহিত্য* (সম্পাদনাঃ ড. সৈয়দা মোতহেরা বানু), নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ঈসায়ী। |
| কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী | : | *তাফসীরে মাসহারী*, সেরহিন্দ প্রকাশন, ৮৯ যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩, জুলাই, ১৯৯৮। |
| কাশেম শরীফ (মাওলানা) | : | *চাষাবাদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি*, কালের কণ্ঠ (দৈনিক) ২৮ এপ্রিল ২০১৭। |
| খতীব তাবরেযী (র), শামস ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ | : | *মেশকাত শরীফ* (অনুঃ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব), সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, এপ্রিল ২০১০। |
| খন্দকার মাহমুদুল হাসান | : | *বাংলা সাহিত্য মুসলিম অবদান*, প্রকাশকঃ মুহাম্মাদ আরিফুর রহমান নাইম, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। |
| জামাল আল বাদাবী (ড.) | : | *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ* (অনুঃ ডাঃ আবু খলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), অক্টোবর ২০১২। |
| জাফর আলম | : | *বাংলাদেশের স্মরণীয় বরণীয়*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৩। |

| | | |
|---|---|---|
| জিয়াদ আবু রাজায়ী | : | *রিযকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর ইচ্ছাধীন* (অনুবাদ- সানাউল্লাহ নজির আহমাদ), ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ৩ মে ২০১৩ ঈসায়ী। |
| জাফর আলম | : | *বাংলাদেশের স্মরণীয় বরণীয়*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৩। |
| জিয়াদ আবু রাজায়ী | : | *রিযকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর ইচ্ছাধীন* (অনুবাদ- সানাউল্লাহ নজির আহমাদ), ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ৩ মে ২০১৩ ঈসায়ী। |
| ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ | : | *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০৪। |
| দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | : | *রূপ, রস ও সুন্দর*, ঋদ্ধি পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, ইন্ডিয়াঃ ১৯৮১। |
| নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | : | *কাজের আনন্দ*, আমার বাংলা বই (বোর্ড বই) ২য় শ্রেণি। |
| নাসিরুদ্দীন আলবানী (আল্লামা) | : | *হাদীসে কুদসী সমগ্র*, অনুবাদকঃ আল মাসরুর, সম্পাদন- অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২। |
| নাসিরুদ্দীন তুসী | : | *হিজাব, পর্দা ও ফ্যাশন*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকাঃ ২০০৭। |
| নূর মোহাম্মদ আ'জমী (মাওলানা) | : | *মেশকাত শরীফ*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা-১১০০, ৭ জানুয়ারি ১৯৮০। |
| পি. কে. হিট্টি | : | *আরব জাতির ইতিহাস*, অনু: জয়ন্ত সিংহ, সেজুতি ভট্টাচার্য, সৌমিত্র সেনগুপ্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ১৯৯৯। |

| | | |
|---|---|---|
| ফাউখান শাইখ সালিহ আল ফাউযান | : | *সবরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা*, (অনু: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল), দাঈ জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার সউদী আরব, ১৬ মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী। |
| মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (ইমাম) | : | *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু: মাওলানা ফজলুর রহমান, মীনা বুক হাউজ, ৫ ও ১৩, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০। |
| মালিক ইবনে আনাস (ইমাম) | : | *আল মুয়াত্তা*, কিতাবুল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯৮ ঈসায়ী। |
| মুনির উদ্দীন আহমাদ (হাফেজ) | : | *কোরআন শরীফ*, আল কুরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ৫ম প্রকাশ ডিসেম্বর। |
| মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম | : | *উসলুল ঈমান*, অনুবাদ ড. মোহাম্মদ ইলাহী, ড. আবু মুহাম্মদ জাকারিয়া, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স, নর্থব্রুক রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ২য় সংস্করণ আগষ্ট ২০১৬। |
| মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেম | : | *উসূলুল ঈমান*: কুরআন সুন্নাহর আলোকে ঈমানের মৌলভী নীতিমালা, অনু: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৪ ঈসায়ী। |
| মীযানুর রহমান ইকবাল (সম্পাদক) | : | *দেশে বিদেশে*, ইকবাল একাডেমী, ৫নং পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৯। |
| মুকুল চৌধুরী | : | *কবি ও কবিতার প্রতি রসূল (স) এর অনুরাগ ও উৎসাহ*, মজিদ পাবলিকেশন, ঢাকা। |
| মুহাম্মদ আবু তাহের | : | *ইসলামের ইতিহাস ও ব্যাংকিং প্রকাশনী*, চলক, ডিসেম্বর ২০০৬। |
| মুহম্মদ আবদুর বারী | : | *মুসলিম দর্শন ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি*, প্রকাশক: শুভেচ্ছা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৫-১৬ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০১। |

| | | |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (মাওলানা) | : | *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, খায়রুন প্রকাশনী*, ১৩ কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০, মে-১৯৯৬। |
| মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (মাওলানা) | : | *ইসলামের নীতিদর্শন*, খায়রুন প্রকাশনী, ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, জুন ২০০১। |
| মুহাম্মদ আব্দুর রহিম (মাওলানা) | : | *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, আগষ্ট, ২০১২ ঈসায়ী। |
| মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ | : | *রসুলুল্লাহ শিক্ষাদান পদ্ধতি*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, মে-২০০১। |
| মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী (ড.) | : | *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ঈসায়ী। |
| মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী | : | *আদর্শনিষ্ঠা ও পরা-নীতিবিদ্যা*, ক্ষণিকা, বৈশাখ ২৬, ১৩৮৮। |
| মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (ইমাম) | : | *বুখারী শরীফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, সপ্তম সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬। |
| মুহম্মদ এনামুল হক (ড.) | : | *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯। |
| মুহাম্মদ ছালেহ আল মুনাজ্জিদ | : | *আল্লাহর উপর ভরসা, অনু: মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, হাদীছ ফাউণ্ডেশন*, বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩, ডিসেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী। |
| মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ (ডা:) | : | *সুন্নতে রসূল (সা.) ও আধুনিক বিজ্ঞান*, (অনু: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), আল কাওসার প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, জানুয়ারি, ২০১৩ ঈসায়ী। |

| | | |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান | : | *মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮০। |
| মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন (ডক্টর) | : | *ইসলামের আলোকে চিকিৎসা বিজ্ঞান*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা-চট্টগ্রাম ১০ অক্টোবর, ২০১৩ ঈসায়ী। |
| মুহাম্মদ শাফী (মাওলানা মুফতী) | : | *মা'আরিফুল কুরআন*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮২। |
| মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (হাফেজ) | : | *দর্শন বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোকে দো'আ*, নকিব পাবলিকেশন্স, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, সেপ্টেম্বর, ২০০৯। |
| মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান | : | *কোরআন সূত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৫। |
| মোঃ আব্দুর কাদের (ডঃ) | : | *ইসলামে হালাল উপার্জন: গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ইসলাম প্রচার ব্যুরো*, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ৪ অক্টোবর, ২০০৬ ঈসায়ী। |
| মোঃ আলমগীর হোসেন | : | *নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন*, গুগল প্লাস পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০১৪। |
| মোঃ ছানাউল্লাহ (ড.) | : | *ইসলামে 'তাকওয়ার স্বরূপ ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব'* ডিসেম্বর ২৩, ২০১২ ঈসায়ী। |
| মোঃ বাকী বিল্লাহ | : | *কোন চাকরি ইসলাম নিষিদ্ধ?* PNS News 24 ১২ জুন, ২০১৬ ঈসায়ী। |
| মোফাজ্জল হক (মাওলানা) | : | *বোরকা ওড়না সাজসজ্জা*, খন্দকার প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ |
| মোহাইমিনুর রশিদ | : | *ইসলাম ও কৃষি*, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অভিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, সিলেট, নভেম্বর ২২, ২০১৭। |
| মোহাম্মদ আজহার আলী | : | *পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন*, বাংলা একাডেমী ১৯৮২। |

| | | |
|---|---|---|
| মোহাম্মদ আব্দুর রহীম | : | *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, যোগাযোগ পাবলিশার্স, ৩৪৫ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। |
| মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | : | *তাফসীরে নুরুল কোরআন*, আল বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০৬। |
| মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ | : | *পারস্য প্রতিভা*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-২০১০। |
| মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন (অধ্যাপক ডক্টর) | : | *প্রেম ও প্রজ্ঞার বাহক রুমি*, জোনাকী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০১৯ |
| মোহাম্মদ শামসুজ্জামান | : | *যুগ যুগান্তরের মুসলিম মনীষা*, প্রকাশক- ইবরাহিম খলীল (পারভেজ), ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বর্ণবিন্যাস- জবা কম্পিউটার। |
| রশীদুল আলম (ড.) | : | *নীতি বিদ্যাপরিচয়*, মেরিট কেয়ার প্রকাশন, ৪র্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৭। |
| রফিকুল ইসলাম | : | *নজরুল-জীবনী*, নজরুল ইনষ্টিটিউট, কবি ভবন, প্রথম মুদ্রণঃ একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩। |
| শাহ-মুহাম্মদ আহমাদ রেজা খান বেরলভী ও সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী | : | *তরজমা-ই কুরআন*, ইমাম আহমাদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬। |
| শেখ সা'দী হযরত | : | *গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ*, মোহাম্মদ আবু জাফর, মীনা বুক হাউজ, ৪৫ বাংলা বাজার, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৫। |
| শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী | : | *হালাল রিযিকের সন্ধানে*, ইমাম পাবলিশেন্স লিঃ ঢাকা জানুয়ারি, ২০১৬ ঈসায়ী। |
| শেখ আব্দুল আজীজ বায | : | *ইসলামি হিজাব ও পর্দা*, উত্তর রিয়াদের ইসলাম প্রচার কার্যালয়, ইসলাম, ওয়াকফ, দাওয়া ও ইরশাদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে। |
| শেখ আবদুল ওয়াহাব | : | *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, শিখা প্রকাশনী, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। |
| সাইয়্যেদ কুতুব | : | *পি যিলালিল কুরআন*, আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, ১৯৯৫। |

| | | |
|---|---|---|
| সুলাইমা ইবনুল আশ আছ আস্ সিজিস্তানী | : | *সুনানু আবু দাউদ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯০। |
| সাঈদ ইব্ন ্অলী ইব্ন ওয়াহফ আল ক্বাহাত্বানী (ড.) | : | *হিসনুল মুসলিম*, অনু. ড আবূ বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া ও আব্দুর রহমান মজুমদার, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স, বর্ধিত সংস্কৃরণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬। |
| সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (অধ্যাপক ড.) | : | *মুসলিম ক্যালিওগ্রাফি*, মজিদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা। |
| সাইয়্যেদ সাবেক | : | *ফিক্হুস্ সুন্নাহ*, অনু. আকরাম ফারুক, আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস, রেলগেট, ঢাকা-১২১৭, সেপ্টেম্বর ২০১২। |
| সম্পাদনা পরিষদ | : | *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা, ই.ফা. বা ১৯৯২ ঈসায়ী। |
| সম্পাদনা পরিষদ | : | *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- জুন ২০০৬ ঈসায়ী। |
| সাইয়্যেদ কুতুব | : | *আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য* (অনু: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন), খায়রুন প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৮ ঈসায়ী। |
| হাফিজ আল্লামা ইমানুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র.) | : | *তাফসীরুল কুরআনিল কারীম*, (অনু: অধ্যাপক আখতার ফারুক), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন। বাংলাদেশ, ঢাকা। |
| হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী (র), (ইমাম) | : | *আল মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন*, কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯০ ঈসায়ী। |
| হাসনাত আব্দুল হাই | : | *সবার জন্য নন্দনতত্ত্ব*, কাগজ প্রকাশনী, ঢাকা: ২০০৪। |
| হুসাইন আল-বায়হাকী (রহ:) | : | *শুয়াবুল ঈমান*, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রি.। |
| হাফেজ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান | : | *দর্শন বিজ্ঞান ও কুরআনের আলো দো'আ*, নাবিক পাবলিকেশন্স, ৪৫ বাংলা বাজর, ঢাকা-১১০০, সেপ্টেম্বর ২০০৯। |
| **ইংরেজি** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Aristotle | : | *The poetics*, tram lated by D. S. Margoiouth London Hodder and Stoughton, 1911. |
| A. M. Chowdhury | : | *Education in Islamic Society*, Dhaka, 1965. |
| A. N Whitehead | : | *The aim of education and other essays*, New York: Free Press, 1967. |
| A. R. Mallick | : | *British policy and Muslim Bengal*, Bangla Academy, Dhaka, June 1977. |
| Bahammam, Ahmed S | : | *Sleep from an Islamic respective*, PMC US national librares of medicine, October – December 2011. |
| Basnet, syasor et al | : | *Associations of common chronic non – communication disease and medical condition with sleep – related problems in a population based health examination study*, PMC US National library of medicine national institute of health, 25 November 2016. |
| Edwyn Bevan | : | *Symbolism and Belief*, George Allen and Unwin Limited, 1938. |
| Hamza Andreas Tzortzis | : | *Aesthetics reception of the Quran* |
| Jerrold Levinson | : | *Aesthetics and ethics: Essays a the intersection*. United States of America by Cambridge University Press, New York, 1998. |
| Joseph Twadell ~tipely | : | *Dictionary of word origin*, LLC: Literacy Licensing, 2018. |

| | | |
|---|---|---|
| KAC Creswell | : | *A short account of early Muslim architecture*, revised edition, Cairo: The America University Press, 1989. |
| Masudul Alam Chowdhury | : | *A critical examination of the concept of Islamization of knowledge in contemporary times*, Muslim Education Quarterly, 10. |
| Milton Cowan | : | *A dictionary of modern written Arabic*, Macdonald and Evans Ltd. London, Third printing 1974. |
| Nasr, Seyyed Hossein | : | *Islamic Art and Spirituality*, State University of New York Press, State University Plaza, Albany, N.Y 12246, 1987. |
| Omar W. Nasim | : | *Toward an Islamic Aesthetic Theory*, The American Journal of Islamic Sciences. |
| Richard Yeomans | : | *The art and Architecture of Islamic Cairo*, Garnet Publishing Limited, 8 Southern Court, South Street Reading RGI 4QS, UK, 2006 |
| R.O. Ettinghausen | : | *Grabas and M. Jenkings*, Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven and London, Pelican publishers, 2001. |
| Sahitya Samsad | : | *English – Bengali dictionary* Calcutta 22nd Press, September 1990. |
| Thomas Aquinas | : | *Summa Theologica*, Volume-1. |

| | | |
|---|---|---|
| Valeri Gonzalez | : | *Beauty and Islam*, Aesthetic in Islamic Art and Architecture I.B. Tanis and Co. Ltd. 6 Salem Rd. London W2 4Bu 175 Fifth Avenue, New York, N.Y-10010, 2001. |

আব্দুল মুকিত চৌধুরী, *'শেষ সালাম'* 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

ইবন্ জারীর আত তাবরী, *তারীখুত তাবারী* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭) ২য় খন্ড, পৃ. ৯০; শায়খ আলী ইবন্ বুরহানুদ্দীন আল হাকাবী আসযীরাতুল হালাবিয়্যা (মিসরঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ ১৩২৮ হিজরী) ৩য় খন্ড।

জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (ষান্মাসিক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ড. সিরাজুল হক, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, সংখ্যাঃ ৮, ৯ জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারী- জুন ২০১৪ ঈসায়ী।

মুহাম্মদ আলী আল হাবরুক, পত্রিকা আল জমহুরিয়াহ, কায়রো, ০৩-০৩-১৯৬৬

Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006

Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, No-5, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006

Editor: Professor A. B. M. Siddiqur Rahman Asrafi PhD, *The Quranic Studies*, Journal of the Department of Al-Quran and Islamic Studies, Volume-5, Islamic University, Kushtia, Bangladesh, June 2006 আলী ইবন্ বুরহানুদ্দীন আল হালাবী, প্রাগুক্ত, ২৮২